প্রকাশক—
প্রবীর ভট্টাচার্য
মনোমোহন প্রকাশনী
৫৪/৮ কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০০৭৩

প্রকাশকাল—
৪ঠা শ্রাবণ, ১৩৬৫

মুদ্রাকর—
শীতলচন্দ্র রায়
তারকেশ্বর প্রেস
৬, শিবু বিশ্বাস লেন
কলিকাতা—৭০০০০৬

জনসংযোগ ও বিক্রয় প্রতিনিধি

ডেল কার্নেগী রচিত

PUBLIC SPEAKING AND INFLUENCING MEN IN BUSINESS

অবলম্বনে ভাষান্তরিত সম্পাদনা

মুকুল গুহ

মনোমোহন প্রকাশনী • কোলকাতা তিয়াত্তর

ডেল কার্নেগীর ভাষায়

সেই বিস্ময়কর সফলকাম পুরুষ ও ঐতিহাসিক বাগ্মী

বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলীন-এর

মহান স্মৃতির উদ্দেশ্যে—

ডেল কার্নেগীর আরও কয়েকটি বই

আনন্দময় কর্ম ও সুখীজীবন—১০.০০

যদি বড় হতে চান—১০.০০

অনুসরণ ও সাফল্যের নূতন দিগন্ত—৮.০০

মন জয় করার সহজ উপায়—১০.০০

ভূমিকা

বারো বছর বয়স পর্যন্ত যে বালকটি কোন মোটর গাড়ি দেখেনি। কাছাকাছি রেল স্টেশনটির দূরত্ব ছিল দশ মাইল। মিসৌরি গ্রামে ঘণ্টায় পাঁচ সেণ্টের বিনিময়ে স্ট্রবেরী ফল ঝুড়ি ভর্তি করে যার দিন চলতো, সেই বালকটিকেই ছেচল্লিশ বছর বয়সে সারা পৃথিবীর লোক চিনে ফেললো।

প্রতি মিনিটে এক ডলারের বিনিময়ে যিনি কথা বলা শেখার স্কুল খুললেন। সমাজের উঁচুতলার হোমরা—চোমরা মানুষ পর্যন্ত যাঁর ছাত্র হতে ইতস্ততঃ করেননি—তিনি হলেন ডেল কার্নেগী।

ডেল কার্নেগী, প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের ভেতরকার সুপ্ত প্রতিভা, অব্যবহৃত শক্তিকে উদ্দীপনা আর অধ্যবসায়ের আগুনে পুড়িয়ে খাঁটি সোনায় রূপান্তরিত করার পবিত্র মহান কার্যে; এক অনন্য শিক্ষাব্রতীর ভূমিকা পালন করে চলেছেন।

আজ পৃথিবীর, অনেক বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ডেল কার্নেগীর লেখা বইগুলো পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এখানে কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম আপনাদের জ্ঞাতব্যে আনা হলো।

(১) আমেরিকান ইনস্টিটিউট অফ ব্যাঙ্কিং
(২) ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ক্রেডিট
(৩) ফোর্ডহাম য়ুনিভার্সিটি
[illegible]র্ক টেলিফোন কোং
(৫) ব্যবসন ইনস্টিট্যিউট
(৬) ডিপার্টমেণ্ট অফ সিভিল ইঞ্জিনীয়ারীং,—
জন্স হপকিন্স য়ুনিভার্সিটি।

[illegible] কার্নেগী আজ অবধি বহু লক্ষ লোককে তাদের আত্ম-বিশ্বাস আর কর্মশক্তি বাড়িয়ে এক আনন্দময় সুখী কর্মজীবনের সন্ধান দিয়েছেন।

—লোয়েল টমাস

ডেল কার্নেগী পড়েছিলাম বহুদিন আগে,—যখন ম্যাট্রিকুলেশানের ছাত্র-সেই সময়। এখনও বিদেশের বহু স্কুলেই ছাত্রদের ডেল কার্নেগীর রচনা অতিরিক্ত পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে ডেল কার্নেগীর নাম এখনও বহু পাঠকের কাছে অজ্ঞাত। ইংরাজী সাহিত্যের বহু নিয়মিত বাঙ্গালী পাঠক আছেন, যাঁদের বুক কেশে হোমার —দান্তে থেকে শুরু করে পাবলো নেরুদা পর্যন্ত অনেকেই সেখানে বিরাজমান, কিন্তু ডেল কার্নেগী—নৈব নৈব চঃ। প্রশ্ন করলে সেই বুক-কেসের মালিক হয়ত উত্তর দেবেন—আরে ও তো আমার না পড়েই জানা হয়ে গেছে। মানুষের সঙ্গে কি করে কথা বলতে হবে তা আবার বই পড়ে শিখতে হবে?—সেই বহু গ্রন্থের পাঠক ভদ্রলোকের শিক্ষাভিমান এখানে রীতিমত আহত হয়ে পড়ছে। বাংলা ভাষায় ডেল কার্নেগীর প্রকাশনার বয়স বিশ বছর পার হয়ে গেছে। এদিক থেকে বাংলা ভাষা ও বাঙ্গালী পাঠকরা সমস্ত ভারতীয় ভাষার মধ্যে শীর্ষস্থান দাবী করতে পারেন। মাত্র কয়েক বছর আগে কার্নেগী হিন্দিতে প্রকাশিত হয়েছে। সম্প্রতি আরও কয়েকটি ভারতীয় ভাষায় অনুবাদের খবর পাওয়া গেছে। এ থেকে আশ্বস্ত হওয়া যায় এই ভেবে যে এদেশেও তাহলে মানুষ তার খাটাখাটনি সম্পর্কে ভাবনা চিন্তা করছে!

বাংলায় এখনও অবধি জনসংযোগের উপর কোন বই প্রকাশিত হয় নি। "বিক্রয় প্রতিনিধি" বিষয়ের অবস্থাও তথৈবচ। জনসংযোগ ও বিক্রয়প্রতিনিধি সেদিক থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বই। এই বইয়ের প্রকাশক প্রবীর ভট্টাচার্যের অদম্য উৎসাহ ও প্রকাশনা ক্ষেত্রে তার গতানুগতিক হীন রুচি ও শ্রীমতি কৃষ্ণা মিত্রের অকৃপণ সহযোগীতার জন্যই এই বইয়ের প্রকাশনা সম্ভব হলো। এঁদের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার আত্মতৃপ্তির সহায়ক। আর একজনের কাছে সবিশেষ কৃতজ্ঞ তিনি—হার্বার্ট ক্যাসন, "আপ-টু-ডেট সেলসম্যানশীপ" বইয়ের লেখক।

॥ মুকুল গুহ ॥

সাহসী হ'য়ে ওঠা এবং আত্মবিশ্বাসের চাবিকাঠি

জনসংযোগের সমস্যা নানানরকমের, বিশেষতঃ বক্তৃতা দেওয়ার প্রয়োজন যেখানে, সেখানে অভ্যাস, সাহস এবং আত্মবিশ্বাসের অভাব হ'লে চলে না। সমস্যা যত রকমেরই হোক না কেন মোটামুটি এইভাবে সম্ভবতঃ সমস্যাগুলির মূলনিরেখ প্রয়োজনীয়—"যখনই আমাকে বক্তৃতা দেবার জন্য, মঞ্চে ডাকা হয়, আমি এত বেশী আত্মসচেতন হয়ে পড়ি। ভয় আমাকে পেয়ে বসে, কোন কিছুই সঠিকভাবে ভাবতেই পারি না ছাই, মনসংযোগ ত দূরের কথা, মনে হয় নিজের দুপায়ের ওপর দাঁড়িয়ে থাকাটাই কঠিন হ'য়ে পড়ছে। উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর সামনে, আমার কথাগুলি গুছিয়ে বলতে চাই আমি, কিন্তু কেমন সব যেন গুলিয়ে যায় ক্রমশই"—সমস্যাটির রকম কতকটা এই রকমই কিন্তু সত্যিকারের বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে অনুশীলনের ফলে যে ভদ্রলোকটি কয়েকমাস আগেও অসহায় ভাবে লুকিয়ে বেড়াতেন বক্তৃতা দেয়ার ভয়ে তিনি দিব্যি দিনের পর দিন বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতে সংকোচ ত বোধ করছেনই না, বরং আনন্দই পাচ্ছেন যথেষ্ট।

আসলে আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তোলা কিংবা সাহস সঞ্চয় করার কাজটি সাধারণ লোকে যতটা কঠিন ভেবে থাকে, ব্যাপারটা সেরকম কিছুই নয়। উপস্থিত কিছু গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সামনে, শান্ত, ধীরভাবে নিজের বক্তব্য সুকৌশলে তুলে ধরতে পারার সামর্থ অভ্যাস সাপেক্ষ। কোন অবস্থাতেই মেনে নেওয়া সম্ভব নয় যে এই ধরনের পেরে ওঠাটি ঈশ্বর প্রদত্ত মাত্র এবং বিশেষ কয়েকজনের ওপরই সেই অনুগ্রহ বর্ষিত হ'তে পারে। বরং উল্টোটাই ঠিক। যে কোন

মানুষ সঠিক ইচ্ছা দ্বারা চালিত হ'য়ে কাজে নিযুক্ত হ'লে তার সুপ্ত সামর্থ্যগুলো প্রস্ফুটিত করা সম্ভব।

পৃথিবীতে এমন কি কারন থাকতে পারে যে বসে থাকাকালীন যে চিন্তাগুলি মানুষটি ক্রমাগত করে চলেছিল সেটি সে মঞ্চে উঠে করতে পারবে না। নিশ্চয়ই সেরকম কোন কারনই নেই। বরং লোকজনের সামনে দাঁড়িয়ে পড়লে আরো বেশী চিন্তা করার অবকাশ থাকাটাই স্বাভাবিক। নয় কি? লোকজনের উপস্থিতিই ত লোকটিকে উত্তেজিত ক'রে তুলে, তাকে উচ্চতর অবস্থায় দাঁড় করিয়ে দেবে। তাই না? পৃথিবীর বিখ্যাত বক্তাদের অনেকেই বলবেন যে, শ্রোতৃমণ্ডলীকে সামনে দেখার সংগে সংগেই তারা একটি বিশেষ ধরনের প্রেরনা পেয়ে থাকেন। একটি বিশেষ ধরনের উত্তেজনা সব মিলিয়ে তাদের মস্তিষ্কের কোষগুলোকে আরো ভালোভাবে কাজ করছে। এইরকম সময়, যে সমস্ত ঘটনা, ধারনা কিংবা চিন্তাভাবনাগুলোর কথা তিনি ঘুনাক্ষরেও' ভাবেন নি সেগুলি পরপর সারি দিয়ে আসতে সুরু করে তার সামনে অতি স্বাভাবিক ভাবেই। ফলে বক্তৃতা দেয়ার কাজটি কেমন সহজ হয়ে যায় তার কাছে, তবে এটা ঠিকই যে ওইসব ভিড় করে আসা ভাবনা চিন্তাগুলোকে আবার সঠিক ভাবে অত্যন্ত কম সময়ের মধ্যে কাজে লাগানোর পদ্ধতিটিও অভ্যাস করা দরকার। সেটাই হওয়া উচিৎ বক্তার অভিজ্ঞতার প্রমান। এবং তা হ'তে পারে কেবলমাত্র ধৈর্য্য এবং অভ্যাসের নিষ্ঠা অনুসারে।

এই ব্যাপারে অবশ্য একটা নিশ্চয়তা র'য়েছে—অভ্যাস আর নিষ্ঠার দ্বারা শ্রোতৃমণ্ডলীর ভয় কেটে যাবে, আত্মবিশ্বাস এবং সাহস সহজেই ফিরে আসবে। একথাটি ভাববারই দরকার নেই যে আপনার, হ্যা বিশেষতঃ আপনার অবস্থাটি হতাশাব্যাঞ্জক। কঠিন, কারণ মনে করা যেতে পারে যে, বিখ্যাত সব বক্তরাও তাঁদের প্রথম জীবনে একই রকম ভাবে বক্তৃতামঞ্চে উঠতে ভয় পেতেন। হঠাৎই

আত্মসচেতন হ'য়ে পড়তেন—যেমন ধরুন একজন বিখ্যাত যুদ্ধবিশারদের কথা, একজন জেনারেল কিংবা অনুরূপ কেউ, বলতে শোনা গেছে যে সৈনিকদের সামনে বক্তৃতা দেবার আগে, উঠে দাঁড়ালেই তার তুই হাঁটু ঠকঠক করে কেঁপে উঠত। কিংবা মার্ক টোয়েনের কথা, যিনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে, প্রথম প্রথম বক্তৃতা দিতে ওঠার সময়ে তার মুখ শুকিয়ে যেত, মনে হ'ত যেন একটুরা তুলো কেউ মুখের মধ্যে ভরে দিয়েছে, আত্মসচেতনতা ঝলকে ঝলকে আড়াল দিচ্ছে সব চিন্তা আর গুছিয়ে রাখা বক্তৃতার বিষয়গুলি। ইংলণ্ডের হাউস্ অব্ কমোন্স-এ ত সবাই বলাবলি করেন যে "কোন নতুন সদস্যের প্রথম বক্তৃতায় জড়তা থাকলেই সম্ভবতঃ তার পক্ষে ভবিষ্যতে বড় নেতা হওয়া সম্ভব।

আসলে মনে রাখা দরকার যে বক্তৃতা, সে যে ধরনেরই হোক না কেন ব্যবসায়িক সূত্রে ডজন তুয়েক লোকের সামনে হলেও সে ব্যাপারে এক বিশেষ ধরনের দায়িত্ব থেকেই যায়, একটা বিশেষ ধরনের উত্তেজনা, বক্তাকে সারাক্ষণ সেই উত্তেজনার সংগে সংগে নিজেকে টান টান করে রাখা দরকার। তুহাজার বছর আগে সেই অমর সিসেরো বলেছিলেন যে—সত্যিকারের ঐতিহাসিক বক্তৃতাগুলো সবই স্নায়ুচাপের দ্বারা তাড়িত।

বেতার বক্তৃতার আগেও একই রকমের অনুভূতি ঘটাই স্বাভাবিক। "মাইক্রোফোন ভয়"—সবাই বলে থাকেন। এমন কি চার্লি চ্যাপলিনও প্রথম বেতারে বক্তৃতা দেবার সময়ে বক্তৃতার বিষয়টি লিখে এনেছিলেন, শ্রোতৃমণ্ডলীর সামনে অহরহ কথা বলার অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও। জেমস্ কির্কউড্, সেই বিখ্যাত চলচ্চিত্র প্রযোজক, যিনি নিজেই সুবিখ্যাত বক্তা ছিলেন, বেতারের স্টুডিও থেকে বক্তৃতা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে কপালের ঘাম মুছতে হয়েছিল তাকেও, এবং স্বীকার করেছিলেন নিজের অসহায় অবস্থার।

কিছু কিছু বক্তা আছেন, যত উঁচুদরেরই হোন না কেন বক্তৃতা দেবার ঠিক আগে সব সময়ই এই রকমের স্নায়ুচাপের দ্বারা সর্বদাই তাড়িত হয়ে থাকেন। কিন্তু সুরু করার কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই নিজেকে সামলে নিয়ে অনায়াসে বক্তৃতা চালিয়ে শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করে রাখতে পারেন।

এমন কি আব্রাহাম লিংকনকেও বক্তৃতা দিতে ওঠার ঠিক পরেই লজ্জিত হ'তে দেখা যেত। আপনার অবস্থাও অনুরূপ হওয়া সম্ভব। কিন্তু কয়েকটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অনুশীলন করলেই সেই সব অসুবিধার থেকে মুক্ত হওয়া কঠিন নয়।

প্রথম—সুরুই করুন কঠিন ধৈয্য এবং প্রবল ইচ্ছাকে সংগে নিয়ে

অনেকেই হয়ত প্রথমে বুঝতেই পারবেন না. কঠিন ধৈর্য এবং প্রবল ইচ্ছা থাকাটা কতটা জরুরী। এই বিষয়ে শিক্ষকের সামনে আপনার শারীরিক এবং মানসিক গঠনের ব্যাপার বিশদ পর্যালোচনা করার যদি সুবিধা থাকে তাহলে তিনি সহজেই বলে দিতে পারবেন কত তাড়াতাড়ি আপনি উন্নতি লাভ করবেন। যদি ধরুন আপনার ইচ্ছা দোলায়মান হয় তাহলে স্বাভাবিক কারণেই আপনার উন্নতির গতি অনুরূপভাবে দোলায়িত হ'য়ে চলবে। কিন্তু যদি আপনি এই বিষয়ে নিরাশী নির্মম এবং ধৈর্যশীল হ'তে পারেন তাহলে কিন্তু সাফল্য আপনার করায়ত্ব হ'তে দেরী হবে না। কোন অন্ধকারই আপনাকে হতাশ করে পেরে ফেলতে পারবে না।

ফলতঃ এই বিষয়ে আপনার উৎসাহ বাড়িয়ে তুলুন। মনে করতে চেষ্টা করুন কি কি লাভ হবে তাতে। চিন্তা করতে চেষ্টা করুন আপনার ব্যবসা বাণিজ্যে কতটা আত্মবিশ্বাসি হ'তে যাচ্ছেন আপনি। কত সহজে বিশ্বাস উৎপাদন করার সংগে সংগে আপনার কাজে লাগছে এইসব। লাভ লোকসানের ব্যাপারেও বিষয়টি কতটা কাজের হ'তে চলেছে। সামাজিক পরিবেশেও আপনার ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠছে। নতুন বন্ধুদের পেতে সুরু করছেন, ব্যক্তিগত প্রভাব কেমন বেড়ে যেতে থাকছে, এবং ক্রমশই নেতৃত্ব আপনাকে আহ্বান করবে। সত্যিইত এইরকম ভাবে যত সহজে আপনি নেতৃত্ব লাভের সুযোগ পেতে থাকবেন, অন্য কোন উপায়েই সেরূপে পাওয়া সম্ভবই নয়। শিক্ষিত ব্যক্তির সামনে এমন সাফল্য লোভনীয় সন্দেহ নেই।

মনে করতে চেষ্টা করুন আপনার এই নব অর্জিত ক্ষমতাটি

প্রয়োগ করার মধ্যে আপনি কেমন আত্মসন্তুষ্টি পেতে পারবেন। যাই বলুন না কেন উপস্থিত লোকজনের মনে আপনার চিন্তাধারা প্রসারিত করতে পারার মতন পরিতৃপ্তি আর কিসেই বা রয়েছে। ক্ষমতা এবং শক্তির পরিচয় হ'য়ে দাঁড়াবে সেইসব, বলা যেতে পারে ব্যক্তিগত সাফল্যের গর্বে গর্বিত হ'তে পারেন আপনি। আপনার অনুরূপ ক্ষমতা লাভের সংগে সংগে আপনার বন্ধুদের চাইতে একটু উঁচুতে অধিষ্ঠিত হ'য়ে যাবেন আপনি। প্রায় ভোজবাজির মতনই মনে হবে ব্যাপারটা আপনার কাছে। এবং এই সন্তুষ্টির স্বাদ কোন দিনই ভুলতে পারবেন না আপনি—

যেমন সব অধ্যয়নের ক্ষেত্রেই হ'য়ে থাকে। তেমনি এ ক্ষেত্রেও কয়েকজন নিশ্চয়ই অর্ধমনোযোগী হ'য়ে শিখতে আসবেন, ফলে সব সময়েই আপনাকে ভাবতে হবে এই শিক্ষা লাভের প্রয়োজন আপনার জীবনে কতটা যতক্ষণ না আপনার নিজের মধ্যে বিষয়টি সম্পর্কে ইচ্ছা প্রবলতম হ'য়ে ওঠে। সুরু থেকেই অদম্য ইচ্ছাকে আপনি দমিত হ'তে দেবেন না একেবারেই যতক্ষণ পর্যন্ত না শিক্ষা সম্পূর্ণ হ'য়ে ওঠে। আপনার বন্ধুদের চট করে বলে ফেলুন যে আপনি এই রকমের একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংগে জড়িত হ'য়েছেন। সারা সপ্তাহের অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্যেও অন্তত একটি দিন আপনি নির্দিষ্ট করুন যখন এই বিষয়ের সর্ববিধ অনুশীলন আপনি যথাযথ করে চলতে পারেন। নিজের বক্তৃতা তৈরী করতে চেষ্টা করবেন। মোট কথা বিষয়টি যতটা সম্ভব হাল্কা করে দ্রুত এগিয়ে চলে যান আপনার লক্ষ্যের দিকে। যতটা সম্ভব কঠিন করে তুলুন আপনার হতাশ হ'য়ে ফিরে যাওয়ার পথটি।

কি কারণে জুলিয়াস সীজার ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করে ইংলণ্ডে পা দিয়ে তার সৈন্যদলের জয়যাত্রা অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছিলেন ভাবুন ত। খুবই একটা চালাকির ব্যাপার—যখন তিনি অবাক

হয়ে দেখতে পেলেন যে, যে সমস্ত জাহাজে করে তিনি তার সৈন্যদলের সংগে সাগর পাড়ি দিয়েছিলেন, সহসা সেইসব জাহাজগুলি আগুন লেগে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। তখন যেহেতু আর পালিয়ে যাওয়ার কোন পথই খোলা নেই তখন তার সামনে একটি মাত্র পথই খোলা ছিল, সেটি হচ্ছে জয় করে এগিয়ে যাওয়ার। এবং ঠিক সেইটিই তাকে সম্ভব করে তুলতে হয়েছিল অগত্যা—আপনার ক্ষেত্রেও বিষয়টি সীজারের মতনই একমাত্র করে তুলুন। আপনার যুদ্ধওত বস্তুত শ্রোতৃমণ্ডলীর সামনে ভয়ের লাঞ্ছনা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া, তাই না—

দ্বিতীয়—যে বিষয়ে বলতে চলেছেন সেই বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে জেনে নিন

যতক্ষণ না একজন বক্তা, তার বক্তৃতার বিষয় সম্পর্কে সর্ববিধ ভাবে ওয়াকিবহাল হয়ে নিজের মনে সেই বিষয় সম্পর্কে চিন্তাধারাটিকে গুছিয়ে নিচ্ছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত শ্রোতৃমণ্ডলীর সামনে তাকে অস্বস্তি অনুভব করতেই হবে। সেটা হবে অন্ধের অন্ধকে রাস্তা চেনানোর মতন অসম্ভব। এইরকম পরিস্থিতিতে স্বভাবতঃই তাকে আত্মসচেতন, লজ্জিত হ'তেই হবে বিষয়টি সম্পর্ক অবহেলা দেখানোর জন্য—

রুজভেল্ট তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন—"১৮৮১ সালের শীতে নির্বাচিত হ'য়ে দেখলাম যে আমিই পরিষদের সর্বকনিষ্ঠ সদস্য—যেমন সকল কনিষ্ঠ অনভিজ্ঞ সদস্যেরই হয় তেমনি আমিও বক্তৃতা দেয়ার ব্যাপারে নিজেকে গড়ে তুলতে যথেষ্ট অসুবিধা বোধ করেছিলাম—অবশ্য একজন পুরোন সদস্য এই ব্যাপারে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন—(অবশ্যই ডিউক অব্ ওয়েলিংডনের কথারই পুনরাবৃত্তি-করে—) "কথাই বোল না, যতক্ষণ না, তুমি স্থির নিশ্চিত হচ্ছ তোমার বক্তব্যের বিষয় সম্পর্কে। সেটা হ'লে চট্ করে ব'লে ফেলে বসে পড়"—

আমরা বলব, ভদ্রলোকটির উচিৎ ছিল আরও দুএকটি কথা উপদেশটির সংগে জুড়ে দেওয়া যাতে রুজভেল্টের স্নায়ুচাপ কমে যায় —তার বলা উচিৎ ছিল "দাঁড়িয়ে ওঠার পর কিছু একটা করে উঠতে পারলে তোমার লজ্জা ভেঙে যাবে। যেমন ধর কোন জিনিষ যদি তুমি দেখাতে পার। ব্ল্যাকবোর্ডে হয়ত কিছু লিখলে। ম্যাপের ওপরে হয়ত কোন জায়গা দেখালে। হয়ত টেবিলটা একটু সরিয়ে

দিলে। কিংবা জানালাটা খুলে দিলে। হয়ত টেবিলের ওপরে রাখা বই খাতাপত্রগুলো একটু আধটু নাড়াচাড়া করলে—অর্থাৎ শারীরিক কোন কাজের মধ্যে যেতে পারলেই তোমার স্নায়ুর চাপের তাড়না চলে যাবে—তুমি সহজ বোধ করতে পার।"

অবশ্য এইরকম কোন কিছু করে উঠতে পারার সুযোগ যোগার করে নেয়াটা সহজ নয়। কিন্তু তবু এরকম একটা রাস্তা জানা থাকা ভাল.। যদি পাওয়া যায় সেরকম সুযোগ, ব্যবহার করা মন্দ না, কিন্তু ব্যাপারটা দুত্রকবারের বেশী করাটা ঠিক হবে না—দশপা হাঁটতে শিখলে কোন্ শিশুই বা চেয়ার ধরে ধরে হাঁটতে থাকে বলুনত।

ভাব করুণ প্রচণ্ড আত্মবিশ্বসের

আমেরিকার প্রথম সারির মনস্তত্ত্ববিদ অধ্যাপক উইলিয়ম জেমস্ একবার লিখেছিলেন—"অনুভব করার পরই কাজ শুরু হয়। কিন্তু বস্তুত অনুভব করা এবং কর্মসম্পাদন যুগপৎ একই সংগে চলতে থাকে। এবং কাজের উপরে নিয়ন্ত্রন এনে, স্বভাবতই ইচ্ছা শক্তির প্রত্যক্ষ প্রভাব সেখানে উপস্থিত। মানুষ পরোক্ষভাবে অনুভবের ওপরেও নিয়ন্ত্রন আনতে পারে—যেখানে ইচ্ছাশক্তির প্রত্যক্ষ প্রভাব অনুপস্থিতে—সেজন্যই যদি সন্তুষ্টির ভাবটি যদি সত্যি সত্যিই হারিয়ে যায়, তাহলে সন্তুষ্টি আনার সব চেয়ে সঠিক পথটি হল সন্তুষ্টি রয়েছে এমন ভাবটি চালিয়ে যাওয়া। যদি সেটি করে সন্তুষ্টি ফিরে না পাওয়া যায়, তাহলে অন্য কোন কিছুতেই সেটি ফিরিয়ে আনা দুষ্কর। ফলে সাহসী হতে গেলে সাহসীর মতনই ভাবরূপ ধারণ করতে হবে, এবং সেটা করার জন্য যতখানি সম্ভব ইচ্ছাশক্তিকে নিয়োগ করতে হবে। তাহলেই এক সময়ে দেখা যাবে যে ভয়ের তড়কা থেকে সাহসের তড়কা তৈরী হয়ে গেল"—সুতরাং অধ্যাপক জেমসের উপদেশ নেয়াই বাঞ্ছনীয়। শ্রোতৃমণ্ডলীর সামনে দাঁড়িয়ে সাহস পেতে হ'লে এমন ভাবটি করাই ভাল যেন যথেষ্ট সাহস বর্তমান। অবশ্য ঠিক মতন তৈরী না হলে পৃথিবীর তাবৎ অভিনয়েও কোন লাভ নেই। ধরা যাক আপনি ঠিক করে ফেলেছেন আপনার বক্তৃতার বিষয়টি তাহলে ধীরে এগিয়ে আসার আগে টেনে নিঃশ্বাস নিন তিরিশ সেকেণ্ড। এই বেশী অক্সিজেনের ভাগটা আপনাকে ভেসে থাকতে সাহায্য করবে, সাহায্য করবে সাহস ফিরিয়ে আনতে—

সর্বকালে সর্ব দেশে মানুষত সাহসকেই পূজা করে এসেছে—তাই

যতই আপনার বুকের মধ্যে ধুকধুকি বাজুক। আনায়াস সাহসীর মতন এগিয়ে যান কয়েক পা, থামুন, তারপর ধীরে সুস্থে এমন ভাব করে দাঁড়িয়ে পরুন যেন অত্যন্ত আহ্লাদিতই হয়েছেন ব্যাপারটিতে। তারপর টান টান করে দাঁড়িয়ে দর্শকদের দিকে সোজাসুজি তাকান, আত্মনিশ্চয়তার সংগে বলতে সরু করুন এমন ভাবে যেন দর্শক সাধারনের প্রত্যেকেই আপনার কাছে টাকা ধার করে বসে রয়েছে, সেই রকমই কল্পনা করুন যেন ওরা সকলেই ধার শোধ দেয়ার মেয়াদ বাড়িয়ে নেয়ার আবেদন নিয়েই আপনার সামনে হাজির হয়েছে—এরকম কল্পনা আপনার মনস্তত্বে ভালই প্রভাব ফেলবে সন্দেহ নেই।

কক্ষনো কোটের বোতামটি বারবার খুলবেন না-বন্ধ করবেন না। হাত কচলাবেন না একেবারেই, যদি সত্যিই সত্যিই স্নায়ুচাপের দরুন শারীরিক নড়চড়া বন্ধ নাই করতে পারেন ত, হাতদুটো চট করে শরীরের পিছনে নিয়ে যান, আর সেখানে সকলের অলক্ষ্যে আঙুল মটকাতে থাকুন, তাছাড়া পা ফিরে মেঝেতে দাগ কাটার চেষ্টা করবেন না। স্বাভাবিক নিয়মে কোন আসবাবের পিছনে নিজেকে লুকিয়ে রেখে বক্তৃতা দেয়াটা ভাল নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রথম দিকে টেবিলের পিছনে দাঁড়ালে আপনার সাহস বর্দ্ধিত হতে সাহায্য হবে—

এখন যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটিই নিঃসন্দেহে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এখন পর্যন্ত যা কিছু আলোচনা হয়েছে সব কিছু যদি ভুলেও যান, তবু একটা কথা মনে রাখলেই হবে যে, প্রথম কথা, শেষ কথা এবং সর্বকালের কথাটি হচ্ছে যে কথা বলতে চাইছেন সে বিষয়ে আত্মনিশ্চয়তা আনার একমাত্র রাস্তা হচ্ছে কথা বলতে সুরু করা। এ বিষয়ে সব কিছুই শেষ পর্যন্ত একটি অনুশীলনের মধ্যেই ঘুরে ফিরে আসে, আর সেটি হচ্ছে অভ্যাস। অভ্যাস, নিরলস অভ্যাস।

ফলে ধৈর্য্য রাখুন। অনুশীলনের সময়ে ব্যবসায়িক ব্যস্ততার জন্য যেহেতু সারা সপ্তাহের মধ্যেও আপনার বক্তব্যের বিষয়টি প্রস্তুত করে উঠতে পারেন নি, সেই কারনে অনুপস্থিত হবেন না। প্রস্তুত থাক বা না থাক অনুশীলনিতে আসবেনই। শিক্ষক এবং সহপাঠিরা আপনার বিষয়টি ঠিক করে দিক না কেন।

আপনি কি চান—শ্রোতৃমণ্ডলীর সামনে আপনার অনায়াস ব্যবহার। ভয় না পাওয়া- তাই না, আচ্ছা এখন ভাবা যাক এই সবের কারণগুলো কি কি—

"ভয় আসলে অজ্ঞানতা এবং অনিশ্চয়তার সন্তান"—বলেছেন অধ্যাপক রবিনসন। অন্যভাবে দেখলে বলা যায়, আত্মবিশ্বাসের অভাব যেখানে ভয়ও সেখানে।

তার কারণ কি—আসলে আপনার ক্ষমতা কতটুকু সেটা না জানার জন্যই এই ভয়। আর সেটা না জানার কারণই হচ্ছে অভিজ্ঞতার অভাব। যখন অপনার সাফল্যের নিদর্শনগুলো আপনার পিছনে এসে দাঁড়াবে, তখনই ভয় আপনাকে ছেড়ে যাবে। সূর্য উঠলেই রাতের হিমবরফ গলে যাবে-তাই না।

একটা বিষয়ত ঠিকই—সাঁতার শিখতে চাইলে জলে নামতেই হবে। অনেকক্ষণ ধ'রে এই বইটা আপনি পরে চলেছেন। পরেই চলছেন, এখন ছুঁড়ে ফেলে দিন এটা। আসুন বাস্তব কাজের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়া যাক।

বিষয়টি বেছে নিন সন্তঃর্পনে। এমন বিষয়ে যার সম্পর্কে কিছুটা অন্তত ধারনা আপনার রয়েছে—তারপর তিন মিনিটের একটা বক্তৃতা তৈরী ক'রে ফেলুন। অনেকবার নিজের মনেই অভ্যাস করে যান বক্তৃতাটি, তারপর আপনার সহ অনুশীলনকারীদের মধ্যে বক্তৃতাটি তুলে ধরুন। যতটা সম্ভব ক্ষমতা আর দৃঢ়তা আনার চেষ্টা করুণ সেই সময়ে—

স্বর ভঙ্গিমা—সঠিক শ্বাসগ্রহণ

একনিষ্ঠ গলার স্বরটি মধুর করে তুলতে সঠিকভাবে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের অনুশীলন জরুরী। স্বর ভঙ্গিমার প্রথম স্তরটি হ'ল নিঃশ্বাসের সংযম, নিঃশ্বাসের ওপর ভিত্তি করেই আমাদের যাকিছু শব্দচয়ন এবং স্বরভঙ্গিমা। ঠিকমতন নিঃশ্বাস নিয়মিত করতে পারলে, নিটোল এবং মনোরম স্বরের অধিকারী হওয়া সম্ভব। কর্কশ সরু গলা নয়। এমন গলা যা মানুষকে আকর্ষণ করতে পারে, কাছে টেনে নিতে পারে।

বিখ্যাত ইটালিয়ান সঙ্গীতকারেরা সবসময়েই বলেছেন যে ভাল গলা তৈরী করতে হ'লে নিঃশ্বাস নিয়মিত করা প্রয়োজন—সে বস্তুটা আবার কি—কোন কিছু বিস্ময়কর, নতুন কঠিন ব্যাপার কিছু—একেবারেই নয়—সেট হওয়া উচিতও নয়। বাচ্চা বয়সে হামেশাই আমরা সেটা করেছি একসময়। এখন চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে অল্প একটু সময় সেরকম অভ্যাসটি করতে হবে। রাতে বিছানায় টানটান চিৎ হ'য়ে শুয়ে পড়ে হাল্কাভাবে সহজে নিঃশ্বাস নিতে থাকুন সঠিক নিয়মে, —দেখবেন নিঃশ্বাস নিয়মিত হ'তে চলেছে ক্রমশই। বিশেষ শারীরিক কারণে ঐরকমভাবে শুয়ে থাকলে সঠিক নিয়মে নিঃশ্বাস ছাড়া উপায় থাকে না।

এখন আপনার সমস্যাটা তাহলে দাঁড়াল এইরকম—যখন আপনি ঐরকম শোয়া অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়াবেন তখন ঠিক আগের মতন নিঃশ্বাস নেয়াটা চালিয়ে যাওয়া। ব্যাপারটা খুব কঠিন মনে হচ্ছে কি—

তাহলে আপনার ব্যায়ামটি হবে কেমন—না—প্রথমে চিৎ হয়ে

টান টান শুয়ে পড়ে নিয়মিতভাবে গভীর নিঃশ্বাস নিন লক্ষ্য করতে থাকুন যে এই রকম সময় আপনার শরীরের মাঝামাঝি জায়গায় আসলে আপনার ব্যায়ামটি স্থিত হচ্ছে। আর যখন এইরকম ভাবে নিঃশ্বাস নেবেন কাঁধটি যাতে উঠে না যায় লক্ষ্য রাখুন।

প্রত্যেকদিন রাত্রিবেলায় পাঁচ মিনিটের জন্য এই ব্যায়ামটি অভ্যাস করে যান, প্রত্যেকদিন সকালে পাঁচ মিনিট। রাতে এই ব্যায়াম আপনাকে শরীরের স্নায়ুগুলো শান্ত করে তন্দ্রাতুর করে তুলবে। সকালে আপনাকে তাজা করে তুলবে এই ব্যায়ামটি যদি ঠিক ঠিক মতন কিছুদিন করতে পারেন, তাহলে আপনার গলায় স্বরটিরই যে কেবল উন্নতি হবে তা নয়, আয়ু বেড়ে যাবে আপনার।

থিয়েটারে যারা গান গায় তাদের, কিংবা সঙ্গীত শিক্ষকদের আয়ু যে অনেক বেশী হয় সেটাত সকলেরই জানা। বিখ্যাত গায়ক ম্যানুয়েল গার্সিয়া একশো এক বছর পর্যন্ত বেঁচেছিলেন—তিনি নিজেই স্বীকার করেছিলেন যে তার দীর্ঘায়ুর কারণ নিঃশ্বাসের ব্যায়াম নিয়মিত প্রতিদিন করে যাওয়া—

প্রস্তুতির মাধ্যমে আত্মবিশ্বাস

অসংখ্য লোকের সংগে কথা ব'লে জানা গেছে যে সব চাইতে জরুরী বিষয় হ'ল, বক্তৃতা দেওয়ার অনেক আগে বক্তৃতার বিষয়টি নিয়ে অভ্যাস করা। তৈরী হ'য়ে ওঠা যাকে বলে আর কি। স্পষ্টভাবে বিষয়বস্তু নির্বাচন করা। যে বিষয় মানুষের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করতে পারবে। আর সেই বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু যেন বলতে ভুল না হয়। আপনি নিজেই ভাবুন, এমন কারো বক্তৃতা শুনেছেন যে বক্তৃতার মধ্যে আপনাকে প্রভাবিত করার মতন কিছু ছিল, আর সেটা আপনি ভুলতেই পারছেন না। কথা বলার ধরনধারণে এই বিষয়টি সেই কারণেই অত্যন্ত জরুরী।

যখন কোন বক্তা তার বক্তৃতার বিষয়বস্তুর সংগে মানসিক ভাবে যুক্ত হয়ে পড়বেন, তখন দেখা যাবে যে, কথাগুলি নিজের থেকেই জুগিয়ে আসছে। কষ্ট করে সাজিয়ে গুছিয়ে তৈরী করার খুব প্রয়োজন হয়ে পড়ছে না। নিজস্ব গতিতেই ঠিকমতন অবয়ব পেয়ে যাচ্ছে বক্তৃতার শরীর।' চাপ কমে গেছে কখন। অনায়াস বক্তৃতার ফলে বক্তৃতা দেয়ার কঠিন দায়িত্বের নয় দশমাংশ ভাগই হ'য়ে যাবে সহজ।

তাই বলব অভ্যাসে অবহেলা করার চিন্তাটা মারাত্মক ক্ষতিকর। যুদ্ধক্ষেত্রে ভেজা কার্তুজ আর অপরিষ্কৃত বন্দুক নিয়ে এগোনোর যেমন কোন মানে হয় না তেমনি বক্তৃতামঞ্চে ওঠার আগে তৈরী না হয়ে এগিয়ে আসার মানেই হয় না। ফলে সেরকম পরিস্থিতিতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ না করলে বলার কিছুই নেই। হোয়াইট হাউসে আব্রাহাম লিংকন বলেছিলেন একবার—"আমার বিশ্বাস, জীবনে কোনদিনই

অপ্রতিভ হওয়ার লজ্জা থেকে রেহাই পাব না, বক্তৃতা দেবার সময় যতক্ষণ না বক্তৃতার বিষয়বস্তু আগেভাগে স্পষ্ট তৈরী করে উঠতে পারি—

যদি আপনি সত্যি সত্যিই সাহস অর্জন করতে চান তাহলে সাহস পেতে হলে যা দরকার সেটি করাই ত ভাল।

কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে যারা এই অনুশীলনীর সংগে যুক্ত হ'য়েছেন, তারা কেন ভালরকম প্রস্তুতি গ্রহণ করেন না, কেন?—আসলে অনেকের প্রস্তুতির সংজ্ঞা সম্পর্কে সঠিক ধারনাই নেই, অনেকে আবার বুঝতে পারলেও কেমন করে সেটি করা যায় তা জানেন না। অনেকের আবার সময়ের অত্যন্ত অভাব। ফলে এইসব সমস্যাগুলো নিয়ে বিশদ আলোচনা করা দরকার তাইনা—

প্রস্তুতি কি ক'রে গড়ে তুলতে হবে

প্রস্তুতিটা কি বস্তু—বই পড়া? সেটা একটা ব্যাপার বটে কিন্তু সবটা তা নয়। বই পড়াতে সাহায্য হয় বৈকি—কিন্তু বই পড়ে তার থেকে কিছুটা নিয়ে সোজাসুজি শ্রোতাদের সামনে উগরে দিতে চেষ্টা করলে সাফল্যলক্ষ্মী আপনাকে অভিষিক্ত করবে না নিশ্চয়ই। হয়ত শ্রোতারা ঠিক বুঝতে পারবে না গোলমালটা কোথায় কিন্তু বক্তৃতাকে গ্রহণ করবে না উদারভাবে।

ধরা যাক কাউকে বক্তৃতা দিতে হবে কোন বিষয়ে। ব্যস্ততা অথবা অন্যান্য কারণে প্রস্তুতির সময়ই পেল না বেচারা—যেদিন বক্তৃতা দেয়ার কথা সেদিন বিকালে দোকান থেকে গুচ্ছের কয়েকটা বই কিনে পড়ে নিল সে, তারপর সন্ধ্যাবেলায় সেই পড়ার ওপরে ভিত্তি করেই বক্তৃতা দিতে চেষ্টা করল। ফল কি হোল—না সাদা মাটা বক্তৃতা একটা, লোকজনেরা একটুও পছন্দ করল না সেটা। আসলে হোল কি, ভদ্রলোক পড়লেন ঠিকই কিন্তু ঠিকমতন হজম করে নিজের কথা গুছিয়ে নিতে পারেন নি। ফলে নিজেই হয়ত বইয়ের বিষয়টির সম্পর্কে একমত হতে পারেন নি। ফলে আন্তরিকতার অভাব হ'য়ে গেল তার বক্তৃতায়। সেই কারণেই বক্তৃতার মধ্যে বারবার হয়ত তাকে বইগুলির উল্লেখ করতে হ'ল—লেখক এই বলেছেন, লেখক সেই বলেছেন, এই রকম। বক্তৃতাটি ঐ বইগুলির লেখকদের কপিবুক হ'য়ে গেল, উক্ত লোকটির নয়।

ফলে শিক্ষক হয়ত তাকে বললেন—"ম'শায় আমরা কিছু ছায়াশরীরির বক্তব্য শুনতে আসি নি, তিনি এখানে উপস্থিত নেই। আমরা তাকে দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু আমরা আপনার কথা শুনতেই চাইছিলাম। এই বিষয়ে আপনি কি ভাবছেন তাইত শুনতে

চাইছি আমরা—আপনি বরং বিষয়টি নিয়ে যথাযথ ভাবনা চিন্তা করে পরে বলবেন না হয় একসময়। যে লেখকদের আপনি উল্লেখ করলেন, তাদের বক্তব্যের সংগে আপনি একমত হ'লে তাই বলবেন, না হ'লেও বলবেন আপনার কথা। মোটকথা আপনার নিজস্ব কথাই আমরা শুনতে চাই।"—

ভদ্রলোকটি শিক্ষকের নির্দেশ মেনে নিয়ে বাড়িতে গিয়ে আদ্যোপান্ত ভেবে দেখলেন বিষয়টি। দেখতে গিয়ে দেখা গেল যে, ঐ লেখকদের সংগে তিনি কোনমতেই একমত হ'তে পারছেন না। ব্যস, তখনই বোঝা গেল গণ্ডোগোলটি কোথায়। তিনি নিজের মতটা ঠিক করে নিলেন, লেখকদের মতগুলোও ভালো ক'রে মনে করে রাখলেন। ফলে পরের সপ্তাহে যখন তিনি বক্তৃতা দিতে উঠলেন দেখা গেল তার বক্তৃতায় উৎসাহ রয়েছে উদ্দীপনা রয়েছে, যুক্তি—তর্ক রয়েছে, আন্তরিকতা এবং আত্মবিশ্বাসে জ্বলন্ত হ'য়ে উঠল বক্তৃতাটি। এই হ'চ্ছে প্রস্তুতির সঠিক সংজ্ঞা—

প্রস্তুতি অর্থ এই নয় যে কয়েকটি বাছা বাছা শব্দ দিয়ে তৈরী বাক্যগঠন করে মনে করে রাখা। কয়েকটা ইতস্ততঃ ভাবনা জড়ো করে রাখা মনের মধ্যে যেগুলোর সংগে আপনার মানসিকতার আদৌ হয়ত কোন যোগ নেই, তাও নয়। প্রস্তুতি হ'চ্ছে **আপনার। ধারনা, আপনার বিশ্বাস, আপনার ইচ্ছে এবং আপনার চিন্তাভাবনা-গুলিকে সুন্দরভাবে গুছিয়ে উপস্থাপিত করার অভ্যাস** আপনার ত সেরকম ধারনা আছেই, সেরকম বিশ্বাস, আশা—ইচ্ছে, যেগুলি কখনও স্বপ্নের মধ্যেও আপনাকে তাড়িত করে, আপনার সর্বময় অস্তিত্বই জুড়ে রয়েছে' আপনার অনুভব, আপনার অভিজ্ঞতার স্মৃতি নিয়ে। আপনার অবচেতন মনের ভিতরেই সমুদ্রবেলায় ছড়ানো নুড়িপাথরের মতনই ছড়িয়ে রয়েছে সেইসব। প্রস্তুতি মানেই হচ্ছে, চিন্তা করা, মনে ক'রে রাখা। আপনাকে যা সবচেয়ে বেশী আকর্ষণ করে সেই বিষয়টি বেছে

নেওয়া। আর সেই সব চিন্তা ভাবনাগুলো মাজাঘষা করে একটা পদ্ধতির মধ্যে সাজিয়ে আনা, যেটা হবে আপনার নিজস্ব। আপনার একান্ত আপন। খুব কঠিন একটা কাজ বলে মনে হচ্ছে কি! একেবারেই নয়। দেখবেন একটু মনোযোগী হ'য়ে চিন্তা করলেই ব্যাপারটা আয়ত্বে আনতে দেরী হবে না।

প্রায় একশো বছর আগে আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট আব্রাহাম লিংকন তার জনসংযোগ এবং বক্তৃতামালার জন্য যেভাবে প্রস্তুতি নিতেন সে গল্পগুলো আসাধারণ। মনে ক'রে দেখুন লিংকনের সেই ঐতিহাসিক উক্তি "—যে হাউস নিজেদের মধ্যেই বিভক্ত, সে হাউস দাঁড়াতে পারে না"—সারা দিনের কর্মব্যস্ততার মধ্যে, খাওয়ার সময়ে, রাস্তায়—ঘাটে চলাফেরার সময়ে, দৈনন্দিন হাটে বাজারে দোকানে যাওয়ার সময়ে, বাজারের থলি হাতে চলাফেরার সময়ে,—তার ছোট ছেলেটিকে নিয়ে বেড়াতে যাওয়ার সময়ে, সব সময়ে ঐ একই চিন্তার মধ্যে নিমগ্ন থাকতেন তিনি। এত গভীর ছিল তার বিশ্বাসের ভূমিটি।

প্রায় সব সময়েই তিনি ছোট কাগজের টুকরো, খাম, কিংবা সিগারেটের খোলের ওপরে নতুন কোন ভাবনা অথবা ঘটনা এলেই লিখে টুপির মধ্যে রেখে দিতেন, যতক্ষণ না স্থুস্থির হ'য়ে কোথাও বসে সেইসব টুকরো লেখাগুলো থেকে গুছিয়ে নিজের কোন বিশাল বক্তব্য তুলে ধরতে পারছেন। সেই লেখা সম্পূর্ণ হ'য়ে গেলে বারবার করে পড়ে দেখতেন তিনি। তারপরই শুধু বক্তৃতা দিতে উঠতেন সেই বিষয়ে, ছাপাতে দিতেন বাইরে। বিভিন্ন জায়গায় একই বক্তৃতা দেয়ার বদলে সারাক্ষণ তিনি নতুন নতুন খড়সা বক্তৃতার তৈরী করতেন অক্লান্তভাবে। ফলে তার বক্তৃতার পরিবেশ যথাযথই হ'য়ে উঠত ব্যাপক এবং বিশদও নিশ্চয়।

যে বক্তৃতা ব্যর্থ হতে পারে না—

বক্তৃতার বিষয়ের সঙ্গে আপনার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা যুক্ত হলে কি রকম হয়। ধরুন আপনারই গাড়িটা চুরি গেল। এখন আপনি থানায় যাবেন উদ্ধারকরার জন্য, হয়ত বা কিছু পুরস্কারের কথাও বলবেন। কিন্তু সকলের যা হয় আপনারও তেমনি অভিজ্ঞতা হবে—যে পুলিস আপনার গাড়িচোরটিকে ধরতে পেরে উঠবে না। অথচ এই পুলিসই কয়েকদিন আগেই ভুল পার্কিং করার অপরাধে আপনার জরিমানা করেছিল। তার অর্থ এই যে পুলিসের যথেষ্ট সময় হয় সম্মানিত নাগরিককে বিরক্ত করতে কিন্তু একদম সময় হয় না কোনও চুরির সুরাহা করতে। এরকম দেখলে মাথায় আগুন জ্বলে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। এখন আপনাকে যদি বক্তৃতা করতেই হয় এই সংক্রান্ত বিষয়ে তাহলে আপনাকে আর বাজারের বইপত্র পড়াশুনা করে সেইসব বইগুলির ওপর নির্ভর করতে হবে না। নিজের জীবনে অনুষ্ঠিত আগুনের মত তপ্ত তীক্ষ্ণ অভিজ্ঞতা টগবগ করে ফুটে আপনার মুখে কথার ফুলঝুরি ফুটিয়ে তুলত। তাই কলকাতা শহরের উল্লিখিত অবনতি সম্পর্কে এখন যদি কেউ আপনাকে বক্তৃতা করতে আহ্বান করে তাহলে যে আপনাকে কিছুকাল আগেও এই রকম বক্তৃতার ক্ষেত্রে খুব কষ্টে সৃষ্টে লাইনের পর লাইন টেনে বক্তৃতা করতে হয়েছিল, সেই আপনিই আজ, যেহেতু ব্যক্তিগতভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছেন কিছু সমস্যা, তাই এই বিষয়ে অনর্গল বলে যেতে দেখবেন একটুও অসুবিধা অনুভব করবেন না। মাথার মধ্যে ওই রকমের একটি জ্বলন্ত অভিজ্ঞতার অস্থিরতা নিয়ে আপনাকে শুধু শ্রোতৃমণ্ডলীর সামনে দাঁড়াতে হবে, তারপরই দেখবেন আগ্নেয়গিরির মতন আগুনের লাভাস্রোত কিরকম ভাবে বেরিয়ে আসে আপনার

মুখ থেকে। আর এইরকম বক্তৃতা আপনার ব্যর্থ হতে পারে না। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার জ্বলন্ত নিদর্শনের সঙ্গে আপনার সৎ ইচ্ছা যুক্ত হওয়ার ফলে আপনার শ্রোতারা মুগ্ধ হয়ে যেতে বাধ্য হবেন, এতে কোন সন্দেহ নেই।

অপরের থেকে শিক্ষা নিন নিজের মত করে—মনে রাখবেন আপনি কারো আজ্ঞাবহ বক্তা নন।

প্রস্তুতির সঠিক অর্থটি কি

প্রস্তুতি মানে কি কয়েকটি নিখুঁৎ বাক্যবিন্যাস শিখে ফেলা ; লিখে রাখা কিংবা মুখস্থ করা নাকি কয়েকটি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত চিন্তা ভাবনাকে একটা সঠিক পদ্ধতিতে সাজিয়ে নেয়ার কৌশলটি জেনে রাখা। না—তা মোটেই নয়ই। প্রস্তুতি অর্থই আপনার চিন্তা, বিশ্বাস, ইচ্ছা সব কিছুতেই একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ উপস্থাপনের কৌশল উদ্ভাবন করা। এই গুণ ও শক্তি আপনার মধ্যে রয়েছে। তোকদিন দৈনন্দিন কাজকর্মের মধ্যে এগুলোকে লালন করে থাকেন আপনি নিজে এমনকি স্বপ্নেও। আপনার অস্তিত্বের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে এ-সবই অভিজ্ঞতা আর অনুভূতিগুলি নিয়ে। আপনার অবচেতন মনে সব সময়েই এগুলি বেশ ভালভাবেই উপস্থিত থাকছে। তাই বলা যেতে পারে প্রস্তুতি এক্ষেত্রে মানে, চিন্তা করা, মনে করে রাখা। যে জিনিসটি আপনাকে বেশী টানে সেই জিনিষটিকে বেছে নেয়া। বেছে নেয়ার পরে ঘসামাজা করা। আপনার নিজের মতন করে রূপ দেয়া। খুব একটা কঠিন কাজ বলে মনে হচ্ছে না ত ? না। কারণটা কি স্পষ্ট করে একটু গভীরভাবে মনোসংযোগ করলেই বুঝতে পারবেন বিষয়টি ঠিক রয়েছে। বিগত শতব্দীতে যার বক্তৃতা ঐতিহাসিক হয়ে আছে এবং নিশ্চিত স্মরণীয় সেই রকম একজন বিখ্যাত ধর্মযাজককে প্রশ্ন করা হলে উত্তরে তিনি বেশ মজার উক্তি করেছিলেন—তিনি বলেছিলেন—"আমার কোন গোপনীয়তা নেই যখনই আমি কোন বিষয় নির্বাচন করি, সেই বিষয়টি একটা বড় খামের ওপরে লিখে রাখি। এরকম অনেক খাম আমার রয়েছে। পড়াশুনা করতে করতে মনে করে বলার মতন কিছু নজরে এলেই আমি সেটা ওই খামগুলির মধ্যে নির্দিষ্ট বিষয় সম্বলিত খামটির মধ্যে ঢুকিয়ে রাখি।

হয়ত অনেকদিন ওই খাম অব্যবহৃতই থেকে যায়। কিন্তু নতুন কোন বক্তৃতার দরকার হলে আমি সব খামগুলি নিয়ে নাড়াচাড়া করে দেখি। ওই খামে তুলে রাখা বিষয় যা পাই তার সঙ্গে আমার পড়াশুনা, আর অভিজ্ঞতা নিয়ে আমার অঢেল মালমশলা তৈরী। হয়ে যায় তাই তারপর বক্তৃতা দিতে আমার কোন অসুবিধা হয় না। একটু যোগ করে একটু বাদ দিয়ে, ভাষা বলার ভঙ্গী নিয়ন্ত্রিত করে যখনই আমি তারপর বলতে থাকি প্রত্যেকটা বক্তৃতাই নূতন আর সর্বাঙ্গ সুন্দর হয়ে যায়" তবেই দেখুন প্রস্তুতির মজাটা কিরকমের।

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

যে কোন কাজের সাফল্য নিহিত থাকে তার প্রস্তুতির মধ্যে। অতএব প্রস্তুতি পর্বে আরও নিষ্ঠাবান হন।

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

লিংকন কিভাবে তার বক্তৃতার প্রস্তুতি নিতেন

আমেরিকার ঐতিহাসিক প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন কিভাবে তার বক্তৃতার প্রস্তুতি নিতেন ? আমাদের সৌভাগ্য যে এ ব্যাপারে বিশদ বিবরণ রয়েছে। লিংকনের যে বিখ্যাত বক্তৃতাটি এক শতাব্দী-রও বেশী সময় ধরে বিখ্যাত হয়ে আছে সেটা হল—"—গৃহের বন্ধন ছিন্ন হলে সেই গৃহটি দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। আমার বিশ্বাস এই সরকার অর্ধেক ক্রীতদাস প্রথা এবং অর্ধেক মুক্ত অবস্থা এইরকম খণ্ড মানসিকতা নিয়ে স্থায়ী কোন আসন টিকিয়ে রাখতে পারবে না—"

লিংকন তার এই বক্তৃতাটি শয়নে স্বপনে ভেবে যেতেন, যখন তিনি তার স্বাভাবিক কাজকর্ম করছেন, খাওয়া দাওয়া করছেন, রাস্তা দিয়ে হাঁটছেন, তার খামারে গরুর দুধ দুইছেন। মাংসের দোকানে কিংবা মুদি দোকানে যখন তিনি জিনিস কিনতে যাচ্ছেন, কাঁধে ধূসর রঙের চাদরটি জড়িয়ে নিয়ে, হাতে বাজারের থলি নিয়ে তার ছোট্ট ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে, যে ছেলেটি সারাক্ষণ তার পিতাকে নানারকমের প্রশ্ন করে কথা বলে উত্যক্ত করে চলেছে, সারাক্ষণ দীর্ঘদেহী তার পিতার কোটের প্রান্তদেশ টানাটানি করে যাতে তিনি তার সঙ্গে কথা বলেন সেজন্য মনোযোগ আকর্ষণ করার চেষ্টা করে চলছে সারা পথ—লিংকন কিন্তু অবিচলিত ভাবে ভেবেই চলেছেন তার বক্তৃতার বিষয়টি। সমস্ত কাজ, কাজের দায়িত্ব। তীব্র চাপের মধ্যে থেকেও সেই অনুশীলনের মূল সুরটি কিন্তু তিনি কখনই বিচ্ছিন্ন হতে দেন নি। পার্থিব দুনিয়ার সবকিছু, এমন কি তার শিশুপুত্রটির কথাও তিনি বিস্মৃত হয়ে মগ্ন হয়ে যান তার চিন্তার অধ্যবসায়ের মধ্যে।

আর সেই সঙ্গে তার এই আত্মমগ্নতার মধ্যে সময়ে সময়ে দেখা যেত তিনি ইতস্তত ছেঁড়া কাগজের টুকরো, খামের পিছনে, ঠোঙার

ওপরে মনে করে রাখার মতন কিছু টুকে রাখছেন। আর সারাদিনের জমানো এই সব টুকরো কাগজ লুকিয়ে রাখছেন তিনি যতক্ষণ না কোন একটা জায়গায় স্থির হয়ে একটু বসে সাজিয়ে নিতে পারেন কথাগুলি, বক্তৃতা দেবার জন্য কিংবা প্রকাশের জন্য। লিংকন সব সময়ই বিশ্বাস করতেন যে প্রত্যেকদিন একটি বক্তৃতাই বারবার ব্যবহার করার চাইতে অনেক সোজা প্রত্যেকবারই বক্তৃতার উপস্থাপনাকে নূতন করে সাজানো। তাঁর কারণ বিষয়টিত সারাক্ষণ তার মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে ক্রমশই ছড়িয়ে বড় হয়ে চলেছে। প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার ঠিক পরেই, হোয়াইট হাউসে প্রবেশ করার কিছু আগে, আমেরিকার সংবিধান আর তিনটি বক্তৃতার নকল হাতে নিয়ে স্প্রিংফিল্ডের ঘিঞ্জী একটি দোকানের পিছনদিকের ঘরে বসে তিনি তার উদ্বোধনি ভাষণটি লিখেছিলেন। ভাবা যায়— প্রস্তুতি পর্বে আপনি যে কোন একটি বিষয় বেছে নিন। তারপর সেই বিষয়টি নিয়ে ভাবনা চিন্তা শুরু করুন। দুচারটে বই পড়ে উলটে পালটে দেখুন, দুচারজন লোকের সঙ্গে কৌশলে কথা বলতে চেষ্টা করুন। ক্রমশঃ বিষয়টি সম্পর্কে একটা ধারনার পথ স্পষ্ট হতে সুরু করবে। এরপর আপনি আপনার বিশ্বাস মাফিক্ বিষয়টি সম্পর্কে আপনার চিন্তার একটি পরিধি তৈরী করুন। প্রথমে ছোট করে, হয়ত বা একটু এলোমেলো—তারপর দ্বিতীয়বার যখন একই বিষয় নিয়ে লিখতে বসবেন দেখবেন স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছে আপনার বক্তব্য। এইরকমভাবে দু একবার করতে পারলেই বিষয়টি মোটামুটি আপনার আয়ত্বে চলে আসতে বাধ্য। তার কারণ যেহেতু বিষয়টি নিয়ে বিশদভাবে আপনি চিন্তা করেছেন— পড়াশুনা করছেন তাই অন্য অনেকের চাইতে আপনার কাছে বিষয়টি সম্পর্কিত তথ্যাদি থাকবে বেশী। ফলে নতুন কথা বলার সুযোগ আপনার এসে যাচ্ছে। এখন বক্তৃতাটি কতটা মনোমুগ্ধকর করতে পারবেন—কতটা সরস করতে পারবেন সেটাই শুধু ভাববার ব্যাপার।

বক্তৃতা করার সময়টিতে আপনার শ্রোতাদের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য রাখবেন। বুঝতে চেষ্টা করবেন কি তারা চান, কি তাদের সমস্যা। যে পরিস্থিতি বা যে পারিপার্শ্বিকের মধ্যে দাঁড়িয়ে আপনি বক্তৃতা দিতে যাচ্ছেন, যাদের কাছে আপনি বক্তৃতা দিতে যাচ্ছেন, তাদের সম্পর্কে চিন্তা করে একটা বিশেষ সিদ্ধান্ত আপনাকে নিতেই হবে।

তাছাড়া রয়েছে তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারটা—বিখ্যাত দার্শনিক বলেছিলেন—"লাখো তথ্যের মধ্যে একটি দুটিই কাজে লেগেছে আমার, বাকিগুলো ব্যবহার করতে পারি নি"—সত্যিই ত তাই। কিন্তু তাই বলে মাত্র দুটো একটা তথ্যের ওপরে ভিত্তি করা, নির্ভর করা ঠিক নয়। তথ্য আপনি যতটা সম্ভব বেশী যোগাড় করতে চেষ্টা করবেন। যোগাড় হয়ে গেলে তার থেকে বেছে নেবেন একটা দুটো। অনেক তথ্য আপনার বুলিতে থাকলে দেখবেন আত্মবিশ্বাস কেমন বেড়ে যায় আপনার।

সেই একজন বিখ্যাত বক্তার কথা ধরুন—এডউইন জেমস ক্যাটেল যিনি প্রায় তিনকোটি লোকের সামনে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তিনি পর্যন্ত স্বীকার করেছিলেন যে কোন একটি বক্তৃতা শেষ করার পরই হাত কামড়াতেন যে এক্ষুনি যে বক্তৃতাটি শেষ করেছেন তার জন্য আরও বিশদ তথ্য তার সংগ্রহে ছিল, বলা হয়নি।

আপনি হয়ত আপত্তি তুলবেন—বলবেন—আর আমার এত সময় কোথায়। একটা বিষয়ে এত ভাবা, তথ্য যোগাড় করা, চিন্তা করার সময় যদি থাকত তাহলেত ভাবনাই ছিল না। ব্যবসা-চাকরী আছে, ঘর—সংসারের গৃহস্থের যা কাজ সবই আছে। আমার পক্ষে লাইব্রেরীতে ছোটা, বই যোগাড় করে রাত জেগে পড়া অসম্ভব ব্যাপার। কথাটি সত্যিই কিন্তু যে কোন বিষয়ই হোক না কেন সৃষ্টিছাড়া কিছুত নয়, আপনিত নিশ্চয়ই কিছু না কিছু ভেবেছেন

ইতিমধ্যেই। আপনার কাজ হবে যতটা সম্ভব দ্রুত এই ব্যাপারে আপনার মনটি একটু গুছিয়ে নেয়া।

এই গুছিয়ে তোলার ব্যবস্থাটি সম্পর্কে ভাবা যাক। "একারস অব ডায়মণ্ড্‌স্" গ্রন্থটির লেখক ডাঃ রাসেল, এইচ, কনওয়েলের ভাষায় বক্তৃতার বিষয়টিকে মনের মধ্যে সাজিয়ে নেয়ার কয়েকটি স্পষ্ট নিরেখ তৈরী করে তিনি সাফল্য লাভ করেছিলেন—কি সেগুলো।

১। আপনার জানা তথ্যগুলো বুঝিয়ে বলুন।

২। তারপর সেই তথ্যগুলোর ওপরে আলোচনা করুন।

৩। অতঃপর বিষয়টিতে শ্রোতাদের কাছে কর্মোদ্যগের অনুরোধ করুন—

কিংবা অন্য ভাবে, যেমন—

১। অন্যায় বা ভুলটি ধরিয়ে দিন

২। প্রতিকার কিভাবে করা যায় দেখান

৩। সহযোগিতা প্রার্থনা করুন।

অথবা—বলুন

১। এই বিষয়ে প্রতিকার এখুনি দরকার

২। আমাদের এই করা উচিৎ, সেই করা উচিৎ ইত্যাদি

৩। আপনাদের উচিৎ সাহায্য করা।

এমনও হতে পারে—

১। শ্রোতাদের আগ্রহ জয় করুন

২। শ্রোতাদের বিশ্বাস অর্জন করুন

৩। সাদামাটাভাবে বলুন কিভাবে আপনার বক্তব্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা অনুধাবন করেছেন।

৪। উদ্দেশ্যের অবতারনা করুণ—শ্রোতারা কিভাবে সাহায্য করতে পারে—ইত্যাদি।

বক্তৃতার সময় হাতে লেখা নোট ব্যবহার করা কিরকম

হঠাৎ বক্তৃতা দেয়ার বিষযে আব্রাহাম লিংকন চূড়ান্ত পারদর্শি হওয়া সত্বেও, প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়ে হোয়াইট্ হাউসে প্রবেশ করার পরে, কোনদিন তিনি মন্ত্রিপরিষদে আলোচনা, সে—গুরুত্বপূর্ণই হোক কিংবা সাধারণ আলোচনাই হোক, আগেভাগে নিজস্ব বক্তব্যগুলি কাগজে না লিখে বলতেনই না কিছু। অবশ্য আবার যখন তিনি ইলিওনয়েস এ ফিরে গেলেন তখন বক্তৃতার সময় কোন কাগজ দেখার প্রয়োজন বোধ করতেন না—সেই সময় তাঁর বক্তব্য ছিল —"বক্তৃতার সময় কাগজের টুকরো থেকে দেখে দেখে বলতে গেলে খুব গোলমাল হয়ে যায়—শ্রোতাদেরও অসুবিধা হয়।"

কথাটা সত্যি সন্দেহ নেই। আপনি আমি আমরা সবাইত জানি বক্তা কাগজের টুকরোতে নোট করে রাখা বিষয়ে বারবার চোখ বোলাতে থাকলে বেশ অসুবিধা হয়। আগ্রহের পঞ্চাশ ভাগই কমে যায়। বক্তা এবং শ্রোতার মধ্যেকার আন্তরিকতার সেতুবন্ধনটি কেমন যেন আলগা হয়ে যায়। কৃত্রিমতার ছাপ পড়ে। শ্রোতাদের বারবারই মনে হতে থাকে যে বক্তার সম্ভবতঃ নিজের ওপর বিশ্বাস একটু কম বুঝিবা।

বরং বলা যাক, নোট তৈরী করুন, প্রস্তুতি পর্বে যত বেশী সম্ভব। একা একা যখন অভ্যাস করবেন তখন সেগুলি সামনে থাক। হয়ত পকেটে নোট গুলো থাকলে আত্মবিশ্বাস বেড়ে যেতে পারে আপনার শ্রোতাদের সামনে দাঁড়ালে। কিন্তু বক্তৃতার সময়ে ব্যবহার না করতে পারলেই ভালো। যদি ব্যবহার করতেই হবে মনে করেন তাহলে যতটা সম্ভব সংক্ষিপ্ত করে লিখুন বড় বড় অক্ষরে। তারপরে কায়দা করে যেখানে দাঁড়িয়ে আপনি বক্তৃতা দেবেন তার সামনে কোন একটা

বই কিংবা কিছু দিয়ে চাপ দিয়ে রাখুন। যাতে বক্তৃতার মাঝে মাঝেই একটু দৃষ্টি ফিরিয়ে সবার অজান্তে দেখে নিতে পারেন পয়েন্টগুলো। একজন বিখ্যাত বক্তা তার লেখা নোটটি বক্তৃতার সময় সামনে রাখা টুপিটির মধ্যে লুকিয়ে রাখতেন এমনভাবে যাতে একবার তাকালেই পড়তে পারেন।

তবে এমন অবস্থা হতেই পারে যখন নোট হয়ত ব্যবহার করতেই হবে। নতুন যারা বক্তৃতা দিতে যাচ্ছেন, তিনি হয়ত এমন নার্ভাস হয়ে পড়লেন বা তৈরী থাকা সত্ত্বেও বক্তৃতার সময়টাতে হয়ত সবই ভুলে গেলেন। ফলটা কি হল। এলোপাথারি কথা বলতে হল হয়ত। ফলে আরো নার্ভাস হয়ে পড়লেন। তাদের পক্ষে হাতে নোট করে রাখা কাগজটি ব্যবহার করাটা কি আর এমন দোষের। বাচ্চারা চেয়ারের হাতল ধরে দাঁড়াতে শেখে বলেই ত চিরকাল সেই রকম ভাবেই চলা ফেরা করে না।

মনে রাখবেন বিটোফেন একদিনেই বিটোফেন হন নি। অনুশীলন ও অধ্যবসায়ই তাঁকে বিটোফেন করে তুলে ছিল।

কোন বই, কোটেশন' অন্যের বক্তব্য, কিংবা আপনার নিজেরই বক্তৃতা মুখস্থ করার চেষ্টাটা ভয়ংকর সময় নষ্ট করে দিয়ে থাকে। বিপদও ডেকে আনাতে পারে মুখস্থ কিছু বলার চেষ্টা থেকে। বক্তৃতা দিতে উঠে দাঁড়ানোর মুহূর্তটিতে বক্তাকে তখন মুখস্থ করা বক্তৃতাটির ভাষা চিন্তা করতে হচ্ছে ভীষণ ভাবে। সামনে দেখার বদলে পিছনের দিকে ভাবতে হচ্ছে তাকে, ঠিক কি ছিল প্রথম শব্দটি—এই পুরো ব্যাপারটা এক মুহূর্তের জন্য হলেও সমস্ত পরিবেশটাই চেতনাহীন করে তুলবে। ঠাণ্ডা করে তুলবে। তাই কোন অবস্থাতেই মুখস্থ করে কিছু বলতে চেষ্টা করাটা খুবই ভুল হয়ে থাকে।

বিখ্যাত অভিনেতা ডগল্‌স ফেয়ার ব্যাংকস্‌ এবং চার্লি চ্যাপলিন জীবনে অভূতপূর্ব যশ এবং অর্থ অর্জন করে ছিলেন। সেই বিলাস বাসনের সুবিধায় তারা আলস্যে দিন কাটাতে পারতেন অবশ্যই। কিন্তু তাদের সবচেয়ে আকর্ষনীয় ছিল এক্সটেম্পো (মন থেকে বক্তৃতা দেয়া) বক্তৃতার অনুশীলন করা।

ডগল্‌স ফেয়ার ব্যাংকস্‌ একটা গল্প খুবই চিত্তাকর্ষক।—"এক সন্ধ্যায় আমরা আড্ডা মারছিলাম। আমি এমন অভিনয় করলাম যেন চার্লি চ্যাপলিনকে একটা নৈশভোজে পরিচিত করিয়ে দিচ্ছি। ফলে চার্লিকে দাঁড়িয়ে উঠে সকলের উদ্দেশ্যে কিছু বলতেই হল। এই রকমের একটা মজার ব্যাপার থেকে আগামী দু বছর আমরা এই চিত্তাকর্ষক খেলাটি খেলেছিলাম সকলে মিলে। আমরা কাগজের টুকরোয় আলাদা আলাদা করে কিছু লিখে তাস সাফাইয়ের মতন করে চোখ বন্ধ করে তুলে নিতাম। সেই কাগজের টুকরোতে যে বিষয়ই লেখা থাক না কেন তার ওপরে আমাদের ঝাড়া এক মিনিট অন্তত বলতে হত, এটাই ছিল

খেলার নিয়ম। একবার আমার ভাগ্যে উঠল—বিষয়—"ল্যাম্পসেড" —দুটো একটা কথা ছাড়া ল্যাম্পসেড সম্বন্ধে কিছুই জানা নেই আমার। এক মিনিট যে কিভাবে বললাম সে আমিই জানি। যা থেকে তবু এই রকম একটা খেলার মধ্য দিয়ে আমরা নিজেদের যে কতটাতীক্ষ্ণ করে তুলতে পেরেছিলাম সেটা বোঝানো যাবে না। এর দ্বারা নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে চিন্তা করার যোগ্যতা অর্জন করছিলাম আমরা। কেউ কেউ হয়ত বলবেন আরে বাবা অত বড় অভিনেতা কিংবা নেতা আমি ত হতে যাচ্ছি না—আমার দরকার ছোট একটা পরিবেশের সামনে রাখা যায় এমনি একটা বক্তৃতা দেবার যোগ্যতা অর্জন করা—

ঠিক কথা, কিন্তু বড় হোক বা না হোক, যে বিষয়টির শিক্ষা ব্যবস্থা পৃথিবীর অন্য সব শিক্ষা ব্যবস্থার মতন, একই রকমের। অভ্যাস ত করতেই হবে।

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

মনে রাখবেন—অপরের কাঁধে ভর দিয়ে দশ পা হাঁটার চাইতে নিজের পায়ে পাঁচ পা হাঁটাও অনেক নিরাপদ।

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

স্মরণ শক্তি বাড়িয়ে তুলুন

স্মরণ শক্তির ক্ষমতার মাত্র দশভাগও সাধারণ মানুষেরা কাজে লাগাতে পারে না। মনে করে রাখার প্রকৃতিগত নিয়ম নিষ্ঠাকে অবহেলা করেই নব্বাই ভাগ সম্ভাবনাই নষ্ট করে ফেলা হয়।

আপনি কি সেই রকমই একজন সাধারণ মানুষ—তাহলে মেনে নিতেই হবে যে একদিন সামাজিকভাবে এবং ব্যবসায়িক সূত্রে দু-দুটো অসুবিধা অন্তত ভোগ করছেন, ফলে আপনি নিশ্চয়ই বইয়ের এই অংশটি বারবার করে পড়তে থাকবেন, এই অংশে স্মৃতিশক্তি বাড়ানোর উপায়গুলি আলোচিত হচ্ছে।

স্মরণশক্তি বাড়ানোর জন্য প্রাকৃতিক নিয়মপন্থাগুলো কঠিন কাজ মোটেই নয়, যেমন ধরুণ অনুধাবন, পুনরাবৃত্তি এবং যোগসূত্র এই এই তিনটি নিয়মই যথেষ্ট।

প্রথম নিয়ম যে জিনিষটি আপনি মনে রাখতে চান সেটি গভীর ভাবে অনুধাবন করা, সেটা করতে গেলে মন সংযোগ আপনাকে করতেই হবে, জলে দাগ কাটার মতন হাল্কা নয়, লোহার পাতে দাগ কাটার মতন গভীর হোক আপনার অনুধাবন।

মানসিক অস্বস্তি কিংবা অস্পষ্টতার মধ্যে দিনের পর দিন কষ্ট পাওয়ার বদলে মাত্র পাঁচ—দশমিনিটের জন্য মন সংযোগ করতে পারলেই অনেক বেশী ফল পাওয়া যায়। সমগ্র পাঠ্য বিষয় অনুশীলনের সবচাইতে গুরুত্ব পূর্ণ বিষয় হচ্ছে এই মন সংযোগের অনুশীলন, স্মৃতি-মধ্যে বিশিষ্ট স্মরণ শক্তি বাড়ানোর ব্যাপারে এই রকম ভাবে অনুশীলনের তুলনা নেই।

আব্রাহাম লিংকন, তার ছেলেবেলায় চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়তে অভ্যস্থ ছিলেন এমন কি তার ল অফিসে বসে, সামনের ছোট টেবিলে

পা তুলে সোফায় হেলান দিয়ে প্রত্যেকদিন সকাল বেলায় খবরের কাগজ পড়তেন, তার অংশীদার ভদ্রলোক ত যৎপরনাস্তি বিরক্তই হতেন এই ব্যাপারে। কেন জোরে পড়তেন জিজ্ঞাস করলে লিংকন উত্তর দিতেন—"জোরে পড়লে দুধরনের লাভ হয়—কি পড়ছি সেটা দেখতে পাই, আবার পড়তে পড়তে শুনতে পাই কি পড়ছি, ফলে মনে রাখতে সুবিধা হয়। স্মৃতিশক্তি প্রখর ছিল লিংকনের—ওই যে আগে বললাম- জলের ওপরে দাগ নয়। লোহার পাতে দাগ ফেলার মতন। আমার মনে দাগ ফেলা কঠিন।' কিন্তু একবার ফেললে মুছে ফেলা আরও কঠিন"—একথাই লিংকন বলতেন।

মনে রাখার ব্যাপারে শুধু পড়া বা শোনা নয়। দর্শন, শ্রবণ ছাড়াও, স্পর্শন, মননপ্রয়োজন।

কিন্তু সর্বোপরি দেখাটাই ভাল করে করা দরকার। আধুনিক সমাজে আমরা দর্শনের ওপরে বেশী নির্ভর শীল। চোখের দেখা স্থায়ী হয়। কারো নাম মনে করতে না পারলেও আগে দেখে থাকলে অনেক সময় লোকটিকে মনে থাকে। চোখ থেকে মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত যে স্নায়ুরাশি রয়েছে সেগুলি কান থেকে মস্তিষ্ক পর্যান্ত বাহিত স্নায়ুগুলোর চাইতে অন্তত বিশ গুন বড়। চীনা ভাষায় প্রবাদে বলে না "একবার দেখা হাজার বার শোনার চাইতে বেশী"—আপনার বক্তব্যটি গুছিয়ে একটা কাগজে লিখে ফেলুন, তারপর সেই লেখাটিকে পড়ে ফেলুন কয়েকবার। চোখ বন্ধ করে অতঃপর সেই লেখাগুলি মনে করতে চেষ্টা করুন—

বিশেষ দিনটি মনে করে রাখা

কোন বিশেষ দিনটি মনে করে রাখার সহজতম রাস্তাটি হচ্ছে অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ দিনের সংগে দিনটিকে যোগ করে দিয়ে মনে রাখার চেষ্টা করা।

স্মৃতি সম্পর্কিত সাফল্যের গোপন সূত্রটি

একটা মজার গল্প মনে করা যাক। ভলতেয়ারকে একজন বলেছিলেন—"আমি বাঁচতে চাই"—শান্ত ভাবে ভলতেয়ার উত্তর দিয়েছিলেন—"কিন্তু আমি তার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারিনা" আপনার বক্তৃতা, আপনার কথা শোনার ব্যাপারে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই হয়ত দুনিয়া উপরোক্ত রকমের অবহেলাসূচক ভঙ্গী নিতে পারে, আপনি বললেন কি বললেন না কার কি এসে যায় এই রকম আর কি—কিন্তু সেটা ভেবে দমে যাওয়ার মানে হয় না। বরং সফল হলে ব্যাপারটাই যাবে উল্টে—সেটাই ত মজার নয় কি—

যা দেখা যায়, পড়া যায়, শোনা যায়। সেগুলি মনে করে রাখার জন্য নোট করে রাখা এবং বক্তৃতা দেবার সময় সেগুলো ব্যবহার করতে চেষ্টা করার ব্যাপারে মার্ক টোয়েন দীর্ঘকাল অসুবিধা বোধ করেছিলেন। বাধ্য হয়ে নোট ব্যবহার করার অভ্যাস তাকে ত্যাগে করতে হয়েছিল। এই ব্যাপার তিনি বলেছিলেন—

—দিনক্ষণ মনে করে রাখা কঠিন কারণ সেটা সংখ্যাতত্ত্বের ব্যাপার। আর সংখ্যাগুলো একঘেয়ে রকমের সাদামাটা, মনে দাগ কাটার কোন ব্যাপার নেই সেগুলোতে। কোন ছবির অবতারনা করে

না বলেই মনে ছাপ রাখার ব্যাপার খুবই দুর্বল। ছবি থাকলে দিনক্ষণ মনে গেঁথে যেতে পারে। আর নিজে যদি আঁকা যায় তাহলে ত প্রায় সব কিছুই মনে থাকা স্বাভাবিক। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি আমি। ত্রিশ বছর আগে আমি প্রত্যেক সন্ধ্যায় মুখস্থ একটি করা বক্তৃতা অবশ্যই দিতাম। আর প্রত্যেক সন্ধ্যারাতেই কোন না কোন নোট দেখে নিতে হত পাছে গুলিয়ে যায় সবকিছু। আমার নোটগুলোতে মুখস্থ করা বক্তৃতার শুরুর কয়েকটা শব্দ লেখা থাকত। এরকম এগারোটা লাইন থাকত তৈরী। কতকটা এইরকম—

ওখানকার আবহাওয়া/সেসময় ওইজায়গার রীতি ছিল

কিন্তু ক্যালিফোর্নিয়াতে কস্মিনকালেও কেউ শোনেনি এইরকম এগারোটি লাইনের প্রথম কয়েকটি শব্দ। যাতে কোন বিষয় বাদ না পড়ে যায়। অথচ নোটের সব কটা লাইনই একইরকমের মনে হয়ে। যেন কতবার'যে মুখস্থ হয়ে গেছে তার ঠিক নেই অথচ কোন ছবি না থাকার জন্য কোনদিনই আত্মবিশ্বাস তৈরী হত না যে সবকটা লাইন ঠিকঠিক বলে উঠতে পারব নোট না দেখে। একদিন নোটটা হারিয়ে গেল। ওঃ সেদিন সন্ধ্যাটা যে কিভাবে কেটেছে ভগবান জানেন। তখনই ঠিক করলাম নতুন কোন পদ্ধতি বের করতে হবে। চেষ্টা করলাম প্রথম অক্ষরগুলো নখে লিখে রেখে বক্তৃতা দিতে উঠব। কিন্তু তাতে কোন লাভই হোল না। সবকিছু গুলিয়ে যেতে লাগল। যেন আতঙ্কিত হয়ে উঠলাম আমি। দেখলাম যে লোকজনেরা আমাকে বারবার হাতের আঙুলের দিকে তাকাতে দেখে সেদিকটাতেই

মনোযোগ দিচ্ছে বেশী। বক্তৃতার শেষে বেশ কয়েকজনত আমাকে জিজ্ঞাসাই করলেন আমার আঙুলে কি হয়েছে।

তখন আমার ছবি ব্যবহার করার কথা মাথায় এল। বুদ্ধিটা মাথায় আসতেই আমার সমস্যার সমাধান এক মুহূর্তেই হয়ে গেল। দুমিনিটের মধ্যে ছটা ছবি হাতে এঁকে ফেললাম। বক্তৃতা দিতে উঠে আর একটুও অসুবিধা হল না আমার। বক্তৃতার পরে ছবিগুলো ছিঁড়ে ফেললাম আমি। পরে আর কোনদিন দরকার হয়নি আমার। এঘটনা প্রায় পঁচিশ বছর আগের। কুড়ি বছর হল ওই বক্তৃতাটি আমার মাথা থেকে চলে গেছে কিন্তু আজও চোখ বন্ধ করে ছবিগুলো মনে করে অনায়াসে অনর্গল বলে বা লিখে যেতে পারি আমি।

কিন্তু আহরণ করা তথ্যগুলোর নিপুন বুনন কিকরে সম্ভব।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে তথ্য যোগাড় হওয়ার পরে সেগুলো ঠিকমতন মনের মধ্যে সাজিয়ে নেয়া যায় কিভাবে। উত্তর হল তথ্যগুলোর অর্থ বুঝে নেয়া। একটু চিন্তা করি অবশ্য।

দুরকম ভাবে বক্তৃতার পয়েণ্টগুলো মনে করে রাখা সম্ভব। প্রথম বাইরে কারো সাহায্যে, দ্বিতীয় কোন মনে করে রাখার মতন জিনিসের সঙ্গে যুক্ত করে। বক্তৃতার ক্ষেত্রে বাইরের সাহাযের অর্থই হচ্ছে লিখিত কাগজটির সাহায্যে নেয়া। কিন্তু কোন বক্তাই বা চায় লিখিত কাগজ পড়তে। কোন শ্রোতাই চায়ই না। দ্বিতীয় পদ্ধতিটি হচ্ছে অন্য কিছুর সঙ্গে বিষয়টি যুক্তকরে ভেবে রাখা। এমন কিছু যা আপনার মনের মধ্যে গেঁথে আছে। আর পুরো ব্যাপারটা এমনভাবে

সাজানো দরকার যাতে প্রথমটি থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে দ্বিতীয়টির কথা, দ্বিতীয়টি থেকে তৃতীয়টি—এরকমভাবে মনে পড়ে যায়। হয়ত সহজ মনে হচ্ছে। কিন্তু সন্ত যারা সুরু করেছেন তারা স্বভাবতই ভয় পাচ্ছেন এই ভেবে যে তাদের কাছে ব্যাপারটা কঠিন হয়ে দেখা দিতে পারে। অবশ্য কতকগুলো পদ্ধতি রয়েছে যেসব পদ্ধতির মাধ্যমে পুরো জিনিসটি একটি সূত্রে গেঁথে ফেলা যায় সহজে, অত্যন্ত দ্রুতভাবে এবং প্রায় ত্রুটিহীন বলা যেতে পারে। অর্থহীন বাক্য গঠনের পদ্ধতিটি কিন্তু মন্দ নয়। উদাহরণ দেযা যাক। মনে করুন আপনি কয়েকটি ছড়ানো বিষয় নিয়ে নাজেহাল হচ্ছেন। একটা স্মরণযোগ্য সূত্রে গাঁথতে চান সবকটি বিষয় কি? ধরা যাক বিষয়গুলো—বিড়াল, ধূমপান, শিবাজী, গৃহ, ধর্ম ইত্যাদি। অর্থহীন বাক্য গঠনের চেষ্টা করে দেখা যাক বিষয়গুলো একটি সূত্রে গাঁথা যায় কি না। "একটি বিড়াল ধূমপান করতে করতে শিবাজীর পিছনে হেঁটে যাচ্ছিল যখন ধর্মচাপা পড়ে বাড়িটা ধ্বসে পড়ল।"

এখন বাক্যটি যে কাগজে লিখেছেন সেটা হাতে চাপা দিয়ে রেখে মনে করতে চেষ্টা করুন ত প্রথম বিষয়টি কি। দ্বিতীয়টি, তৃতীয়টি—"

এইরকম ভাবে যেকোন বিষয়ই পরস্পরের সঙ্গে গেঁথে ফেলা সম্ভব। এবং সেই বাক্যরচনা যতবেশী অর্থহীন এবং হাস্যকর হবে মনে রাখা যাবে ততটা বেশী।

ধরে নেয়া যাক যে এত সব প্রস্তুতি করা সত্বেও, এতসব ভেবে চিন্তে এগিয়ে যাওয়া সত্বেও যদি বক্তৃতামঞ্চে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে স্নায়ু-বৈকল্য ঘটে যায়। বক্তৃতার মাঝখানে কিংবা শুরুতেই যদি বক্তার মনে হয় যে মাথাটা ফাঁকা হয়ে গেছে—মনে পড়ছে না কিছুই। সব শ্রোতারা সাগ্রহে হাঁ করে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে এবং সে একটাও, কথা বলতে পারছে না কি ভয়ংকর পরিস্থিতি—তাহলে। হঠাৎ অর্ধসমাপ্ত বক্তৃতা থেকে সে বসেও পড়তে পারছে না। তার মনে হবে দশ পনেরো সেকেণ্ড সময় পেলেই বক্তৃতার বিষয়গুলি মনে পড়ে যাবে তার। অথচ শ্রোতাদের সামনে পনেরো সেকেণ্ড চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকাটা সর্বনাশ ডেকে আনতে পারে। তাহলে এ অবস্থায় কি করা যাবে? একজন বক্তাকে আমরা জানি যিনি ঠিক এইরকম একটি পরিবেশে, শ্রোতাদের উদ্দেশ্য করে জিজ্ঞাসা করেছিলেন তারা ঠিকমত শুনতে পাচ্ছে কি না। একেবারে শেষে যারা রয়েছেন তারাও ঠিকমতন শুনতে পাচ্ছেন ত। অবশ্য বক্তা খুব ভাল করে নিজেই জানেন যে ঠিকমতনই সবাই শুনতে পাচ্ছেন তবু আসলে তিনি ত কোন কোন কিছু শুনবার, জানবার জন্য ত আর প্রশ্নটা করেন নি। তিনি সময় নিচ্ছিলেন কিছুটা, যে সময়ের মধ্যে সব কিছু মনে পড়ে যেতেই আবার বক্তৃতাটি সুরু করা কঠিন হয়নি তার পক্ষে।

কিন্তু সম্ভবতঃ সবচেয়ে সহজ উপায়টি হল, শেষে ব্যবহৃত বাক্যটির শেষ অক্ষরটি নিয়ে একটা বাক্য রচনা করা। এভাবে অনেকক্ষণ চালানো যায়।

অনেকদিন আগেকার চেম্বার অব কমার্সের একটি আলোচনা সভার কথা বলা যাক। শ্রোতাদের মধ্যে অনেকেই আমরা বসেছিলাম সেখানে। ঠিক মনে নেই আমাকেও সম্ভবতঃ বক্তৃতা দিতে হয়েছিল সেদিন। এবং সেইদিন মূল বক্তা ছিলেন আন্দামান নিকোবর দ্বিপপুঞ্জের দীর্ঘকাল ধরে কাঠের ব্যবসা করছেন এমন একজন ভদ্রলোক, যিনি আবার অন্যসূত্রে আমার বন্ধুও বটে। আপনারা সবাই বুঝতে পারছেন যে আমি আমার জানা সবরকমের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে সংক্ষীপ্ত ভাষণটি দিয়েছিলাম এবং আমার বন্ধুটি অতঃপর বলতে উঠলেন।

এখন এই কাঠের ব্যবসায়ীটি দূর দ্বীপপুঞ্জে তথাকথিত সভ্য সমাজ, বিলাস বসন ইত্যাদি থেকে বহুদূরে বাস করেন, সঙ্গীরা তার কাছে দ্বীপের আদিম বাসিন্দারা এবং কিছু সহকারী। বন্ধুটি সাধারণ জনসংযোগ সম্পর্কিত কোন কিছুরই ধার ধারেন না। মেঠো গ্রাম্য তার ধরনধারণ। তিনি বক্তৃতা দিলেন। দীর্ঘ বক্তৃতা। কোনও রকম নিয়ম কানুন প্যাঁচ-পয়জার তিনি মানলেন না। আর মানার কথাও নয় কারণ তিনি জানতেনই না কোনও রকমের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। অথচ তার বক্তৃতার মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল যা বিদ্যুতের মতন কাজ করল শ্রোতাদের কাছে। আন্দামানে শ্রমিক হিসাবে তিনি যখন কাজ করেছিলেন সেইসব অভিজ্ঞতার কথা। তারপর মালিক হিসেবে, ব্যবসায়ী হিসেবে তার অভিজ্ঞতার কথা তিনি যখন বলছিলেন তখন মনে হচ্ছিল তিনি কথা বলছেন নাভিমূল থেকে, রক্তের মধ্যে থেকে অতি অন্তরঙ্গতার সঙ্গে তার প্রতিটি বাক্যবিন্যাস, তা সে যতই মেঠো, গ্রাম্য, উচ্চারণ দোষে দুষ্ট,

কিংবা ব্যকরণগত ভুলেই তরা থাক না কেন, শ্রোতাদের মুগ্ধ করে রাখছিল। আমরা সকলেই স্তম্ভিত হয়ে শুনছিলাম তার বক্তৃতা। দারুন উৎসাহে, উত্তেজনায়, ভাবপ্রবণতায় টগবগ করে ফুটছিলেন, যার বেগ শ্রোতাদের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়ে গেল। আমার এই বন্ধুটির গল্প বলতে গিয়ে আমার মনে পড়ে যাচ্ছিল আর একজন সফল ব্যবসায়ীর কথা, যিনি কয়েকটি পয়সা পকেটে নিয়ে অনেকদিন আগে কলকাতায় এসে নেমেছিলেন। এখন ভারতবর্ষের সবচাইতে বেশী টাকার বিজ্ঞাপন তিনি করে থাকেন যা প্রতি বছরই বেড়ে চলেছে। তিনি বলতেন—

"বড় কিছু হওয়া যায় না উৎসাহ না থাকলে"—একথা ঠিকই যে জনসংযোগের নানানরকমের নিয়ম শৃংখলা, পদ্ধতি প্রকরণ ইত্যাদি রয়েছে কিন্তু ক্রমশই আমরা কথা বলার মধ্যে মননশীলতা, অদম্য উৎসাহ, উদ্দীপনা এবং অন্তরঙ্গতার উপরে বেশী আস্থা খুঁজে পাচ্ছি। তাইত প্রচলিত উপদেশবাণীতে দেখতে পাচ্ছি—""আন্তরিকতা ছাড়া জ্ঞান মূল্যহীন। হৃদ্যিক যোগাযোগ প্রয়োজন—শুধু কথার কথা নয়। যদি কিছু বোঝাতে হয় তবে তা একান্ত জরুরী।"

দুহাজার বছর আগে প্রাচীন কবির ভাষায় বলা যায়—"অন্যের চোখে জল আসার কারণ যদি তুমি হও তাহলে শীঘ্রই দুঃখ যে যে তোমাকে তাড়া করবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।"

মার্টিন লুথার একসময়ে বলেছিলেন—"কোন কিছু লিখতে হলে, বক্তৃতা দিতে হলে, আমাকে ক্রুদ্ধ হতেই হয়। তার কারণ ক্রোধ এলেই আমার রক্তে আগুণ ধরে যায়। বোঝাটা তীক্ষ্ণ হতে শুরু করে।" মার্টিন লুথারের মতন ক্রুদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা হয়ত আপনার আমার নেই কিন্তু যা আমাদের দরকার সেটা হোল—বিষয়টি সম্পর্কে অন্তরঙ্গ অভিজ্ঞতা খোলা মনের ব্যবহার।

গভীর চিন্তা করলে বোঝা যায় যে মানুষজনদের মধ্যে যাবতীয়

ভুল বোঝাবুঝির কারণ গোলমালভাবে কথাবার্তা বলতে না পারার। সমীক্ষায় দেখা গেছে যে এমন কি পশুপাখিও অন্তরঙ্গ ব্যবহারের বশ। সেই পুরোন কথাই আবার বলতে হয়—যে বিনয়ের কোন শত্রু নেই।

বিখ্যাত রেসহর্সের ট্রেইনাররা সবাই বিশ্বাস করেন যে অন্তরঙ্গ ব্যবহার করতে পারলে রাগী ঘোড়াও শান্ত থাকে। যা বলা যায় দ্রুত শিখেও ফেলে। গৃহপালিত পশুদের ক্ষেত্রে এটি ত সকলেরই নিত্য অভিজ্ঞতা। মরু অঞ্চলের উটদের ব্যবহারে এটি স্পষ্ট প্রমাণিত হয়েছে দীর্ঘকাল আগেই।

শ্রোতারা খুবই অনুভূতি প্রবণ, সব সময়েই মনে করে রাখা দরকার যে বক্তৃতা দেবার সময়ে আমরা প্রত্যেকেই শ্রোতাদের বুঝতে চেষ্টা করি। বক্তৃতা যদি তরল হয় ত শ্রোতাদের পরিবেশও তরল হয়ে উঠবে, গম্ভীর ভারিক্কি হলে গম্ভীর ভারিক্কি। খাপছাড়া ভাবে বিষয় নিয়ে কথা নিয়ে কথা বললে তারাও হালকাভাবে বিষয়টি নেবে আবার অত্যন্ত গভীরভাবে নিলে শ্রোতারাও গভীর ভাবে চিন্তিত হতে থাকবে। বক্তা যদি তাই অত্যন্ত অন্তরঙ্গতার সুরে সমস্ত বিষয়টি শ্রোতাদের সামনে তুলে ধরতে পারেন তাহলে দেখা যাবে শ্রোতারা বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে অনুধাবন করছেন। দিনের আলোর মতন পরিষ্কার যে তথ্যটি সকলের সামনে অধুনা উদ্‌ঘাটিত সেটি হল—গম্ভীর ভাবে কিংবা হাস্যরসের মধ্যে কথা বলার প্রয়াস ব্যর্থ হতে পারে কিন্তু অন্তরঙ্গ সুরে ভাষা বললে তার কোন মার নেই। বিশ্ববিখ্যাত রুবেনস্টাইন যখন গানের সঙ্গে বাজনা বাজাতেন তার সুর তাল যে নিখুঁত হত' তা নয়—কিন্তু সেই ত্রুটি কেউ লক্ষ্যই করত না তার কারণ তার কথা মানুষের হৃদয়ে প্রবেশ করত। এথেন্স-এর ঐতিহাসিক ব্যক্তি পেরিক্লিস ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন—যেন একটিও অবাঞ্ছিত অথবা অবাস্তব শব্দ তার মুখ

দিয়ে কখনও উচ্চারিত না হয়। তাই পেরিক্লিসের কথায় সমস্ত দেশ নির্দ্বিধায় পরিচালিত হত। আমেরিকার সুবিখ্যাত মহিলা লেখিকা একটি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন—"সব শিল্পীরই গোপন তথ্যটি হল আবেগ। অবশ্য এখন ব্যাপারটি সকলেরই জানা।" বলা বাহুল্য সব বক্তাই ত সেই শিল্পী—ফলে কি দাঁড়াল—

আবেগ-অনুভব-উদ্দীপন-অন্তরঙ্গতা।

এই সবই থাকা দরকার আপনার বক্তৃতায়। পৃথিবীর বরেণ্য বক্তাদের মধ্যে সকলেরই কিছু না কিছু দোষ ছিল যেমন—আব্রাহাম লিংকন কর্কশ এবং উচ্চগ্রামে বক্তৃতা দিতেন। ডেমোস্থেনিস আমতা আমতা করতেন। লুকার ফিসফিস করে বলতেন, অথচ এরা সকলেই কিন্তু বক্তা হিসাবে সাধারনের অনুসরণযোগ্য এবং এদের সকলের মধ্যেই যে গুণটি দেখতে পাওয়া গেছে সেটি হচ্ছে আন্তরিক প্রয়াসের রকমটি, যে গুণ হাজারো ত্রুটি ঢেকে তাদের লক্ষ্যে পৌঁছে দিয়েছিল।

এখন আপনি বলবেন—বাঃ আপনি ত গভীর অন্তরঙ্গতার কথা বললেন. কিন্তু সেটা আয়ত্ব করব কিভাবে। কথাটা সত্যিই। কোন ভুল নেই। কিন্তু তার উত্তরটি নিদারুণ—আপনি কোনদিনই আয়ত্ব করতে পারবেন না ভাসা ভাসা কথা বললে, ভাবলেন আপনি যে কোন মনোযোগী শ্রোতার কানে ধরা পড়ে যাবেনই যে আপনি গভীর আত্মবিশ্বাসের মধ্যে থেকে বলছেন না এমনি সব কথার মাধ্যমে কথার ফুলঝুরি বানিয়ে চলেছেন। আসলে আপনি যে বিষয় নিয়ে বলবেন সেই বিষয়ে শ্রোতারাও নিশ্চয়ই কিছু ভাবনা চিন্তা করেছে ইতিমধ্যেই। কিন্তু আপনার বিশ্বাস। আপনার অভিজ্ঞতা আপনার নিজস্ব সিদ্ধান্ত সূচক কথাই তারা শুনতে চাইছেন। প্রথমেই তাই আপনাকে শ্রোতাদের সেই প্রত্যাশাগুলো পূরণ

করতে হবে। যদি না করেন তাহলে শ্রোতারা ভদ্রতার খাতিরটুকু ছাড়া আপনার কথা শুনবে কেন।

ফলে আলস্য ত্যাগ করুন। নিজের কাজের মধ্যে ডুবে যান। গভীরে প্রবেশ করুন বিষয়টির, আপনার নিজেরও। আপনার নিজের প্রাণের মধ্যে যে সুধা আছে সেই সুধাভাণ্ড উদ্ধার করুন। পাথরের একটি টুকরো কষ্ট করে সরিয়ে দিতে পারলে দেখবেন স্বচ্ছ জলের কেমন ঝর্ণাধারা কলকল শব্দে নেমে এসে শরীর মন জুড়িয়ে দেয়।

মনসংযোগ করুন। ভাবুন যতক্ষণ না বিষয়টি আপনার কাছে তার স্পষ্ট রূপ নিয়ে প্রতিভাত হয়। সবশেষে দেখবেন প্রস্তুতির কি ভয়ংকর প্রয়োজন ছিল। হৃদয়বৃত্তির উৎকর্ষ সাধনের কাছে তাল মিলিয়ে মস্তিষ্কবৃত্তির উৎকর্ষ সাধন দরকার। একটি উদাহরণ ভাবা থাক।

ধরা যাক একটি বড় ধরনের সওদাগরী অফিস। সেখানে বিশেষ ধরনের সঞ্চয় পরিকল্পনা চলছে। কিছু কর্মীদের শিক্ষনের ব্যবস্থা হয়েছে। এক সময় দেখা গেল যে শিক্ষানবিশীদের একজনের মধ্যে উৎসাহের অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে শিক্ষানবিশটি বিশেষ সঞ্চয় পরিকল্পনা সম্পর্কে বক্তৃতা দিতে গিয়ে সাদামাটা বক্তৃতা দিলেন যে বক্তৃতায় হৃদয়ের তাপ উত্তাপের কোন বালাই ছিল না। শিক্ষণকালে তাকে প্রথম যে উপদেশটি দেয়া হল সেটি হচ্ছে বিষয়টি সম্পর্কে উত্তেজিত হতে শিখতে। তাকে বলা হল, যাও বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করতে শুরু কর। আর যাবার সময় তাকে মনে করিয়ে দেওয়া হল যে সাধারণত: ৮৫% লোক মৃত্যুর পরে কিছু রেখে যেতে পারেন না। ৩% লোক হাজার দশেক করে টাকা রেখে যেতে পারেন মাত্র। এবং বলা হল ভাবতে যে শ্রোতাদের কাছে সে আসছে তাদের উপকার করতে যাতে অবসর

নেওয়ার পরে তারা কিছু জমানো অর্থ হাতে পেতে পারে, যাতে দুমুঠো খাবার সংস্থান হয়। অসহায় অবস্থাটি যাতে অন্তত তাদের বিপদে ফেলতে না পারে। তাদের স্ত্রী পুত্রকন্যার মুখের হাসি যেন তাদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে চিরতরে না হারিয়ে যায়।

এখন এই কথাগুলি বারবার ভাবতে থাকলেই আমাদের এই শিক্ষানবিশটির ক্রমশঃ ধারণা হতে থাকবে যে সে আসলে সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে যাচ্ছে। ফলে তার মধ্যে দৃঢ়তা আসবে, কাজটি আরও ভালভাবে করার অদম্য আগ্রহ আসবে।

সার্থক বক্তা হতে কি কি গুণ প্রয়োজন

উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু অভিযানে যারা অংশ নিয়েছেন তাদের যে মানসিক উৎসাহ ছিল সেইরকম পরিমাণের উৎসাহ জনসংযোগের ক্ষেত্রে, যিনি সফল হতে চান তার ত দরকার হবেই। অথচ ওইরকম দৃঢ়সংকল্প নিয়ে সাধারণতঃ কেউ জনসংযোগের ক্লাস করতে আসে না। সত্যি কথা বলতে কি অন্য কোন কাজেও কেউ ওই ধরনের উৎসাহ, উদ্দীপনা, দৃঢ়সংকল্পের কথা ভাবতেই পারে না। স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটিতে গেলেই লক্ষ্য করা যাবে যে একজন ছাত্র বা ছাত্রীর উৎসাহের পরিমান আসলে কতটা। বিশেষত রাতের স্কুলগুলোতে এবং এ্যাডাল্ট এডুকেশন সেকশন গুলোতে, ছাত্রছাত্রীরা সেখানে সাধারণতঃ চাকরীরত অবস্থায় পড়াশুনা করতে এসে থাকেন। ক্লাস সুরু হওয়ার অল্প কিছুদিন পরেই ভয়ংকর ক্লান্ত হয়ে পড়েন সবাই। এক একজন করে টুপটাপ খসে পড়তে দেখা যায় ক্লাস থেকে। এটা খুবই দুঃখজনক ঘটনা সন্দেহ নেই।

অদম্য নিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা

যে কোন কাজেই নিষ্ঠা না থাকলে যতটুকু সময় বা অর্থ খরচ করা হল ততটুকুই ক্ষতি। টাইপ শিখতে শিখতে, ব্যায়াম করতে করতে যদি ক্লান্ত হয়ে কেউ পুরোপুরি অথবা কাজ চালিয়ে দেবার মতন শেখার আগে ছেড়ে দেয় এবং এরকম ঘটনা যদি সে একের পর এক করতেই থাকে তাহলে সারা জীবনের ইতিহাসে ক্ষয়ক্ষতির পরিমানটা হবে খুব ভয়াবহ। বলা বাহুল্য সেটা খুব আনন্দ সংবাদ নয়। তাই সিদ্ধান্ত নিতে দেরী করা ভালো, কিন্তু একবার সিদ্ধান্ত নিলে শেষ পর্যন্ত দেখতে চেষ্টা করাই বাঞ্ছনীয়।

সংকল্পে স্থির হওয়া মানেই সাফল্যের দোরগোড়ায় পৌছে যাওয়া

লিংকনের পরিচিত একটি ছেলে একটা সময়ে ইতিহাস পড়ার ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে ওঠে কিন্তু মনে মনে সে চিন্তিত হয়েছিল যে ইতিহাসের মতন দীর্ঘ বিষয় সে ঠিক·মতন পড়ে উঠতে পারবে কি না। এইরকম সন্দেহ প্রকাশ করে ছেলেটি লিংকনের-উপদেশ চেয়ে একটি চিঠি লেখে। উত্তরে আব্রাহাম লিংকন লিখেছিলেন।

তোমার সংকল্প যদি স্থির হয়, এবং তুমি যদি শেষ অবধি সংকল্প থেকে বিচ্যুত না হও, তাহলে অর্ধেক সাফল্যই তুমি আয়ত্বে করে নিতে পারো"।

সব সময়ে মনে রাখবে যে সাফল্যলাভ সংক্রান্ত বিষয়ে তোমার নিজস্ব সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। আর সেটাই সবচেয়ে বেশী জরুরী।"

লিংকন জানতেন বুঝতেন ব্যাপারটা। তার নিজস্ব ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাপ্রসূত বিষয়টি। সারা জীবনে গোনাগুনতি বছরখানেকের বেশী স্কুলে, পড়াশুনা করেননি লিংকন। কিন্তু বই-টই পড়ার ব্যাপারে তিনি ছিলেন ওস্তাদ। একবার তিনি নিজেই বলেছিলেন যে তার বাসস্থানের পঞ্চাশ মাইল পরিধির মধ্যে যত বইপত্র ছিল-সবই তার পড়া হয়ে গেছে। পায়ে হেঁটেই তিনি লোকজনদের বাড়ি থেকে বইপত্র ধার করে আনতে যেতেন। সারা রাত ধরে তার শোবার ঘরে কাঠের আগুন জ্বালানো থাকতো। অনেক রাত অবধি জেগে তিনি পড়াশুনা করতেন। ঘুমোতে যেতেন, তারপর আবার সকালের আলো ফুটতে না ফুটতেই আবার চোখ কচলে উঠে পড়তে সুরু করতেন। দশ বিশ মাইল অনায়াসে হেঁটে কোন একজন অখ্যাত বক্তার বক্তৃতা শুনতে তিনি চলে যেতেন। আবার ফিরে আসতেন। মাঠে ঘাটে। পরিচিত অপরিচিত দোকানদারদের সামনে, হয়ত বা একটা গাছকে সামনে রেখেই তিনি তার বক্তৃতার অভ্যাস করে যেতেন। নিউ সালেম এবং স্প্রিংফিল্ড এর সাহিত্য সভা ও আলোচনা সভার তিনি সভ্য ছিলেন। হয়ত হীনমন্যতাতেও ভুগতেন। কোন মহিলার সামনে পারতপক্ষে তেমন অনর্গল কথাবার্তা বলতেই পারতেন না। যখন মেরী টড্ এর সংগে বিবাহের কথা ভাবছিলেন তখন তিনি প্রতিদিন বসার ঘরটিতে চুপ করে বসে থাকতেন, আর মেরী টডের অনর্গল কথা শুনতেন। সেই সময় তাকে ক্বচিৎ—কদাচিৎ কথা বলতে শোনা যেত। অথচ এই লোকটিই শুধুমাত্র অধ্যাবসায়, দৃঢ়-সংকল্প এবং অভ্যাসের মাধ্যমে নিজেকে ইতিহাসের পাদপ্রদীপের সামনে উপস্থিত করতে পেরেছিলেন। লিংকনের বক্তৃতা মানব সভ্যতার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে সন্দেহ নেই এমন কি থিয়োডর রুজভেল্টকেও বলতে শোনা গেছে—

"কোন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অবস্থার মধ্যে পড়ে গেলে, আমি প্রথমেই নিজেকে লিংকনের জায়গায় বসিয়ে বুঝাতে চেষ্টা করি যে এইরকম পরিস্থিতিতে লিংকন কি করতেন, কি রকমের সিদ্ধান্ত হত তার। ব্যাপারটা হয়ত অস্বাভাবিক মনে হতে পারে আপনাদের। কথাটা কিন্তু ঠিক যে এইরকম ভাবে লিংকনের কথা ভাবলেই আমার কঠিন কঠিন সমস্যাগুলোর অত্যন্ত সহজ সমাধানসূত্র আমি খুঁজে পেতাম।" আচ্ছা—শিক্ষানবিশী থাকার সময়ে রুজভেল্টের মতন প্রয়াস চালালে কেমন হয়।

পুরস্কার অবশ্যম্ভাবি

হার্ভার্ডের বিশ্ববরেণ্য মনস্তত্ত্ববিদ প্রফেসর জেমস তার বক্তৃতায় বলেছিলেন—

"কোন ছাত্রের, সে যে বিষয়েরই হোক না কেন, চিন্তিত হওয়ার কোন কারন নেই। সে দিনের মধ্যে কাজের সময়টি যদি ঠিকমতন নিষ্ঠাসহকারে ব্যবহার করতে পারে, তাহলে পরীক্ষার ফলটিও অনায়াসেই তার করায়াত্ত হয়ে থাকবে। অধ্যবসায় ঠিক মতন চালিয়ে যেতে পারলেই হঠাৎ একদিন সকাল বেলায় সে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত অবস্থায় দেখতে পাবেই, সে যে কোন ধরনের কঠিন কাজই বেছে নিক না কেন।" প্রোফেসর জেমসের সঙ্গে যে কথাগুলো জুড়ে দেয়া যায়। জনসংযোগের বেলায়। বিক্রয় প্রতিনিধিত্বের বেলায় এবং বক্তা হিসেবে ওই অধ্যাবসায় টুকু থাকলে পাঁচের মধ্যে একজন নয় একেবারে পঞ্চম হয়ে উঠতে সময় লাগে হয়ত, কিন্তু হয়ে ওঠার ব্যাপারে দ্বিধা নেই। লোকে বলে করে পাওয়া অর্থই হচ্ছে কৃপা।

সুতরাং ঈশ্বরের কৃপার ওপরে আস্থা থাকলে করতে হবে। করে পেতে হবে, অন্যথা নান্য পন্থা। অনেককিছু চেয়ে লাভ নেই। একেরই যাতে চরম হয় সেরকম করতে পারলে সাফল্যলক্ষ্মী যে ঘরে এসে উঠবেন সন্দেহ নেই।

অর্থাৎ আরও সংক্ষিপ্তভাবে বলা চলে যে সফলতার ব্যাপার দুটো জিনিষের ওপর নির্ভর করছে। এক, একজনের কার্যক্ষমতা, আর দুই—আপনার প্রত্যাশা, উদ্দেশ্য কিংবা ইচ্ছার গভীরতা এবং সে সম্পর্কে আপনার সংকল্পের দৃঢ়তা। প্রফেসর জেমস আরও বলেছিলেন—

"যে কোন বিষয়ই হোক না কেন—বিষয়টি সম্পর্কে আপনার তীব্র আগ্রহই আপনাকে বাঁচিয়ে দেবে। ফললাভ সম্পর্কে যদি আপনি যথেষ্ট যত্নবান হন, ফললাভ হবেই। বড়লোক যদি হতে চান বড়লোক হবেন। জ্ঞানী-গুনী হতে চান ত তাই হবেন। ভাল হতে চাইলে ভাল হতে পারেন। শুধু আপনি নিজের মনে এগুলো চাইবেন তীব্র আগ্রহ নিয়ে এবং সেই চাওয়ার ব্যাপারে ভাবের ঘরে চুরি করে মনকে চোখ ঠারবেন না। এবং চাওয়াটা আপনি নির্দিষ্ট করে ফেলুন। এক চাইতে গিয়ে বহু চেয়ে বসবেন না।"

সমাজে চোখ খুলে তাকালে দেখা যাবে যে অনেক বেশী তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন এবং চালাক চতুর কেউ হয়ত,টাকা রোজগারের ব্যাপারে সারাক্ষণ নিজেকে ব্যস্ত রাখছেন তারা ঠিক বেশীদূরে যেতে পারেন না। অথচ অন্যদিকে হয়ত খুবই সহজ সাধারণ একজন তার একটি ইচ্ছা বা একটি উদ্দেশ্য নিয়ে গোঁ ধরে চলে সাফল্যের শিখর-চূড়ায় আরোহন করছেন। সেটাইত স্বাভাবিক, প্রাকৃতিক নিয়মতও বটে। একই ব্যাপারত আবহমান কাল ধরে ব্যবসায় এবং পেশাগত ব্যাপারে হয়ে চলেছে। রকফেলার একটা কথা বলেছিলেন যে—ব্যবসায় সাফল্যের চাবিকাঠিটি হচ্ছে ধৈর্য্য।

বিশ্বযুদ্ধের সময়ে প্যারিসে জেনারেল জোফ্রি তার অধীনের সমস্ত সেনানায়কদের আদেশ দেন, পালানোর বদলে আক্রমন রচনা করতে। পৃথিবীর যুদ্ধের ইতিহাসে এই যুদ্ধটির কথা বিশেষ স্মরণীয় হয়ে আছে। দুদিন যুদ্ধের পরে জেনারেল ফক্ জানালেন—“আমার সৈন্যদলের বাঁধুনি ভেঙে পড়ছে। ডানদিকে সৈন্যরা ধ্বংস হয়ে গেছে। অবস্থা চমৎকার। আমি আক্রমন করছি।” সেই আক্রমনের জন্যই প্যারিস শহর রক্ষা পেয়েছিল।

সুতরাং যখন মনে হবে যে-বড় কষ্ট হচ্ছে, আর পারা যাচ্ছে না অর্থহীন হয়ে যাচ্ছে সব চেষ্টা, তখনই কিন্তু আপনাকে মনে রাখতে হবে যে—“অবস্থা চমৎকার—আক্রমণ করতে যাচ্ছি”—আক্রমন-আক্রমণ-আক্রমণ—আপনার পৌরুষের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুটো গুণ আপনি রক্ষা করতে পারবেন—আপনার সাহস এবং বিশ্বাস।

জয় করার দৃঢ় সংকল্প

সাধারন মানুষজন আমরা—আপনারা যদি প্রবাদ বাক্যের মতন গৃহীত নিচের বর্ণিত উপদেশটির নিয়ম মেনে চলি তাহলে আমাদের মতন সুখী আর কে হতে পারে—

“বাড়ি থেকে বাইরে বেরোনোর সময়ে মাথা উচু করে দাঁড়ান, বুক ভরে নিঃশ্বাস নিন। মুখের হাসি ফুটিয়ে তুলুন—বাইরের রোদ্দুরের উজ্জ্বলতা আকণ্ঠ পান করুন—যার সঙ্গেই দেখা হোক মনোমুগ্ধকর হাসি দিয়ে অভ্যর্থনা করুন। আন্তরিকতার সঙ্গে নমস্কার করুন। ভুল বোঝার কথা মনেই আনবেন ঃনা, শত্রুদের কথা ভেবে একটি মুহূর্তও নষ্ট করবেন না। মনটাকে গুছিয়ে নিয়ে

বরং ভাবতে চেষ্টা করুন আপনার এখন কি কাজ করার পরিকল্পনা। তারপর এদিক ওদিক হাঁটাচলা না করে সোজা গন্তব্যের দিকে এগিয়ে চলুন। কাজে সফল হলে কি কি করবেন সেই স্বর্ণময় স্বপ্নের মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে রাখুন। দেখবেন ক্রমশঃ একটি সময় আসবে যখন আপনার ওই উদ্দেশ্যের লক্ষ্যে পৌছোনর জন্য যেসব রাস্তা এবং সুযোগ সুবিধা রয়েছে আপনি নিজের অজান্তেই সেইগুলির দিকে ধাবিত হচ্ছেন। চোখের সামনে সেই ছবিটি সারাক্ষণ দীপ্ত করে রাখুন যে ছবিতে আপনি নিজেকে, সক্ষম, সফল এবং আন্তরিক একজন হিসেবে দেখতে পাবেন—আপনার চিন্তাই ক্রমশঃ সেই স্বপ্নের মানুষটিকে বাস্তবের মানুষ হিসেবে তিলতিল করে সৃষ্টি করে তুলবে। চিন্তার ক্ষমতা অসীম। তবে মানসিকতার যথার্থতা রক্ষা করাটা জরুরী—যথার্থতা সাহসের, অকপট ব্যবহারের এবং সদা প্রফুল্লময়তার। ঠিকমতন ভাবতে পারাটাই হচ্ছে সৃষ্টি। সমস্ত সাফল্যই ইচ্ছাপ্রসূত। সমস্ত আন্তরিক প্রার্থনারই স্ফুরণ হয়ে থাকে। আমাদের হৃদয় যেখানে অবস্থান করে বস্তুত আমরা সেখানেইঅবস্থান করি। সেইরকমই হয়ে যাই।—"অমৃতের পুত্র আমরা"—এ কথাটা ভুললে চলবে কেন।

শ্রদ্ধার ভাবটি বজায় রাখুন

আপনি যাই করুন না কেন ইতিপূর্বে সংঘটিত বিশিষ্ট ঘটনাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্টজনের প্রতি সদাসর্বাদা শ্রদ্ধার ভাবটি বজায় রাখবেন। শ্রদ্ধা করতে শেখা মানেই নিজে শ্রদ্ধা পাওয়া। পৃথিবীতে কোন শুভ কাজই সম্পান্ন হয়নি, কোন মানুষই সফল হয়নি যেখানে কোন না কোন কিছুর প্রতি, কারও প্রতি শ্রদ্ধার ভাবটি অনুপস্থিত ছিল। বরং একটা আবহমানকালের ইতিহাসে কোন কাজের সাফল্য উৎকর্ষসাধন কিংবা কোন মানুষের ব্যক্তিগত সাফল্যের পিছনে শ্রদ্ধার ভাবটি ছিল আন্তরিক। কথায় বলে—শ্রদ্ধা জানালে সাপও আপনার বস হয়ে যাবে।

ব্যক্তিত্ব বক্তৃতামঞ্চে উপস্থিতজনের মনের অবস্থা

সমীক্ষা করে দেখা গেছে যে ব্যবসায় কিংবা কাজের বিষয়ে সুপার-ইনটেলিজেন্স এর বদলে ব্যক্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশী।

একজন লোকের ব্যক্তিত্ব নির্ভর করে কিছুটা তার জন্মগত ঐতিহ্যের ওপরে। জন্মের আগেই সেটি পূর্ব নির্দ্ধারিত। পরবর্তী কালের পরিবেশ-পার্থক্য অবশ্য তার এই জন্মগত ব্যক্তিত্বের কিছুটা ওলট পালট করতে পারে। ব্যক্তিত্ব বাড়িয়েও তুলতে পারে কিন্তু সাধারণভাবে ব্যক্তিত্ব বদল করা অথবা উন্নতি করাটা বংশানুক্রমিক। কিন্তু মানুষ পুরুষকারের ফলে যেমন সব ক্ষেত্রে তেমনি ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রেও উন্নতি করতে সক্ষম।

যদি আপনি আপনার শ্রোতাদের সামনে আপনার সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বটি তুলে ধরতে চান তাহলে প্রথমেই অত্যন্ত শান্ত ধীরস্থির এবং স্বাভাবিকভাবে বক্তৃতামঞ্চে উঠে যেতে হবে। একজন ক্লান্ত চিন্তিত বক্তার কখনও চুম্বকশক্তি থাকতে পারে না। আপনার যা কিছু প্রস্তুতি এবং বক্তৃতা সম্পর্কিত পরিকল্পনা সবটাই শেষ মুহূর্তের জন্য মুলতুবী রাখবেন না। কারণ তাহলে হঠাৎই দেখবেন সময় সংক্ষিপ্ত করতে হচ্ছে আর তখন তাড়াহুড়ো করে আপনার পরিকল্পনামাফিক প্রস্তুতিগুলো আপনাকে এড়িয়ে যেতে হবে অস্বাভাবিক দ্রুতগতিতে। তাহ'লেই সব কিছু অগোছালো হয়ে যেতে পারে।

একজনবক্তা অন্যদের চাইতে বেশী শ্রোতা টানে কিভাবে

লক্ষ্য করা গেছে যে, যে সব বক্তাদের মধ্যে অদম্য উৎসাহ, উদ্দীপনা এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের মনোভাব রয়েছে তারাই অন্যদের চাইতে বেশী শ্রোতাদের মন জয় করতে পারে।

বক্তৃতাক্ষেত্রে পোষাক পরিচ্ছদের অবদান

ঠিকমতন পোষাক পরিচ্ছদ পরা থাকলে মনের মধ্যে কোথায় যেন একটা সাহসের ভাবটি থেকে যায়। নিজের ওপরে বিশ্বাস থাকে বেশী। আত্মমর্যাদার ক্ষেত্রটিও বেড়ে যায়।

আবার বক্তার জামাকাপড় পরিধানের ব্যাপারে শ্রোতারা যদি দেখে বুক পকেটে গুচ্ছের কাগজ পত্র মুখ বার করে আছে, বেল্টটা বাঁকানো। তাহলে শ্রোতাদের মনে বক্তা সম্পর্কে শ্রদ্ধার ভাব কমে যাবেই। তার কারণ সে নিজে ওইরকম পোষাক পরিধান করলে সেটা তার পছন্দসই হত না ফলে বক্তা সম্পর্কেও অপছন্দ হ'বেই।

বক্তৃতা দেবার আগেই বক্তা গৃহীত কিংবা বর্জিত হয়ে যায়

অনেকদিন আগে বিশিষ্ট একজন বক্তাকে প্রশ্ন করেছিলাম তার সাফল্যের কারণ সম্বন্ধে। তিনি সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়েছিলেন যে তার নিজস্ব হাসিটিই তাকে সফল করে তুলেছে। প্রথমে বিশ্বাস হয়নি, পরে বুঝতে পেরেছিলাম কথাটি কত সত্যি।

অনেককেই দে'খা যায় বেশ মজার মতন করে যেনবা শ্রোতাদের সঙ্গে খোশ গল্প করতেই এসেছেন এমন ভাব নিয়ে অনেকে বক্তৃতা দিতে ওঠেন। শ্রোতারা সঙ্গে সঙ্গে তাকে যেন তাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে, কথা বলতে শুরু করার আগেভাগেই। আবার অনেককে দেখা যায় গম্ভীরভাবে মঞ্চে উঠে কোনমতে বক্তৃতা দিয়ে ও ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়ে বসে পড়েন। শ্রোতাদের মনে হতে পারে যে তিনি একটি অত্যন্ত অবাঞ্ছিত কাজ করছেন। ফলে কথা বলতে শুরু করার আগেই শ্রোতারা তাকে অপছন্দ করতে শুরু করে। এবং ফলে এক্ষেত্রে বক্তা এবং শ্রোতার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করা সম্ভব নয়। আর অন্যক্ষেত্রে যোগসূত্র স্থাপনে সর্ব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। তাই অনেক সময়েই মনে হয় যিনি তক্ষুণি বক্তৃতা দিলেন এবং চলে গেলেন তার বক্তৃতাটির প্রয়োজনটাই বা কি ছিল। মনে হতে পারে শ্রোতারা এবং বক্তা নিজেও বুঝি বা বাধ্য হয়েছেন বলা বা শোনার অপ্রীতিকর কাজটি করতে। কোন অবস্থাতেই এরকম একটি মানসিকতা তৈরী হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

শ্রোতার সংখ্যাটি কোন ব্যাপার নয়

বিশাল ময়দানে অসংখ্য লোকজনের ভিড়ে বক্তৃতা দেয়ার সঙ্গে ছোট ঘরে কয়েকজনের সামনে বক্তৃতা দেওয়া ব্যাপারটার খুব যে একটা তফাৎ আছে তা নয়। বক্তার দিক থেকে ব্যাপারটা একই রকমের। অর্থাৎ একই রকমের ভয় থাকে। শ্রোতাদের ক্ষেত্রেও তাই, তবে কিনা বিশাল জনসমাবেশে ব্যক্তিগত শ্রোতার মতামত প্রকাশের সম্ভাবনা কম। ফলে শ্রোতার সংখ্যা যাই হোক না কেন, এক্ষেত্রে বক্তার উচিৎ শ্রোতাদের একটি দল হিসেবে ভাবা।

কিভাবে বক্তব্য স্পষ্টতর করতে হয়

বক্তৃতা দেয়ার উদ্দেশ্যটি প্রথমেই স্পষ্ট হয়ে ওঠা প্রয়োজন। ভালো বক্তা হোন বা না হোন বক্তৃতার কয়েকটি বিশেষ সংজ্ঞা থাকা প্রয়োজন। সেগুলো কি কি—

১। স্পষ্টভাষায় স্পষ্ট বক্তব্য রাখা।

২। শ্রোতাদের বিশ্বাস উৎপাদন করা।

৩। উত্তেজিত করে দেয়া।

৪। মনোরঞ্জন করা।

বক্তব্য স্পষ্টতর করার জন্য যত কঠিনই হোক না কেন বিষয়টির গুরুত্ব যেন হারিয়ে না যায়! অনেক সময়ই দেখা গেছে কেউ হয়ত তার কবিতা আবৃত্তি করে চলেছে অথচ শ্রোতাদের কেউই তেমন মনোযোগ সহকারে শুনছে না। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই

এটা ঘটে। মনে রাখা দরকার যে বিষয়টিতে ভুল বোঝার সম্ভাবনা রয়েছে। যে বিষয়টিতে ভুল বোঝার সম্ভাবনা রয়েছে সেই বিষয়টি কেউ না কেউ ভুল বুঝবেই। নেপোলিয়নকে দেখা গেছে তার সহকারীদের বারবার তার স্বরে বলছেন—স্পষ্টভাবে কথা বলো—স্পষ্টভাবে”—যীশাস ক্রাইস্টকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, এতবেশী গল্প তিনি তার বক্তৃতায় রাখেন কেন। তার উত্তরে তিনি বলেছিলেন—তার কারণ—“কারণ ওরা দেখেও দেখে না, শুনেও শোনে না, বোঝেও না কথা”—ফলে সহজতম উপায় বেছে নিয়ে এই সমস্যার সমাধান করেছিলেন তিনি। স্বর্গরাজ্য কোন শ্রোতার পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। তাই স্বর্গরাজ্য বোঝাতে গিয়ে তিনি বলেন—স্বর্গরাজ্য একটা সমুদ্রে মেলে দেওয়া জালের মতন—”

তাই দেখা গেছে তুলনামূলক ভাবে প্রকাশ করার চেষ্টা করলে বক্তব্য সহজ হয়ে যায়। যেমন একটা দেশের আয়তন কোন লোকের পক্ষে সাধারণভাবে মনে রাখা কঠিন। তাই বক্তৃতায় যদি বলা হয় পাশ্চমবাংলার আয়তন এত, কিংবা বাংলাদেশের আয়তন এত, সেটা শ্রোতার পক্ষে বোঝা একটু কঠিন কিন্তু বাংলাদেশ বোঝাতে গিয়ে যদি বলা হয় যে বাংলাদেশ পশ্চিমবাংলার প্রায় সমান একটা দেশ, কিংবা ভিয়েৎনাম পশ্চিমবাংলার মতন বড় তাহলে অনেকেরই বোঝা সহজ হয়। কিংবা পৃথিবীর সবচেয়ে কাছের নক্ষত্রটি ৩৫ মিলিয়ন মাইল দূরে, তারবদলে বোঝানো সহজ হবে যদি বলা হয় যে একটা ট্রেন মিনিটে একমাইল গতিবেগে চললে পৃথিবীর কাছের নক্ষত্রটিতে পৌছতে ৪৮ মিলিয়ন বছর লাগবে।

কঠিন টেকনিক্যাল কথা যতটা সম্ভব বাদ দিতে পারলেই ভালো

সবচেয়ে সহজ কথা ভাষায় বক্তব্য উপস্থাপনা করাটা দরকার। কারণ কঠিন টেকনিক্যাল ভাষা হয়ত কয়েকজন বুঝতে পারে কিন্তু সবাই নয়, আবার বুঝলে অচিরেই বিরক্ত হয়ে পড়বে সেই নীরস কথার কচকচিতে। ফলে শ্রোতাদের মধ্যে যাকে সবচেয়ে সাধারণ বলে মনে হবে তাকেই যেন বলছেন এরকম উদ্দেশ্য নিয়ে বক্তব্য তৈরী করা দরকার। যাতে বুঝতে যেন অসুবিধা না হয়।

লিংকন যেভাবে তার বক্তৃতা স্পষ্ট করে তুলতেন

সব সময়ই লিংকন তার বক্তৃতা এমনভাবে উপস্থাপন করতেন যাতে অত্যন্ত সাধারণ অজ্ঞ লোকজনেরাও তার বক্তব্য বুঝতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে।

যেমন একবার এক বক্তৃতায় তিনি "সুগার কোটেড" কথাটি ব্যবহার করেছিলেন। লিংকনের ব্যক্তিগত বন্ধুরা যুক্তি দিয়ে তাকে বলেছিলেন কথাটি বদলে নিতে কারণ ঐতিহাসিক বক্তৃতার ক্ষেত্রে কথাটা খুব গৌরবজনক নয়। উত্তরে লিংকন ধীর গম্ভীর গলায় উত্তর দিয়েছিলেন—"জনসাধারণ যখন সুগার কোটেড কথাটা বুঝতে পারবে না তখন আমি শব্দটা বদলাব তার আগে নয়।"

কোন কিছু সামনাসামনি দেখতে পারলে ভালো হয়

কানে শোনার চাইতে চোখে দেখার মূল্য অনেক। বৈজ্ঞানিকরা জানিয়েছেন যে মানুষ কানে শোনা প্রস্তাবের চাইতে চোখে দেখার প্রস্তাব গ্রহণ করে থাকে পঁচিশগুণ বেশী। জাপানের সেই প্রচলিত প্রবাদই রয়েছে যে-একবার দেখা একশ বার বলার চাইতে বেশী। পিছনের ব্ল্যাকবোর্ডে কিছু লিখে দেখানো, চার্ট দেখানো, কিংবা স্লাইড নিয়ে বুঝিয়ে দেয়া ব্যাপারটা কি ইত্যাদি, এই পদ্ধতি শ্রোতাদের মনে বেশী দাগ কাটিতে বাধ্য।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো বারবার বলুন, কিন্তু ভিন্ন বাক্যবিন্যাসে

আপনার কাছে যে বিষয়টি পরিষ্কার সেই বিষয়টি অন্যজনের কাছে স্পষ্ট নাও হতে পারে। ফলে এমনভাবে কথা বলতে হবে যাতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির ওপরে শ্রোতাদের মনোযোগ বারবার কেন্দ্রীভূত হয়। বিখ্যাত নেপোলিয়ন বোনাপার্ট মনে করতেন বারবার বলাই বেশী কাজের। আবার একই ভাষায়। একই ধরনের কথায় একটি বিষয় যদি বারবার পুনরাবৃত্তি করা হয় সেটাতেও শ্রোতাদের ক্লান্তি আসা স্বাভাবিক ফলে পুনরাবৃত্তির সময়ে এক ভাষা ব্যবহার না করে ভিন্ন ধরনের বাক্যবিন্যাসে বেশী লাভবান হওয়া যায়। ভিন্ন ধরনের বাক্য এবং শব্দচয়ন করতে পারলে কেবল মনে হতে পারে যে বিষয়টি প্রাঞ্জল করার জন্যই এত সব প্রয়াস।

অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা বলে ফেলা কম সময়ে অসম্ভব ব্যাপার

অনেক বক্তাকে বলতে শোনা গেছে একটিই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে এক ঘণ্টারও বেশী সময় বক্তৃতা দিচ্ছেন। আবার অন্যত্র দেখা গেছে বক্তা কুড়ি মিনিটের একটি বক্তৃতায় পনেরোটি পয়েণ্ট বোঝাতে চাইছেন। অর্থাৎ এক একটি পয়েণ্ট-এর জন্য দেড় মিনিট। সম্ভব কি। একটা পয়েণ্ট থেকে অন্য পয়েণ্টে তাকে লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে হবে। বরং একটিই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বেছে নিয়ে সেটাকে বিশদভাবে উপস্থাপিত করতে পারলে শ্রোতাদের মনে দাগ কাটবে বেশী। বিষয়টির ওপরে বলার দখলও হারিয়ে যাবে না।

শ্রোতাদের আগ্রহী করে তোলা যায় কিভাবে

কেউ কথা বলতে শুরু করলে যদি আপনি কোন বিস্ময়কর কথা শুনতে পান তাহলে মুহূর্তের মধ্যে আপনি বক্তা সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে উঠবেন। একটা ব্যাপার বলা যায়।

আগেকার দিনে আপনি যদি কখনও চীনদেশের পুরনো আমলের কোন ধনী লোকের বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেতে যেতেন তাহলে দেখতেন সেখানকার লোকাচার ছিল মাংস খেয়ে হাড়টা আপনার কাঁধের দিকে পেছন ছুঁড়ে মেঝেতে ফেলে দেয়া। এরকম একটা কাজের উদ্দেশ্য এই যে আপনি ওই লোকটিকে পরোক্ষভাবে ধনী হিসেবে স্বীকৃতি দিলেন, জানিয়ে দিলেন যে ভদ্রলোকটির অনেক লোকজন আছে যারা পরিষ্কার করে দেবে। আপনার এরকম ব্যবহারে তিনি

আত্মপ্রসাদ লাভ করবেন। আপনি এরকম ব্যবহার না করলে তিনি অপমানিত বোধ করতে পারেন এই ভেবে যে আপনি তাকে দরিদ্র ভাবছেন। আবার চীনদেশেরই অন্য অনেক স্থান ছিল যেখানে জলের জন্য সব সময় হাহাকার লেগে থাকত। সেখানে জল গরম করার খরচ এত বেশী যে গরম জলের জন্য আলাদা দোকানই রয়েছে। একজন গরম জল কিনে সেটা ব্যবহার করে সেই জলটাই আবার বিক্রী করত ওই একই দোকানে দ্বিতীয়বার বিক্রির জন্য—

এই যে ঘটনা দুটো বলা হল এগুলো খুবই চিত্তাকর্ষক সন্দেহ নেই, এবং প্রথমেই এরকম দুএকটি আশ্চর্য্যজনক গল্পের সূত্রপাত করতে পারলে, সন্দেহ নেই। শ্রোতারা সঙ্গে সঙ্গে আগ্রহী হয়ে উঠবে। অর্থাৎ পুরনো দিন সম্পর্কে নতুনভাবে পরিবেশিত খবর। কিংবা এমন অবাক করে দেবার মতন খরচ যা শুনলে লোকে হতচকিত হয়ে যাবে আবার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত কৌতূহলী হয়ে উঠবে

পৃথিবীর তাবৎ বিষয়ের মধ্যে বলা বাহুল্য তিনটি বিষয় হচ্ছে সাধারণ এবং সবচেয়ে বেশী আলোচিত, এই তিনটি বিষয় নিয়ে মানুষ চিন্তা করেও বেশী। বিষয় তিনটি কি কি ? আদিরস, সম্পত্তি এবং ধর্ম।

জনসাধারণ কিসে বেশী আগ্রহী এই প্রশ্নের উত্তরে নানা জনে নানান কথা বলে থাকেন অবশ্য, কিন্তু একজনের উত্তরটিই মনে রাখার মতন—তার উত্তর ছিল—"জনসাধারণ সম্পর্কে"। হ্যাঁ, একথাটিতে নিঃসন্দেহে কোন ভুল নেই। সাধারণ মানুষ তাদের নিজেদের সম্পর্কেই বেশী সচেতন, এরা আবছা এবং এই সাধারণ মানুষের তালিকায় কারা কারা বাদ যায় সেটাই দেখবার মতন।

সবসময়েই আসলে মনে রাখার দরকার যে যাদের সামনে আপনি আপনার বক্তব্য রাখতে যাচ্ছেন তারা ব্যবসা, সামাজিক

সমস্যা ইত্যাদি নিয়ে যতনা ব্যতিব্যস্ত তার চাইতে অনেক বেশী ব্যতিব্যস্ত কিভাবে স্বকার্যে আত্মসমর্থনের উপর নির্দ্ধারিত করবে কিংবা নিজেকে প্রস্ফুটিত করে তুলবে। বাড়িতে সব সময়ের জন্য কাজের লোকটি চলে যাওয়ার সমস্যা নিয়ে তারা বেশী চিন্তিত। ভারতের রপ্তানী বাণিজ্যে ঘাটতি সম্বন্ধে নয়। কিন্তু যে মুহূর্তে সে যে কোম্পানীতে চাকরিতে বহাল সেই কোম্পানীর রপ্তানী বাণিজ্য কমছে বলে কেউ জানাবে, সেই মুহূর্তে সে কিন্তু ঐ বিষয়ে আগ্রহী হয়ে উঠবে। কারণ তার রুজি-রোজগার জড়িয়ে রয়েছে কোম্পানিটির সঙ্গে। তার নিজের দাঁতব্যথার যন্ত্রণা অসহ্য। কোথায় ভিসুভিয়াসে ভূমিকম্প হল কি হল না তাতে তার কি মাথাব্যথা পড়ে গেছে। বরঞ্চ আপনার দু—চারটি কথা তার নিজের সম্বন্ধে, কিংবা সমস্যা দাঁতব্যথা সম্পর্কে যদি বলেন তাহলে হয়ত ওই ক্ষুব্ধ শ্রোতাটি শুনলেও শুনতে পারে।

সুন্দর কথোপকথনের মূল্য কম নয়

আমরা যখন কথা বলি তখন নিজেদের কথাটাই বড় বেশী বলতে চাই। বেশীর ভাগ সময়েই যে আমারা সুবক্তা হতে পারি না তার কারন কিন্তু আমরা আমাদের কথা, যে কথা আমাদের ভাল লাগে শুধুমাত্র সেই কথাই বলে চলি। হয়ত অন্যরা অলক্ষ্যে হাই তুলতে বাধ্য হয়। বরং ব্যাপারটা উলটে দিন। টেবিলের অন্য লোকটিকে বরং কথা বলতে প্ররোচিত করুন, সে তার নিজের কথা, নিজের পছন্দমতন বিষয় নিয়ে যথেচ্ছ বলতে সুরু করুক। লোকটি

তার স্বাস্থ্য, ব্যবসা, সাফল্য, তার ছেলেমেয়ে, তাদের পড়াশুনা ইত্যাদি হাজারো বিষয়ে নিয়ে বরং বলতে থাকুক; বাধা দেবেন না। গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনুন, এই শোনার জন্যই অপর বক্তা খুশী থাকবে আপনার ওপরে। আপনাকে মনে করবে ভালো বক্তা, যদিও আপনি হয়ত কথাবার্তাই তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু করেন নি।

অকল্পনীয় সাফল্যের একটি উদাহরণ

কিছুদিন আগে একটি খবরের কাগজের অপ্রত্যাশিতভাবে হঠাৎই বিক্রী বেড়ে যেতে লাগল। প্রকাশনার জগতে এইরকমের অপ্রত্যাশিত এবং অকল্পনীয় সাফল্য কদাচিৎ হয়ে থাকে। কিন্তু কেন হল, গোপন সূত্রটি কি। পরবর্তী কালে জানা গেছে যে গোপন সূত্রটি হচ্ছে কাগজের সম্পাদক এবং তার কিছু কিছু নতুন ধ্যান-ধারণা। এই সম্পাদক মহাশয়টির ধারণা ছিল এই রকম—

"আসলে লোকজনেরা খুবই স্বার্থপর। তারা তাদের নিজেদের বিষয়েই বেশী আগ্রহান্বিত। কোন কারখানার সরকারী অধিগ্রহণ ঘটল কি না ঘটল না সে বিষয়ে তাদের কৌতুহল নেই। বরং তারা জানতে চায় কি করে এগিয়ে যাওয়া যায়। কি করে দুটো পয়সা বেশী আয় করা যায়। ফলে সম্পাদক হিসাবে আমি আমার পাঠকদের বলব কিভাবে দাঁত মাজবে, কি করে উন্নতি করবে চাকরিতে। অধঃস্তন কর্মচারীদের কিভাবে চালাবে, কি করে জমি কিনবে—বাড়ি করবে। কিকরে স্মৃতি শক্তি বাড়াবে, অঙ্কের ভুল না হয়-ইত্যাদি। জনসাধারন জীবন্ত গল্প শুনতে চায়। ফলে যিনি ধনী তার জন্য আমি গল্প করব তিনি কিভাবে এত টাকা রোগগার করেছেন।"—

বুঝুন ব্যাপারটা তাহলে। আমার ওই বন্ধুটি আসলে অল্প কিছু দিন পরেই কাগজের সম্পাদক হয়ে যান এবং যথা রীতি তার সব পরিকল্পনা ঠিকঠাক মতন কাজে লাগাতে সুরু করেন। বলা বাহুল্য অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যেই সেই কাগজটি, যেটির প্রায় উঠে যাবার দাখিল হয়েছিল।—সেটি বিক্রী হতে লাগল অভূতপূর্ব। আসলে আমাদের বন্ধুটি পাঠকদের স্বার্থ—সচেতনতায় সুড়সুড়ি দিয়েছিল।

বক্তব্য দৃঢ় করুন সংযত করুণ

একজন ডক্টরেট উপাধি পাওয়া প্রফেসর ভদ্রলোকের একেবারে পাশাপাশি অন্য একজন ছোটখাটো ব্যবসাদারের পার্থক্য অনেক সময়েই নজরে পড়ে। অবশ্য বক্তৃতা দেয়া কিংবা জনসংযোগ বিষয়ে সাফল্যলাভের দৃষ্টিকোন থেকেই কথা বলছি। হামেশাই দেখা গেছে যে ওই মধ্যবয়স্ক প্রফেসর ভদ্রলোকের বক্তৃতায় চাইতে বেশী আগ্রহ এই কমবয়স্ক সাদামাটা ব্যবসাদারটির বক্তৃতাটির দিকে। অনেকটা সময়ে মাথা ঘামিয়ে তারপর আবিষ্কার করা গেল,—কারণ প্রফেসর ভদ্রলোকটি চোস্ত সাধু ভাষায় বক্তৃতা দেন। তার কথায় শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্যের ছড়াছড়ি, যুক্তিতত্ত্বেরও। কিন্তু যে মোক্ষম জিনিষটি অধ্যাপক মশাই-এর বক্তৃতায় ছিল না সেটি হল—স্পষ্টতা। সব গুণ থাকা সত্ত্বেও ভদ্রলোকটির বক্তৃতা ছিল অস্পষ্ট, খুবই সাধারণ। অন্যদিকে ওই ব্যবসাদারটির সাধারণের সামনে তুলে ধরার মতন তেমন মালমশলা কিছু নেই। ফলে ধানাই—পানাই না করে সোজা তিনি বিষয়ে চলে আসেন। স্পষ্টভাবে। এই ছোট্ট বিষয়েই সাফল্যলক্ষীতাকে বরণ করে নেয়।

আপনার সামনে যদি এখন কেউ এমন কোন বর প্রার্থনা করতে বলে, যে বরে চাইবা মাত্র আপনার যা আছে তা চতুর্গুণ বেড়ে যাবে, তাহলে আপনি কোন বর প্রার্থনা করবেন। আপনি উত্তর দেয়ার অনেক আগেই আমরা বলে দিতে পারি আপনি কি চাইবেন—আপনি নিশ্চয়ই চাইবেন এমন বর যাতে অন্য লোকদের ওপরে প্রভাব ফেলতে পারেন। যার অর্থই হোল—আরও অর্থ, আরো ক্ষমতা—আরও মুনাফা, আরও সম্ভোগ আয়োজন।

প্রতিষ্ঠিত হওয়ার এই যে কৌশল সেই কৌশল কি আমাদের অনেকের কাছে অজানাই থেকে যাবে। আমাদের কাউকে কাউকে কি সেই ষষ্ঠেন্দ্রিয়ের বৈশিষ্টের ওপরে নির্ভর করেই চলতে হবে। চলতে হবে আন্দাজের ওপরে নির্ভর করে কিংবা ভাগ্যের ওপরে। এমন কি কোন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নেই! কোন বুদ্ধিদীপ্ত পথ !! যে পথ বা যে শিক্ষা গ্রহণ করলে মানুষের পক্ষে উপরোক্ত কৌশল আয়ত্ব করা সম্ভব হতে পারে।

হ্যাঁ নিশ্চয়ই আছে। এমন এক পদ্ধতি যে পদ্ধতি এমন এক শিক্ষার ক্রম যা সাধারণ জীবনের ওপর ভিত্তি করেই রচিত। যা মানুষের অর্থাৎ আপনার আমার প্রকৃতি গত ব্যবহারের ওপরে নির্ভর করেই রচনা করা হয়েছে।

এই বিষয়ে প্রথম করণীয় কাজটি হল—আগ্রহপূর্ণ মনোযোগ, সেটী না হলে লোকজনেরা ত আপনার কোন কথাই শুনবে না। আপনার দ্বিতীয় কাজটি হল, শ্রোতাদের বিশ্বাস অর্জন করতে পারা। ঠিক এই জায়গাটিতে অনেকেই ব্যর্থ হয়। অনেক বক্তাকেই হাল ছেড়ে দিতে হয়। এই সমস্যাটার ওপরে ভিত্তি করে বিজ্ঞাপন ব্যর্থ হয়ে যায়, অনেক জরুরী চিঠিপত্র, অনেক মালিকপক্ষ অনেক ব্যবসায়ী—সংস্থা।

বিশ্বাস উৎপাদনের সহজ উপায়—
বিশ্বাসী হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করা

বিশ্বাসযোগ্যতা প্রমান করার শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠা। সেই প্রাচীন আবহমান কালের প্রবাদটি মনে করুন যে—চরিত্র সম্পর্কে লোকজনদের ভালো ধারনা থাকলে তার বলতে অসুবিধা হয় না। নিজের ওপরে যত বিশ্বাস জন্মানো যাবে। অবশ্য বাস্তবসম্মত কাজের পরিপ্রেক্ষিতে, কাল্পনিক আত্মম্ভরিতায় নয়, তত সেই বিশ্বাসটুকুই শ্রোতাদের কাছে আপনাকে বিশ্বাসী করে তুলবে।

একজন কথা বলে গেলেন অনর্গল। তার কথা শেষ হলে সকলেই ভাবতে বাধ্য হল যে ভদ্রলোকটি চতুর সন্দেহ নেই। তিনি যে কথাগুলি বললেন সেগুলি শ্রোতাদের ক্ষনিক রেখাপাত মাত্র করতে পেরেছিল। তার বেশী নয়। আবার অন্যদিকে অন্য একজন সাধারণ কেউ হয়ত কথা বলতে সুরু করল। কথা বলতেই হয়ত তাকে ভাবতে হল অনেক। কিন্তু তার আন্তরিক এবং বিশ্বাসের ভূমি থেকে বলা কথা সে যতই এলোমেলো হোক না কেন শ্রোতাদের মনে গম্ভীর রেখাপাত করতে বাধ্য। অবশ্য পাশাপাশি বলে রাখা ভালো যে এই আন্তরিক এবং বিশ্বাসী ভদ্রলোকটির কথা এলোমেলো না হয়ে যদি আর একটু বিশদ এবং টু-দি-পয়েন্ট হয় তাহলে কথায় ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তি হয় আরও বেশী। ব্যবহারের উষ্ণতা থেকেই বন্ধুত্বের আহ্বান—তাই শাস্ত্রে নাভি থেকে উচ্চারনের কথা বলা হয়েছে—অর্থাৎ নিজ বিশ্বাসের-দৃঢ়স্থলে দাঁড়িয়ে কথা বললে সেই কথা শ্রোতাদের পক্ষে ভুলে যাওয়া কঠিন হয়ে

থাকে। নেপোলিয়ন ক্রমওয়েল কিংবা যেই হোন না কেন পৃথিবীর বাগ্মীশ্রেষ্ঠদের কেউইত সেই অর্থে সম্পূর্ণ এবং নিখুঁত নন। তারা যা কিছু বলেছিলেন গভীর আত্মবিশ্বাস থেকেই বলেছিলেন। সেই জন্যই লোকজনদের মন এত বেশী জয় করতে পেরেছিলেন। আপনার ক্ষেত্রেও তাই হবে। লোকে আপনাকে বিখ্যাত বক্তা নাই বা বলুক, সৎ লোক ত বলবেই। এবং সততার বিনাশ নেই। নিজস্ব শক্তিও কম নয়, বরং বেশীই বলা যেতে পারে। তাই নিজেকে বিকশিত করার প্রয়াসে সততা একটি উপযুক্ত পথ। সততা এবং নিষ্ঠা এই দুয়ের সঙ্গে আদর্শ যুক্ত হলেত কথাই নেই। জয় আপনার অবশ্যম্ভাবি।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা ব্যক্ত করুন

আপনার সামনে যারা আপনার কথা শোনার জন্য উপস্থিত রয়েছেন তাদের সঙ্গে আপনি একাত্মতা অনুভব করুন। আপনার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা তাই তাদের সামনে তুলে ধরতে অসুবিধা নেই। যদি বলেন—আমি শ্রমিক ছিলাম—মালিকও ছিলাম—আমি জানি দু'তরফেরই বলবার মতন অনেক কথা রয়েছে—" তাহলে সেই অভিজ্ঞতা প্রসূত কথাগুলো শ্রোতাদের কাছে অনেক দৃঢ় হয়ে উপস্থিত হবে।

আপনার শ্রোতাদের শিক্ষিত করে তুলুন
আপনার বক্তব্যের যথার্থতা ভালভাবে বোঝাতে চেষ্টা করুন

এখন যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করছি সেটি হচ্ছে সবচেয়ে জরুরী বিষয়। আপনার বক্তৃতার মূল উপাদান। এই একটি পয়েন্টে আপনাকে সবচেয়ে বেশী সময় ব্যয় করতে হবে। আপনার শ্রোতৃমণ্ডলীকে আপনার উপস্থাপিত বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহিত করে তুলতে পারা। অনুরণিত করে তুলতে পারার পরীক্ষা হবে এই সময়টিতে। একজন বিখ্যাত সেনানায়ক একদা বলেছিলেন— "যুদ্ধক্ষেত্রে পড়াশুনা করার সুযোগ নেই। একজন যা জানে এবং তার মধ্যে যতটুকু করতে পারে ততটুকুই সে করে থাকে। ফলে প্রয়োজনীয় সব কিছু যথাযথ জেনে রাখাই উচিত তার পক্ষে, যাতে প্রয়োজন মাফিক ব্যবহার করতে দেরী না হয়।

প্রশ্নের উত্তর কিভাবে দেবেন,
আপনি নিজেও শিক্ষিত হয়ে উঠুন।

আপনি যখন কোন ব্যবসায়ি মহলে কিংবা কোন বাস্তবানুগ আলোচনায় উপস্থিত থাকছেন তখন সেই ছোট্ট প্রায় ঘরোয়া অভিযানে আপনি শুধুমাত্র যে নিজেকে শ্রোতাদের নতুন দিকনির্দেশক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করবেন তাই নয়, আপনিও শ্রোতাদের কাছ থেকে নতুন দিকনির্দেশ গ্রহন করবেন। এবার আমি একবারের একটা ঘটনা বলি। একটি সংস্থা তাদের উৎপন্ন

সামগ্রীর দাম বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয়। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বিক্রয় বিভাগ প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে। অসংখ্য চিঠিপত্র আসতে থাকে এজেন্ট, ডিসটিবিউটরদের কাছ থেকে। এই সংস্থাটির যিনি কর্মকর্তা তিনি সঙ্গে সঙ্গে একটি মিটিং ডাকেন। সমস্ত প্রতিনিধিদের নিয়ে তিনি মিটিং করতে বসেন এবং সেই মিটিং-এ একটি বিশাল বোর্ড টাঙানো হয় দেয়ালে। প্রথমদিন তিনি উপস্থিত সকল ফিল্ড্ স্টাফদের অনুরোধ করেন তাদের প্রতিবাদের কারণ স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করতে। সারাদিন শুধু প্রতিবাদগুলো নোট করা হয়। দিনের শেষে দেখা গেল প্রায় শ দুয়েক প্রতিবাদ নোট করা হয়েছে ওই বিশাল বোর্ডটিতে। সারাদিন কর্মকর্তাটি ধৈর্য্য ধরে চুপ করে শুনে যান। পরের দিনের মিটিং এই কর্মকর্তাটি প্রত্যেকটি প্রতিবাদ নিয়ে চুলচেরা বিচার করেন। অঙ্ক কষে, সমীক্ষা তত্ত্ব জুড়ে তিনি সকলের বিশ্বাস উৎপাদন করতে সমর্থ হন যে দাম বাড়ানো দরকার, এবং দাম বাড়ানোর ফলে কিন্তু, স্টাফদের তেমন অসুবিধার কোন কারণ নেই। এই পুরো ব্যাপারটা এমন সুচারু-ভাবে নিয়ন্ত্রিত করা হয় সমস্ত সম্ভাব্য প্রতিবাদের কারণগুলো একসাথে নিয়ে যে কারও কিছু আর বলার রইল না।

আমাদের যাবতীয় যোগাযোগ এই পৃথিবীর সংগে সব নির্ভর করে চারটি জিনিষের ওপরে! আপনার আমার এর চাইতে বেশী কিছু যোগাযোগ স্থাপনের সূত্র নেই। এই চারটি সূত্র কি কি—

১। আমরা কি করি

২। আমরা কেমন দেখতে

৩। আমরা কি ভাবে দেখি।

৪। আমরা কি ভাবে বলি

সত্যিই হয়ত আমাদের যাতে খুবই সম্মানিত বলে মনে হয় তার জন্য আমরা পাট করা জামাকাপড় জুতোর বন্দোবস্ত করি, সেটা করাও ভালো। কিন্তু আমরা হয়ত কি করে কথা বলা সুন্দরতর করা যায়, কি-ই বা তার উপায় সেবিষয়ে মাথা ঘামাই না একবারে।

কি করে সেটা করা যাবে। সৌভাগ্যবানের এই কাজে কোন রহস্য নেই। লিংকন অকল্পনীয় সাফল্য অর্জন করতে পেরেছিলেন এই ব্যাপারে। কারণ তার খুব সহজ সরল আন্তরিক শব্দচয়ন ছিল মারাত্মক, লিংকনির বাবা ছিলেন অশিক্ষিত কাঠের মিস্ত্রি, মা ছিলেন সাধারন গৃহস্থ বধূ। লিংকন নিজে সারা জীবনে মাস-তিনেকের বেশী স্কুলে পড়াশুনা করেন নি। প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হওয়ার পরে তিনি শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে সমালোচনা করতে গিয়ে অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে একটি শব্দই উচ্চারণ করেছিলেন—"ত্রুটিপূর্ণ"—তাই লিংকন সম্পর্কে বলা যায় যে—"এই স্বয়ং শিক্ষিত ব্যক্তিটি তার চিন্তাভাবনাকে সুন্দর মার্জিত এবং কর্মপ্রেরণামূলক উৎসাহে সারাক্ষণ সাজিয়ে রাখতেন—কোন স্কুলশিক্ষকের কাছে স্বাভাবিক

নিয়মে তিনি পড়াশুনা করেন নি বলেই, সম্ভবত অন্য আর যে একটিই পদ্ধতি ছিল সেই পদ্ধতিতে নিজেকে শিক্ষিত করে তুলতেন ক্রমাগত। সেটি হল অক্লান্তভাবে পডাশুনা করা এবং দেখা এবং নিজের মধ্যে যুক্তিতর্কের ক্রমাগত অবতারণা করে বিষয়টি সম্পর্কে স্পষ্ট ধ্যানধারনার সৃষ্টি করা।"

সেই বিখ্যাত গেটেস্‌বার্গ বক্তৃতার কথা স্মরণ করুন। সেই গেটেস্‌বার্গ বক্তৃতার আয়োজনে তদানিন্তন কালের কয়েকজন বিখ্যাত বাগ্মীরা অনর্গল বক্তৃতা দিয়েছিলেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা, যে বক্তৃতাগুলো আজ আর লোকেরা মনে করে রাখে নি। কিন্তু সেখানে লিংকন বক্তৃতা দিয়েছিলেন মাত্র দুমিনিট। তার বক্তৃতার সময়ে একজন ফটোগ্রাফার ছবি তোলার চেষ্টায় ক্যামেরার লেন্স ঠিকঠাক করার আগেই তিনি তার বক্তৃতা শেষ করে ফেলেন। লিংকনের এই বক্তৃতাটি কিন্তু ঐতিহাসিক হয়ে আজও সকলের মনে দাগ কেটে আছে। অক্সফোর্ড লাইব্রেরীতে বাঁধিয়ে রাখা হয়েছে এই বক্তৃতাটি সকলের অবগতির জন্য। সকলের স্মরণ করার জন্য। বলা বাহুল্য প্রত্যেকেরই এই বক্তৃতাটি মুখস্থ করে রাখা দরকার যাঁরা জনসমক্ষে বক্তৃতা দিতে ইচ্ছা করেন—

বক্তৃতাটি কি

"দীর্ঘকাল আগে আমাদের পূর্বপুরুষরা এই মহাদেশে উপস্থিত হয়ে একটি নতুন জাতির উদ্ভব ঘটিয়েছিলেন, যে জাতির উদ্দেশ্যছিল স্বাধীনতা, সমানকার প্রতিষ্ঠা করা। এখন আমরা গৃহযুদ্ধে লিপ্ত'। এই গৃহযুদ্ধ প্রমাণ করবে যে সেই জাতি তার মহান উদ্দেশ্যে নিয়ে দীর্ঘ অবস্থানের স্বীকৃতি পেতে পারে কি না ? আমরা পরস্পর এই যুদ্ধক্ষেত্রে মিলিত হচ্ছি। এখানে আমরা উপস্থিত হয়েছি সেই যুদ্ধক্ষেত্রের কিছু অংশ সংরক্ষিত করে রাখতে তাদের জন্য, যারা তাদের জীবন দান করেছিলেন এই জাতিকে বাঁচিয়ে রাখতে। যদি সেটা যথাযথ মনে হয় তাহলে তাইত আমাদের করা উচিৎ। কিন্তু বৃহদার্থে আমরা ত্যাগ স্বীকার করতে পারি না। উৎসর্গ করিতে পারি না। সেই সব দুঃসাহসী মানুষ যারা জীবিত অথবা মৃত। যারা এখানে সংগ্রাম করেছিলেন, যারা এই ভূমি পবিত্র করেছিলেন, তাঁদের সেই কৃতকর্ম, আমাদের মূল্যায়ন কিংবা অবমূল্যায়নের অনেক উর্দ্ধে। আজ আমরা যেসব কথা বলাবলি করছি এখানে পৃথিবী হয়তভার কিঞ্চিৎ অনুধাবন করবে, মনে রাখবে অতি অল্প সময়ের জন্য। কিন্তু পৃথিবী কোনদিন ভুলতে পারবে না তারা যা করেছিলেন এখানে। আমরা যারা জীবিত, আমাদের কাছে, পবিত্র কর্ত্তব্য হচ্ছে নিষ্ঠাবান উৎসর্গীকৃত প্রাণ হয়ে আমাদের সেই মহান পিতৃপুরুষদের অভিযত্নে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সমৃদ্ধির আয়ত্বের উৎকর্ষসাধনের প্রয়াস নেয়া। বরং আমাদের সেই অসম্পূর্ণ কাজের প্রতি উৎসর্গীকৃত হয়েই এখানে উপস্থিত থাকার প্রয়োজন রয়েছে। সেই পিতৃপুরুষগত যারা তাদের

উদ্দেশ্যের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা প্রদর্শন করেছিলেন, তাদের স্মৃতি থেকে নিষ্ঠার শিক্ষা গ্রহণ করা। এবং প্রমাণ করা যে সেই সব মহান মৃত্যু কখনই বৃথা হয় নি। এবং উপস্থিত থাকা প্রমাণ করতে যে ঈশ্বরের আগে আমাদের এই জাতির কাছে নবজন্ম হোকে স্বাধীনতার। এবং সরকার, অফ দি পিপল, বাই দি পিপল এবং ফর দি পিপল, যেন ধ্বংস না হয়ে যায়।"

শব্দ চয়ন/উচ্চারণ দোষ

শব্দচয়নের ক্ষেত্রে বলা বাহুল্য যে কথা সবসময়েই মনে রাখতে হবে সেটি হল যে যার সঙ্গে কথা বলছেন তাকে যেন আঘাত না করা হয়। আঘাত করার ইচ্ছা আপনার আছে কি নেই সে প্রশ্ন ওঠে না। আপনি ইচ্ছা না করলেও হয়ত এমন একটা খুবই সাধারণ শব্দ আপনি ব্যবহার করলেন যে শব্দটির সত্যিই অনেক অর্থ হয়, যার মধ্যে। যে কোন একজন শ্রোতা হয়ত না বুঝে আপনার প্রতি বিরূপ হবেন। তাই সর্বাংশে নানা অর্থ বোঝায় এরকম শব্দচয়ন না করতে পারলেই ভালো হয়।

যেমন ধরুন আপনি হয়ত একটি জিনিষের মূল্য বোঝাতে খরিদ্দারকে বললেন—আপনার জিনিষটা সস্তা, বললেন চিপার—এখন খরিদ্দারের নিজস্ব সম্মান, মান অভিমান রয়েছে। আপনার কথা শুনে তার মনে হতে পারে বা আপনি তাকে কম দামের খদ্দের বলে চিহ্নিত করেছেন। আবার মনে হতে পারে যে জিনিষটার মূল্যমান কম। ফলে ওই "চিপার" শব্দটা ব্যবহার করা বিপজ্জনক। কিন্তু তার বদলে যদি আপনি—"ইকনমিক" শব্দটি

ব্যবহার করতেন তাহলে এই সব অবান্তর সমস্যায় পাড়ায় কোন প্রশ্নই উঠত না।

কিংবা ধরুন—বক্তৃতার সংহার টানতে আপনি বললেন—"তাহলে সিদ্ধান্ত হল এই যে"—দেখুন আপনি হয়ত অনেক যুক্তির অবতারনা করেছেন—করে সিদ্ধান্ত টানার কথা বলছেন। কিন্তু সিদ্ধান্ত আপনি টানেন এবং সেটা আপনার ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। শ্রোতাদের নয়—বরং যদি বলতেন—"তাহলে কি আমরা সিদ্ধান্ত-সূচক চিন্তাটা গুছিয়ে নিতে পারি এই বলে যে"—তাহলে দেখুন আপনি আগ—বাড়িয়ে সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করলেন না। শ্রোতাদের অভিমানে ঘা দিলেন না। অথচ সুন্দরভাবে আপনার কথাটি উপস্থাপিত করতে পারলেন—সেক্ষেত্রেও শ্রোতাদের কাছে আপনি একটি স্পষ্ট দিক-নির্দেশক প্রস্তাব রাখলেন যা হয়ত শ্রোতাদের সিদ্ধান্ত নিতে দরকার ছিল।

আন্তরিকতার ভাবটি আয়ত্ব করুন

আলোচনার প্রথম দিকে আমরা অধ্যাপক জেমস্ এর একটি বিখ্যাত উক্তির উদ্ধৃতি দিয়েছিলাম।—"কর্মসম্পাদন এবং অনুভবের পাশাপাশি অবস্থান—মানুষের ইচ্ছার প্রত্যক্ষ অধীনে কর্মসম্পাদন যদি নিয়ন্ত্রণ করা যায়—তাহলে পরোক্ষভাবে অনুভবও নিয়ন্ত্রিত হয়ে যায়—"

সুতরাং সামনে দাঁড়িয়েই আন্তরিকতা এবং উৎসাহের ভাবটি এনে ফেলুন। টেবিলের ওপর ঝুঁকবেন না, টানটান হ'য়ে স্থিরভাবে দাঁড়ান। সামনে পিছনে দুলবেন না, শরীরের ভার এ পায়ে ও পায়ে বদল করবেন না ক্লান্ত ঘোড়ার মতন—মোদ্দা কথা নানারকমের স্নায়ুদৌর্বল্যের উদাহরণ হ'য়ে সহজ অমায়িক, স্বাভাবিক এবং সপ্রতিভ ভাবটি নষ্ট করে ফেলবেন না। শারীরিকভাবে নিজেকে সংযত করুন। দাঁড়ানোর ভঙ্গীতে যেন ব্যক্তিত্ব এবং ক্ষমতার রূপ ফুটে ওঠে।

যাদের কাছে বলছেন তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা রাখুন—ভালবাসুন তাদের—

যাদের সামনে কথা বলার জন্য এসেছেন তাদের সম্পর্কে ঠাণ্ডা মনোভাব পোষণ করবেন না। আন্তরিক ভাবে গ্রহণ করুন তাদের প্রত্যেকের জন্য যেন উপস্থিত প্রত্যেকটি শ্রোতার মধ্যে কথাগুলি প্রসারিত না হ'লে আপনি দুঃখিত হবেন সত্যি সত্যিই, তাই প্রত্যেকটি উপস্থিত লোকই আপনার কাছে বিশিষ্ট।

দেখবেন ধীরে ধীরে আপনার এই ভালবাসার উত্তাপ তাদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ছে। এতটুকুও দেরী হ'বে না তার—

প্রাথমিক অসুবিধা গুলোর অন্যতম প্রধান হচ্ছে কিভাবে কথা সুরু করা যেতে পারে যাতে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করা সহজ হয়। বিখ্যাত বক্তারা তাদের বক্তৃতার শেষ এবং শুরুটা কিভাবে হবে আগে থাকতেই ঠিক করে রাখেন। কিন্তু নতুন বক্তার পক্ষে কাজটা কঠিন। সত্যিই ত আগে থাকতে প্রস্তুত হওয়া এবং চিন্তার মধ্যে সামঞ্জস্য আনা সময় সাপেক্ষ। আর তখনই প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তির প্রয়োজন হয়।

আগে থাকতেই বুঝতে হবে কিভাবে আপনি শুরু করছেন, কিভাবে শেষ করছেন আপনার কথা। একাই হোক কিংবা সভা ভর্তি লোকজনের ভিড়ই হোক, আজকের গতির যুগে সকলেই এত ব্যস্ত যেন অলিখিত ভাবে সবার চোখে মুখে সর্ব্বদাই প্রতিফলিত—"ঠিক আছে আপনার কিছু বলার আছে বোঝা যাচ্ছে। বলে ফেলুন যত তাড়াতাড়ি, বলে বসে পড়ুন।" তখন—

যাই হোক অরিস্টটল এর সময় থেকে আজ পর্য্যন্ত যে অসংখ্য বইপত্র লেখা হ'য়েছে সব বইতেই দে'খা যায় বক্তৃতার মোটামুটি তিনটি ভাগ রয়েছে : সূচনা, বক্তব্য এবং শেষ। অতীতে বক্তা তার বক্তব্যের সংগে কিছু খবরও সরবরাহ করতেন যা আজকের বা আজকের রেডিও, টেলিভিশন এবং দৈনন্দিন খবরের কাগজের কল্যাণে আগেই পরিবেশিত হ'য়ে যাওয়া স্বাভাবিক। বিস্ময়কর ভাবে আধুনিক জীবনটাই বদলে গিয়াছে। যেন নতুন করেই তৈরী করা হ'য়েছে আমাদের পৃথিবী। গত একশো বছরের মধ্যে যতটা আবিষ্কার হয়েছে গত পাঁচলক্ষ বছরে সেরকম সম্ভব হয়নি। গাড়ি, বিমান, বেতার, দূরদর্শন, রকেট, কতকিছু, সবই গতির পিছনে পাল্লা

দিচ্ছে। গতি, গতি সর্ব্বস্ব এই গতি প্রগতির অবশ্যম্ভাবি প্রভাব, ফলে আপনি কথা বলতে যাচ্ছেন যাদের কাছে, যার কাছে, তাদের কিংবা সেওত ঐ গতির সংগে জড়িত, তার অসহিষ্ণুতার পাল্লার মধ্যে আপনি স্বভাবিকভাবেই পড়ে যেতে পারেন, কিন্তু তখন আপনার কর্তব্য হবে সেই অসহিষ্ণু গতির সংগে নিজেকে ভাসিয়ে নিয়ে তার অথবা তাদের মনটি ছোঁয়ার চেষ্টা করা। ফলে যদি উপস্থাপনায় আপনি বিশদ হ'তে যান সব পণ্ড হ'য়ে যাবে। সুচনা আপনার বিজ্ঞাপনের হেড্ লাইনের মতনই দু-পাঁচ শব্দের মধ্যেই সারতে হবে, হবেই। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে অনভিজ্ঞ বক্তার পক্ষে কি সহজ সংক্ষিপ্ত এবং মর্মভেদী সূচনার অভিব্যক্তি করা সম্ভব! অভিজ্ঞতা বলে, না সম্ভব নয়। বরং আরও বিশদ আলোচনা করা যাক বিষয়টি নিয়ে।

তথাকথিত হাসির গল্প দিয়ে স্বুরু করতে যাবেন না

নতুন বক্তারা কি কারনে বোঝা যায় না, হাসির গল্প দিয়ে তার বক্তব্য শুরু করতে চান। যতই গভীর জ্ঞানের অধিকারীই তিনি হোন না কেন মনে মনে তিনি ভাবেন হাল্কা কথাবার্তার মধ্যেই বক্তব্য স্বুরু করা উচিৎ। এই রকম মনোভাবের ফল হয় কিন্তু মারাত্মক—দেখা যায়, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই যে, শ্রোতারা হাসির খোরাক ত পাচ্ছেনই না বরং

বক্তার সেই কষ্টকর প্রয়াস দেখে কৌতুকই অনুভব করছেন—আপনার কথা বলার উদ্দেশ্য মাঠে মারা যাবে তখন। মনে রাখা দরকার যে কথা বলার সৌকর্যের মধ্যে সবচাইতে কঠিন হচ্ছে শ্রোতাকে হাসাতে পারা। ব্যাপারটা নির্ভর করে ব্যাক্তিত্বের ওপরে পুরোপুরি। কিছুটা জন্মগত ক্ষমতাও। আপনি হয়ত জন্মগত ভাবেই লোককে আনন্দদান করতে পারেন, নয়ত পারেন না—ফলে সে ব্যাপারে তেমন কিছু জোর করে করার মত নেই। আপনি যে গল্পটা বলে পরিহাস তরল করে দিতে চাইছেন পরিবেশ, সে গল্পটা যতই হাসির হোক না কেন, সাফল্য নির্ভর করছে আপনার বলার ভঙ্গিমাটির ওপরে। যে গল্প ব'লে মার্ক টোয়েন বিখ্যাত হ'য়েছিলেন, সেইসব গল্পের রস পরিবেশন করা নিরানব্বই শতাংশ লোকের পক্ষেই সম্ভব নয়।

যদি অবশ্য হাস্যরস পরিবেশনের ক্ষমতা আপনার জন্মগত থেকে থাকে তাহলে আপনি অবশ্যই সেটা অর্থকরী করার চেষ্টা করবেন। একবারের জায়গায় লোকে আপনাকে তিনবার আদর করে ডেকে নেবে, কিন্তু যদি তা না হয় তাহলে চেষ্টা করতে যাবেন না। লোকে একবারও আপনার সেই প্রয়াস শুনতে চাইবে না।

তাহলে কি সূচনাতেই আপনি ভাবগম্ভীর কোন বক্তব্য রাখার চেষ্টা করবেন—না কখনই না—কোন স্থানীয় গল্প, আপনার বক্তব্য বিষয়ক কিছু হাল্কা কথা দিয়ে সুরু অবশ্যই করা যায়, কিংবা পূর্ববর্তী কোন বক্তার কোন উক্তি নিয়ে। সাবধান, হয়ত সেটাই খুব কার্যকরী হ'য়ে যেতে পারে, সাধারণ শাশুড়ি—বউয়ের প্রচলিত গল্প, ছাগলের গল্প কিংবা রাম রহিমের গল্পের চাইতে।

মনে হয় হাসির উদ্রেক করার সহজতম রাস্তা হচ্ছে নিজেকে নিয়ে কোন গল্প। কিংবা সূক্ষ্ম কোন তির্যক কটাক্ষ দিয়ে—যেমন একজন সাংবাদিক একবার লিখেছিলেন—"আমি মশায় পেটুকদের, ভুঁড়ি-অলাদের আর ডেমোক্রাটদের ঘৃণা করি—"

ক্ষমা প্রার্থনা দিয়ে সুরু করবেন না

"আমি ঠিক বক্তা নই, প্রস্তুতও ছিলাম না বক্তৃতা দেয়ার জন্য—তেমন কিছু বক্তব্যও আমার নেই, ক্ষমা করবেন—"

এইরকম ভাবে শুরু করাটা মারাত্মক ক্ষতি করতে পারে। আপনি যদি সফল বক্তা নাও হন। আপনার সাহায্য ছাড়াই অনেকে তা বুঝে নিতে পারবে—তাই না। অনেকে যারা পারবে না, খামোখা তাদের খুঁচিয়ে দিয়ে লাভ কি। শ্রোতারা আবার অপমানিত বোধ করতে পারেন—অবহেলা করে বক্তৃতার প্রস্তুতি নেয় নি বক্তা—এটাও অপমান—তাই না, কেউই আসলে আপনার ক্ষমা প্রার্থনা শুনতে আসে নি। আপনার বক্তব্যে আপনার কথায় মনোযোগী হ'তেই এসেছে,।

যে মুহূর্তে আপনি প্রবেশ করছেন। শ্রোতাদের আপনার ওপরে চোখ পড়ছে। একটা ধারনা তাদের হচ্ছেই যেটা খারাপ হ'তে পারে না। কিন্তু সেই ধারণাটা জিইয়ে রাখতে পারার কৌশলটাই আয়ত্ব করতে হবে। ফলে ঢুকেই দ্বিতীয় নয় তৃতীয় নয়—প্রথম বাক্যেই আপনাকে এমন কথা বলতে হবে যেন শ্রোতারা মনোযোগী হ'তে বাধ্য হয়।

কিন্তু কিভাবে আপনি জিজ্ঞাসা করবেন—কয়েকটা পদ্ধতি নিয়ে তাহলে আলোচনা করা যাক, কি বলেন—

কৌতুহল উদ্রেক করুন

একটি বক্তৃতার অংশবিশেষ বলছি শুনুন—দেখুনত আপনার কৌতুহল সংগে সংগে জেগে ওঠে কি না—

"বিরাশি বছর আগে, বছরের এই রকমটি সময়ে। এই শহরে একটা ছোট্ট গল্পের বই প্রকাশিত হ'য়েছিল। যে বইটি চিরায়ত সাহিত্যের ভাণ্ডারে স্থান পেয়েছে। অনেকেই এই বইটিকে বলেছেন —'বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বই' —যখন বইটি প্রকাশিত হয়, কেউ হয়ত অন্য-জনকে জিজ্ঞাসা করেছিল—বইটা পড়েছ—উত্তর ছিল সংক্ষিপ্ত—"ঈশ্বর তার ভাল করুন—পড়েছি"—

প্রথম যেদিন বইটি প্রকাশিত হয় এক হাজার কপি বিক্রী হয়—পনেরো দিনের :মধ্যে পনেরো হাজার—অতঃপর অগুনতি সংস্করণ ক্রমাগত হয়ে চলেছে—বইটি কি জানেন—ডিকেন্সের "ক্রিস্টমাস ক্যারল—

আপনার কি মনে হচ্ছে আপনি কৌতুহলী হ'য়ে উঠছেন। টেনে নিচ্ছে বক্তা আপনাকে তার দিকে রহস্যজনক ভাবে—কেন না কৌতুহলটি জেগে উঠছে—

কিংবা সেই ছাত্রটির কথা মনে করুন যে কথা বলতে সুরু ক'রে প্রথমেই বলেছিল—"আপনারা কি জানেন যে পৃথিবীতে আজকের দিনেও অন্তত সতেরোটি রাষ্ট্র আছে যেখানে দাসত্ব প্রথা বিদ্যমান"—শ্রোতাদের মধ্যে দারুন কৌতুহলের সৃষ্টি হ'ল—কোন দেশ—আজকের দিনেও,—দাসত্বপ্রথা—অসম্ভব মনে হয়—

আবার কোন রহস্যজনক গল্প দিয়েও সুরু করতে পারেন—সত্যি কথা বলতে কি গল্প দিয়ে সুরু করাটা অনেক নিরাপদ।

আপনার বক্তব্য স্পষ্ট করা দরকার

যে কথা আপনার নিজের কাছে মনে হবে "না বোঝার সম্ভাবনা রইল" ধরেই নেয়া উচিৎ যে শ্রোতারা সেগুলো বুঝবে না একেবারেই, ফলে আপনার বক্তব্য প্রাঞ্জল ভাষায় বলা উচিৎ।

বক্তব্য বিশ্বাসযোগ্য এবং প্রভাব বিস্তারে সমর্থ্য হওয়া উচিৎ

একটি মনস্তাত্বিক আবিষ্কারের গল্প শুনুন—"যে কোন ধারনা, বক্তব্য অথবা সিদ্ধান্ত আমাদের মনে প্রবেশ করে, সে সমস্তই সত্যি ব'লেই গৃহিত হয় যতক্ষণ বিরুদ্ধভাব দ্বারা সংক্রমিত না হচ্ছে। আমরা যখন উপস্থিত কাউকে কোন কথা বলি, সে কথা বিশ্বাসযোগ্য করার চেষ্টার তেমন দরকার পড়ে না, যদি আমরা তার মনে বিরুদ্ধ-ভাবের সংক্রমনে বাধা দিতে পারি—" ফলে কোন কিছু স্পষ্ট করে বিশ্বাসের সংগে বলার মতন সফল অস্ত্র কমই রয়েছে'—পৃথিবীতে যাঁরাই জনসংযোগে সফলতা লাভ করে বিখ্যাত হ'য়েছেন তারা সকলেই তর্কের পরিবর্তে অভিভাবনের উপরেই বেশী নির্ভর করেছেন। আধুনিককালের বিজ্ঞাপন, জনসংযোগ এবং বিক্রয়বিজ্ঞান মূলত অভিভাবনের উপরেই বেশী গুরুত্ব দেয়া হ'য়ে থাকে।

আসল কথাটি হচ্ছে বিশ্বাস করাটি হচ্ছে সহজ, সন্দেহ করার কাজটি কঠিন। অভিজ্ঞতা, জ্ঞানার্জন এবং চিন্তা ভাবনা করা প্রয়োজন হয় যাতে আমরা বুদ্ধিমানের মতন সন্দেহ এবং প্রশ্ন করতে সমর্থ হই।

একটি শিশু এবং একজন অসভ্য উপজাতিকে আপনি যদি বলেন যে—গভীর রাতে সান্টা ক্লস স্বর্গ থেকে নেমে এসে আকাঙ্খিত বস্তু

দিয়ে যাবে. ওরা দুজনেই, নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করবে কথাটি। যতক্ষণ না তাঁর সন্দেহ করার উপযোগী যথেষ্ট জ্ঞান হয়।

ফলে বক্তার বিশ্বাসে আস্থা স্থাপন করার সহজতম প্রয়াস হওয়া উচিৎ, কোনো উপায়ে শ্রোতার মনে বক্তব্যের মূল ভাবটি প্রোথিত করে দেয়া এবং সংগে সংগে চেষ্টা করা যাতে সেই ভাবের বিরুদ্ধে কোন ভাব সংক্রামিত করতে না পারে—যে এই কাজটি ঠিকমতন করে উঠতে পারবে তার পক্ষে কাজ বাগিয়ে নেয়া আর কঠিন হবে না।

আপনি যাদের সংগে কথা বলছেন তাদের মধ্যে আগ্রহ সঞ্চার করতে চাইলে আপনাকে আন্তরিক হ'তেই হবে। আন্তরিক অথবা কপট হ'লে আপনার বক্তব্যের দৃঢ়তাও ঝুলে পড়বে যতই আপনি ভাল ভাল কথার আমদানী করুন, অলংকৃত করুন আপনার বক্তৃতার, শরীর. যতই আপনি গলার স্বর নিয়ন্ত্রিত করুন, সেজেগুজে সুন্দরভাবে উপস্থিত করতে চেষ্টা করুন আপনার নিজেকে এবং আপনার বক্তব্যকে সব কিছুই মনে হবে ফাঁপা সোনার জলে গিলটি করা, তাই বলছি—যদি আপনার শ্রোতাকে আগ্রহান্বিত করতে চান ত সবার আগে নিজের মধ্যে আগ্রহ সঞ্চারিত করুন, বিশ্বাসস্থাপন করুন নিজের মধ্যে —আপনার সেই উজ্জ্বল, বিশ্বাস. সেই আগ্রহের দীপ্তি জ্বলজ্বল করে ফুটে উঠবে আপনার চেহারায়। কণ্ঠস্বরে, ভাষায়, শ্রোতারাও অনায়াসে, উদ্বেলিত হ'য়ে উঠবে আপনার উপস্থিতিতে তখনই দেখবেন আপনার বক্তব্য ধীর গতিতে শ্রোতাদের মনের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে যাচ্ছে অতি সহজেই।

বিফলতার ভয়

সমাজ মানুষের কাছে সফলতা দাবী করে থাকে, কিন্তু সাফল্য-লক্ষ্মী ধরা দেন মুষ্টিমেয় কয়েকজনের কাছেই। অসংখ্য লড়িয়ে লোকজনের মধ্যে কয়েকজনই মাত্র পুরস্কৃত হ'য়ে থাকে। সাদামাটা শরীর রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয়—খাদ্য, পানীয় এবং বাসস্থান। এই তিনটি জিনিষ ছাড়া অনেক কিছুই'ত মানুষের ঈপ্সিত হ'তে পারে, কেউ সেগুলো অর্জন করতে পারে, কেউ পারে না। সাধারণতঃ সাফল্যের মাপকাঠি হয় তারাই যারা এগুলো অর্জন করতে সমর্থ হ'য়েছে। ফলে সফল যে তার সাফল্য বোঝার জন্য বিফল যাঁরা তাদের উপস্থিতি প্রয়োজন, আবার বিফল যারা তাদের সামনে সাফল্যের দৃষ্টান্ত থাকা জরুরী, আশা সঞ্চারের প্রয়োজনে। ফলে সফলতার প্রতিযোগিতা থেকে সম্পূর্ণ রেহাই নেই কারোই।

অনেকেই আছেন যারা হেরে যাওয়ার ভয়ে তাদের চাহিদার নিরেখ অনেক নীচু মানে নামিয়ে রাখেন। ফলে সফলতা কিংবা বিফলতার মাপকাঠি হ'য়ে থাকে চাহিদার নিরেখ অনুসারে। আবার অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে অনেক উঁচুতে রাখা চাহিদার নিরেখও ওই বিফলতার ভয়েই করা হ'য়ে থাকে। সুতরাং শুধুমাত্র নীচুমানের চাহিদা দেখলেই বলা যাবে না যে সেক্ষেত্রে বিফলতার ভয় বিদ্যমান। মনে করা যাক একটি লোক যার চাহিদার নিরেখ অনেক উচু কিংবা অনেক নীচু, সে ওই চাহিদা পূরনের প্রতিযোগিতায় যথেষ্ট চেষ্টা বা নিষ্ঠার পরিচয় দিল না, বিফল হ'ল, সরে দাঁড়াল প্রতিযোগিতা থেকে। পরিবেশের কাছে তার মাথা হেঁট হ'য়ে যাবে এই ভয়ই তাকে বিফলতা এনে দিচ্ছিল বারবার। কিন্তু এটাও ত সত্যি যে সমাজে সাফল্য ছাড়াও আরও দুএকটা বিষয় রয়েছে, যার দ্বারা মানুষ

সমাজে মাথা উচু করে চলতে পারে, উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে —বিনয় এবং আত্মসম্মানবোধ—

চাহিদার নিরেখ এই কারনেই খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এবং চাহিদার নিরেখের গতি প্রকৃতি থেকেই সেই সমস্যার গভীরে প্রবেশ করা সম্ভব যে সমস্যা হচ্ছে সফলতা এবং বিফলতার সমস্যা, যাঁর মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে বিফলতার ভয়।

নানানরকমের উপায় রয়েছে যে সবের মাধ্যমে বিফলভাব এড়ানো যেতে পারে, কিন্তু সবচেয়ে প্রথম এবং মুখ্য উপায়টি হ'ল সফল হওয়া-, তাই না ?

সাফল্য আসলে স্বনির্ভর কৌশলমাত্র। তার কারন যদি সফলতা সম্পর্কে কেউ নিঃসন্দেহ হয় তাহলে সাফল্যের চরিত্রটাই অস্বীকার করতে হবে তাকে। সফলতার সংগে ঝুঁকি শব্দটা ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে যে।

আপনার সফলতার অনুভব কি হবে যদি আপনি সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ রকমভাবে সমর্থ ব'লে বুঝতে পারেন—তখন বর্ণহীন হয়ে যাবে আপনার যা কিছু ক্রিয়াকর্মের পরিশ্রম। কর্মের কাঠিন্যের সঙ্গে বিষয়গত সম্ভাবনার আলোচনায় সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক যে সাফল্য অথবা ব্যর্থতার অভিজ্ঞতা ভিন্নতর।

বিষয়গত সম্ভবনা এবং সংবাদ আহরণের প্রেক্ষিতে মনে হয় যে সাফল্য কিংবা ব্যর্থতা আসলে স্বসম্পর্কিত ধারনার উর্দ্ধকরণ কিংবা নিম্নকরণ। তার কারন আমাদের যে কোন ক্রিয়াই আত্ম-মূল্যায়ণের প্রেক্ষিতে কৃত নয়। যে কোন লোককেই জিজ্ঞাসা করে দেখুন সে ঠিক বলবে যে সে চায় আত্মমূল্যায়নের নিরেখ বেড়েই চলুক, কমাতে নয়—আশাবাদীদের সংগে ব্যর্থতাশংকিতদের পার্থক্য এই যে যে ব্যার্থতাশংকিতেরা সবসময়েই আত্মমূল্যায়নের নিরেখটি বাড়াতে চায় না বরং কমিয়ে রাখতেই বেশী উৎসাহী—ফলে ব্যর্থতাশংকিত

লোকদের স্বাভাবিককারণেই লোকে বলে থাকে যে তারা সাফল্য এড়াতে ভালবাসে।

সাফল্যের মূল্যায়ন বেড়ে যায় বিফল হ'লে। সকলেই যে কাজটি পারে সেই কাজে সাফল্যের গভীরতা কমে যায়। মানুষের চরিত্রই হচ্ছে, নিজে যখন কাজটি সে পেরে ওঠে তখন সে কাজে আপনার সাফল্যকে সে ছোট চোখে দেখতে চায়। যে কাজ সকলে পারে না, সে কাজে সফল হ'লে আমাদের নিজেদের মূল্যায়ন বেড়ে যায় যেমন তেমনই যে কাজ অনেকে পারে সে কাজে ব্যর্থতা এলে মূল্যায়ন যথারীতি কমে যায়।

ফলে আমাদের সফল হওয়ার ইচ্ছার সংগে যথার্থ স্বমূল্যায়নের সে অর্থে কোন সম্পর্কই নেই। একজন সমাজের চোখে মূল্যমানের নিরেখ চাযাই করতে নাও চাইতে পার যদি সে বোঝে যে সে কিছুতেই সফল হতে পারবে না, আবার যদি সে বোঝে যে সফল হ'বেই, তাহলে সেই কাজে ব্রতী হ'তে সে দ্বিধা করবে না। আসলে তখন সে কিন্তু তার মূল্যায়নের নিরেখ নিজের কাছে যত না তার চাইতে বেশী সে করছে সমাজের কাছে—

যখন সে যে কোন কারণেই হোক না কেন বাধ্য হয় কর্মসূচনা করতে, যদিও সে তার সাফল্য সম্পর্কে সন্দীহান, তখন সে ব্যর্থতা আসার আগেই নানান ধরণের কারণ দর্শাতে সুরু করবে, ব্যর্থতা এলে-ত কথাই নেই। ব্যর্থতাশংকিত ব্যক্তিদের মূখ্য দর্শনই হচ্ছে ব্যর্থতার অভিজ্ঞতাকে এড়িয়ে চলা। এবং এই এড়িয়ে যাওয়ার রূপটিও ভিন্নতর। একটি কৌশল হ'ল প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র থেকেসরে দাঁড়ানো। আপন ইচ্ছার নিরেখ অনেক নীচু পর্দায় বেঁধে রেখে সে চমৎকার কারণ দর্শাতে চেষ্টা করে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র থেকে সরে দাঁড়ানোর জন্য। কিন্তু সবসময়েই যে সেই সুযোগটি থাকবে তারও কোন মানে নেই। প্রতিযোগিতার মধ্যে যেতে বাধ্য হ'তেই হতে পারে তাঁকে অনেক

সময়, কেবল প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রবিশেষ হ'তে পারে মাত্র। প্রকৃতির সেই পুরোন নিয়ম "Survival of the fittest"—আজও এতটুকু ম্লান হয় নি। এক সময় বন্য হিংস্র জন্তু জানোয়ারদের সংগে লড়াই করে মানুষকে বেঁচে থাকতে হয়েছিল, এখন পরিবেশ আলাদা, কিন্তু সামাজিক অসমতার কারণে বেঁচে থাকার কৌশল জেনে জ্ঞানে অথবা অজ্ঞানে প্রতিযোগিতার সামিল হতেই হচ্ছে। জন্মগত কিংবা পরিবেশের কারণে যে ভয়হীন, তার কাছে হয়ত এই প্রতিযোগিতার সুযোগ পাওয়া একটা চ্যালেঞ্জ। অন্যের কাছে শংকার সৃষ্টি করে, তাই, স্বাভাবিক কারণেই কেউ কেউ হয়ত কর্মকাণ্ডের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে, কেউবা পিছিয়ে একটু সরে দাঁড়ায়। হেরে যাওয়ার ভয় থেকে রেহাই পাওয়াই তার মূল কারণ। কিংবা নানা কারণে যদি সে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে নিজেকে প্রকাশ করতে বাধা হয় এবং স্বমূল্যায়নে ব্যর্থ হয় তখন সে স্বাভাবিক কারণেই প্রতিযোগিতা শুরুর আগেই এবং প্রতিযোগিতা চলাকালীন নানারকমের অসুবিধার কথা প্রচার করতে সুরু করে যাতে যদি সে হেরে যায় তাহলে সেইসব অসুবিধার কারনই তার হেরে যাওয়ার গ্লানির ভাগটি কমিয়া দেয়।

বিফল হওয়ার ভয়, এর সংগে সংগে সাফল্যের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা হওয়া দরকার। সাফল্যের প্রয়োজনীয়তা যাদের মাঝামাঝি রকমের বেশী তারা সাধারণতঃ নিরাপত্তা বিষয়ে বেশী সচেতন ফলে বিফলতা এড়াতে চেয়ে থাকে। অন্যদিকে সাফল্যের প্রয়োজনীয়তা যাদের খুব বেশী তাঁরা সাফল্য সম্পর্কিত সম্ভাব্য আলোচনা শুনতে আগ্রহী হয় এবং সাফল্য লাভও করে থাকে। সাফল্য সম্পর্কে মাঝামাঝি রকমে যাঁরা উৎসাহী তারা সাধারণতঃ কাজের কথাগুলিই ভুলে যেতে থাকে। কিন্তু সাফল্যের প্রয়োজনীয়তা যাদের খুব বেশী তারা তাদের অসম্পূর্ণ কাজ মনে করে রাখতে অভ্যস্ত। অন্য দিকে খুব বেশীরকমের উৎসাহী যারা তারা সেগুলিকে

চ্যালেঞ্জ হিসেবেই নিয়ে থাকেন। ফলে ব্যর্থতাশংকিতদের ব্যবহার নানান রকমের বৈচিত্র্যে ছলনামুখর—

লক্ষ্য নির্ধারণ—সাধারণতঃ তিন রকমের লক্ষ্য নির্ধারিত হ'য়ে থাকে, প্রথম যারা তাদের লক্ষ্য অনেক উঁচুতে স্থাপিত করতে চায়, দ্বিতীয় অনেক নীচুতে, এবং এই দুটোই অত্যন্ত বাস্তব জ্ঞান বিরোধী হ'তে বাধ্য। তৃতীয় যারা তারা নিজেদের ক্ষমতার চাইতে অল্প কিছুটা ওপরে কিংবা নীচুতে লক্ষ্য স্থাপন করে থাকেন। বস্তুত ব্যর্থতা শংকিতেরা তাদের লক্ষ্য নির্ধারনের ব্যাপারে সে কারণে সর্বদাই প্রায় অবাস্তব প্রক্রিয়াকে অনুসরণ করে থাকে।

ঝুঁকি নেয়া

—লক্ষ্য নির্ধারণ এবং ঝুঁকি নেয়া প্রায় একই রকমের ব্যবহার—ব্যর্থতাশংকিতদের ঝুঁকি নেয়া ব্যাপারটা সাফল্যের জন্য উৎসাহের সমগোত্রিয়। ব্যর্থতাশংকিতেরা হয় ছোট ছোট ঝুঁকি এবং সাফল্যের দিকে, না হয়ত বিশাল বা ঝুঁকি বিশাল সাফল্যের দিকে ছুটে যায়।

ব্যর্থতার চিহ্ন সচেতনতা

কিছু ব্যর্থতা শংকিতেরা ব্যর্থতার ইঙ্গিত সম্পর্কে অত্যাধিক সচেতন হয়ে থাকেন। ঘুণাক্ষরেও এতটুকু ইঙ্গিত পাওয়ামাত্রই পিছন ফিরে দাঁড়াতে চান। আবার অন্যের ব্যর্থতা সম্পর্কে অত্যাধিক উদ্বেগ থাকার ফলে ব্যার্থতার ইঙ্গিত দেখতে চান সচেতন ভাবে। দেখা গেছে যে যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের কাছে মনে হবে যে সরে দাড়িয়ে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব ততক্ষণ পর্যন্ত যে ব্যর্থতার ইঙ্গিত লক্ষ্য করে থাকে। যখন সে সম্ভাবনা ক্ষীণ হ'য়ে আসে তখন সে দেখতেই পায় নি এমন ভাব করে থাকে।

অতীতের ব্যর্থতা কিংবা সাফল্যের স্মৃতিচারণ

অতীতের ব্যর্থতা কিংবা সাফল্যের স্মৃতি অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু দেখা গেছে যে ব্যর্থতাশংকিতেরা যতনা ব্যর্থতার স্মৃতি মনে রাখতে উৎসাহী সাফল্য সম্পর্কে ততটা নয়।

কর্মসম্পাদন

এটা খুবই স্বাভাবিক যে ব্যর্থতাশংকিতেরা তাদের লক্ষ্য নির্ধারণ সম্পর্কে উদ্বেগে আকুল হওয়ার ফলে তাদের পক্ষে এমনকি তাদের কর্মক্ষমতা অনুসারে কাজ করতেও অসম্ভব হ'য়ে পড়ে। উদ্বেগ ছাড়াও এরূপ অবস্থার কারণ হিসেবে দেখা যায় যে সে কোন সমস্যার সমাধান করতে নিরুদ্যম।

ব্যর্থতার উদ্বেগ

সাফল্য সম্পর্কে উৎসাহী জনের চাইতে একই রকম পরিস্থিতিতে বার্থতা শংকিতেরা অনেক বেশী বার্থতার উদ্বেগ ভোগ করে থাকে।

অন্যান্য

উপরোক্ত কারণগুলি ছাড়াও আরও বহুতর রকমের কারণ বিদ্যমান। ব্যর্থতাশংকিতদের মানসিকতা আরও বিচিত্রতর রূপ নিতে পারে।

সিদ্ধান্ত—কর্মোদ্যগ এবং প্রেষণা

একজন ব্যর্থতাশংকিত মানুষের কাছে আমরা কি আশা করতে পারি। পৃথিবীর ইতিহাস ঘাঁটলে এবং এ সম্পর্কে যত গবেষনা হ'য়েছে সর্বকিছুর ফলাফল খতিয়ে দেখলে উপরোক্ত প্রশ্নটির একটিই উত্তর পাওয়া সম্ভব, সেটা হচ্ছে লোকটি এমনভাবে নিজেকে তৈরী করতে চেষ্টা করবে যাতে ব্যর্থতাকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয়। নানানভাবে এই কাজটি করা সম্ভব। বলা বাহুল্য সবকিছুই নির্ভর করছে ব্যক্তিবিশেষের ব্যক্তিত্বের ওপরে কিছুটা। কিছুটা আবার পরিস্থিতির ওপরে।

লক্ষ্যের সমুখীন হ'লে একজন মানুষের সামনে দুটো পথ খোলা থাকে। এক এই কর্মোদ্যগে লিপ্ত হওয়া অথবা না হওয়া। যদি সে লিপ্ত না হয় তাহলে ব্যর্থতার ভয়টি থাকেই না ফলে আশংকা করা যেতে পারে যে লোকটি কর্মোদ্যগের থেকে সব সময়েই দূরে থাকতে চেষ্টা করছে। ফলে আমরা যদি তাকে এইরূপ কর্মোদ্যগের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি সংগে সংগে সে প্রত্যাখ্যান করবে ধরেই নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু যদি আমরা তাকে এই কর্মপরিস্থিতিতে লিপ্ত হতে বাধ্য করি এবং যথেষ্ট সুযোগ দিই সে কি করবে সে সম্পর্কে, তাহালে সে ব্যর্থতাকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য অনেক কিছুই করতে পারে। সে বলতে পারে সফল্যের সংগে সুযোগের সম্পর্ক গভীর, বলতে পারে তার খারাপ সময় যাচ্ছে, বলতে পারে যে কাজটা তার পছন্দ ছিল না, সে চেষ্টা করে নি তেমন—ইত্যাদি। মোদ্দা কথা সে কাজে লিপ্ত হতে বাধ্য হবে। (তার কারন আমরা তাকে এড়িয়ে যেতে দিই নি) কিন্তু তার ব্যক্তিগত কর্ম উদ্যোগের বিস্তার থেকে সার দাঁড়তে চেষ্টা করবে। সর্বোপরি যদি আমরা লোকটিকে বাধ্য করি কাজটিতে লিপ্ত হতে এবং কর্মপ্রচেষ্টার মান নির্ধারিত করে দিই। যেখানে উপরোক্ত কারণগুলির কোনটাই সে খাটাতে না পারে, তাহলে ধরে নেয়া যেতে পারে যে সে এমনভাবে নিজেকে সাজিয়ে নেবে যাতে ব্যর্থতা থেকে রেহাই পায় এবং তার জন্য কঠিন কর্ম সম্পাদনার মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে সাফল্যকে করায়ত্ব করতে পারে।

ব্যর্থতার কারণ সাধারণতঃ পাঁচটি—

(১) অন্যের নির্দ্ধারিত লক্ষ্যে পৌছনোর অক্ষমতা—

(২) স্বনির্দ্ধারিত লক্ষ্যে পৌছনোর অক্ষমতা—

(৩) স্বমূল্যায়ন অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ অন্য লোকের দ্বারা মূল্যায়িত হওয়ার চাইতে—

(৪) অন্যের চাইতে স্বাধীন ভাবে নিজের সাফল্য কিংবা ব্যর্থতার বিচার করা—

(৫) সাফল্য এবং ব্যর্থতা দুটোই স্বমূল্যায়নের নিরিখের বিচার্য, বাইরের কারো দ্বারা মূল্যায়িত হওয়ার চাইতে !

কোন মানুষই ব্যর্থতার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হ'তে চায় না। ফলে প্রত্যেকেই তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অনুসারে ব্যর্থতাকে জয় করার প্রয়াসে ব্রতী হয়। আধুনিক জগতে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে গবেষণা করা, পরীক্ষা নিরীক্ষা করার সুযোগ যেহেতু রয়েছে সেই হেতু ব্যক্তিগত ভাবে অন্ধকারে না হাতড়ে প্রত্যেকের উচিত ব্যর্থতাকে ব্যর্থ করার কৌশল গুলি জেনে নেয়া। একথা সত্যি যে এখন ব্যক্তিগত পরিস্থিতির সংগে সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ইতিমধ্যেই নিয়ে নিয়েছে। ফলে মানুষকে তার প্রতিটি কর্ম উদ্যোগের আগে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে এগোতে হচ্ছে। সমস্ত কিছু করার আগে অবশ্য একটা কথাই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় যে তাকে সহজভাবে গোটা পরিস্থিতিটা বুঝতে হবে, তারপর সীদ্ধান্ত নিতে হবে, তারপর কাজের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। এই তিনটি কাজের কোন একটি গোলযোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকার অর্থই হচ্ছে পিছিয়ে যাওয়া। একথা খুবই ঠিক যে ব্যর্থতার ঠিক পরেই সাফল্যের আবির্ভাব। সেই কবে আবহমান্ কাল থেকে ইতিহাসের অভিজ্ঞতা তাই বলে, ফলতঃ কৌশলে ভাগ্যলক্ষ্মীকে আহ্বান করে স্বভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস যুক্তিযুক্ত।

রোগ নিরূপনের অভিজ্ঞতা থেকেই রোগ উপশমের প্রয়াস সম্ভব। সেই কারণেই ব্যর্থতার রোগ নিরুপণের প্রয়াসে আমরা এতটা সময় ব্যয় করেছি। আশা করব এই দীর্ঘ আলোচনার অভিজ্ঞতা থেকেই আমরা ক্রমশঃ সাফল্যের চাবিকাঠিটি আহরণ করার পথ খুঁজে নিতে পারব।

তাহলে এতক্ষণের আলোচনা থেকে আমরা কয়েকটি সমস্যার নির্দেশ স্পষ্ট করতে পারছি—সাফল্যকে করধৃত আমলকীর মতন বাস্তবায়িত করতে হ'লে যে সমস্যাগুলির সমাধান প্রয়োজন। অবশ্য পৃথিবীর চিরায়ত নিয়মে দেখা গেছে যে সমস্যা চিহ্নীত করতে সমর্থ হ'লে কাজ বেশ কয়েকধাপই এগিয়ে যায়। অন্ধকারে হাতড়ে ফেরার বদলে তখন আমরা চেষ্টা করতে পারি সঠিক পথটি ধরার! হটে যাওয়াটা দুর্বলতা নয়কো, চেষ্টা না করাই দুর্ব্বলতা। হেরে গেলেও ক্ষতি নেই। সেই চেষ্টাই পরবর্তী কাজের সাফল্যের কারণ হ'য়ে দাঁড়াবে। এখন সমস্যাগুলি কি কি—

১। ভয় না পাওয়া

২। লক্ষ্য স্পষ্ট করা

৩। অভ্যাস করা

৪। হতাশ না হওয়া

৫। বিশ্বাস রাখা

৬। সততা রক্ষা করা

ভয় না পাওয়া

রক্তশোষণকারী এই ভয়নামক vampire কে যত শীঘ্র সম্ভব মন থেকে মুছে ফেলতে হবে। ভয়ের অনেক কারণ প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ-ভাবে থাকলেও আপনাকে নিজের মনে স্থির থাকতে হবে যে আপনি ভয় পাননি। আসলে ভয় পেলে মানুষজন যে সমস্ত কার্যকারণগুলি ঘটিয়ে থাকে সাধারণতঃ সেগুলি করে ভয়ের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায় না।

যেমন ধরুন সাঁতার শেখা, আপনি জলে নামতে ভয় পান, কিন্তু সাঁতার শিখতে হ'লে জলে আপনাকে নামতেই হবে। আপনাকে মনে করতে হবে যে কত ছোট ছোট শিশুরা সাঁতার শিখে গেছে, তাহলে আপনি পারবেন না কেন, এই ভেবে ভেবে জলে নামলেন, কিছুটা নাকানি চোবানি খেয়ে সাঁতার শেখা হয়ে গেল। কিন্তু একা কি জলে নামবেন। না কখনই না। সাঁতার যে জানে এমন লোককে সংগে নিয়েই আপনি জলে নামছেন। কিংবা কম জলে, অর্থাৎ প্রথম আপনি সাহস আনলেন জলে নামতে, তারপর আপনি সাবধান হলেন দুর্ঘটনা এড়াতে, তারপর আপনি জলে নামলেন—এই তিনটি পর্যায়ে কাজ করে আপনার সাঁতার শেখা হয়ে গেল।

কিংবা আপনি আপনার বিগত স্কুল কিংবা কলেজ জীবনের কথাটাই ভাবুন না। সারা বছর হয়ত আপনি বাড়ির লোকজনদের কথা শোনেন নি। তেমনভাবে প্রস্তুত করেন নি নিজেকে। সামনে পরীক্ষা নিয়ে হতভম্ব হয়ে পড়েছিলেন। অগত্যা পড়াশুনা যতটুকু সম্ভব চালিয়ে ওইটুকু সময়ের মধ্যে তৈরী করে নিজেকে, পরীক্ষায় পাশ করলেন। হয়ত আশপাশের দুএকজনের সাহায্য নিয়েছিলেন সেই সময়ে। আমরা সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, সামনে

পরীক্ষা এবং একেবারেই অপ্রস্তুত থাকলেও আপনি ভয় পেলেন না। সাবধান হয়ে অন্য দু'একজনের সাহায্য নিলেন। পড়াশুনা অর্থাৎ কাজটি করলেন এবং লক্ষ্যে পৌছলেন।

আপনি এখন নিশ্চয়ই মনে মনে টগবগ্ করছেন বলতে যে সাঁতার শেখা কিংবা পরীক্ষায় পাশ করা ব্যাপারটা আর এমন কি জীবনের সাফল্যের প্রেক্ষিতে। চাকরী পাওয়ার সমস্যার কথা বলুন। ব্যবসায়েস সাফল্যের কথা বলুন।

হ্যাঁ আপাত দৃষ্টিতে আপনার মনে হতে পারে যে দুটো গল্প আমরা করেছি, সাঁতার শিক্ষা কিংবা পরীক্ষায় পাশ করা সেগুলি খুবই তুচ্ছ আরও বড় সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে—আপনি কেন আমরা অনেকেই এই রকম ভাবেই ভাবতে অভ্যস্ত। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ঘটনাটি কি—সাঁতার না শেখা পর্যন্ত সাঁতারটি আপনার কাছে অসম্ভব ব্যাকরণ। পরীক্ষায় পাশ করাও তেমনি। কিন্তু ভেবে দেখুন আজ ওই ব্যাপারগুলো যতই গুরুত্বহীন বলে মনে হোক না কেন শেখবার সময় কত না গুরুত্বপূর্ণ ছিল সেগুলো। সে যাই হোক যে ভাবে আপনি সাঁতার দেয়াটি শিখে ফেলেছিলেন কিংবা কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে গেলেন, সেই একই পদ্ধতিতে জীবনের অন্যান্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবেন না কেন—সেই কারণগুলো তাহলে ভেবে দেখা যাক। আপনার মনে হচ্ছে যে পরিস্থিতি দুটো এক নয়। বেশ, তফাৎটি কি। —ধরা যাক চাকরি পাওয়ার লক্ষ্য—এই ব্যাপারে—তাহলে ঘটনাটি হচ্ছে চাহিদা বেশী সরবরাহ কম তাই না, অর্থাৎ বেকার বেশী কিন্তু চাকরী নেই। কিংবা চাকরীতে উন্নতি করার লক্ষ্য—অর্থাৎ উন্নতি অনেকেই করতে চাইছে, কিন্তু প্রমোশনের সম্ভাবনা দুত্রকটি মাত্র হয়ত। কিংবা ব্যবসা—আপনি যে বিষয় নিয়ে ব্যবসা করতে চাইছেন, দেখা যাচ্ছে হয়ত অনেক লোক রয়েছে সে ব্যাপারে, সরবরাহের স্থান কয়েকটি মাত্র—কথাটি আপনি ঠিকই বলেছেন।

তবে কিনা কয়েকটি বিষয়ে আলোচনা করতে পারলে পরিস্থিতিটি বোঝা আরও সহজ হ'তে পারে—

আমাদের সামনে যে কোন রকম সমস্যাই আসুক না কেন, সেই সমস্যাগুলির পরিপ্রেক্ষিতটি বোঝা দরকার—ব্যক্তিগত, পরিবারগত এবং দেশজ পরিপ্রেক্ষিতটি কেমন।

যে সমস্যার পটভূমি সমস্ত দেশ, সেই সমস্যার হেতু নির্দ্ধারনের কাজটি এক্ষেত্রে আপনার নয়—অর্থাৎ সেই অর্থে আপনি সামাজিক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কোন কর্মযজ্ঞের মধ্যেই নিয়ে যাচ্ছেন না নিজেকে—ফলে আপনার সমাজে চাকরী খালি নেই তা নিয়ে দুঃখ করতে পারেন সন্দেহ নেই, কিন্তু হতাশ হ'য়ে চাকরী খোঁজা থামিয়ে রাখবেন কি—আবার সমাজে চাকরী তৈরী করার দায়িত্বও এখন আপনার নেই—ফলে আসল কথাটি হচ্ছে চাকরী থাক বা না থাক চাকরী খুঁজতে বেরোবেনই। সেখানে অন্য দেশে চাকরীর পরিস্থিতিকত ভালো সে কথায় আপনার গিয়েই বা কি লাভ নিছক জ্ঞানআহোরণ ছাড়া। আবার পরিবারগত পরিস্থিতি ভাবুন—অনেক একান্নবর্তী পরিবারে হয়ত এমন সুযোগ রয়েছে যে বাড়ির ছেলেরা টপটপ চাকরী পেয়ে যাচ্ছে—যোগাযোগ ইত্যাদি হয়ত সেইরকম রয়েছে তাদের—যা আপনার নেই—তাহলে সেইসব পরিবার সম্পর্কে আলোচনা করে লাভ কি—আপনার পরিবার এই ব্যপারে আপনাকে সাহায্য করতে পারুক বা না পারুক, চাকরি আপনাকে খুঁজতে যেতে হচ্ছেই। এবারে আসুন ব্যক্তিগত পরিস্থিতি। হয়ত অন্য সকলের মতন আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই, চেহারাও নয়, হয়ত আপনি অনেকের মতন তেমন শারীরিক সক্ষম নন—কিন্তু হাজারো অপ্রতুলতা থাকা সত্ত্বেও আপনি চাকরি খুঁজতে বেরিয়ে পড়বেনই। কারণ লক্ষ্য আপনার চাকরী। ব্যবসার ক্ষেত্রটিও অনুরূপ।

অর্থাৎ আরও স্পষ্ট হওয়া গেল যে আপনার পরিস্থিতিটি যাই

হোক, আপনি চাকরি খুঁজতে বেরোবেনই। কেন, না প্রয়োজন আপনার খুবই। অর্থাৎ প্রয়োজন আপনি অনুভব করছিলেন, সিদ্ধান্ত নিলেন কি তার সমাধান, তারপর নেমে পড়লেন কাজে—ভয় পেলেও নামছেন। আশাহত হ'লেও নামছেন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে ভয় পুষে রেখে লাভ নেই। ভয় পেলেই আপনি আর এক পাও এগোতে পারবেন না। এই ভয়কে শিকেয় তুলে রাখুন—তারপর অদম্য শক্তিতে ঝাঁপিয়ে পড়ুন আপনার কাজে—সেই সাহসই আপনাকে আপনার লক্ষ্যে পৌঁছে দেবেঅচিরেই—

লক্ষ্য স্থির করুন

এক চাইতে বহু চেয়ে ফেলবেন না। একেরই যাতে চূড়ান্ত হয় তাই করুন। প্রথমে আপনি ঠিক করুণ আপনার ঠিক কি প্রয়োজন। কতটুকু প্রয়োজন। এখন এই চাওয়ার নিরেখটি কি হবে সেটা বোঝা দরকারী—আট/দশ বছর বয়সে আপনার ভয়ংকর জরুরী চাওয়া ছিল নীলরঙের মার্বেলটি। ১৪/১৫ বছর বয়সে পরীক্ষায় পাশ করা কিংবা ধরুন সেই বালিকাটির সংগে দেখা হওয়া—দুটো কথা বলা। ২৪/২৫ বছর বয়সে চাকরী কিংবা ব্যবসার সূত্র। বলাবাহুল্য এর প্রত্যেকটিই কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ যেমন গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়িক উন্নতি কিংবা চাকরীর উন্নতি পরবর্তীকালে! সূতরাং চাকরী পাওয়াটাই মুখ্য এক্ষেত্রে এবং লক্ষ্য স্থির করা প্রয়োজন। এবং সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে গেলে আপনাকে সেই লক্ষ্য সম্বন্ধীয় যা কিছু সবই জেনে নিতে হবে। সূতরাং সাফল্যের পৌঁছনোর প্রাথমিক এবং সবচাইতে প্রধান উপায় হচ্ছে আপনাকে আপনার লক্ষ্যটি স্থির করতে হবে।

বিশ্বাস রাখুন

আপনি ভয় তাড়িয়ে দিয়েছেন। আপনার লক্ষ্যটিও স্থির—এবার আপনার তৃতীয় কর্তব্যটি হবে বিশ্বাসের ভূমি দৃঢ় করা। আপনি নিশ্চয়ই 'পারবেন না' এমন মানসিকতা নিয়ে কাজে এগোবেন না। যতই আপনি মুখে হতাশার কথা বলুন না কেন মনের গভীরে কোথাও ক্ষীণ হ'লেও 'পারব' এই বিশ্বাসটি আপনি ধরে রেখেছেন।

কার্যকারণ সূত্রগুলি আপনি বিবেচনা করুন। আলোচনা করবেন কারা সফল হ'য়েছে, কিভাবে হ'ল। তাহলে নিশ্চয় হওয়া যায়—যদি সম্ভব হয় তাহলে আপনার ক্ষেত্রেও সম্ভব হবে। এই রকম বিশ্বাস রাখাই ভালো।

বিশ্বাস করলেই নির্ভরতা আসে। অহেতুক সন্দেহবাতিক লোক যারা আসলে তারা রোগীমাত্র, তাঁরা ছাড়া অন্য সকলেই বিশ্বাসের ওপরেই বেঁচে থাকে। স্ব-নির্ভরতা এলে কঠিন কাজও সহজ হ'য়ে যায়। এবং বিশ্বাস আর বিশ্বাসের সংগে সংগে নির্ভরতা আনা সম্ভব সেবা দ্বারা। আপনি নিশ্চয়ই আশা করেন না যে সমাজের কাছ থেকে আপনি শুধু নিয়েই যাবেন, দেবেন না কিছুই। অথচ সমাজ চিরকালই আপনার সেবা করে যাবে। সমাজের কাছ থেকে সেবা পেতে হলে আপনাকেও আপনার ক্ষমতা অনুযায়ী সেবা করতে হবে। কেউ অর্থ দিয়ে পারে কেউ পারে না। সে তখন তার মিষ্টি হাসিটি দিয়েই সেবা করতে চেষ্টা করে। অর্থাৎ দেবার দরজাটি আপনার খুলে থাক, দিতে থাকুন দেখবেন সব একদিন আপনার হ'য়ে যাচ্ছে। বরং আপনি বন্ধু আহরণ করুন। বন্ধুকে ত্যাগ করবেন না। আপনার প্রয়োজন। ব্যর্থতা যতই আসুক না কেন বন্ধুকে ত্যাগ করলে একসময় আপনি একলা হ'য়ে যাবেন। তখন জীবনের প্রতি, অস্তিত্বের প্রতি আপনার বিশ্বাসের ভূমি শিথিল হয়ে যাবে। তাছাড়া বিশ্বাস রাখা ছাড়া আপনার গত্যান্তরই বা কি রয়েছে—

আপনি সাহস ফিরিয়ে এনেছেন। লক্ষ্য স্থির করেছেন, বিশ্বাসও স্থাপন করেছেন। এযাবৎ এ সব কিছুই আপনার মানসিক প্রস্তুতি, এইবার বাস্তব কাজের মধ্যে আপনাকে নেমে পড়তে হ'চ্ছে।

আপনার লক্ষ্য সম্পর্কেও যতটা সম্ভব সংবাদ সংগ্রহ করুন—সংবাদ সংগ্রেহের ক্ষেত্রে কোন দিনই সংকুচিত হবেন না। ক'রে জানুন কি কি করলে ওই লক্ষ্যে পৌঁছন সম্ভব। হয়ত ইতিপূর্বে আর কেউ আপনারই লক্ষ্যে যাত্রা করে সফল হ'য়েছেন, তার কাছে যান। জিজ্ঞাসা করুন, কিভাবে তিনি সফল হয়েছেন। সেই সব কিছু সংগ্রহ করে মনে মনে আপনি প্রস্তুতি নেবার পদ্ধতি ছকে ফেলুন। তারপর নিয়মিত অভ্যাস করুন। আপনার কথা বলা। বক্তব্যের শব্দচয়ন, গলার স্বর, ভাবভঙ্গী। লোকজনের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ ইত্যাদি সঠিক মাপে তৈরী করতে অভ্যাস করুন, প্রয়োজন হলে পূর্ববর্তী বক্তার সংগে আলোচনা করে তারই মতন হ'তে চেষ্টা করুন। পারছেন না, ব্যর্থ হচ্ছেন বারবার, তবুও সেই অভ্যাসের অমোঘ আদেশপালন করে যান। আপনার শরীর মন, অস্তিত্বই তখন আপনার স্থির লক্ষ্যের সংগে মিশে যাবে—এবং পাওয়ার চাহিদা তখন এত বেশী জরুরী হ'য়ে পড়েছে যে, আপনি যতক্ষণ না ঐ লক্ষ্যে পৌঁছতে পারছেন ততক্ষণ পর্যন্ত চেষ্টা এবং অভ্যাস না করে পারবেনই না।

চেষ্টা, অভ্যাস এবং নিষ্ঠার ভূমিকা সাফল্যলাভের প্রয়াসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর ফলে ব্যর্থতার কালো ছায়া আপনা থেকেই মিলিয়ে যাবে। শুধু মনে রাখবেন কোন ক্রমেই যেন আপনি দোলায়মান চিন্তা বা কর্মের মধ্যে নিজেকে স্থাপিত না করেন।

হতাশ হয়ে পড়বেন না

এতক্ষণ আলোচনা করার পরে আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে প্রয়োজন যদি আপনার সত্যিই থেকে থাকে, তাহলে ব্যর্থতার ভয় এবং হতাশ হওয়ার আশঙ্কা আপনার খুব কমই রয়েছে। আপনি যদি একান্তই দায়িত্বজ্ঞানহীন লোক না হন্ সচেতনতার বিন্দুমাত্র লেশও যদি আপনার মধ্যে থেকে থাকে, তাহলে ব্যর্থ হওয়া আপনার ব্যকরণে নেই। যতবারই আপনি ব্যর্থ হ'ন না কেন, আকাশ যতই না ভেঙে পড়ুক আপনার মাথায়, যতই কেন না সকলে আপনাকে পরিত্যাগ করুক, আপনি কিন্তু চুপটি করে বসে থাকতে পারবেনই না, কারণ চরিত্রের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য আপনাকে ব'সে থাকতে দেবেই না। প্রাণপন চেষ্টা আপনি করে যেতে বাধ্য হবেন, বিষয়টিতে সাফল্য আনতে, কথায় বলে" যতক্ষণ শ্বাস—ততক্ষণ আশ" কথাটী অত্যন্ত সত্যি নিশ্চয়ই, মানুষ আশা ত্যাগ করতে পারে না। অবশ্য সর্বাকিছুই নির্ভর করছে আপনার মানসিকতার ওপরে। হতাশ হওয়ার আগে আপনি একটু ভাবুন যে আপনি আপনার নিজের, নিজ পরিবারের, সমাজের এবং রাষ্ট্রের শুভা-শুভের জন্য আপনিই দায়ী, ভাবুনত কত সহস্র লোক আবহমান কাল থেকে আপনি যতটা কষ্ট পাচ্ছেন তার চাইতে কত বেশী রকমের কষ্টের মধ্যে জীবন কাটিয়ে গেছে। যাদের তুলনায় বলা বাহুল্য—আপনি ভালোই আছেন। এই পৃথিবী, মানুষজন প্রভৃতি সকলেই আপনাকে দীর্ঘকাল সেবা দিয়ে এসেছে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে, আজ কিন্তু সেসবের উত্তরে সেবা করা প্রয়োজন ছিল। কাজে বিফল হয়েছেন বলে যদি আপনি সেটা না করেন তাহলে অকৃতজ্ঞতার দোষে আপনি দুষ্ট হবেন। আর মানুষ যেহেতু স্বাভাবিকভাবেই অস্তিবাদী, সেহেতু নেতিবাদ তার কাছে হয় পলায়ন নয়তো কায়দাবাজী, ভাবুন আপনি তাই করবেন, নাকি মানুষের মতন লড়াই করে আমৃত্যু সংগ্রাম করে সৌভাগলক্ষীকে জয় করবেন।

আপনি ভয় ত্যাগ করেছেন, বিশ্বাস ফিরিয়ে এনেছেন। অভ্যাস করেছেন, হতাশ হননি—সব ঠিক আছে, কিন্তু আপনার যদি লক্ষ্যই স্থির না হ'য়ে থেকে থাকে, তাহলে আপনি কোন বিষয়েই বা সাফল্য লাভ করবেন। মহাভারতের কথা মনে করুন—অস্ত্রশিক্ষার পরে পরীক্ষা নিচ্ছিলেন দ্রোণ প্রথমে যুধিষ্ঠিরকে পরে অন্য সবাইকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন তারা কি দেখতে পাচ্ছেন, তারা জবাব দিয়েছিলেন গাছ, ডালপালা, খাঁচা, পাখি এইসব। অর্জুনকে জিজ্ঞাসা করাতে অর্জুন উত্তর দিয়েছিলেন যে তিনি পাখির ডানচোখ ছাড়া আর কিছুই দেখছেন না। লক্ষ্যে অনুরুপ হওয়া উচিৎ, তাহলেই লক্ষ্যভেদ সম্ভব।

আপনি যতক্ষণ মনস্থির করতে পারবেন না ততক্ষণ লক্ষ্যও আপনার সরে সরে যাবে কারণ কোন বিশেষ লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য সেই বিশেষ লক্ষ্য অনুযায়ী কোন কাজ আপনি করেন নি। অথবা বলা যেতে পারে, যা করেছেন অত্যন্ত ভাসা ভাসা ভাবে, গভীরে অনুশীলন বা চেষ্টা করতে পারেন নি, কারণ একজন মানুষের পক্ষে সব লক্ষ্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়া'ত সম্ভব নয়, বিশেষ লক্ষ্যে পৌছনোর বিশেষ ধরনের চেষ্টার রুপটি শেখা, অনুসরণ করা, অনুশীলন করাটা সেই লক্ষ্যে পৌছনোর জন্য অত্যন্ত জরুরী। লক্ষ্য স্থির করার সময়ে অবশ্য আপনাকে ব্যক্তি, পরিচয়, সমাজ, সেবা এবং সর্বোপরি পারিপার্শ্বিকের অবস্থার সম্যক বিবেচনা প্রয়োজন। সেই সব বিবেচনা করার পরে অতঃপর আপনাকে আপনার প্রয়োজনের বিষয়টি বাস্তবসম্মত ভাবে বিচার করে ঠিক করে নিতে হবে। আমরা আগেই আলোচনা করেছি বা এইরূপ বিচার অনেক সময়ে আপনি নিজে একা একা ক'রে ঠিক নাও করতে পারেন তখন আপনার অন্তরঙ্গ লোকদের সঙ্গে আলোচনা করুন। তারপরে ঠিক করুন আপনার লক্ষ্য—এবার আর ব্যর্থ হবেন না সেই লক্ষ্যের ব্যাপারে। তা না হলে সব গণ্ডোগোল হ'য়ে যেতে পারে।

আপনার ঐ লক্ষ্য। আপনার মানসিক প্রস্তুতির সম্পর্কে আপনি সৎ থাকতে চেষ্টা করুন। লোকের কাছে না হোক নিজের মনের কাছেই আপনি সততাটুকু হারিয়ে ফেলবেন না—অর্থাৎ ভাবের ঘরে চুরি করে মনকে চোখ ঠারবেন না—তাহলে আপনি লক্ষ্যভ্রষ্ট ত হবেনই, হয়ত ঠকবেনও বিস্তর। প্রতিকূল পরিবেশকে অনুকূল করে তোলার ভয়ংকর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আপনি সৎ থাকুন, দেখবেন অমলীন চেষ্টাই আপনাকে ক্রমশঃ মুক্তির দিকে নিয়ে যাবে।

লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্য নীচের ছটি বিষয়ে আপনাকে ক্রমান্বয়ে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে : যতক্ষণ না আপনি আপনার লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারছেন না। তাছাড়াও আপনাকে আপনার শরীরটি ঠিক রাখতে হবে। স্বাস্থ্য ভেঙে গেলে আপনি চেষ্টা চালিয়ে যেতে পারবেন না বরং মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়বেন আপনি, সুতরাং শরীরের যত্ন আপনাকে করতেই হচ্ছে।

এবং সবচাইতে মজার ব্যাপার হ'ল, নিম্নোক্ত ছটি অবশ্য করণীয়ের মধ্যে যে কোন একটাও যদি আপনি আপনার চরিত্রে ফুটিয়ে তুলতে পারেন, তাহলে অন্য পাঁচটি আপনা থেকেই এসে দানা বাঁধবে আপনার মনে। ফলে আপনার কাজ ক্রমশঃই সহজ হ'য়ে আসবে।

বিক্রয়বিজ্ঞান এবং বিক্রয় প্রতিনিধি

"বিক্রয় সম্পর্কিত মানসিক সংগঠন"—শেলডন দীর্ঘকাল আগে এ বিষয়ে তার বিখ্যাত উক্তিটি করেছিলেন—সঠিক মনোযোগ, উৎসাহ, ইচ্ছা এবং কর্মতৎপরতা,-এই চারটি নিয়মে তিনি বিক্রয় বিজ্ঞানের রূপ-রেখাটি স্পষ্ট করেছিলেন। হার্বার্ট কা'সন পরবর্তী কালে তার সুবিখ্যাত ফর্মুলা ব্যাখ্যা করেছিলেন।

= অভ্যর্থনা

= অনুসন্ধান

= প্রদর্শন

= নির্বাচন

= ধারনা প্রযুক্তি

= বিদায় সম্ভাষণ

বিক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে দুজন মাত্র ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট। একজন বিক্রেতা অন্যজন ক্রেতা। প্রয়োজন দুজনেরই সমান, ক্রেতা-একটি দোকানথেকে না কিনে অন্য দোকানে কিনতে পারেন তেমনি একজন ক্রেতা না কিনলেও অন্যজন নিশ্চয়ই কিনবে সেই দোকান থেকে।

দেখা গেছে যে একশজন ক্রেতার মধ্যে সাধারণত কুড়িজন ক্রেতার কাছে বিক্রয় করা সম্ভব হয়ে থাকে। বাকী শতকরা আশিভাগ ব্যর্থ হয়। এই আশিভাগের থেকে বিক্রয় বিজ্ঞানের সাহায্যে কিছু বিক্রয় করে যেতে পারলে একটি দোকানে যা লাভ হয়ে থাকে সাধারণত, তার থেকে অনেক বেশী লাভ করা সম্ভব হ'তে পারে।

প্রত্যেক ক্রেতাই দোকানে ঢোকার আগে এবং পরে সেই

দোকানের বিক্রয় পদ্ধতি নিয়ে একটা মানসিক ধারণা তৈরী করে ফেলেন। তিনি হয় মনে করেন তাকে যথার্থভাবে ব্যবহার করা হয়েছে নয়ত মনে করেন যথেষ্ট মনোযোগ দেয়া হয়নি। এখন কোন ক্রেতা যদি মনে করেন যে ঐ দোকান যথেষ্ট ভাল ব্যবহার তিনি পেয়েছেন। দোকানে জিনিষপত্রের বৈচিত্র্য যথেষ্ট রয়েছে তাহলেই তিনি জিনিষ কিনবেন এবং ঐ ব্যবহার মনে রেখে পরবর্তী প্রয়োজনেও তিনি আবারও ফিরে আসবেন সেই দোকানে। তার বন্ধুদেরও বলবেন গল্প। ফলে কিছু সময়ের মধ্যেই ঐ দোকানের বিক্রি ঠিক পদ্ধতিতে অনুসৃত হয়ে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকবে। আবার অন্যদিকে ক্রেতার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় কারণটি যদি ঘটে তাহলেই কোন কারণে বাধ্য হয়ে ক্রেতাকে সেবারের মতন জিনিষ কিনলেও, সে পারতপক্ষে ঐ দোকানটি এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করবেই করবে, বন্ধুদেরও এড়িয়ে যেতে বলবে। সামাজিক অর্থনীতিতে বাজার যখন বিক্রেতাদের, তখন হয়ত এরূপ ঘটনায় দোকানটির লাভ লোকশানে, বিশেষ কিছু হেরফের হবে না কিন্তু ক্রেতার বাজার হ'লে দোকানটির টিকে থাকা মুশকিল হ'য়ে উঠবে। তার কারণ দোকানটি পারিপার্শ্বিকতার সহানুভূতি ক্রমশঃ হারিয়ে ফেলেছেন। সাধারণতঃ বলা হয়ে থাকে যে দোকানে যত ক্রেতা আসেন তাদের মধ্যে তিনভাগের একভাগ মাত্র জিনিষ কেনেন। বাকিরা দর দস্তুর করে অন্যত্র চলে যান। ফলে সব দোকানদারই জানেন যে তার দোকানে বিক্রয়-যোগ্যতা বাড়াতে পারলে বিক্রী বেশী হোক বা না হোক বিক্রয়ের নিরাপত্তা বাড়ানো সম্ভব। ব্যবসায় সাফল্য লাভ করতে হ'লে এরূপ স্বাচ্ছন্দবোধ দরকার।

বিক্রয়বিজ্ঞানের আলোচনা বলা বাহুল্য সর্বস্তরের বিক্রয় প্রতিনিধিকে আরো সাফল্যলাভে সাহয্য করবে সন্দেহ নেই, একজন ক্রেতার পক্ষে বিক্রয় প্রতিনিধির বিশেষ পদ্ধতিগুলি সম্পর্কে জানা

সম্ভব নয়। কিন্তু বিষয়টি ঘটে যাওয়ার পর তিনি তার মনে সুচারুরূপে হ'ল কি হোল না, পছন্দমতন হোল কি হোল না, সেটা পর্যালোচনা করবেনই আর সেই পর্যালোচনার ফলশ্রুতি হিসেবে হয় খুশী হবেন না হয় বিরক্ত হবেন।

অভ্যর্থনা

ক্রেতাটি যখন দোকানে ঢুকছেন তখন থেকে যখন বেরিয়ে যাচ্ছেন, সমস্ত সময়টি ভাল ব্যবহার পেয়েছেন মনে করতে পারলে খুশী হবেন। এমনকি এটাও মনে করা তার পক্ষে অস্বাভাবিক নয়, যে তাকে অত্যন্ত বিশিষ্ট ভাবেই গণ্য করা হ'য়েছে, যেন'বা একটু পৃথকভাবে, যেটা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে কাউণ্টারের বিক্রয় প্রতিনিধি ওপরে।

অনুসন্ধান

দ্বিতীয় দফায় ক্রেতাটির কাছ জেনে নেয়া দরকার তার প্রয়োজন ঠিক কোন জিনিষের। যিনি ক্রেতাকে অভ্যর্থনা করবেন তার উচিৎ ক্রেতার কাছাকাছি এসে দাঁড়ানো, যাতে লোকে যেটাকে বলে ক্রেতা প্রতিরোধ' যেন সে ব্যাপারটি না তৈরী হয়। যা সাধারণত হ'য়ে থাকে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই, বিক্রয় বিজ্ঞান সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান না থাকার ফলে বেশীর ভাগ সময়ই বিক্রয় প্রতিনিধিটি অনুত্তেজিত এবং

উদাস চোখে তাকিয়ে থাকেন, ক্রেতা এসে পড়লে তারপর যেন বা অত্যন্ত অনিচ্ছসত্বে দুচারটি জিনিষ দেখাতে চেষ্টা করেন – সব সময়েই ভাবটি যেনবা অবহেলাব্যঞ্জক। মনে রাখা দরকার যে বিক্রী করায় ক্ষেত্রে সবচেয়ে দোষনীয় কাজ হচ্ছে ক্রেতাকে অবহেলা করা হচ্ছে এমন ভাবটি জাগিয়ে দেয়া—সবচাইতে সহজ ভাবটি হচ্ছে আপনার কথা গুরুত্ব দিয়ে শোনা হচ্ছে, জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে বিশদভাবে—এরকম ভাবটি জানিয়ে তোলা।

ক্রেতাটির প্রয়োজন সম্পর্কে জেনে নিতে নিতে বিক্রয়-প্রতিনিধিটিকে অত্যন্ত সহজ ও বুদ্ধিমানের মতনই জেনে নিতে হবে যে ক্রেতাটি বস্তুত যা চাইছিল তাই কিনবেন কি না, না কি অন্য কোন জিনিষ আসলে বিক্রি করার সুযোগ রয়েছে, তার ক্রয়ক্ষমতা সম্পর্কে কিঞ্চিৎ ধারনা করার চেষ্টা ইত্যাদি, এ সমস্তই কিন্তু বিক্রয় প্রতিনিধিটির পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে সাহায্য পুষ্ট হবে।

প্রদর্শন এবং ধারণা প্রযুক্তি

তৃতীয় পর্যায়ে বিক্রয় প্রতিনিধি এইবারে ক্রেতাটি যে সব জিনিষ দেখতে চেয়েছেন সেগুলির প্রদর্শনি করবেন। সংগে তিনি তার বুদ্ধিবিবেচনা মতন আরও দুএকটি জিনিষ দেখাবেন যেনবা প্রসঙ্গতঃ। অবশ্য কোন অবস্থাতেই না জিজ্ঞাসা করা পর্য্যন্ত দাম বলবেন না।

প্রদর্শনি পর্যায়ে বিক্রয়প্রতিনিধিটির কর্ত্তব্য হচ্ছে ক্রেতাটিকে জিনিষ নির্বাচন করতে সাহায্য করা। বলা বাহুল্য খুবই সতর্কতার সংগে। মনেরাখা দরকার যে সমস্ত রকমের ব্যবহারের মধ্যে সবচাইতে ক্ষতিকর হচ্ছে যদি সেই ব্যবহারের কারনে ক্রেতার অহং

ভাবটি আহত হয়ে যায়। প্রতিনিধিটির কর্তব্য এবং দায়িত্ব বিক্রি করা। ব্যক্তিগত মান অপমানের কোন অবকাশ সেখানে নেই।

এই প্রদর্শনির সময়েই প্রতিনিধিটির সামনে সুযোগ রয়েছে ক্রেতাটির ক্রয় ভাবনাকে বিস্তৃততর করার। হয়তো ক্রেতাটি শুধু জুতো কিনতে এসেছেন, জুতোটি বিক্রি করতে করতে মোজাটিও বিক্রি করার ব্যবস্থা করা—এই রকম আর কি। দেখা গেছে যে বিক্রয়-প্রতিনিধির দু-একমিনিটের প্রয়াস কোন কোন দোকানের বিক্রয় পরিমান অন্ততপক্ষে দশ শতাংশ বাড়াতে সাহায্য করেছে।

বিদায় সম্ভাষণ

ক্রেতাটি দোকান থেকে জিনিষ কিনেছেন এবং ক্যাশমেমোটি কাউন্টারে দিয়ে গেছেন অন্য কোন ক্রেতাকে অভ্যর্থনা করতে। পুর্বোক্ত ক্রেতাটি কাউন্টারে অপেক্ষা করছিল টাকা দেবার জন্য। টাকা দেয়া খোল প্রত্যেকটা জিনিষ নিলেন এবং যাওয়ার জন্য পা বাড়ালেন। বিক্রয় প্রতিনিধিটি যতই ব্যস্ত থাকুন লক্ষ্য রাখবেন ক্রেতাটির উপর। চলে যাওয়ার আগে নমস্কার করবেন মিষ্টি হাসিটি দিয়ে।

মনে রাখা দরকার যে ওই বিদায় সম্ভাষণটি ক্রেতাটির মনে প্রভাববিস্তার করবে যথেষ্টই এবং সেটি হবে সুদুর প্রসারী। পরবর্তী কালে যা দোকানটির পক্ষে হবে খুবই লাভজনক।

আধুনিক কালের কয়েকটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে বস্তুত সারা দিনের পঞ্চাশ শতাংশেরও কম সময় একজন বিক্রয়প্রতিনিধি ব্যস্ত থাকেন। বাকী সময়টা নয়। ফলে খুব সহজেই যে কোন দোকানই

তাঁর গড় বিক্রয়ের পঁচিশ শতাংশেরও বেশী বিক্রয়ভার গ্রহণ করতে সমর্থ। হয় তাই, না হয়ত ক্রেতাদের পিছনে ওই সময়টুকু ব্যয় করার সুযোগ রয়েছে।

একটি দোকানের পক্ষে বন্ধুসুলভ ব্যহারের প্রচার হওয়ার চাইতে বিক্রয় সাফল্যের আর কোন সহজ উপায় নেই। প্রত্যেকটি শহরে কিংবা গ্রামে দেখবেন যে কোন একটি মুদির দোকান, ওষুধের দোকান কিংবা দর্জির দোকান আছেই আছে। সেইসব দোকানদারদের বিক্রি নিয়ে ভাবনার কোন কারণই নেই। থাকেও না। কারন এখানে ক্রেতাদের চরিত্রই হচ্ছে তিনি যেখানে নিরাপদ এবং বন্ধুত্বের পরিবেশ দেখতে পাবেন সেখানেই যাবেন বারবার।

বিক্রয় বিজ্ঞানের গুরুত্বপুর্ণ পাঠই হচ্ছে বিক্রয় যতটা সম্ভব কম অটোমেটিক হোক। অটোমেটিক অর্থাৎ মেকানিক্যাল বিক্রয় ব্যবস্থায় বিক্রয়প্রতিনিধির অর্থাৎ দোকানটির সংগে ক্রেতাটির ব্যক্তিগত ব্যবহারের প্রশ্নই আসে না। সেটা সম্ভবতঃ ভাল ব্যবস্থা নয়। মনে রাখবেন ক্রেতার সংগে বিক্রতার ব্যক্তিগত ব্যবহারের সম্পর্কে যতবেশী স্থাপিত হয় ততই ভাল।

অবশ্য সবকিছুই নির্ভর করছে বিক্রয় প্রতিনিধিদের সঠিক শিক্ষন ব্যবস্থার মধ্যে নিয়ে আনার ওপর। দুঃখের বিষয় খুব অল্পই দোকান আছে যেখানে বিক্রয় প্রতিনিধিদের জন্য যথার্থ শিক্ষার বন্দোবস্ত করা হ'য়ে থাকে।

বিক্রয় ব্যবস্থায় মালিকের দায়িত্ব

সম্পূর্ণ বিক্রয় ব্যবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে বিক্রয় প্রতিনিধিদের গুরুত্ব যতই গভীর হোক না কেন মালিক যারা তাদের দায়িত্বও কম নয়।

যেমন অনেক সময় দোকানে মালপত্র বেশী জমে গেলে মালিক খুব সহজ পদ্ধতিতে দাম কমিয়ে বিক্রি করার বন্দোবস্ত করে থাকেন। এই পদ্ধতিটা একেবারেই কার্যকরী নয়। অবশ্য কোন না কোন সময়ে আমাদের প্রত্যেককেই কিছু না কিছু মূল্য কমিয়ে বিক্রয় ব্যবস্থা করতে হয় কিন্তু সেটা একবারে চরম অবস্থা না হ'লে বাঞ্ছনীয় নয়। এবং কাউণ্টারের বিক্রয় প্রতিনিধিরা কম দামে বিক্রির অভ্যাসের মধ্যে পড়ে গেলে আবার সঠিক দামে বিক্রি সুরু করতে অস্বস্তি অনুভব করেন সঙ্গত কারণেই :

এরূপ অবস্থায় যে সব ব্যবস্থা করা যেতে পারে সেগুলো হচ্ছে—

উইন্‌ডো ডিস্‌প্লে—কিছু টাকা খরচ করে ভালভাবে শোকেস সাজালে ভাল ফল পাওয়া সম্ভব।

কোয়ালিটি কার্ড—দাম কমানোর কার্ড ব্যবহারের বদলে ভাল জিনিষ যা আছে তার পরিচয় পত্র ব্যবহার করা উচিৎ।

স্যাম্পেল দেয়া—কিছু কিছু বিনামূল্যে স্যাম্পেল দেয়া অনেক সময় লাভজনক হয়ে ওঠে।

নির্ভরযোগ্য প্রস্তুতকারক—সব জিনিষই নির্ভরযোগ্য প্রস্তুতকারকের কাছ থেকে কেনাই ভাল। যে প্রস্তুতকারক দোকানটি সম্পর্কে সত্যি সত্যিই আগ্রহী এবং দোকানে মাল জমে গেলে শো-কেশ সাজানোর খরচে ও অংশ নিতে সাহায্য করবে।

আপনার বিজ্ঞাপন যেন সঠিকভাবে করা হয়। উত্তরোত্তর বিজ্ঞাপনের বিকাশ আপনার দোকানটির সুদীর্ঘ সাফল্যের প্রয়াসে সাহায্য করবে।

বিক্রয় প্রতিনিধিদের শিক্ষণ সুযোগ—যেকোন রকমেরই দোকান হোক না কেন সেই দোকানের বিক্রয় প্রতিনিধিদের ভালভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা করা জরুরী।

সর্বোপরি একথা মনে রাখতেই হবে বা সারাটি দিন যে সব বিক্রয় প্রতিনিধিরা নানাধরনের ক্রেতাদের সংগে সারাক্ষণ কথা বলে চলেন তাদের মনে অলস অবস্থা কিংবা একঘেয়েমি আসাটা অস্বাভাবিক নয়। ফলে ইন্‌সেণ্টিভ্‌ সিস্টেম চালু করলে বিক্রয় প্রতিনিধিটির মানসিক স্বাস্থ্যটি অক্ষুণ্ণ থাকবে।

যদিও উপরে কেবলমাত্র কাউন্টারের বিক্রয় প্রতিনিধি সম্পর্কিত আলোচনাই আমরা করেছি, তথাপি বলাই বাহুল্য যে সবরকমের পরিবেশে, যে কোন জিনিষ বিক্রয় সম্পর্কেই উপরোক্ত নিয়মগুলি অনুধাবনযোগ্য। পরবর্তী পর্যায় আমাদের আলোচনা সে ক্ষেত্রেই বিস্তারিত করব।

বিক্রয় প্রতিনিধি কে

সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত আমাদের সমাজজীবনে নানারকম মানুষ নানানরকমের বিক্রয়ক্রিয়া সম্পাদনা করে থাকে, জেনে অথবা না জেনে। যেমন ধরুন মা তার ছেলেকে দুধটুকু খেয়ে নিতে বলছে, বাবা ছেলেকে আর্টস স্ট্রিম নিয়ে পড়াশুনা করার বদলে সায়েন্স স্ট্রিম নিয়ে পড়াশুনা করতে বলছে, বন্ধুকে বন্ধু এক রেস্তোঁরাতে খেতে যাবার বদলে অন্য রেস্তোঁরায় নিয়ে যেতে চাইছে ইত্যাদি। এই সব কিছুই কিন্তু কোন না কোন রকমের বিক্রিয়াক্রিয়া। যতক্ষণ পর্যন্ত এইসব ক্রিয়া লোকের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হচ্ছে (বা না হলেও ক্ষতি নেই) ততক্ষণ পর্যন্ত ঠিক আছে, কিন্তু যখনই কোন বস্তু বা ধারনা বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বিক্রি করার দায়িত্ব এসে পড়ে তখনই কিন্তু প্রয়োজন হয় বিশিষ্ট এবং অভিজ্ঞ বিক্রয় প্রতিনিধির। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই বিক্রয় প্রতিনিধিত্বের অস্তিত্ব সর্বদাই বিদ্যমান। বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে সেই গুণটির উৎকর্ষসাধনের শিক্ষা ক্রয়বিক্রয় সংস্থায় যেমন তেমনি জীবন যাপনের মামুলি কিংবা গুরুত্বপূর্ণ সব ব্যাপারেও অত্যন্ত কার্যকরী।

জন্মগত গুণ, নাকি ব্যবহারিক অভিজ্ঞতাপ্রসূত

জীবনের সর্বস্তরেই কেউ না কেউ থাকেনই যার মধ্যে জন্মগত কিছু গুণ লক্ষ্য করা যাবেই। সেই নিয়ম অনুসারে জন্মগত গুণ আরোপিত বিক্রয় প্রতিনিধি থাকা অসম্ভব নয়। কিন্তু আর সব কিছুর মতন সেটাও কয়েকটি বিশেষ জনের মধ্যেই স্ফুরিত। জন্মগত সৌকর্য্য থাকা সত্ত্বেও চরম উৎকর্ষতার জন্য সেই জন্মগত গুণের অধিকারী লোকটিকে নিরন্তর অনুশীলনীর মধ্যে থাকতে হয়

এবং সেই সব অভিজ্ঞতা কিভাবে আরোপিত করা যেতে পারে সেটা জানাই একটা বড় ধরণের জানা।

অবশ্য অন্যান্য সব ব্যাপারের যেমন কিশোর বয়সেই কারো কারো মধ্যে বিশেষ ধরনের অভীপ্সা অথবা উৎকর্ষতা লক্ষ্য করা যায়, বিক্রয় বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও অনুরূপ অভিজ্ঞতাপ্রাপ্তি অস্বাভাবিক নয়, যার ওপর নির্ভর করে একটি বিক্রয়প্রতিনিধিকে সুচারুরূপে গড়ে তোলার কাজটি নির্ভরশীল। যদি ভিত্তিটা সবল হয় নির্মানটিও অপ্রতিরোধ্য হবে, যদি দুর্বল হয় তাহলে দুর্বল হবে সেটাই স্বাভাবিক। একজন হয়ত সত্যি সত্যিই জানেই না যে তার মধ্যে অন্যদের বিশ্বাস করানোর মতন গুনগত বৈশিষ্ট রয়েছে, হয়ত জানেই না যে সেই ধৈর্য্য এবং সহনশীলতা রয়েছে, যা একজন সত্যিকারের বিক্রয়প্রতিনিধির কাছে অনেক কষ্টলভ্য। যতক্ষন না কেউ বিষয়টি সঠিকভাবে তার সামনে উপস্থিত করতে পারছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত সে হয়ত জানতেও পারবে না কোনদিনই। ফলে বৈশিষ্ট জন্মগত হ'লেও তার সাফল্য নির্ভর করবে কি ধরনের শিক্ষণ ব্যবস্থার মধ্যে তা কি রাখা হচ্ছে তার ওপর। সাফল্য এবং ব্যর্থতার মধ্যে যে সূক্ষ্ম রেখাটি বিদ্যমান বা প্রায় অদৃশ্যই বলা যেতে পারে সেটি নির্ভর করছে সেই বিষয়ে মানুষটির অনুরাগের পরিমানের উপর। যদি কোন বিষয়ে মানুষটির যথার্থই আগ্রহ থাকে। তাহলে যে সেই বিষয়ে সফল হ'তে সর্ববিধ চেষ্টা না করে পারবেই না। পৃথিবীর সবচাইতে বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে যে মানুষের অসাধ্য কাজ বলতে সম্ভবতঃ কিছুই নেই।

ফলে আমরা সহজেই এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে একজন বিক্রয় প্রতিনিধি জন্মগত বৈশিষ্ট ছাড়া আরও কিছু বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন।

বিক্রেতা এবং বিক্রয়প্রতিনিধি

যে বিক্রেতা সে বাজারে জিনিষপত্রের আমদানী করেন এবং বিক্রয়প্রতিনিধি বিক্রি চালিয়ে যায় বাস্তব ভাবে। অর্থাৎ একজনের কাজটি পরোক্ষ অন্যজনের প্রত্যক্ষ। বিক্রয় প্রতিনিধিটি জিনিষপত্র নিয়ে চুপচাপ বসে অপেক্ষা করে, সে বাইরে বেরিয়ে ক্রেতাদের সংগে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপন করে, চাহিদা বাড়ায় এবং বাজার তৈরী করে।

বিক্রয়ের স্থান

বিক্রয় প্রতিনিধিকে জানতে হয় যে তার জিনিষপত্রের প্রকৃত ক্রেতাটি কোনজন। তার কারণ সময় কম থাকার ফলে তাকে সঠিক লোকটির কাছে উপস্থিত হতে হয়। আন্দাজে চলাফেরা করলে সাফল্য লাভে দেরী হবেই।

এখন দোকানের একজন বিক্রয় প্রতিনিধির সংগে ভ্রাম্যমান বিক্রয় প্রতিনিধির মধ্যে যে ব্যবধান বিদ্যমান সেটি আলোচনা করা যেতে পারে। দোকানে ক্রেতা নিজে এসে উপস্থিত হন। কিন্তু ভ্রাম্যমান প্রতিনিধিটিকে ক্রেতাকে অনুসন্ধান করে যোগাযোগ করতে হয়। দোকানের প্রতিনিধিটি তার সমস্ত ক্রেতাদেরই একসংগে এক জায়গায় বসে পেয়ে থাকেন। অথচ ভ্রাম্যমান প্রতিনিধিটিকে প্রত্যেকটি ক্রেতাকে আলাদা আলাদা ভাবে খুঁজে নিতে হয়।

ক্রয়ক্ষমতা

একজন বিক্রয় প্রতিনিধির প্রথমে অত্যন্ত কৌশলে জেনে নিতে হবে যে সম্ভাব্য ক্রেতাটির যথার্থ ক্রয় ক্ষমতা আছে কিনা।

দরকার/প্রয়োজন

সম্ভাব্য ক্রেতার কোন্ জিনিষটা দরকারী আর কোন্ জিনিষটা প্রয়োজনীয় নয় সেটাও বুঝি নিতে হবে। প্রয়োজনীয় জিনিষটা ক্রেতাকে কিনতেই হবে এবং তৎক্ষণাৎ আর অপ্রোয়জনীয় জিনিষটা তত জরুরী নয়, কিন্তু কেউ সেই দরকারের বিষয়টি ভালরকম ভাবে বুঝিয়ে দিলেই সে একটু দেরী করে হ'লেও ক্রয়ে আগ্রহ দেখাবে।

আগ্রহ

অভিজ্ঞ বিক্রয় প্রতিনিধির পক্ষে একজন সম্ভাব্য ক্রেতার সত্যি সত্যি আগ্রহ আছে না সে অযথা বাক্যব্যয় করছে সেটা বুঝে নিতে দেরী করা উচিৎ হবে না।

বাতিল করা কিংবা ক্রয়ে অস্বীকার করা

বিক্রয় প্রতিনিধিটির পক্ষে বুঝে নিতে হবে যে, যে ক্রেতা ক্রয়ে অস্বীকার করছে, সেটাই তার প্রায় শেষ সীদ্ধান্ত, অথচ সে যদি ওই সময়ে বাতিল করে তাহলে পরবর্তী কোন সময়ে বিক্রয়ের সম্ভাবনা থেকে যায়।

ক্রেতা কখনই একা সীদ্ধান্ত নেন না

দেখা গেছে যে কোন জিনিষ যে কেউই ক্রয় করুক না কেন, তিনি একক সিদ্ধান্ত খুব কমই গ্রহণ করেন। কেউ না কেউ তাকে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে।

বিক্রয়ের সময়

সঠিক সময়টি বেছে নেওয়া একজন বিক্রয় প্রতিনিধির পক্ষে অত্যন্ত জরুরী। সময়ের যথার্থ মূল্য হচ্ছে অর্থ, সুতরাং সময়ের যথার্থ ব্যবহারের ফলশ্রুতি অর্থ উপার্জন এবং অপব্যবহারের ফলশ্রুতি অর্থনষ্ট। একজন ভ্রাম্যমান বিক্রয় প্রতিনিধিকে একজায়গা থেকে অন্য জায়গায় যতটা সম্ভব দ্রুত যাতায়াত করতে হয় এবং তার সেই গতিময়তার মধ্যেই বিক্রয়সাফল্য অর্জন করতে হয়, ফলে সঠিক সময় নির্দ্ধারণের ক্ষমতা অর্জন তাকে করতে হবে, না হলে খুবই মুস্কিল।

চেহারা

হিন্দিতে একটা প্রবাদ আছে "পহেলা দর্শনধারী-পিছে গুন বিচারী" —একজন বিক্রয় প্রতিনিধির ক্ষেত্রে উপস্থিতির প্রথম প্রভাব হবে চেহারা থেকে। সুন্দর দেখতে হ'লেই যে সেটা হবে তা নয়। উপযুক্ত হওয়া দরকার। ব্যক্তিত্ব থাকাটা একান্তই জরুরী।

আচরণ

কথাটার যদিও আক্ষরিক অর্থ ব্যবহার। অর্থাৎ মানুষজনের সঙ্গে সে কিরকম ব্যবহার করে চলে। অত্যন্ত সন্তর্পণে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে বিক্রয় প্রতিনিধিকে সতর্ক থাকতে হয়ে তার আচরণ এবং ব্যবহার সম্পর্কে।

মেজাজ

যদিও ব্যবহারের মধ্যেই এটা রয়েছে। তবুও মেজাজের ক্ষেত্রটি আলাদা করে ভাবতে পারলে ভাল হয়। পছন্দ অপছন্দ এবং স্বভাবের প্রতিফলন তার কথা বলায়, চলায় পড়বেই, ফলে তার এগুলির সব কিছুই নিয়ন্ত্রিত হওয়া জরুরী।

চটপটে কেতাদুরস্ত থাকা

চেহারা এবং জামাকাপড়ে চটক যতটা তার চাইতে বেশী কথাবার্তায় এবং ব্যবহারে চটপটে হওয়াটাই বেশী জরুরী। কথায় বলে "কথা বললেই বোঝা কার কতখানি এলেম"। শুধুমাত্র কেতাদুরস্ত পোষাকে আবৃত কেউ কথা বললেই তার ব্যক্তিত্বের দুর্বলতা প্রকাশ হয়ে পড়ে। আবার হয়ত তেমন কেতাদুরস্ত নয় এমন পোষাকে সজ্জিত অবহেলিত কেউ কথা বলতে সুরু করলেই হয়ত বিদ্যুৎ শিহরনের মত চমক সৃষ্টি হয়ে যায়। এরকম প্রভাবসৃষ্টির জন্য গলার স্বর এবং দৃষ্টির নিয়ন্ত্রন ও উপস্থিত বুদ্ধি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

বিনম্র

একজন বিক্রয় প্রতিনিধির পক্ষে সবচাইতে জরুরী এবং বিশিষ্ট গুন সম্ভবতঃ বিনয়। যত বেশীই সে অভিজ্ঞ হোক না কেন, যত বেশীই সে সফল প্রতিনিধি হোক না কেন, বিনয় নামক গুণটি বজায় না রাখতে পারলে সব সাফল্যই তার সমূলে বিনষ্ট হতে বাধ্য।

নম্রতা

কথাবার্তায় এবং ব্যবহারে ও স্বভাবে বিক্রয় প্রতিনিধির নম্রতা থাকা দরকার। তার ভাষা কখনই উগ্র হবে না, কর্কশ হবে না, ব্যবহার স্বভাবতই নম্র এবং মধুর হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ঔজ্জ্বল্য

উপস্থিতির সংগে সংগে একটা উজ্জ্বল দীপ্তির স্ফুরণ প্রমান করে যে বিক্রয় প্রতিনিধিটির বিশ্বাস রয়েছে, প্রেরণা রয়েছে, রয়েছে উদ্দীপনা। এই সব প্রক্ষেপনখুবই কার্যকরী।

চমৎকারিত্ব

বুদ্ধির ওপরে নির্ভর করছে এই গুনটি। কর্মধারার প্রথম থেকে শেষ অবধি সর্ববিধ বুদ্ধির পরিচয় ছাড়াও একজন সাধারণ বিক্রয় প্রতিনিধির সাফল্যের চাবিকাঠিটি হচ্ছে প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি বিষয়ে অবহিত হওয়া এবং সেবিষয়ে সতর্ক হওয়া।

সূক্ষ্মতা

একজন বিক্রয় প্রতিনিধি যখন ক্রেতার কাছে প্রস্তাবটি রাখবেন তখন সেই প্রস্তাবনার রূপটি হবে অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং সুচিন্তিত। মোটা মোটা কথায় সহসা উপস্থাপিত কোন প্রস্তাবেই ক্রেতা আগ্রহ প্রকাশ নাও করতে পারেব। তাই ভেবে চিন্তে করাই ভাল!

ভাষা

বাক্যবিন্যাস এবং কথাবার্তায় নির্বাচিত শব্দের ব্যবহারেই হওয়া উচিৎ। কথার বাঁধুনি না থাকলে বক্তব্যের গভীরতা নষ্ট হয়ে যায়।

অগ্রণীর ভূমিকা

বিক্রয় প্রতিনিধিকে ক্রেতার উপরে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে রাখতে হবে। তাৎক্ষনিক ফললাভ না হ'লেও যাতে ভবিষ্যতে ক্রেতাটি তার হাতছাড়া না হয়ে যায়।

নিরুদ্যম না হওয়া

ক্রেতা ক্রয়ের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করলেও নিরুৎসাহ না হ'য়ে পড়াটাই বিক্রয় প্রতিনিধির যথার্থ চরিত্র হওয়া উচিৎ।

সমতা

চরিত্রে, মেজাজে, ব্যবহারে সর্বত্র বিক্রয় প্রতিনিধির সারাক্ষণ সমতা রক্ষা করে চলা উচিৎ।

উদ্ভাবনাশক্তি

যখন সব রকমেরই প্রয়োজনীয় গুণ একজন বিক্রয় প্রতিনিধি অর্জন করতে পারছেন তখন তার কিঞ্চিৎ উদ্ভাবনীশক্তিও থাকা দরকার। রস গ্রহণের ক্ষমতার সংগে রস পরিবেশনের ক্ষমতাও কিছুটা থাকা দরকার, নাহলে ক্রেতাদের কাছে সে অত্যন্ত একঘেয়ে চরিত্রের হ'য়ে উঠবে।

সততা

যদি ভবিষ্যতে বড় কিছু হওয়ার যথার্থই ইচ্ছে থেকে থাকে তাহলে বিক্রয় প্রতিনিধিটিকে তার ক্রেতাদের কাছে সততার পরিচয় রাখতেই হবে। ক্রেতাটি যদিও ভালভাবেই জানেন যে বিক্রয়ের ফলশ্রুতি হিসেবে প্রত্যক্ষই কিংবা পরোক্ষই যে ভাবেই হোক না কেন প্রতিনিধিটি লাভবান হবেনই। তবুও তিনি আশা করেন একটু অন্য ধরনের ব্যবহার, ব্যবসা সূত্র ছাড়াও অন্য ধরনের কিছু। যেন বা একটি বিশেষ বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে এই রকমটা।

কথার মূল্য

সততারই একটা অংশ মাত্র। ক্রেতাদের কাছে এমন পরিচয় গড়ে উঠবে যে,—"না এই বিক্রয় প্রতিনিধিটি তার কথার খেলাপ করে না।

ব্যক্তিত্ব

সব মিলিয়ে একটা বিশেষ ব্যক্তিত্ব তৈরী না হ'য়ে উঠলে যথার্থ বিক্রয় প্রতিনিধি হওয়ার ব্যাপারে অনেকটাই ঘাটতি থাকে।

চরিত্র

বলা বাহুল্য যে ব্যক্তিগত চরিত্রের খুঁটিনাটি কাজের ব্যাপারে আসার কোন কারণ নেই। তথাপি সত্যিকারের সৎ চরিত্রের প্রতিফলন প্রতিকাজের মতন বিক্রয়ের ক্ষেত্রেও সমানভাবেই গড়ে থাকে।

সেবাপরায়ণতা

কেবলমাত্র ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য কাজ করা ছাড়াও সত্যিকারের বিক্রয়প্রতিনিধি তার পরিচিত মহলে সেবাপরায়ণ হিসেবে পরিচিত হয়ে পড়বেন। যাকে যতটুকু সম্ভব ততটুকুই সে সাহায্য করতে পরাঙ্মুখ হবে না।

বিক্রয়প্রতিনিধি যে তার দায়িত্ব থাকে ততক্ষণ যতক্ষণ না সুষ্ঠুভাবে মালপত্র ক্রেতার ঘরে ডেলিভারী হয়। যে সময়ে পাঠানোর কথা সেই সময়ের মধ্যেই যাতে মালপত্র যায় তার ব্যবস্থা করা। যদি ন্যূন-মূল্যমানের মালপত্র অথবা দেরী করে ডেলিভারি হয় তাহলে কিন্তু ক্রেতার সঙ্গে তার যে চুক্তি সেটা ভেঙে যায়। এবং ক্রেতার সঙ্গে তার সম্পর্ক ব্যাহত হয়। কিছু কিছু বিক্রয় প্রতিনিধির ধারণা হতে দেখা গেছে যে অর্ডার হাতে পাওয়ামাত্রই তার কাজ ফুরোল, অফিসের অন্য ডিপার্টমেন্টগুলোর এবার দায়িত্ব ঠিক মাল ঠিক জায়গায় পৌঁছে দেয়া। সেটা ঠিক নয়। বিক্রয় প্রতিনিধির অভ্যাস হওয়া উচিৎ অর্ডার নেয়া থেকে ডেলিভারী হওয়া পর্যন্ত এবং তার সঙ্গে লক্ষ্য রাখা যে ক্রেতার যেন এ সম্পর্কিত কোন অসুবিধার সৃষ্টি না হয়। বিক্রয় প্রতিনিধির কাজ তাই আধখ্যাচরা হওয়ার উপায় নেই। প্রথম থেকে শেষ অবধি তার দায়িত্ব। বিক্রয় প্রতিনিধির জানা উচিৎ যে তার সঙ্গে সম্পর্ক একটা তৈরী হয়েছে বলেই অর্ডারটি তিনি পেয়েছেন। ফলে কোনও অসুবিধা হলে সেই সম্পর্কে চিড় ধরতে পারে। এবং ক্রেতা অন্য কাউকে দায়ী করার আগে তাকেই দায়ী করবে সবচেয়ে বেশী। সফল বিক্রয় প্রতিনিধি তাই একটি সংস্থায় সম্পূর্ণ প্রতিনিধি—ফলে কাজের ক্ষেত্রেও সেইরকমই হওয়া উচিৎ। যদি তার সংস্থা এইসব ব্যাপারে তার মতের সঙ্গে বিরোধ উপস্থিত করে তাহলে তার উচিৎ দৃঢ়ভাবে সংস্থাটিকে পরিস্থিতিটি বোঝানো এবং বাজারে তার নিজস্ব গুডউইলটুকু যাতে নষ্ট না হয় তার ব্যবস্থা করা। যার সঙ্গে সংস্থাটির গুডউইলও জড়িয়ে রয়েছে।

বিক্রয় বিভাগ

বিক্রয় পদ্ধতি নির্ভর করছে উৎপাদন সামগ্রীর ওপরে। কারখানায় কি উৎপাদন হচ্ছে। কোথায় বিক্রয়ের ব্যবস্থা। ইত্যাদি বিষয়গুলি একান্ত জরুরী।

সাধারণত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে, যেখানে ভারত অন্যতম সেখানে বাজার সাধারণতঃ বিক্রেতার নিয়ন্ত্রণে থাকে। বিশেষতঃ জনসংখ্যা যেখানে ক্রমবর্দ্ধমান, শিল্প উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে যেখানে বিলাসবহুল জীবনযাপনের প্রয়াস বেড়ে চলেছে। পুরনো অভ্যাসগুলির বদলে নতুন নতুন তৈজসপত্র ব্যবহারের প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, সেক্ষেত্রে উৎপাদক শ্রেণীর সংস্থা তুলনামূলক-ভাবে সাধারণতঃ কমই থেকে যায়। কিন্তু যেহেতু উৎপন্ন সামগ্রীর ক্রেতা সাধারণ মানুষজন তাই বিক্রেতার যতই বাজারের ওপর নিয়ন্ত্রণ থাক না কেন ক্রেতা-বিভাগের একটা ভয় সব সময়েই থেকে যায় প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র ছাড়াও। সেই কারণেই বিক্রয় ক্ষেত্রেও সবচেয়ে জরুরী বিভাগটি হল 'মার্কেটিং' যার মধ্যে তথ্য এবং সমীক্ষার বিভাগটি ক্রিয়াশীল। ক্রিয়াশীল বিজ্ঞাপনের দিকটিও। অতঃপর সরাসরি বিক্রয়বিভাগ—এই বিভাগটিতে যারা কাজ করবেন তাদের সাধারণ ক্রেতার সঙ্গে সরাসরি যোগসূত্র স্থাপিত হচ্ছে। তারা কোটেশন দেবেন, অর্ডার বুক করবেন, ঠিকসময় ডেলিভারী দেবেন এবং সবশেষে বিল করবেন এবং টাকা আদায় করবেন।

মার্কেটিং বিভাগের প্রথম এবং প্রধান বৈশিষ্ট্য হল সমীক্ষা এবং তথ্য যোগাড় করা। সংস্থাটির অবস্থা পরিপ্রেক্ষিতে মার্কেটিং বিভাগ সমীক্ষা করবেন এবং বিক্রয়বিভাগকে জানাবেন।

১। কাঁচা মাল

ক) কোথায় পাওয়া যায়

খ) দাম কোথায় কেমন

গ) কারা এই কাঁচামাল সরবরাহ করে থাকেন।

ঘ) কাঁচামালের মূল্যমান

ঙ) প্রতিযোগী সংস্থা কি কাঁচামাল ব্যবহার করেন

চ) টেকনিক্যালি মূল্যমান বদলের প্রয়াস

২। তৈরী জিনিষ

ক) কোথায় বিক্রয়ের সুবিধা

খ) প্রতিযোগীরা কোথায় বিক্রী করেন

গ) তৈরী জিনিষের মূল্যমান

ঘ) সুযোগ সুবিধা

ঙ) মূল্য

৩। **নতুন প্রোডাক্ট**

ক) নতুন কি জিনিষ তৈরী করা যেতে পারে
খ) বিক্রীর অবস্থা কেমন
গ) সাধারণভাবে অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় টেকনিক্যাল ডিপার্টমেণ্টের সহযোগিতা
ঘ) পুরনো প্রোডাক্টগুলির কাটতি সম্পর্কিত ব্যবস্থা

৪) **বিজ্ঞাপন**

১। খবরের কাগজ
২। ব্রোকার
৩। প্যাকেজিং
৪। ভিস্যুয়াল পাব্লিসিটি
৫। হাউস জার্নাল
৬। প্রেস কনফারেন্স, ইত্যাদি

৫) বিভাগ
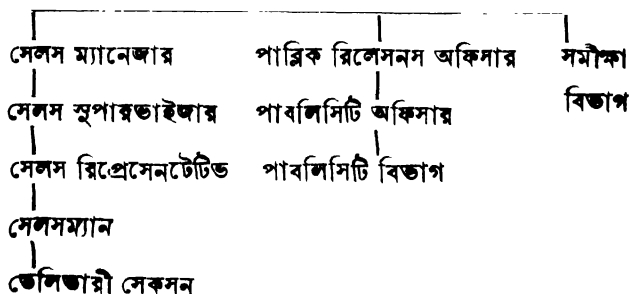
জাতীয় জীবনে একজন বিক্রয় প্রতিনিধির গুরুত্ব অনেক। একটি সংস্থার জীবনেও। প্রথমেই কোনও রকমের অসুবিধা সৃষ্টি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সাধারণত সেলসম্যানদেরই দায়ী করা হয়ে থাকে—বলা হয়ে থাকে—যে সেলসম্যানেরা খুবই ধুরন্ধর হয় এবং সাধারণতঃ অর্ডার পাওয়ার জন্য যা খুশী করতে পারে।

যেমন সর্বত্র বিক্রয় ক্ষেত্রেও কিছু কিছু যে উপরোক্ত ধরনের লোক নেই তা বলি না। তবে তারা খুব একটা বেশীদিন টিকে থাকতে পারে না বলে সংস্থার ক্ষতি তেমন করে উঠতে পারে না। এদের মধ্যে সকলেই যে ঠিকঠিক বিক্রয় প্রতিনিধি তা নয়। অনেকেই এদের মধ্যে হঠাৎ গজিয়ে ওঠা দালালের ভূমিকা নিয়ে আছে যারা হঠাৎ মুনাফার জন্য অনেক কিছুই করে থাকে।

বেশীর ভাগ বিক্রয় প্রতিনিধি যারা সরাসরি ফিল্ড-এগিয়ে ক্রেতার কাছে বিক্রী করেন অথবা এজেন্ট কিংবা ডিস্ট্রিবিউটারের মাধ্যমে বিক্রী করেন তারা সাধারণতঃ একটি ভেবেচিন্তে তৈরী করা বিক্রয়দলের সঙ্গে যুক্ত। অভিজ্ঞ সেলস ম্যানেজারের কাছে প্রত্যক্ষভাবে কাজে নিযুক্ত যিনি কোন বিক্রয় প্রতিনিধিকে ক্ষতিকর কিছু করতে দেখলেই থামিয়ে দিয়ে থাকেন। বাণিজ্য এবং শিল্পগত ক্ষেত্রে একজন বিক্রয় প্রতিনিধির দায়িত্বও কম নয়। মনে রাখা দরকার যে মানবমন সদা পরিবর্তনশীল। ফলে বিক্রয় প্রতিনিধিকে সবসময়েই নতুন নতুন হাজরো—রকমের মানুষের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যোগাযোগ করতেই হয় প্রত্যেক দিন। স্বাভাবিক ক্রেতা-বিরূপতাকে জয় করতে হয়। এজেন্ট ডিস্ট্রিবিউটরদের কাছে বারবার গিয়ে তার

জিনিষ রাখার অনুরোধ করতে হয়। যার ফলে একজন ক্রেতা হিসেবে আপনার সামনে অনেক জিনিষ দেখার এবং অনেক যাচাই করার সুবিধা তৈরী হয়ে গেছে। শিল্পক্ষেত্রেও আবার নতুন নতুন মেসিনপত্রের চাহিদা তৈরী করার কাজ ওই বিক্রয়প্রতিনিধিরাই করে চলেছেন, যার ফলে প্রথমে বিরক্তও হলে পরে হয়ত দেখা যাবে যে ওইসব সংস্থা বিক্রয় প্রতিনিধির জন্যই নতুন কোন যন্ত্র ক্রয় করে বেশী উৎপাদন করতে পারছে কম সময়ে, ফলে মুনাফার অঙ্ক বেড়ে গেল।

বিক্রয়প্রতিনিধি

সেই কোন মান্ধাতার আমল থেকে অনেকেই বলে থাকেন যে সার্থক বিক্রয় প্রতিনিধি জন্মগত বৈশিষ্টের অধিকারী। অস্বীকার করার সত্যিই উপায় নেই যে সত্যিই সত্যিই দু একজন বিক্রয়-প্রতিনিধি থাকেনই যিনি প্রায় যে কোন জিনিষই বেচে দিতে পারেন যে কোন সময়ে যে কোন জায়গায়। সার্থক বিক্রয়প্রতিনিধির কাজটি হচ্ছে তার প্রস্তাব ক্রেতাকে দিয়ে গ্রহণ করানো। ক্রেতাকে ঠিক মতন বোঝানো এবং প্রয়োজনীয়তার যৌক্তিকতা মনে ধরিয়ে দেয়ার কাজটিই বিক্রয় প্রতিনিধির।

যাদের "বর্ন-সেলসম্যান"—বলা হয়ে থাকে তারা ওই কাজটি সুচারুভাবে অতি দ্রুত করে ফেলতে পারেন। ক্রেতার মানসিকতাকে সম্পুর্ণ নিজের দিকে ঘুরিয়ে দেবার ক্ষমতা তাদের রয়েছে। ফলে তাদের ক্ষেত্রে বিক্রী করাটা খুব সহজেই হয়ে যায়। তাদের মিষ্টি ব্যবহার, গভীর স্বভাবিক জ্ঞান, কথা বলার ভঙ্গী সব মিলিয়ে ক্রেতা

প্রস্তাবটি গ্রহণ করতে দ্বিধা করতে পারেনই না। তাছাড়া এইসব বিক্রয়প্রতিনিধিদের অগাধ আত্মবিশ্বাস থাকে যে কোন ধরনের কাজে সফলতা সম্পর্কে যে আত্মবিশ্বাস স্বাভাবিক ভাবেই ক্রেতার মানসিকতায় সঞ্চারিত হয়ে যায়।

তবুও এইসব বিক্রয়প্রতিনিধিরা কিন্তু বস্তুত বিক্রয় নিয়মের বা বিক্রয় পদ্ধতির বৈজ্ঞানিক রূপরেখার বাইরে নন। তারাও ওই বিক্রয় পদ্ধতির কাঠামোর মধ্যেই তাদের কাজ করে থাকেন, হয়ত বা একটু আলাদা রকমে। হয়ত পরিস্থিতি অনুসারে তিনি নিজেই কিছু কিছু পদ্ধতির সৃষ্টি করে নেন এবং ভাবেন যে তারা যে পদ্ধতিতে কাজ করে থাকেন সেটাই সবচেয়ে ভালো। এইসব বিক্রয় প্রতিনিধিরা কোন অর্ডার হারাতে রাজী থাকেন না কারণ সেটা তাদের সম্মানের ব্যাপার। ফলে অর্ডার পাওয়ার জন্য দাম কমানো থেকে আরম্ভ করে আরো অনেক কিছু করতে রাজী থাকেন। ফলে সংস্থার নিয়মকানুন মেনে চলা তাদের পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার এবং যতই সফল হোন না কেন সমস্ত বিক্রয় বিভাগের নিয়মশৃংলায় গোলমাল ঘটে যায় তাদের উপস্থিতিতে।

বিক্রয়ের সাফল্যের জন্য কি কি গুণ থাকা দরকার

একটি সওদাগরী সংস্থার পক্ষে বর্ণ—সেলসম্যানের চাইতে সাধারণ বিক্রয়প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি দল গঠন করা বেশী প্রয়োজনীয়। এখন দেখা যাক এইসব বিক্রয় প্রতিনিধিদের কি কি গুন থাকা বিশেষ জরুরী।

১। স্পষ্ট ভাষায় অনর্গল কথা বলার অভ্যাস

২। লোকজনদের সঙ্গে দেখা করার আগ্রহ

৩। সপ্রতিভ ব্যবহার

৪। কাজ সম্পর্কে দৃঢ়সংকল্প

১। সফলতা/স্পষ্ট গলায় অনর্গল কথা বলার অভ্যাস

একজন বিক্রয় প্রতিনিধির কাছে সে যে জিনিষ বিক্রী করতে যাচ্ছে সে সম্পর্কে যাবতীয় গুনাগুন প্রথমে কথা বলার মাধ্যমে ছাড়া আর কোন পথ না থাকার ফলে কথা বলার ধরন ধারণ সম্বন্ধে প্রখর সচেতন তাঁকে হতেই হবে। স্পষ্ট ভাবে কথা বলার অভ্যাস না থাকলে, ইতস্তত করে কথা বলার অভ্যাস থাকলে শ্রোতা অর্থাৎ তার ক্রেতা ব্যস্ততার মধ্যে আগ্রহ প্রকাশ নাও করতে পারে। ফলে এই কথা বলার ধরন একটা অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ বিষয়। বিক্রয় প্রতিনিধির কথাবার্তা এমন হওয়া চাই যাতে বিক্রয়সামগ্রিটি সম্পর্কে সে প্রায় সমস্ত তথ্যই প্রাঞ্জল ভাবে ক্রেতাকে বোঝাতে সক্ষম হয়।

অথচ সমীক্ষায় দেখা গেছে যে বেশীর ভাগ বিক্রয় প্রতিনিধির এই বিষয়ে দুর্বলতা রয়েছে। অথচ তার কাছে কথা বলার আর্ট

নামক অস্ত্রটি সবচেয়ে মারাত্মক। আবছা ভাসা ভাসা বাক্যবিন্যাসে ইতস্তত করে কথা বলতে অভ্যাস তারা ত্যাগ করতে পারেন না। যখন উচিৎ স্পষ্টভাবে ঠিক যেটুকু দরকার সেটুকু বলা। যেমন ধরুন একটি রেডিমেট সার্ট যে বিক্রী করতে আসছে সে হয়ত বলার সময় ক্রেতাকে জানান—জিনিষটি খুবই সুন্দর—যে কথাটি বিশেষণ হিসেবে হয়ত আরও পাঁচজন বিক্রয় প্রতিনিধি এই ক্রেতার কাছে পাঁচরকমের জিনিষ বিক্রী করতে এসে ব্যবহার করল। হয়ত তার একজন চকলেট বিক্রীকরেছে, অন্যজন ডুপ্লিকেটিং মেশিন। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিটি এক্ষেত্রে দাবী করবে যে পাঁচজনই তাদের পাঁচটি ভিন্ন ধরনের জিনিষ সম্পর্কে পাঁচটি ভিন্নতর বিশেষণ প্রয়োগ করুক পাঁচটি ভিন্ন বাক্যবিন্যাসে। যেমন যে রেডিমেট সার্ট বিক্রী করতে আসছে সে হয়ত বলল—"মহাশয়, সার্টের কাপড়টায় হাত দিয়ে দেখুন। কেমন মসৃণ-রঙ দেখেছেন আর ছাঁটকাট—সবই লেটেস্ট মডেলের, এবং চকলেট বিক্রয়কারী হয়ত বলতে পারে—আমাদের বিজ্ঞাপনে যে কথাটি আমরা ব্যবহার করেছি সেটি খুবই সত্যি —মুখে দিয়ে নিজেই একবার দেখুন না চকলেটের রেশ কতক্ষণ থেকে যায়"—ইত্যাদি—ফলে প্রত্যেকটি বিক্রয় প্রতিনিধিকেই চোখ কান খোলা রেখে লক্ষ্য রাখতে হবে নতুন কোন বিশেষণ তার বিক্রয়সামগ্রী সম্পর্কে ক্রেতার ঔৎসুক্য সৃষ্টি করতে পারবে। ফলে কথা বলার আর্ট, বাক্যবিন্যাসের ভিন্নতা শুধুমাত্র লেখকদেরই যে প্রয়োজন তা নয় বিক্রয়কারীর কাছেও একান্ত প্রয়োজনীয়।

২। লোকজনদের সঙ্গে দেখা করার আগ্রহ

একটু কুনো স্বভাবের বা নির্জনপ্রিয় লোকদের বিক্রয়বিষয়ে সফল হওয়া একটু কঠিন। আসলে আগ্রহ যার যেখানে কাজের ক্ষেত্রটিও সেরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয়। একজন হয়ত সন্ধ্যাবেলায় নিজের ঘরে একাকী বসে বই পড়তে বা গল্প করতে ভালবাসে। লোকজনদের সঙ্গে কথা বলায় তার আগ্রহ কম। তার পক্ষে বিক্রয়বিষয়ে প্রথম এবং প্রধান যন্ত্র মানুষজনের সঙ্গে একটা ক্রমাগত সম্পর্ক তৈরীর অবস্থা তৈরী করা একটু কঠিন। কারন তার সব সময়ই ইচ্ছে থাকবে কখন তার একাকী স্থানটিতে সে ফিরে যাবে। এমন কি অফিসের সময়টির মধ্যে যদি কোন সম্ভবনাময় ক্রেতা দেখা করার সময় না পান তাহলে সন্ধ্যাবেলায় দেখা করার আগ্রহ না থাকলে কাজটি হবেই না। আবার অন্যেরা আছেন যারা লোকজন বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে বসে আড্ডা মারতে ভালবাসেন। সেইসব সামাজিক মেলামেশা এবং অনেকটা হালকা মেজাজের মধ্যেই তিনি তার প্রয়োজনীয় কাজের ক্ষেত্রেও বিস্তৃততর করতে সক্ষম হবেন।

৩। সপ্রতিভ ব্যবহার

বিনয়ের শত্রু নেই, এই প্রাচীন প্রবাদটির তুলনা হয় না। বিনয়নম্রতা দৃঢ়তা ত ঈর্ষার বস্তু। একজন বিক্রয়কারী বিনীত ভাবে যখন ক্রেতার সম্মুখে নিজেকে উপস্থাপিত করবেন তখনই সেই গুরুত্বপুর্ণ মুহূর্তটি—যখন এক মুহূর্তের মধ্যে ক্রেতা বিক্রয়কারী সম্পর্কে একটি ধারনা তৈরী করে নেবে। ফলে একজন বিক্রয় প্রতিনিধির

মানসিক অবস্থা যাই থাক না কেন তাকে দেখে সকলের মনে হওয়া উচিৎ টগবগ করে ফুটছে সে কথা বলার জন্য, ব্যবহারিক সম্পর্ক স্থাপন করার জন্য। বস্তুত বিক্রী করার কাজটি মানুষজন নির্ভর। তাই বিক্রয়কারীকেও মানুষজন সম্পর্কে ভীত থাকলে চলবে না। বরং উলটোটাই হওয়া দরকার। একবার একজনের সঙ্গে দেখা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিনয় নম্র, দৃঢ় অথচ সহজ অন্তরঙ্গ ভাব দিয়ে সে ব্যক্তিত্বের ছাপ রেখে দেবে যা চুম্বকের মতন ধরে রাখবে তার পারিপার্শ্বিককে। ফলে বিক্রী করার কঠিনতম কাজের ক্ষেত্রটাই হয়ে যাবে তার কাছে সহজ স্বাভাবিক।

৪। সফলতা সম্পর্কে দৃঢ়সংকল্প

বিক্রয়কারীর কাজটি কিন্তু অন্যান্য কর্মীদের চাইতে ভিন্ন। অফিসে যে লোকটি কেরানীর কাজ করেন, ফ্যাক্টরীতে যে শ্রমিকটি মেশিন চালান, স্কুলে যে শিক্ষকটি পড়ান-তাদের সকলের কাজ বিক্রয়কারীর কাজের থেকে ভিন্ন। এইসব কর্মীদের একটা বিশেষ দৈনিক দায়িত্ব থাকে, ফাঁকি না দিয়ে ঠিকমতন কাজ করলে সেই দায়িত্বটি সম্পূর্ণ করা যায়। তার মধ্যে কেউ একটু বেশী কুশলী, কেউ বা একটু কম। সেখানে তাদের কাজে কোন ব্যাক্তির মর্জির ওপরে কাজের সাফল্যের পরিমান নির্ভরশীল নয়। অথচ বিক্রয়কারী যে সে দৈনিক যে দায়িত্ব পালন করবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে কিন্তু অন্য লোক, সে নিজে নয়। তার ফলে কাজটি কঠিন হয়ে পড়ে। যে দ্রব্যটি বিক্রীকরার জন্য বিক্রয়কারীর আসা সেই দ্রব্যটি সম্পর্কে তার নিজের আস্থা পুরোপুরি রাখতে পারাই ভাল, নিদেন

পক্ষে বাইরের ব্যবহারে। কারণ সে নিজে যদি আস্থার ভাবটি তার ব্যবহারে স্পষ্ট ফুটিয়ে তুলতে না পারে তাহলে নিশ্চয়ই ক্রেতার পক্ষে সেই ভাব অনুভব করার আশা করাটা বাতুলতা মাত্র। অথচ বিক্রয়কারী নিজে যদি সর্বত্র আস্থাসূচক ব্যবহার করতে থাকেন, তাহলে সেই ভাবটি ক্রেতার মনেও গভীর ছাপ রাখতে বাধ্য হবে। এমন অবস্থা দেখা গেছে যে বিক্রয়কারী তার জানা সমস্ত রকমের পদ্ধতি ব্যবহার করেও, দৈনিক বিশজনের সঙ্গে দেখা করেও ২।৩ টির বেশী অর্ডার বুক করতে পারছেন না। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন। আবার অন্যদিকে দেখা গেছে মাসে একটি অর্ডার বুক করতে পারলেই বিক্রয়ের লক্ষসীমায় পৌছে যাওয়া যায়। ফলে একমাস ধরে এ ক্ষেত্রে বিক্রয়প্রতিনিধি ক্রেতার সঙ্গে কথাবার্তা চালাচ্ছে, হয়ত একজন নয় দুজন ক্রেতার সঙ্গে। মাসের শেষে দেখা গেল বা একজন অর্ডারটি অন্য সংস্থাকে দিতে আগ্রহী এবং অন্যজন সিদ্ধান্ত পিছিয়ে দিচ্ছে।

এইরকম সময়কেই বিক্রীব্যবস্থার কঠিনতম অবস্থা বলে ধরা হয়। অথচ বিক্রয়প্রতিনিধি এই সময়ে আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেললে খুবই মুস্কিল। এরকম সময়েই তাকে দৃঢ়সংকল্প হয়ে মুখের হাসিটি বজায় রাখতে হবে। তাকে মানসিক ভাবে দুটো ব্যাপারে প্রস্তুত হতে হবে। প্রথম—এটা ত জানা কথাই যে সব চেষ্টা সফল হয় না। অবশ্য তার মানে এই নয় যে ব্যর্থতাটি অবশ্যম্ভাবী। তার কারণ অন্য কোন সেলসম্যান এইরকম পরিস্থিতিতে নিশ্চয়ই অর্ডারটা বাগিয়ে নিতে পারত, এটা ঘটনা যা তাকে মেনে নিতেই হবে। কিন্তু আমাদের এই সাম্প্রতিককালে ব্যর্থ সেলসম্যানটি ব্যর্থতার জন্য মন খারাপ করবে না, বরং মনে মনে সে আশ্বস্ত করবে নিজেকে যে এক একটি ব্যর্থতা তাকে কোন সফলতার দিকেই এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। দ্বিতীয়—আত্মসমীক্ষা এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ। আমাদের

সেলসম্যানটিকে খুঁজে দেখতে হবে—ত্রুটিটি কোথায় হয়েছিল। সারাদিন কাজের শেষে সন্ধ্যাবেলায় একাকী ভাবতে বসার সময় তাকে করে নিতেই হবে যখন সে চুলচেরা বিচার করে ধরে ফেলতে পারবে তার কথা বলা, উপস্থানাতে কিছু বেশী কথা বলে ফেলেছিল, না কি কোন জরুরী তথ্য বলতে ভুল হয়েছিল যার ফলে ক্রেতা বিরূপ হয়েছে। এইরকম ভাবেই সেলসম্যানটি নিজে উন্নতি করতে পারবে, অন্যথা নয়। এবং সেটি করলে ক্রমশঃ দেখা যাবে সে তুখোর সেলসম্যান হয়ে বেরিয়ে আসছে। বানিজ্যিক সংস্থা-গুলিতে বেশীর ভাগ জায়গাতেই সাপ্তাহিক কিংবা মাসিক প্রতিবেদন খুঁটিয়ে দেখার ব্যবস্থা রয়েছে। এই ব্যবস্থায় সেলসম্যান হিসেব রাখতে পারবে যে দেখা করার পরিপ্রেক্ষিতে অর্ডার লাভ বাড়ছে না কমছে। এই বাড়া—কমার ভিত্তিতেই কিন্তু সে তার নিজের পারদর্শিতার মূল্যায়ন করতে পারবে। কমলে তাকে আরো পারদর্শি হতে হবে। আবার বাড়লেও রেহাই নেই, একজন সেলসম্যানের চূড়ান্ত পারদর্শি হয়েছি ভেবে আত্মসন্তুষ্টির কোন অবকাশ নেই। সে আরো বেশী নিজেকে তৈরী করবে, যাতে উত্তরোত্তর তার কাজের সাফল্য বেড়েই চলে ক্রমাগত।

কেন লোকে জিনিষ কেনে—কেনার পটভূমি বিক্রয়ের

জিনিষপত্রের রূপ দর্শন করেই ত আর ক্রেতা জিনিষপত্র কেনেন না। ক্রয় করার কারণটি কিন্তু কোন বিশেষ সমস্যার সমাধান প্রয়াস। যেমন ধরুন একজন একটি রেফ্রিজারেটর কিনেছে। এখন সেখানে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা থেকে আরম্ভ করে ফ্রিজটি রক্ষনাবেক্ষন করা সবটাই জরুরী। অথচ দুএক বছরের মধ্যেই সেটি ছেড়ে দিয়ে নতুন মডেলের জিনিষ কেনার আগ্রহ প্রায় সকলের থাকে। কিন্তু সেক্ষেত্রে একজন সেলসম্যানের সামনে ওই ক্রেতাকে বোঝানোর মতন কথা খুব কমই থাকে। কিন্তু বিক্রয়কারী যদি ক্রেতাকে হিসেব করে নতুন ফ্রিজটি কিনলে আর্থিক সাশ্রয় কতটা হবে তা বোঝাতে পারেন তাহলে কিন্তু ক্রেতা নতুন ফ্রিজটি কিনতে পারেন। সেক্ষেত্রে এই ক্রয় সংঘটিত হচ্ছে আর্থিক সাশ্রয়ের পরিপ্রেক্ষিতে মাত্র। অন্যান্য ক্রয় বিক্রয়ের পর্যালোচনাও একই রকমের উদ্দেশ্য উদ্ঘাটিত করবে। ফলে প্রত্যেক সেলসম্যানেরই তার বিক্রয় সামগ্রী সম্পর্কে গুনাগুন বোঝানোর পিছনে লক্ষ্য থাকবে আর্থিক সাশ্রয়ের সুবিধাজনক দিকটি স্পষ্ট করা।

জিনিষ ক্রয়বিক্রয়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকেন দুজন। একজন ক্রেতা অন্যজন বিক্রেতা কিংবা তার বিক্রয় প্রতিনিধি। ক্রেতার পক্ষে জিনিষটা নজরে আসা থেকে গুনাগুণ বিচার, আর্থিক সুবিধা এবং সর্বশেষে ক্রয় পর্যন্ত একটি চলন্ত পথ। বিক্রেতার কাছে তার জিনিষ ক্রেতার নজরে আনা, আগ্রহ তৈরী করা থেকে আরম্ভ করে ক্রেতার ইচ্ছার উদ্রেক করা এবং সবশেষে বিক্রয় করা। যেহেতু এই দুটি চলন্ত পথ স্বাভাবিক কারণে একই উদ্দেশ্যে

নড়ছে চড়ছে সেইহেতু মূল মিলনের বিন্দুটি হল যোগাযোগ এবং যা এক কথায় কাজ হাসিলের জন্য প্রয়োজনীয় চাবিকাঠি। ক্রেতা এবং এবং বিক্রেতা দুজনেই সাবধান, দুজনেই উদ্‌গ্রীব অথচ পৌছতে হবে দুজনকেই একটি মিলনের বিন্দুতে। বলাবাহুল্য একরকম একটা পরিস্থিতিতে যতই "শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্ঠতি অগ্রে"র মতন বাস্তব কঠিন মনে হোক না কেন একটু খুঁড়লে নিশ্চয়ই "নীরস তরুবর পুরত ভাতি"র মতন পারস্পরিক আনন্দের খোরাক হতে পারে বৈকি।

বক্তব্য উপস্থাপনার উপায়

সুরুতেই কি ভাবে কথা বলবে একজন সেলসম্যান তার ক্রেতার সঙ্গে। আসলে এই ক্ষেত্রে খুব সাধারণ অথচ কৌতুহল উদ্রেক করে এমন কথা দিয়ে সুরু করাই ভালো। যেমন ধরুন একটি দোকানে ঢুকে সেমসম্যান হয়তবা এমন করে বলল— "—আরে মিঃ চ্যাটার্জ্জী, আপনি নিজে রয়েছেন দেখছি।—" অথবা— "—শক্তিবাবু, যাই বলুন এই ভ্যাপসা গরমে আপনার হালকা সবুজ কাউণ্টারটার কাছে এলেই ভালো লাগে—" ইত্যাদি।

ক্রেতার কাছে বিক্রয়সামগ্রী সম্পর্কে দীর্ঘ বক্তৃতা দেবার অভ্যাস বিক্রয়কারীকে ত্যাগ করতেই হবে। যেমন উপন্যাস পড়তে গেলে লম্বা বক্তব্য আপনার রসকষহীন মনে হবে তেমনই ক্রেতা অনেকক্ষণ ধরে আটকে থাকলে বিরক্ত বোধ করতেই পারেন। সুতরাং সেলসম্যান প্রথমেই দুচারটে কথাবার্তার মধ্যেই তার জিনিষ সম্পর্কে

এমন একটা কিছু উৎসাহব্যঞ্জক কথা শুনিয়ে দেবে যাতে ক্রেতা আগ্রহান্বিত হতে বাধ্য হয়।

এবং বিক্রেতার কথা সাদামাটা স্টেটমেন্ট অব ফ্যাক্টস না হয়ে রসালো করে তুলতে পারলেত কথাই নেই, যে পর্দার কাপড়টা বিক্রী করার জন্য নিয়ে এসেছে সেলসম্যান তার রং এবং হালকা মেজাজ এমন ভাবে সে ক্রেতার কাছে উপস্থাপিত করবে যাতে যেন মনে হয় যে বুঝি সামনেই ক্রেতার বাড়ির জানালা যেখানে ওই পর্দাটা টাঙানো হয়েছে এবং সেলসম্যান ক্রেতাকে দেখাচ্ছে, বলছে, "—দেখুন রংটা কত চমৎকার, তাই। না"—

তারপর ক্রেতার কোন সিদ্ধান্তে আসার মানেই হচ্ছে অর্থলগ্নীর একটা ব্যাপার। ফলে অনেকেই আছেন যারা সিদ্ধান্ত নিতে দেরী করেন, ইতস্তত করেন। কারণ তারা জানেন যে 'হ্যাঁ' বলার মানেই হচ্ছে ওই অর্থলগ্নীর পুরো ঝক্কি সামলাতে হবে। ফলে সহজে হ্যাঁ-বলতে চান না দৈনন্দিন রুটিন মাফিক কেনাবেচার সামগ্রী ছাড়া। সেলস-ম্যান যিনি তিনি ক্রেতার কথাবার্তা থেকেই এইসব নানান ধরনের মানসিক গতি প্রকৃতির খবরাখবর বুঝতে পারেন। ফলে এই ইতস্তত স্বভাবের ক্রেতাটির কাছে সেলসম্যান আলোচনার শেষ হওয়া মাত্রেই সিদ্ধান্তের জন্য অগ্রণীয় ভূমিকা পালন করবে। যেমন ধরুন এইভাবে—

"মিঃ মার্টিন—আমি আর আপনি দুজনেই ত দেখলাম স্প্রে-গানটির গুনাগুণ, বুঝতেই পারা যাচ্ছে আপনার ফ্যাক্টরিতে এই স্প্রে-গান ব্যবহার করলে মাসে আপনার সাশ্রয় হবে ৪৮০ ডলার। ফলে মাস চারেক কাজ করতে পারলেই মেসিনটার দাম আপনার উঠে আসবে। এখন প্রশ্ন হল হাতে চালানোটা নেবেন না ইলেকট্রিকে চালানোটা। আপনি যা বলেন। তবে আমি অবস্থা দেখে যা বুঝছি তাতে আপাতত হাতে চালানোটা নেয়াই ভালো, কারণ

আপনাকে অনেকটা দূরে-দূরে ইয়ার্ডের মধ্যে স্প্রে পেইন্টিং করতে হবে, ফলে ইলেকট্রিক লাইন টানার খরচ করার দরকারটাই বা কি —তাছাড়া শুনছিলাম আপনার ইণ্ডাস্ট্রিয়াল শেডে জায়গা করেছেন —তাহলে ত সবই খুলে আবার নতুন করে লাগাতে হবে— (একটু থেমে), "তাহলে হাতে চালানোটাই পাঠিয়ে দিই ছটা।"—

নিজেকে উপস্থাপন করার চমৎকারিত্ব

ক্রেতার দোকানে ঢোকার মুহূর্তটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একজন বিক্রেতার কাছে। প্রথমেই তার সমস্যা মালিককে খুঁজে নেয়া। দশ বারোজন কাউন্টার সেলসম্যানের মধ্যে মালিক কিংবা ম্যানেজারকে খুঁজে নিতে পারা এক মুহূর্তের মধ্যে, সেটাই সেলস-ম্যানের কৃতিত্ব। সে হয়ত কোন একজন কাউন্টার সেলসম্যানকে যাকে মালিক বলে মনে হওয়ার কারণ আছে—জিজ্ঞাসা করবে— "আপনিই ত মালিক—"। যদি ঠিক হয় তাহ'লে মালিক বেশ অবাক হবে। খুশী হবে ভেবে যে বিক্রেতাটি একনজরে তাকে মালিক বলে চিনতে ভুল করে নি, যদি ঠিক না হয় তাহলে কাউন্টার সেলসম্যানটির মনে মালিকের সঙ্গে সাদৃশ্য থাকার গর্বে পুলকিত বোধ করার কারণ ঘটবে এবং সে প্রকৃত মালিকের কাছে হাজির করবে বিক্রেতাটিকে। অতি দ্রুত ঘটে যাবে ঘটনাটি কিন্তু ব্যস্ততার মধ্যে এই মুহূর্তটি দোকানটিতে উপস্থিত সকলের কৌতুহল উদ্রেক করার মতন ব্যক্তিত্ব থাকা চাই বিক্রেতাটির।

দোকানে সারাক্ষণই ব্যস্ত রয়েছে সবাই। সাধারণতঃ ছোট দোকান বা এজেন্সি হাউস হলেত কথাই নেই। মালিক বা ম্যানেজারকে সবসময়েই চার পাঁচটি কাজ সামলে রেখে চলতে হচ্ছে। যখন তিনি ভাবছেন আজকে এটা করবেন না ওটা করবেন তখনই হঠাৎ বিক্রেতাটির অবির্ভাব। সে হয়ত আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে বলল—মিঃ ষ্টুয়ার্ট, আমার নাম রবার্ট ক্রিফোর্ড—আমি আসছি সানটাস্ কোম্পানি থেকে, যারা বিখ্যাত জ্যাম জেলী তৈরী করে—"

এবং সঙ্গে সঙ্গে হয়ত ক্রেতাটি উত্তর দেবেন—"দুঃখিত—আজ আমি এত ব্যস্ত আছি যে জ্যাম জেলী নিয়ে কথাই বলতে পারছি না। অন্য কোনদিন হ'তে পারে আজ কিছুতেই না—

ব্যাস হয়ে গেল।

এবার ক্রটিটা খোঁজা যাক। প্রথম কথা ক্রেতা সবসময় ব্যস্ত থাকবেন ধরেই নিতে হবে। দ্বিতীয় যেহেতু ক্রেতাটি সেলসম্যানটিকে ইতিপূর্বে কখনও দেখেনি তাই তার নাম শোনা না শোনা একার্থক। তৃতীয় যেহেতু এই দোকান সানটাস কোম্পানীর জ্যাম জেলী রাখে না সেইহেতু কোম্পানির নামটির ব্যাপারে সে উদাসীন। ফলে সেলসম্যানটিকে প্রথমেই ক্রেতার সঙ্গে একটা অদৃশ্য দেয়ালের আড়ালে দাঁড়াতে হল। সুবিধাজনক পরিস্থিতি এখানে ক্রেতার —বিক্রেতা বাধ্য হল আত্মরক্ষামূলক কথাবার্তা বলতে। এবং সেই দেয়াল সরিয়ে ক্রেতার মন জয় করে তারপর তার জিনিষ বিক্রী করা এখানে খুবই কঠিন। দেখা করাটা এখানে অর্থহীন হয়ে গেল। যে চার পাঁচটি জরুরী কাজ ক্রেতামহোদয় করবে কি করবে না ভাবছিল সেগুলো থেকে জ্যাম এবং জেলী ক্রয় করার বিষয় আমার মতে তেমন উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা বিক্রেতাটি ঘটাতে পারে নি। ক্রেতার এরকম ব্যবহার এক্ষেত্রে অবশ্যম্ভাবি।

প্রথমেই মনে রাখতে হবে যে বিক্রেতাটির ক্রেতার সময়ের ওপরে কোন অধিকার নেই। যেহেতু বিক্রেতাটি এসে উপস্থিত হয়েছে দোকানে শুধুমাত্র সেই কারণে ক্রেতার কোন মানসিক দায়িত্ব নেই বিক্রেতাটির সঙ্গে কথা বলার, নেহাৎ ভদ্রতাটুকু ছাড়া। তার কারণ সাধারণতঃ কাজের সময়ে যেই যেখানে থাক না কেন সকলেই ব্যস্ত থাকে। বিক্রেতাকে ওই ব্যস্ততার মধ্যে যে সময়টুকু দেয়া যায় তার পরিমাণ খুবই অল্প—তাছাড়া সকাল থেকে অনবরত বিক্রেতারা এসেই চলেছে একজনের পর একজন ফলে ক্রেতার অনেকটা সময় ব্যর্থ করতেই হচ্ছে। এইরকম পরিস্থিতিতে বুদ্ধিমান সেলসম্যান কখনই উপরোক্তভাবে হটে যেতে চাইবে না।

ক্রেতার কাছে বিক্রেতা যারা দেখা করছেন তাদের সাধারণতঃ তিন ভাগে ভাগ করা থাকে। একদল যাদের সঙ্গে দীর্ঘকাল ব্যবসা করতে করতে প্রায় বন্ধুত্বের সম্পর্ক তৈরী হয়ে গেছে। আর একদল যাদের মালের প্রচুর কাটতি, যারা কখনও—সখনও আসার ফলে তাদের চাহিদা ক্রেতার স্বার্থেই। তৃতীয় দল যারা হয়ত বা প্রথম এসে দেখা করছে, যাদের সম্পর্কে ক্রেতার একটু নিজস্ব কৌতূহল রয়েছে মাত্র যে সে কোন কোম্পানির লোক, কি জিনিষ বিক্রী করে—এই পর্যন্ত। তার ফলে যে সেলসম্যানকে নতুনভাবে কোন দোকান বা এজেন্সি হাউসে ঢুকতে হবে খুবই সাবধানে, মাপা পায়ে এগোতে হবেই। এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি তাকে করতেই হবে যাতে ক্রেতা তার কথা শুনতে চায়। প্রথমে নিজের সপ্রতিভ বিনয় এবং ব্যক্তিত্বের উপস্থাপনায়, দ্বিতীয়তঃ বিক্রেয় সামগ্রী সম্পর্কে চমৎকার কৌতূহল উদ্রেক করে। তা না হলে প্রথমেই যদি ক্রেতা তাকে কেটে বাদ দিতে চায়, তাহলে বুঝতে হবে নিজেকে উপস্থাপনার মধ্যে প্রথম কথা বলার ব্যাপারে নিশ্চয় কোন ত্রুটি ঘটে গেছে।

সফল উপস্থাপনার কয়েকটি চাবিকাঠি

প্রথমেই বলছিলাম যে একজন বিক্রেতা তার সময় অনুযায়ী ক্রেতার দোকানে ঢুকছেন। ক্রেতার সময় অনুযায়ী নয়। ক্রেতার দায়িত্ব এক্ষেত্রে দাবী করা যায় না। তাই একটিই রাস্তা যা ক্রেতার বন্ধ দরজা খুলে দিতে পারে তা হল আগ্রহ তৈরী করা—

যেমন ধরুন প্রথমে ঢুকেই বিক্রেতা যদি বলে—"রাস্তার ওপাশে যে সুপার মার্কেট কমপ্লেক্সটা রয়েছে সেখানকার খদ্দের ভাঙিয়ে আপনার দোকানে আনার একটা প্রস্তাব আমি রাখতে চাইছি আপনার যা কাছে। আপনার বিক্রী বাড়বে —শুনুন তাহলে আমার অভিনব প্রস্তাবটি'—

কিংবা—

"—মিঃ ষ্টুয়ার্ট না, ঠিক ধরেছি, আপনার সঙ্গে একটু কথা ছিল—আমাদের সানটাস কোম্পানী থেকে একটা ক্যামপেন করার প্রস্তাবে আপনার দোকানের নাম আমরা চাইছি—সারা দেশ জুড়ে আমাদের এই সেলস ক্যামপেনে দুটো জিনিষ আমরা তুলে ধরছি—আমাদের তৈরী জ্যাম জেলী – "

অথবা—

"—শুনুন আমি এসেছিলাম আপনাকে জানাতে যে আমাদের সেলস্ ইনসেনটিভ্ একটু বেড়েছে আপনার মতন রিটেল কাউণ্টার পুলের জন্য – আরও দু একটা সুযোগ সুবিধা ছাড়াও। ফলে স্বাভাবিক ভাবে এই জিনিষে অন্য মাল বিক্রী করে আপনি যা লাভ করেন তার চাইতে আমাদের জিনিষ বিক্রী করলে আপনার মূলধন লাগবে কম, লাভ হবে বেশী, আর মূল্যমান,—সে ব্যাপারে এই দেখুন – "

মনে রাখা দরকার যে উপরোক্ত দুতিন রকমের উদাহরণ ছাড়াও হাজারো রকমের কথা শুরু করার কৌশল একজন সেলসম্যানকে জেনে রাখতেই হবে। হয়তবা তাৎক্ষনিকভাবে বুদ্ধি খরচ করে বলতেও হতে পারে। কিন্তু যাই বলা হোক না কেন তার মূল (উপরোক্ত তিনটি ক্ষেত্রেই লক্ষণীয়)—লক্ষ্য থাকবে ক্রেতাকে বোঝানো যে তার লাভ সংক্রান্ত বিষয় সে কতটা সুবিধা পেতে পারছে। বেশী খদ্দের যদি সত্যিই আনা যায়। একটা বিক্রী করলে যদি অন্যগুলোর চাইতে বেশী লাভ হয় কিংবা দুদশটা স্টক করলে যদি গিফট পাওয়া যায় তাহলে মন্দ কি। তাই বিক্রয়-সামগ্রীর যা নিয়ে আজকে সেলসম্যানের আবির্ভাব সেগুলো অবশ্যই ক্রেতার অর্থনৈতিক সুবিধার দিকটাই তুলে ধরবে। এটাই হবে সেলসম্যানের বিক্রী করার সবচেয়ে বড় কৌশল।

সবচাইতে ভাল হয় যদি সেলসম্যানের প্রথম কথাটির সঙ্গে ক্রেতার মানসিকতা মিলে যায়। তাহলে সেলসম্যানের অধিক কাজ গোছানো হয়ে যায়। কারণ সঙ্গে সঙ্গে সে ক্রেতাকে তার সঙ্গেই পেয়ে গেল। হয়তবা সেলসম্যানটি প্রথম ঢুকেই বলল—

—"মিঃ ষ্টুয়ার্ট আপনার মতন আর কে জানে যে ব্যবসা বাড়ানোর মাত্র দুটো রাস্তা খোলা আছে, একটা হচ্ছে বেশী খদ্দের টানা, আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে ক্রেতাদের কাছে বেশী বিক্রী করা। আমি যে প্রস্তাব এনেছি তাতে এই দুটোই সম্ভব—"

কিংবা—

"—আসলে আজকাল আবার খরিদ্দারেরা নানারকম জিনিষ দেখতে চাইছে—আপনি ত জানেনই। সুপার মার্কেটে ত সেইজন্যই ছুটছে তারা। আমাদের তৈরী জ্যাম জেলী আপনার—"

যে বিপজ্জনক ব্যাপারটা সেলসম্যানকে সন্তর্পনে এড়িয়ে যেতে হবে সেটি হল সারাক্ষণ নজর রাখা যেন তার কথায় কেউ আহত না

হয়, কোন তর্ক সুরু না হয়। আর একটা বিপজ্জনক প্রশ্ন সেলসম্যানদের করতে নেই সেটি হচ্ছে ক্রেতাকে সরাসরি প্রশ্ন করা। সরাসরি প্রশ্ন করলে হয় কি ক্রেতাও সরাসরি উত্তর দেবার সুযোগটি পেয়ে যায়।

এর পর অতিদ্রুত কাজ করার অভ্যাস রাখতেই হবে। বিক্রয় প্রতিনিধির জন্য ত সবাই হাত গুটিয়ে বসে থাকবে না। দরকারও নেই। তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তার বিক্রয়সামগ্রী সম্পর্কে ক্রেতার মানসিকতা ও আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারবে ততই মঙ্গল। অথচ অনেকে আছেন যারা একটু নরম অথবা সুবিধাজনক ব্যবহার পাওয়া মাত্র এমন গল্প ফেঁদে বসে যার সঙ্গে তার বিক্রয় সামগ্রীর কোন সম্পর্কই নেই। হয়ত অনেকের এমন ধারনা থাকে বা, ক্রেতাকে যে কোন বিষয়ে উৎসুক করে তুলতে পারলেই তার কাজ হাসিল হবে। কিন্তু ক্রেতার সাইকোলজি নিয়ে একটু ভাবলেই এই ধারনার বদল হতে বাধ্য। কারণ একজন ক্রেতা সেলসম্যানটি ঘরে ঢোকার আগে পর্যন্ত হয়ত তার কাউন্টারের রং নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিল —সেলসম্যান ঘরে ঢুকেই আবহাওয়ার বিষয় নিয়ে বলেই তার বিক্রয় সামগ্রী নিয়ে কথা বলতে সুরু করে। ফলে দেখা গেছে মাত্র ৬০।৮০ সেকেণ্ডের মধ্যে ক্রেতাকে তার কাউন্টারের রং, আবহাওয়া এবং জ্যাম জেলী নিয়ে মাথা ঘামাতে হল। ফলে কোনটাতেই স্থির ভাবে ভাবতে পারছিল না সে। তারপর আবহাওয়ার চড়া রোদ কিংবা ঝিরঝিরে বৃষ্টি যদি ক্রেতাটির পছন্দ হয়, তাহালে সেলসম্যানের কথায় প্রথমেই ক্রেতা বিরক্ত হয়ে ওঠবে সন্দেহ নেই। যদি পছন্দ না হয় তাহলে হয়ত কয়েকমিনিট ধরে আবহাওয়া নিয়েই কথাবার্তা চলবে অথচ মনে মনে ক্রেতা এবং বিক্রেতা দুজনেই অস্থির হয়ে পড়বে সময় নষ্ট হওয়ার জন্য।

ফলে ক্রেতাকে যে মানসিক ভাবনার মধ্যে সেলসম্যানটি পেয়ে

যাবে, সেই মানসিকতা না ভেঙে বিক্রয়সামগ্রীর প্রসঙ্গ যত তাড়াতাড়ি ওঠানো যেতে পারে ততই সুবিধা।

সেণ্ট্রাল পারচেজের মতন বড় জায়গার অসুবিধা

কোন অফিসে কিংবা ফ্যাক্টরীতে, যেখানে বড় ক্রয় বিভাগ রয়েছে, রয়েছে অনুসন্ধান অফিস, সেখানে ঠিক কোন লোকটির সঙ্গে বিক্রীর ব্যাপারে কথা বলা উচিৎ সেটা বের করতেই যথেষ্ট অসুবিধা হওয়ার সম্ভাবনা।

একজন সেলসম্যান সেই অফিসে এঁসে দেখল কাউণ্টারের ভিতরে একজন মহিলা রিসেপনিস্ট বসে আছেন। তার মাধ্যমেই আসল লোকটির সঙ্গে দেখা করতে হবে যার নাম এই বিক্রেতাটি এখনও জানেন না।

কথোপকথনের অংশ তুলে ধরা যাক—

বিক্রেতা—ম্যাডাম আমি ক্রয়বিভাগের কারো সঙ্গে কথা বলতে চাই কিছু স্প্রে-গান বিক্রীর জন্য।

মহিলা—আপনার কি কোন এপয়েণ্টমেণ্ট আছে।

বিক্রেতা—না এইত প্রথমবার এলাম এখানে।

মহিলা—ওই স্লিপটাতে নাম ঠিকানা—কারণ লিখে দিন—পরিচয় দিচ্ছি।

বিক্রেতাটি স্লিপে লিখে দিল এইসব। এখন মহিলাটি ফোন করে উপযুক্ত অফিসারটিকে জানাবে—"মিঃ ষ্টুয়ার্ট—আপনার সঙ্গে সানটাস কোম্পানির একজন দেখা করতে এসেছিল"—মিঃ ষ্টুয়ার্ট ব্যস্ত লোক তিনি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেবেন—"চিনি না ত ভদ্রলোকটিকে। যাই হোক স্প্রে—গান কেনার দরকার নেই এখন

আমাদের, কারন আমরা অন্য একটি কোম্পানির সঙ্গে কথাবার্তা প্রায় শেষ করে এনেছি”—

হয়ে গেল। সেলসম্যানটির পক্ষে মুখ চুন করে ফিরে যাওয়া ছাড়া গত্যান্তর নেই। এখন দেখা যাক ক্রটিটা কি হল।

প্রথমেই দেখা যাক ক্রয় বিভাগের অফিসারটি বিক্রেতার নাম, কোম্পানীর নাম এবং জিনিষ সম্পর্কে শুনলো, যেগুলির সঙ্গে তার ইতিপূর্বে পরিচয় হয়নি। দ্বিতীয়তঃ তারা স্প্রে-গান অবশ্যই কিনে চলেছে অনেকদিন ধরেই। এটাও ধরে নেয়া যেতে পারে যে ক্রীত জিনিষগুলি সম্বন্ধে তারা অখুশী নয়। ফলে স্বাভাবিকভাবেই ক্রেতা নতুন জায়গা থেকে কেনার আগ্রহ প্রকাশ নাও করতে পারে। এইসব বাধা, অতিক্রম করার রাস্তা হচ্ছে কোন ভাবে ক্রেতার সামনে হাজির হয়ে গুনাগুণ বোঝানো। আমাদের সেলসম্যানটি যেভাবে রিসেপসনিস্টের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছে তাতে সেই সম্ভাবনা তৈরী করা কঠিন।

বিকল্পভাবে দেখা যাক নতুন কোন ভাবে কথা বলা যায় কি না—

বিক্রেতা—ম্যাডাম—স্প্রে-গান যিনি কেনেন তার সঙ্গে একটু দরকার ছিল। আমার কাছে তার নামটি লেখা ছিল। খুঁজে পাচ্ছি না এখন—

মহিলা—মিঃ ষ্টুয়ার্টের কথা বলছেন।

বিক্রেতা—ঠিক তাই—আপনাকে একটু উপকার করতে হবে। আমার এই কার্ডে একটা খবর লিখে দিচ্ছি, একটু পাঠিয়ে দিতে হবে মিঃ ষ্টুয়ার্টের কাছে।

মহিলা—কোথা থেকে আসছেন আপনি—

বিক্রেতা—সব লেখা আছে কার্ডে—মিঃ ষ্টুয়ার্ট খবরটা সম্বন্ধে আগ্রহীই হবেন, সন্দেহ নেই।

এক্ষেত্রে রিসেপশনিস্ট কার্ডটা পাঠিয়ে দেবে। মিঃ ষ্টুয়ার্টও আগ্রহ প্রকাশ করবেন কারণ কার্ডের পিছনে হয়ত লেখা থাকবে।—

—"আমাদের নতুন সেলস্ স্কিমে আমরা কিছু বেশী ইনসেনটিভ দিচ্ছি—সেটা আপনারা নিলে আপনাদের ক্রয়খরচের পরিমান অনেক কমে যাবে। লগ্নীও করতে হবে কম—এইরকম কিছু—

এইরকমভাবে মাথা খাটিয়ে প্রতিকূল পরিবেশকে অনুকূল করে তোলার মধ্যে মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য থাকবে অনেক বেশী। আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তোলার ব্যাপারে খুবই কাজ হবে। তাছাড়া যে কাজের জন্য যাওয়া সেই কাজ করে ওঠার সম্ভাবনা হবে উজ্জ্বল। লক্ষ্য করা উচিৎ যে দ্বিতীয় সেলসম্যানটি কথা বলার সময়ে রিসেপশনিস্টকে গুরুত্ব দিয়ে কথা বলার জন্য সাহায্য পাচ্ছে বেশী। সেলসম্যানদের তাই বন্ধুত্বের অবকাশ আছে সর্বত্র। শুই একটি রিসেপশনিস্ট এর জন্যই কিংবা ইউনিফর্ম পরিহিত দারোয়ান এর জন্যই হয়ত তার একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিক্রয়-সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যেতে পারত। মনে রাখা উচিৎ সমস্ত লোকেরই নিজস্ব একটি অভিমান আছে। আর সেই অভিমানকে আহত করলে মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে। বরঞ্চ সেই অভিমানকে সম্মান করলে ফল লাভ করা যাবে অনেক বেশী।

বিরুদ্ধ পরিবেশ

একজন বিক্রয়প্রতিনিধির কাছে বিরুদ্ধ পরিবেশ নানানধরনের। ধরুন একজন পারচেজ অফিসারের কাছে সারাদিন অনেক সেলসম্যানের আনাগোনা, পুরোন, নতুন, নানা ধরনের। এবং ধরেই নিতে হয় যে পারচেজ অফিসারটি সেই কারনেই যথেষ্ট ব্যস্তসমস্ত লোক। তিনি জানেন যে সেলসম্যানটি এখন তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে, তাকে তার চেম্বারে ডেকে পাঠালে অনেকটা সময় নষ্ট হবে। ফলে হয়ত তিনি তাই এই সাক্ষাৎকারটি সংক্ষিপ্ত করার জন্য বাইরে বেড়িয়ে এসে রিসেপশনিষ্ট যেখানে বসে আছেন সেখানেই দেখা করতে চাইলেন। বলা বাহুল্য সেলসম্যানটির কাছে এই রকমের পরিস্থিতিটি অত্যন্ত বিরুদ্ধ পরিবেশ। তার কারণ রিসেপশনিষ্টএর সামনে, হয়ত বা অন্য সেলসম্যান দুএকজনের সামনে, তাকে তার বিক্রয়সামগ্রী নিয়ে আলোচনা করতে হবে, পারচেজ অফিসারটিকে তার সংস্থা সম্পর্কে বিশদ বোঝাতে হবে। যে সব কথা সেলসম্যানটির পক্ষে অনেক সহজে পারচেজ অফিসারের নিভৃত চেম্বারে বলা সহজ ছিল সেইসব কথা বিশদভাবে হলঘরে দাঁড়িয়ে বলার পরিস্থিতিটি সহজ নয়। আবার অন্যদিকে পারচেজ অফিসারটি সেলসম্যানটির সাক্ষাৎপ্রার্থনার স্লিপটি একেবারে উড়িয়ে না দিয়ে হয়ত ভাবলেন যে—কে জানে হয়ত এদের কিছু ভালো জিনিষ থাকতে পারে, অথচ জানেন না কিছুই তাদের সম্পর্কে, ফলে এই ধরনের একটি অপ্রস্তুত সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করলেন তিনি। যদি নতুন এবং তেমন প্রয়োজনীয় কোন জিনিষ পাওয়া যায় তাহলেই সময় নষ্ট করবেন তিনি, না হলে নয়। সুতরাং

সেলসম্যানটির কাছে কিন্তু সমস্যাটি জটিল হয়ে দাঁড়াল। যেমনভাবে সাধারণতঃ সে করে থাকে তেমনভাবেই কি সে পারচেজ অফিসারটির সামনে তার যাবতীয় কথাবার্তা উপস্থাপিত করবে না কি সে সিদ্ধান্ত নেবে যে এইরকম একটি পরিস্থিতিতে সমস্ত বিষয়টি ভালো করে বোঝানো অসম্ভব। যেহেতু পারচেজ অফিসারের এই সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকারের আয়োজন দেখে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে সেলসম্যানটির সামনে যথেষ্ট সময় নেই। সুতরাং সেলসমস্যাটির কাছে বিশদ গল্প ফাঁদার কোন সুযোগ নেই, করাটাও ঠিক হবে না। বরং খুবই বিনীতভাবে সে জানাতে পারে যে এরকমভাবে কথা বলার যখন অসুবিধা তখন বরং পরবর্তী কোন দিনে সাক্ষাতের আয়োজন হলে কেমন হয়। এবং সঙ্গে সঙ্গে সে পারচেজ অফিসারের কৌতুহল অন্তত কিছুটা উদ্রেক করার চেষ্টা করতে পারে যাতে পারচেজ অফিসার পরবর্তী সময়ে তার কথা শোনার জন্য উৎসুক থাকে।

কথাবার্তা কিরকমের হতে পারে সেটা কল্পনা করা যাক—

সেলসম্যান—নমস্কার—মিঃ সরকার, দুঃখিত, খুব একটা অসময়ে এসে পড়েছি মনে হচ্ছে—আপনি যা ব্যস্ত থাকেন। পরে কোন একটি সময়ে না হয় আসা যাবে কেমন—

এখন ধরে নেওয়া যাক যে পারচেজ অফিসারটি তার উত্তরে সেলসম্যানটিকে তার বক্তব্য রাখতেই বললেন—তখন তার উত্তরে সেলসম্যানটি যা বলবে সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ—কল্পনা করা যাক কি বললে সবচেয়ে ভালো ফল পেতে পারে সে—

সেলসম্যান—আমি আসছিলাম সায়ন এ্যান্ড্ সায়ন কোম্পানি থেকে।

(এটা কি সে—বলবে না বাদ দেবে, দেখা যাচ্ছে বাদ দেয়াই উচিৎ কারণ ইতিমধ্যে সে তার কোম্পানির কার্ডটি পাঠিয়ে দিয়েছিল। তাহলে!)

—সায়ন এ্যাণ্ড্ সায়ন এ আমরা নতুন একটি পরিকল্পনা নিয়েছি টার্ন-কি-প্যাকেজিং সার্ভিসএর—জিনিষপত্র সরিয়ে এনে। ঠিকমতন —বলা বাহুল্য ইণ্টারন্যাশন্যাল স্ট্যাণ্ডার্ড অনুযায়ী প্যাকিং করে। লরীতে বয়ে নিয়ে যেমন ক্লায়েণ্ট চান তেমনি, ট্রেনে, লরিতে প্লেনে কিংবা জাহাজে তুলে দিয়ে আসি এবং যেহেতু এই চারটি কাজই আমরা এক সংস্থার তরফ থেকে করে থাকি তাই এস্টাব্লিশমেণ্ট এবং প্রফিট একবারই লাগছে আপনার, যে কাজ চারটি সংস্থাকে দিয়ে করালে হয়ত চারবার লাগত আপনার। সম্প্রতি ১১৯টি সমীক্ষা করে আমরা দেখেছি যে আলাদা আলাদাভাবে কাজ করলে যে খরচ হয় আমাদের কর্পোরেট প্রস্তাব তার চাইতে ৩০% কম, যার অন্ততপক্ষে ১৮% নিট বেনিফিট জমাপড়ছে একটি হাউসের ফাণ্ডে। বছরের হিসেব করলে টাকায় তার পরিমাণ বেশ মোটা রকমের।—যাই হোক, আপনি ত ব্যস্ত আছেন। আর একটা দিন না হয় আসা যাবে —ও: প্রসঙ্গত বলি আপনাদের কোম্পানি এই বাবদে যে খরচ বাঁচে —(যা আমরা সাধ্যমতন হিসেব করার চেষ্টা করেছি খুবই অনুমান) তাতে সাশ্রয়ের পরিমান কয়েক লক্ষ টাকা হবে বছরে—”

এইরকম কিংবা এই ধরনের একটা বক্তব্য নিয়ে সেলসম্যান যদি উপস্থিত হয়। পারচেজ অফিসারটি অত্যন্ত কৌতূহলী হয়ে উঠবেন সন্দেহ নেই। তাছাড়া যেহেতু অনেক টাকা সাশ্রয়ের প্রস্তাব রয়েছে সেইহেতু না করানো মানেই হচ্ছে ক্ষতি, যেটা তার দায়িত্বের ব্যাপারে ব্যক্তিগত ক্ষতি ডেকে আনতে পারে। অর্থাৎ সব মিলিয়ে তিনি তখন বিশদ আলোচনার জন্য সেলসম্যানটির সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ একটি সাক্ষাৎকরের বন্দোবস্ত করতে প্রায় উদগ্রীব হবেন সন্দেহ নেই। প্রকৃত প্রস্তাবে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এই ধরনের বিরুদ্ধ পরিবেশে একজন সেলসম্যানের সিদ্ধান্তের ওপরেই নির্ভর করছে সবকিছু। সে যদি বিরক্ত হয়ে ফিরে যায় তাহলেও তার বিক্রীর সম্ভাবনা হারালো

আর যদি সে সময় বুঝে পারচেজ অফিসারের ঔৎসুক্য তৈরী করতে না পারলো তাহলেও ভবিষ্যতে বেশ বড় ধরনের বিক্রীর সম্ভাবনা হারিয়ে বসলো। সুতরাং সবসময়ের জন্যই সেলসম্যানটিকে তাৎক্ষনিক সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য এবং দ্রুত,—অতিদ্রুত হয়তবা কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই নিজেকে তৈরী করার ব্যাপারে যথেষ্ট প্রস্তুত রাখতে হবে।

সাক্ষাৎকারের আয়োজন করা

একটা সময় ছিল যখন সম্ভাব্য ক্রেতার কাছে বিক্রয়প্রতিনিধি চিঠি লিখে সাক্ষাৎকারের দিনক্ষণটি জানিয়ে দিতেন। বর্তমান সময়ে যখন বিক্রেতার সংখ্যা বেশী, ক্রেতার সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম, অবশ্য যেক্ষেত্রে বিক্রেতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বাজার আছে সেক্ষেত্রে আলাদা। তখন ব্যস্ততার মধ্যে এরকম একটা চিঠি কোন সংবাদই নয়, ক্রেতার পক্ষে মনে করে রাখাটাও কঠিন, এমনকি তাকে যথেষ্ট সময় দেয়া, কোন অজুহাত ভেবে ঠিক করে রাখা। টেলিফোন করলেও একই অসুবিধা, ব্যস্ততার কথা জানালে সেলসম্যানের আর কিছুই করার থাকে না। সুতরাং বর্তমান সময়ে প্রত্যক্ষভাবে সশরীরে উপস্থিত হয়ে ক্রেতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার চেষ্টা করাটাই সুবিধাজনক। বলা বাহুল্য সেজন্যই সেলসম্যানদের আরও বেশী তুখোর হতে হবে -আজকের জগতে বিক্রীর ব্যবস্থা নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে চাইলে।

সাক্ষাতের আগেই সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা

এমন অনেক পরিস্থিতি রয়েছে যখন আগে ভাগে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা না করলে দেখা সাক্ষাৎ করা সম্ভব নয়। দুটো কারনে এরকম একটা পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে। এক—হয়ত যিনি ক্রয়ের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম তিনি খুব উঁচুদরের লোক এবং যা সকলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করাটা তার কাছে অবমূল্যায়নকর। দুই—সেলসম্যানের বিষয়টি হয়ত ক্রেতার কাছে নেহাতই গুরুত্বহীন।

এই সব ক্ষেত্রে সরাসরি সাক্ষাৎকারের চেষ্টা ব্যহত হলে অন্যভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করতেই হবে, বিজ্ঞাপন কাগজে দিয়ে কিংবা সরাসরি বারবার "মেইলিং" করে। হয়ত অনেকটা সময় লাগবে, হয়ত অনেকগুলো চিঠি বা মেইলিং করতে হবে, হয়ত বা তারপরেও পাঁচ-সাতবার কষ্ট করে দেখা করার চেষ্টা করতে হবে। অথবা দশজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে একজনের কাছে বিক্রী করাটা সম্ভব হবে। তবুও মনে রাখতে হবে যে এরকম একটা বিক্রীর সম্ভাবনা ধীরে ধীরে হলেও খুশী হওয়ার মতন ঘটনা হয়ে উঠতে পারে বিক্রয়প্রতিনিধিটির ক্ষেত্রে ভবিষ্যতের কোন একটা দিনে।

বিক্রয় প্রতিনিধির অতি পরিচিত ক্রেতার কাছে বিক্রয়-প্রস্তাব নিয়ে যাওয়া

কিছুকাল আগে ফিল্ডে ঘোরার সময়ে এবং কিছু নতুন সেলসম্যান নেয়ার ব্যাপারে যুক্ত থাকার ফলে আমার কিছু বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়েছিল। আমাদের এই বন্ধুটি যিনি একটি নতুন সেলসটিম গঠন করতে যাচ্ছিলেন তার সঙ্গে আলোচনা করে জানা গেল যে তিনি তাকেই সত্যিকারের সেলসম্যান হিসেবে ধরে থাকেন যার সঙ্গে ছোট দোকান এবং রিটেই'ল কাউন্টার গুলোর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে দহরম মহরম আছে। সঙ্গে সঙ্গে এরকম সেলসম্যানদের নিয়ে বিপত্তিটা কি ধরনের হতে পারে সেই বিষয়ে আলোচনা তোলা গেল।

খোঁজ খবর নিয়ে দেখা গেল যে একজন বিক্রয়প্রতিনিধি তার রুটিন ভিজিটে প্রায় সব রিটেল কাউন্টার গুলিতে সপ্তাহে অন্তত একবার ভিজিট করে থাকে। এবং তার ফলে রিটেল শপগুলোর সঙ্গে তার একটা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরী হয়ে যায়। বেশ কিছুদিন এরকম বন্ধুত্ব চলতে থাকলে অবশ্যম্ভাবি অসুবিধাগুলো তৈরী হয়ে যায়। একজন অপরিচিত সেলসম্যানের পক্ষে দোকানের মালিকের কাছে তার বিক্রয়সামগ্রী নিয়ে জোরজবরদস্তি করা সম্ভব যেটা পরিচিত বা খুব পরিচিত বন্ধুর মতন সেলসম্যানের পক্ষে করা সম্ভব নয়। আসলে এই বন্ধুর মতন সেলসম্যানটির রুটিন ভিজিট প্রায় "সোস্যাল কল" হিসেবেই সংঘটিত হতে থাকে, "সেলস কল" হিসেবে নয়। সেলসম্যানের কাজটি হচ্ছে বিক্রী করা, যার জন্য তার এই আসাযাওয়া আর সেটি বাদ দিয়ে বন্ধুত্বের পরিবেশ চলবে কেন।

ধরা যাক সেলসম্যানটি দোকানে ঢুকে মালিককে জিজ্ঞাসা করবে

"কেমন আছো হে সরকার। শরীর-টরীর কেমন।—"তারপর হয়ত বাচ্চাদের কথা—এইসব ঘরোয়া কথাবার্তা বলবে সে, ব্যবসা কেমন হচ্ছে ইত্যাদি। তারপর হয়ত সে তার বিক্রয়সামগ্রী সম্পর্কে একটা দুটো কথা জিজ্ঞাসা করল, ভদ্রলোক হয়ত একটা অর্ডার দিলেন কি দিলেন না। সেলসম্যানটির মনে পড়ল নতুন প্রোডাক্টটির কথা যেটা ব্যাগের থেকে বের করে দেখানো উচিৎ। কিন্তু বন্ধুত্বের দাবী এক্ষেত্রে এত বেশী যে কোন কিছু জোর করার ব্যাপারই নেই। ফলে মোদ্দকথা যেটা দাঁড়াল সেটা হচ্ছে, যদি অফিসিয়াল রুটিন হিসেবে সেলসম্যানটির প্রতি সপ্তাহেই রিটেল কাউন্টার আর ছোটখাটো দোকান গুলিতে ঘোরার কথা, কিন্তু আমাদের এই সেলসম্যানটির ক্ষেত্রে এই ভিজিট হচ্ছে যতটা সামাজিক বেশী, বিক্রয় সংক্রান্ত ততটা না। ফলে কিছুদিনের মধ্যেই বাস্তবভাবে সেলসম্যানটি কিন্তু বিক্রী করার ব্যাপার থেকে নিরস্ত হয়ে আসবে তখন তার অবস্থা দাঁড়াবে শুধুমাত্র একজন অর্ডার নেয়ার লোক হিসাবে। এবং সেলসম্যানটি না এলে সেক্ষেত্রে অর্ডারটি দোকানদারই কোম্পানিতে পাঠানোর ব্যবস্থা করবে। এবং এই যে সেলসম্যানটির দৈনিক খরচের হিসাব সেটি পূরণ করার কোন চেষ্টাই কিন্তু সেলসম্যানটির তখন নেই। আবার হিসেব করে দেখলে দেখা যাবে যে দশ পনেরো মিনিটের এই ভিজিটের মধ্যে সাত থেকে আট মিনিট সে খরচ করেছে স্বাস্থ্য, ব্যবসা, এবং ব্যক্তিগত খবরাখবরের আলোচনায়। বাকি দুএক মিনিট মাত্র হয়তবা সে আলোচনা করেছে যে কারণে আসা সেই কারণ সম্বন্ধে এবং সেটাও যেন বুঝি বা খুবই ইতস্তত করে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে অন্য সব ক্ষেত্রেই যেমন প্রযোজ্য এক্ষেত্রেও সেই মহর্ষির বাণীই প্রযোজ্য বা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে "Respectable distance" মেনে কথা বললে দুয়েরই সুবিধা এবং দুজনেরই ব্যক্তিত্ব বিকশিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

এতক্ষণ একজন বিক্রয়প্রতিনিধির নিজেকে উপস্থাপিত করার (ক্রেতার বা ক্রেতার প্রতিনিধির সামনে) সমস্যা নিয়ে কিছুটা আলোচনা করা গেল। মোদ্দা কথাটা হল এই যে যখনই কোন সেলসম্যান তার ক্রেতার সঙ্গে কথা বলতে ব্যর্থ হল ঠিকমতন, কিংবা ক্রেতাকে ঠিকমতন কথা বলানোর অবস্থায় নিয়ে আসতে ব্যর্থ হল, সেইসব ক্ষেত্রে সেলসম্যানকে স্পষ্টভাবে স্বীকার করে নেওয়া ভাল যে সেটা তারই ব্যর্থতা। ফলে তার কাছে ব্যর্থতা কি করে জয় করা যায় তার ফন্দিফিকির খুঁজে বের করাটাই প্রথম এবং প্রধান কাজ হয়ে যাবে। তার কারণ সে যদি তার স্যাম্পল কেস ক্রেতার সামনে ঠিকমতন তুলেই না ধরতে পারল তাহলে নিজেকে ছাড়া অন্য কাউকে দোষ দেয়ার সুযোগ কোথায়। সমস্যাটি তার নিজের, সুতরাং সমাধানের পথটিও তাকেই বের করতে হবে। না হলে উপায় নেই।

বিক্রয় সামগ্রী উপস্থাপিত করা

আমরা ইতিপূর্বে ক্রেতার সঙ্গে আমাদের সেলসম্যানটির ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের বিষয়টি নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছি। বিক্রয় প্রতিনিধি ক্রেতাকে তার সঙ্গে কথা বলার ব্যাপারে উদগ্রীব এর তুলেছে। কিংবা রাজী করাতে পেরেছে তার সঙ্গে বিশদ আলোচনা করতে। এখন বিক্রয়প্রতিনিধিটির সামনে তার বিক্রয় সামগ্রী উপস্থাপিত করার সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা যাক।

দীর্ঘকাল ধরে সেলসম্যানদের বিরুদ্ধে যে ধারণাটি

অনেকেই পোষণ করে রেখেছেন সেটি হল এই যে উৎপন্ন জিনিষ সম্বন্ধে সেলসম্যানদের সীমিত জ্ঞান। বিক্রেতার পক্ষে বিক্রয় সামগ্রী সম্পর্কে যাবতীয় জ্ঞান থাকাটা একান্তই জরুরী, অন্ততপক্ষে ব্যবহারিক দিকটায়। যে সেলসম্যান স্বচ্ছন্দে তার জিনিষের গুনাগুন নির্ভুলভাবে ব্যাখ্যা করতে পারবে, তার প্রতি ক্রেতার বিশ্বাস হওয়াটা স্বাভাবিক। আর যে সেলসম্যান আমতা আমতা করবে ক্রেতা দুটো প্রশ্ন করলেই ঠিকমতন উত্তর দিতে পারবে না তার প্রতি ক্রেতার সন্দেহের উদ্রক হওয়াটাই স্বাভাবিক। ফলে—একজন সেলসম্যানের কোন জিনিষ বাজারে নিয়ে যাওয়ার আগে সেই জিনিষ সম্পর্কে যাবতীয় গুণাগুন বিচার করে দেখে নিতে হবে। দেখে নিতে হবে প্রতিদ্বন্দ্বী সংস্থার জিনিষপত্রের গুনাগুন। তারপর প্রস্তুত হতে হবে মনে মনে সেইসব বিষয়ে যে সব বিষয়ে ক্রেতা তাকে প্রশ্নবান ছুঁড়তে পারে। সেই জিনিষটির পরিপ্রেক্ষিতে প্রযুক্তি সংক্রান্ত। অর্থনীতি, এবং ব্যবহারের বিষয়ে সহজ ভাবনায় তৈরী করে নিতে হবে নিজেকে, যাতে সে ক্রেতার সামনে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হয়েই উপস্থিত হতে পারে। আরও একটু বিষদভাবেভাবা যাক বিষয়টি নিয়ে।

১। জিনিষটি সম্পর্কে বিচার—তৈরী সম্পর্কিত
২। জিনিষটি কিভাবে ব্যবহৃত হতে পারে
৩। জিনিষটির বিশেষ গুনাগুণ
৪। অন্য জিনিষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন
৫। বিশেষ সময়ের উপযুক্ততা
৬। জিনিষটির জন্য বিজ্ঞাপন সমর্থন
৭। মূল্য
৮। বিক্রয় উত্তর সার্ভিসের সুযোগ

১। **জিনিষটি সম্পর্কে বিচার-তৈরী সম্পৃকিত**

জিনিষটি তৈরী করার কাঠামো কি ছিল। তার ইতিহাস। কোন বিখ্যাত লোক, কিংবা বিখ্যাত সংস্থা সেই ডিজাইন অনুমোদন করেছে কি না ইত্যাদি।

তারপর কি কাঁচামাল ব্যবহার করা হয়েছে। সেই কাঁচামাল কোন স্থান থেকে কেনা হয়েছে।

ঠিক কিভাবে তৈরী হয়েছে জিনিষটি, কোন মেশিনে। মেশিনটার গুনাগুণ, কতটা জিনিষ তৈরী হচ্ছে প্রতিদিন।

কিভাবে প্যাকিং করা থাকছে। বৈজ্ঞানিক কোন উপায় সংরক্ষিত করার ব্যবস্থা।

২। **জিনিষটি কিভাবে ব্যবহৃত হতে পারে**

ব্যবহারের প্রস্তাবটি কি ধরনের (users point)। কি উদ্দেশ্য ব্যবহার করার কথা। সে উদ্দেশ্য কিভাবে গঠিত হতে পারে। জিনিসটি কি চালিয়ে দেখানো যেতে পারে?

৩। **জিনিষটির বিশেষ গুনাগুণ**

যদি দেখা যায় যে জিনিষটির কোন বিশেষ মূল্যায়ণ করা হয়েছে। কাজের ক্ষেত্রে তার মূল্য অনেক—এটা বলা হচ্ছে এই কারণে যে বর্তমানে উৎপন্ন সামগ্রী তৈরীর যে প্রস্তাব, সেই প্রস্তাবে সবসময়েই এই ধরনের consideration থাকবেই। তার কারণ বাজারে অনেক প্রতিদ্বন্দী, অনেক ধরনের ডিজাইন, ফলে নূতন কিছু তৈরী

করার আগে প্রস্তুতকারককে বিশেষ গুনাগুণের দিকটা ভেবে দেখতেই হবে। টেকনিক্যাল সেল থেকে বিক্রয় ডিভিশনে যখন প্রডাক্টটি সম্পর্কে বিশদ জানানো হবে। সেই রিপোর্টে এই ধরনের Plus point থাকবেই। সেলসম্যানদের সেই পয়েন্ট নিয়ে খুব ভালরকম ভাবে ওয়াকিবহাল হতে হবে। যাতে সে ক্রেতার কাছে ভালভাবে ব্যাখা করতে পারে। অন্য যেসব জিনিষপত্র বাজারে পাওয়া যাচ্ছে সেগুলোর তুলনায় এই জিনিষটির বিশেষ গুনটি কি সেটাই স্পষ্টকরার প্রয়োজন। অবশ্য সবসময়েই একজন সেলসম্যানকে কিন্তু মনে রাখতে হবে যে তার প্রতিদ্বন্দী সংস্থার বিভিন্ন জিনিষের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে কিছু বলাটা রীতিবিরুদ্ধ এবং ভদ্রতা বিরুদ্ধ। সে খুব সাবধানে সব কথাই বলবে নিজের জিনিষ সম্পর্কে, যে বলার মধ্যে স্পষ্ট নিরেথ থাকবে অন্য জিনিষগুলির নিকৃষ্ট অবস্থার পর্যালোচনা।

জিনিষ Display কিংবা Demonstrate করার ব্যাপারে পাঁচটি দিক বিবেচ্য—দর্শন, স্পর্শ, স্বাদ, শব্দ, এবং গন্ধ। এই কটি দিকই মানুষ তার জৈব ক্ষমতার সঙ্গে গ্রহণ করতে পার—এর সঙ্গে, সঙ্গে, ফলাফল হিসাবে আসতে পারে—সহজভাবে চালানোর সুযোগ, কম শক্তি ব্যবহার, বেশী উপাদান, ইত্যাদি।

অন্য জিনিষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন

এককভাবে কোন জিনিষই বা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অন্য কোন না কোন জিনিষের সঙ্গে তার সম্পর্ক থাকছেই। যেমন যে দোকান সাইকেল রাখে সে ওয়াটারপ্রুফ রাখতেই পারে। কিংবা ওষুধের দোকান বিস্কুট চকোলেট। একজন সেলসম্যানকে তাই সম্পর্কযুক্ত কাউন্টার গুলোর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে সেইসব জায়গা-গুলোকেও নিজের জিনিষ রাখার উপযুক্ত করে তুলতে হবে। এবং একজন দোকানদার যদি দেখে যে সম্পর্কযুক্ত আরও জিনিষ সে রাখতে পারছে এবং খরিদ্দার সেই জিনিষ সম্পর্কে আগ্রহী হতে চলেছে তাহলে তার লাভের অংকটা আরও বাড়বে দেখে এই নতুন জিনিষটি রাখতে দ্বিধা করবে না। হয়ত ইতিপূর্বে কোন সেলসম্যান এই সম্পর্কের কথাটি বুঝিয়ে দিতে পারে নি, তাই রাখা হয়নি। এখন ঠিকমতন বুঝতে পারলে সে অবশ্যই রাখবে।

বিজ্ঞাপনের সমর্থন

বাজারের ছোটবড় ব্যবসায়ী দোকানদাররা খুবই সচেতন একটি ব্যাপারে—সেটি হচ্ছে বিজ্ঞাপন। তাদের ধারণা ভালোমতন বিজ্ঞাপন করলে জিনিষের চাহিদা স্বাভাবিকভাবেই বেড়ে যায়। ফলে দোকানদাররা বিজ্ঞাপন কম এমন জিনিষ রাখতে একটু ইতস্তত করে থাকে।

বিজ্ঞাপন নানান ধরনের হয়ে থাকে—রেডিও টেলিভিশন,

খবরের কাগজ, জারনাল, মেইলিং কার্ড, ছোট্ট স্যাম্পেল প্যাকেজিং, হোর্ডিং, উইনডো ডিসপ্লে, কাউন্টার ডিসপ্লে, ইত্যাদি নানানরকমের।

দোকানদারের পক্ষে সব বিজ্ঞাপন আবার ঠিকঠাক মতন মনে করে রাখা কঠিন ব্যাপার। একজন সেলসম্যানের সামনে তখন সবচেয়ে জরুরী হল তার সংস্থার প্রোডাক্টটি সম্পর্কে যে বিজ্ঞাপন দিয়ে চলেছে সেই ব্যাপারটা ক্রেতার কাছে তুলে ধরা। এটা খুব ভালোভাবে করা যায় যদি সেলসম্যান সব বিজ্ঞাপনের একটা করে কপি একটি সুন্দর ফোল্ডারে যদি যত্ন করে রাখতে পারে সবসময় নিজের কাছে। সেটা সে ক্রেতার সামনে তুলে ধরতে পারে যখনই দরকার হয়।

যেহেতু বিজ্ঞাপনের মূল ধরনটা হচ্ছে যে জিনিষ সম্পর্কে বিজ্ঞাপন হচ্ছে সেই জিনিষ সম্পুর্কে জনসাধারনের মধ্যে চাহিদা তৈরী করা, ফলে সেলসম্যানের কাজ হচ্ছে বিজ্ঞাপনের পুরো ফোল্ডারটি দেখিয়ে দোকানদারকে বোঝানো যে একবার জিনিষগুলি স্টক করলেই দেখা যাবে জনসাধারন কেনার জন্য প্রস্তুত হয়ে রয়েছে।

মূল্য

নানাকারনে মূল্য বিক্রয়ক্ষেত্রে একটি বিশেষ ব্যবস্থা: অনেক সময়ে মূল্য নিজেই জিনিষ বিক্রীর সমতা রক্ষা করে থাকে। খুব ভালো একটি জিনিষ, হয়ত দামটাও অনেক বেশী। কিন্তু জিনিষটা যত বেশী বিক্রি হবে প্রত্যেকটি বিক্রির সঙ্গে সঙ্গে দোকানদারের ততো লাভ হবে বেশী।

আবার অনেক সময়েই দেখা গেছে অনেক খরিদ্দার দরদস্তুর করতেই ভালবাসেন। ফলে কমমূল্যের জিনিষ দোকানে থাকলে মালের কাটতি তত হবে। সঙ্গে সঙ্গে দোকানে আসতে সুরু করবে অনেক বেশী লোকজন, এবং বেশী লোকজন দোকানে এলেই সেই কম মূল্যের জিনিষটা ছাড়াও আরও দুচারটি জিনিষ দোকান থেকে বিক্রি হতে সুরু হবেই।

ফলে সেলসম্যানের কাছে রেডিমেড থাকা চাই সেই অংকটি যে অংকে দোকানদার জিনিষটি বিক্রি করলে কত লাভ করবে সেটা যেন সব সময়ই বোঝানো যায়। হয়ত টাকার হিসেবে কিংবা অথবা শতকরা হিসেবে। ফলে জিনিষটির ক্ষেত্রে "মূল্যটি" বিক্রয় করতে পারটাই সেলসম্যানের কাছে জরুরী কাজ।

বিক্রয় উত্তর সার্ভিস

যে জিনিষটি সেলসম্যান বিক্রী করতে বেরোছে বাজারে, সেই জিনিষটি ক্রয়ের বিষয়টি বেশী লাভজনক দেখাবার জন্য প্রস্তুতকারক সংস্থা নানান ধরনের সার্ভিসের সুবিধার প্রস্তাব রাখতে পারে। যদি এমন কোন জিনিষ হয় যা তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যেতে পারে সেই জিনিষের যোগান যদি প্রস্তুতকারক সংস্থা অত্যন্ত দ্রুত করতে পারে তাহলে খুবই ভাল। সেলসম্যানটি অর্ডার বুক করে ফিরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যদি সাপ্লাইএর বন্দোবস্ত করা যায় তাহলে আরও ভাল। ক্রেতা জানবে যে সাপ্লাই অন্তত দেরী করে হবে না, অর্ডার দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকা যায়, ফলে ভবিষ্যতে যখন কেনার প্রস্তাব হতে ক্রেতা অনায়াসেই এই সেলসম্যানটির কথা ভাবতে বাধ্য হবে। কিংবা খুব

সূক্ষ্ম কোন যন্ত্রপাতি হলে, সুচারু একটা ট্রেনিং কোর্সের ব্যবস্থা করার কথাও চিন্তা করা যায়। এইরকম সব বন্দোবস্ত করতে পারলে ক্রেতাকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেয়া হবে। ক্রেতাও চান না যে সেলসম্যান তাকে অন্য অনেকের মতন ভাবুক। একজন ভাবুক তিনি চান, অর্থাৎ প্রত্যেক ক্রেতাই বিশিষ্ট ব্যবহার চান সেলসম্যানদের কাছ থেকে। সেলসম্যানদের ব্যবহারও তেমনি হবে যাতে প্রত্যেক ক্রেতাই ভাববে তাকে অবহেলা করা হয়নি। ঠিক এইভাবে সব দিক চিন্তা করে বিক্রয়সামগ্রী ক্রেতার সামনে তুলে ধরবে সেলসম্যানটি এবং ঠিকমতন করতে পারলে অর্ডার বুকিং এর ব্যাপারে গণ্ডগোল হওয়ার কারণ থাকবে না।

বিক্রয়সামগ্রী উপস্থিত করার ব্যাপারে ক্রেতার সামনে সেলিং পয়েন্টগুলি তুলে ধরা

সেলসম্যানটি নিজেকে উপস্থিত করেছে। তার বিক্রয় সামগ্রীগুলোও ক্রেতার সামনে তুলে ধরেছে। এখন বিক্রয় সামগ্রী তুলে ধরার ব্যাপারে তাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যতখানি বিষয় নিয়ে আগে আলোচনা হয়েছে সব বিষয়েই কি কথা বলবে না কি দু-একটি পয়েন্ট সে শুধু ক্রেতার সামনে তুলে ধরবে। যেহেতু একই ধরনের জিনিষ নিয়ে অন্য সেলসম্যানরা নিশ্চয়ই বিশদ আলোচনা করে গেছে ইতিপূর্বে (এটা প্রায় ধরেই নিতে হবে), তাই সববিষয় নিয়ে কথা বলার দরকার কি। বরং একটা দুটো প্লাস পয়েন্ট নিয়ে কথা বলাই ভাল। আবার হয়ত সমস্ত বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা যাতে পারে। প্রথম ক্ষেত্রে সেলসম্যানটি পার্থক্যটুকুই উপস্থাপন করছে (অন্য সেসলম্যানদের প্রোডাক্টের পরিপ্রেক্ষিতে') দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সেলসম্যানটি—"ধারনাটা" উপস্থাপিত করছে।

পার্থক্য সম্পর্কিত

বাজারে চালু প্রায় বেশীর ভাগ জিনিষের মোটামুটি ধরণ-ধারনটি একই রকমের। হয়ত দুটো একটা মাত্র পার্থক্য বিদ্যমান। প্রত্যেকটির সঙ্গে প্রত্যেকটির। সেই পার্থক্যটুকুই ভাল করে বলতে হচ্ছে। প্রডাক্ট সম্পর্কে বাকি সবই ত ক্রেতার খুব ভালই জানা আছে।

ধার না বিক্রয়

এমন অবস্থা যখন সেলসম্যানটি সম্পূর্ণ নতুন কোন জিনিষ বাজারে বিক্রী করতে আনছে। বাজারে সময় সময় এরকম অনেক জিনিষই এসে থাকে। নতুন জিনিস বলে ক্রেতার কোন ধারনা নেই জিনিষটি সম্পর্কে। এরকম ক্ষেত্রে সমস্ত ব্যাপারই বিশদ বলতে হবে সেলসম্যানকে। কিভাবে—

১। ধারনা অর্থাৎ আইডিয়া (এই নতুন প্রডাক্টটি সম্পর্কে যেটি প্রস্তুতকারক প্রস্তাব করছেন সুবিধাজনক বলে ব্যবহারকারীর জন্য) বিক্রী করার প্রস্তাব করা।

২। তারপর দ্রুত বিশদ ব্যাখা করতে হবে, সুযোগ থাকলে—ডেমনস্ট্রেট করতে হবে। ক্রেতা খুব একটা সহজেই বা নতুন জিনিস কিনতে হাত বাড়বে সেটা ভাবলে ভুল হবে।

একজন সেলসম্যানকে সবসময়েই নজর রাখতে হবে তার ব্যবহারের দিকটায়। কিভাবে সে সেলিং পয়েন্টগুলি ক্রেতার সামনে উপস্থিত করছে। ক্রেতাকে যেমন অপ্রয়োনীয় এবং অত্যন্ত বিস্তারিত আলোচনা করে বিরক্ত করে তোলা ঠিক হবে না। তেমনি আবার কথাবার্তার সময়ে সারাক্ষণ ক্রেতা যে এখানে শ্রোতামাত্র, তার মনে সারক্ষণ ঔৎসুক্যের ভাবটি যাতে বজায় থাকে সেই চেষ্টা করে চলতে হবে। খারাপ ভাবে ভুলভাল ভাষায় কথা বললে ক্রেতার পক্ষে ঔৎসক্য বজায় রাখা কঠিন হয়ে উঠতে পারে। খুব সহজ যে রাস্তাটা রয়েছে সেটা সেলসম্যান নিজেই একটা দুটো প্রশ্নের মাধ্যমে তুলে ধরবে আবার উত্তরটাও দিতে থাকবে নিজেই—যেমন—সেলসম্যান যদি শুধুমাত্র বলে যে—'দেখুন এই সুটকেসগুলোর নীচে চাকা লাগানো আছে। দরকার মতন কুলির সাহায্য ছাড়াই টেনে নিয়ে যাওয়া যায়।" সেটা সাদামাটা হয়ে যায়—কিন্তু যদি নাটকীয় ভাবে বলে—"আপনিনিশ্চয়ই ভাবছেন এতবড় দামী ভারী সুটকেস, মালপত্র রাখলে আরো ভারী হবে। তাছাড়া সবজায়গায় ড়ুলিও পাওয়া যায় না—টানবে কি করে লোকজনেরা—বরং হাল্কা ছোট সুটকেসই ভালো, তাই না—দেখা যাক আমাদের কোম্পানী এব্যাপার কি ভেবেছে—এই দেখুন চারদিকে চারটি ছোট ছোট রাবারের চাকা লাগানো রয়েছে—হ্যাণ্ডেলের সঙ্গে একটা সরু নাইলনের দড়িও বেঁধে দিয়েছি আমরা। দড়ি হাতে নিয়ে সুটকেস যতই ভারী হোক টেনে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যেতে পারে। বিন্দুমাত্র অসুবিধা নেই। কুলি না পাওয়ার চিন্তা নেই, নিজেকেও ভার বইতে হবে না খুব একটা।

বিক্রীর পয়েন্টগুলোকে অর্থমূল্যে রূপান্তরিত করা

মানুষজন জিনিষপত্র ত আর শুধুমাত্র দেখেই কেনে না, কেনে তার ব্যবহারের উপযোগীতা দেখে। যে সেলসম্যান গাড়ির যন্ত্রপাতি বিক্রীর বিষয়ে গীয়ার নিয়ে আলোচনা করেই ছেড়ে দেয়, তার বক্তব্য ক্রেতার পক্ষে বোঝা একটু কঠিন। কিন্তু যদি সে বলে যে নীচের গিয়ার অনেক নীচে স্থির করা রয়েছে এমনভাবে যে পাহাড়ি রাস্তায় গাড়ি বন্ধ হওয়ায় কোন সম্ভাবনাই নেই। ওপরের গিয়ারটি আবার এমনভাবে তৈরী যে কখনও পাহাড়ি রাস্তায় যদি চান ত সত্তর মাইল স্পিডেও চালানো সম্ভব। এবং সেটা করতে বেশী তেল খরচ হওয়ার সম্ভাবনা নেই, এঞ্জিন গরম হবে না।— ইত্যাদি তাহলে ক্রেতার কাছে ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে।

বিক্রয় প্রস্তাব উপস্থাপনার কৌশল

আমাদের বিক্রয় প্রতিনিধিটি ইতিমধ্যেই দুটো জরুরী কাজ সেরে ফেলেছে, একটা হচ্ছে নিজেকে উপস্থিত করা দ্বিতীয়টি হল বিক্রয় সামগ্রীটি ক্রেতার সামনে তুলে ধরা।

কিন্তু কেন।

না আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। সেলসম্যান কেন আসছে, কেন তার জিনিষপত্র দেখাচ্ছে সেটা আন্দাজ করে লাভ নেই। কি কারণে করছে সেটা স্পষ্ট হওয়া দরকার। কিন্তু এত করার পরেও সেলসম্যানটি কেন ব্যর্থ হল বা হবে, তাহলে এবারে তৃতীয় দফায় সেলসম্যানটির সামনে সমস্যা হচ্ছে তার প্রস্তাবটি ক্রেতার সামনে তুলে ধরা।

সেলসম্যান ইতিমধ্যে বিক্রয় সামগ্রীটি সম্বন্ধে যা যা জানে সব বিশদভাবে বলেছে। দেখানো হয়েছে জিনিষটি। এবং আশা করা যাচ্ছে এতক্ষনে ক্রেতার আগ্রহ যথেষ্টই তৈরী হয়েছে।

এখন অর্ডার নেয়ার পালা। এরকম ভাবনা চিন্তা কিছু কিছু সেলসম্যানের থাকে নিশ্চয়ই; তারা ভাবে সবই ত বলা হল সুতরাং বিক্রীর প্রয়াসটি এবারে বন্ধ হল। অর্ডার নিয়ে হাঁটা দিতে পারলেই নিশ্চিন্তি। কিন্তু বাস্তব অবস্থাটি অত সহজ নয়।

প্রথমেই সেলসম্যানের বোঝা উচিত যে কোন জিনিষের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করা এক জিনিষ, আর একেবারে ক্রয় করা অন্য জিনিষ। হয়ত একজন ভদ্রলোক বুনো জন্তু জানোয়ার দেখতে খুবই ভালবাসেন, ঘন ঘন চিড়িয়াখানায় বেড়াতে যান। এই ব্যাপার লক্ষ্য করে চিড়িয়াখানার ওয়ার্ডেন ভদ্রলোকটি যদি তাকে প্রস্তাব দেয় যে একটা উট কিংবা একটা হাতি কিনবেন কি না, সেই ব্যাপারটা যেরকম অবাস্তব এবং হাস্যকর হয়ে ওঠে এটা কতকটা সেইরকমই। আসলে ব্যাপারটি তা নয়।

এতক্ষণ সেলসম্যানটির যা কিছু কসরৎ সব কিছুরই উদ্দেশ্য ছিল বিক্রীর একটা ভীত তৈরী করা মাত্র। যে ভীতের ওপরে নির্ভর করে সে তার বিক্রয় প্রস্তাবটি রাখতে পারে ক্রেতার কাছে। আগ্রহকে আহরণ করার ইচ্ছায় পরিণত করতে পারে সে। এক্ষেত্রে আবার একবার মনে করে নিতে হচ্ছে যে কোন লোকই শুধুমাত্র চোখের দেখা দেখে কোন জিনিষ খরিদ করেন না। খরিদ করেন সেই জিনিষটির ব্যবহারিক দিকটার দিকে লক্ষ্য রেখে। জিনিষটা কিনে তার কি লাভ হবে সেইটা জেনে। সুতরাং এইবারে সেলসম্যানটির কাজ হচ্ছে তাকে ভালভাবে বোঝাতে হবে জিনিষটি নিলে ক্রেতার কি কি লাভ হবে।

এবং কোন রকম বিরতি না নিয়েই সেলসম্যানটিকে উপস্থিত

হয়ে (এক) জিনিষটি উপস্থাপিত করে (দুই) বিক্রয় প্রস্তাবটি সামনে ঠেলে দিতে হবে (তিন) অর্থাৎ কতকটা এইরকমের—

সেলসম্যান—সুতরাং মিঃ সরকার—আমাদের প্রডাক্টটি ত দেখলেন, গুনাগুণ সমেত সবই বললাম আপনাকে। এবার বরং আপনার ব্যবসায়ে এই জিনিষটি কি উপকারে আসবে সেটা দেখা যাক।

কিংবা—দেখলেন ত মিঃ সরকার আমরা কি ধরণের ডুপ্লিকেটিং মেশিনের ব্যবস্থা করেছি। এখন আসুন বরং দৈনিক কষ্ট স্ট্রাকচার খতিয়ে দেখা যাক আপনারা কতটা লাভবান হবেন মেশিনটি নিলে।

অথবা—মিঃ সরকার—প্লাওয়িং মেশিনটির নানাধরনের সুযোগ সুবিধার কথাত বললাম। আপনি নিশ্চয়ই ভাবছেন টাকা আনা পাই-এর দিকটা। সেটাই খতিয়ে দেখা যাক বরং—

এই ধরণের কথা বলে সেলসম্যানটি তার বিক্রয় পদ্ধতির দ্বিতীয় স্তর থেকে ক্রেতাকে নিয়ে যাবে তৃতীয় স্তরে।

এই তৃতীয় স্তরের কথোপকথনে সেলসম্যানটি কোন অবস্থাতেই দ্বিতীয় স্তরের কথা আবার বলতে আসবে না। কারণ ধরেই নিতে হবে যে সেলসম্যানটি তার দ্বিতীয় স্তরের কাজটি সুচারুভাবে সম্পন্ন করেছে এবং ক্রেতাও ভালরকম ভাবে অনুধাবন করেছে বিষয়টি।

তৃতীয় স্তরের আলোচনাটি তাই হবে সীমাবদ্ধভাবে, এবং ক্রেতার মানসিকতার প্রথম এবং শেষ আগ্রহটি সম্পর্কিত যেটা, সেটা হল—জিনিষটি কিনে তার কি লাভ।

লাভের বিষয়টি ব্যাখ্যা করা

তৃতীয় স্তরে আলোচনার দুটি ভিন্ন রকম রয়েছে—

১। যদি জিনিষটি রিটেল কাউণ্টারে বিক্রীর কথা হয় যেখানে দোকানদার জিনিষটি কিনে আবার বিক্রী করবে সেখানে দোকানদারের মূল সমস্যাটি হল—জিনিষটা বিক্রী হবে কি না—এবং হলে তার লাভের পরিমাণটি কত।

২। যন্ত্রপাতি কেনার ব্যাপার যদি হয় তাহলে ক্রেতার শুধু একটাই চিন্তা কতবেশী ক্যাপিটল লগ্নী করতে হবে কতদিনে এবং করা হলে সেই যন্ত্রপাতি থেকে তার উৎপাদন কতটা বাড়বে, লাভ তাতে কি রকম।

বেশীর ভাগ সময়েই দেখা গেছে যে সেলসম্যান যে জিনিষ বাজারে বিক্রী করতে নিয়ে আসছে তার দাম কত সেটা ওরা মুখস্থই করে রাখতে পারে। জিজ্ঞাসা করলে যথাযথ বলেও দিতে পার। কিন্তু সেলসম্যানরা অনেক সময়েই ক্রেতার লাভের পরিমাণ কি ধরণের হবে সে সম্পর্কে কোন স্পষ্ট ধারনা তৈরী করে আসে না। অথচ কেনা কিংবা না কেনাটা সর্বাংশে নির্ভর করছে কিনলে কি কি সুবিধা সে পাচ্ছে সেটা জানার ওপর। এইরকম একটা অবস্থা ক্রেতার সামনে উদ্ভব হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এটা সেলসম্যানদের আগেভাগেই চিন্তা করে রাখা দরকার। এবং সে ব্যাপারে তৈরী হয়ে থাকাও দরকার।

সুতরাং এতক্ষণ সময় ধৈর্য এবং বাক্য বিনিময় করার পরে সেলসম্যানটি যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সময়ে এসে দাঁড়িয়েছে সেটা বোঝা দরকার। কারণ এই সময়টাতেই সে যা বলবে বা করবে তার ওপরেই তার পরিশ্রমের ফল লাভের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

অন্যান্য সুযোগ সুবিধার কথা

ওপরের প্রত্যক্ষ লাভের ব্যবস্থা ছাড়াও অনেক ধরনের গৌণ সুযোগ সুবিধার কথাও বলা যেতে পারে।

১। স্টক করার প্রতিযোগিতা ২। সাবধানতা মনে করিয়ে দেয়া। ৩। ব্যবসা বাড়ানোর সুযোগ ৪। দোকানের সম্মান বাড়ানো। ৫। ভাল জিনিষ রেখে বাজে প্রতিযোগিতা এড়ানো।

এবার সিদ্ধান্তের কথা

আমাদের সেলসম্যানটি ত্রিস্তর বিক্রয় প্রয়াস পেরিয়ে এখন চতুর্থ অর্থাৎ শেষ স্তরে প্রবেশ করছে। এতক্ষণে সে তৃতীয় স্তরের সিদ্ধান্তের জন্য সুস্পষ্ট প্রস্তাব ইতিমধ্যেই রেখেছে। আশা করাটা অন্যায় নয় যে ক্রেতা সিদ্ধান্তের দিকে এগিয়ে গেছেন। এবং সেই সীদ্ধান্তে সেলসম্যানটির দুঃখের কারণ নেই। কিন্তু অনেক সময় দেখা গেছে যে বেশীর ভাগ সংখ্যক ক্রেতা একটু ইতস্তত করবেনই। হয়ত একথাটি ঠিক যে ক্রেতা জিনিষটাকে ভাল কিংবা মন্দ নয় অথবা "বেশত" বলবেন কিন্তু মনে মনে একটা চিন্তা তার থাকবেই,—বলল বটে সেলসম্যানটি, দেখছিও ত ঠিকঠাক কাজ করছে। পরবর্তীকালে কাজ করবে ত। সিদ্ধান্ত নেয়ার সময়টিতে ক্রেতা ইতস্তত করছেন। আবার অনেক আছেন যারা খুব স্পষ্টভাবে—না ভাই, দরকার নেই এখন, পরে বরং ভেবে দেখব অতগুলো টাকা লগ্নীর ব্যাপার—কিংবা আচ্ছা ঠিক আছে একটা নিয়ে দেখা যাক—এই দুইশ্রেণীর ক্রেতা যারা সীদ্ধান্ত নিতে পারেন অতি সহজেই তাদের ছাড়া যারা ইতস্তত করবেন, তাদের সঙ্গে আমাদের সেলসম্যানটিকে অনেক সাবধানে, বুদ্ধি খরচ করে এমন একটা দিক থেকে কথা বলার চেষ্টা করতে হবে যে কথা ক্রেতাকে সাহায্য করবে ক্রয় করার সিদ্ধান্তের কাছাকাছি।

আমাদের সেলসম্যানটি খুব সাবধানে বিক্রয় পদ্ধতির তিনটি স্তর পেরিয়ে এসেছে। চতুর্থ স্তরে যে ক্রেতাটি কেনার ব্যাপারে ইতস্তত করছে তাকে স্পষ্ট করে সিদ্ধান্ত নেয়ার কথা বলতে পারছে না। এই রকম ইতস্তত ভাবটা স্বাভাবিক। কারণ সে ভেবেছে যে যা কিছু করণীয় সবই করা হয়েছে—অর্ডার দেবে না বলে নিত। সুতরাং স্পষ্টভাবে এখনই সিদ্ধান্তের কথা বললে পুরো ব্যাপারটাই নষ্ট হয়ে যায় যদি। অবশ্য মানসিক দিক থেকে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে এরকম মানসিকতার কারণ দুর্বলতা। সেলসম্যানটি দুর্বল হয়ে পড়ল পরিশ্রম ব্যর্থ হওয়া এবং অর্ডার না পাওয়ার সন্দেহে। এই সময়টিতেই কিন্তু সেলসম্যানটির সবচেয়ে বেশী আত্মবিশ্বাস থাকা প্রয়োজন,—কারণ— ১। সে দেখা করেছে ২। গুনাগুণ বিশ্লেষণ করেছে ৩। অর্থ সাশ্রয়ের হিসেব দিয়েছে

৪। বিক্রয়-উত্তর সার্ভিসের কথা বলেছে,

৫। অন্য জিনিষের চাইতে কত ভালো সেটা বুঝিয়েছে

৬। এবং এই সব কাজগুলিই সে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে করেছে বিক্রীর জন্য—চায়ের কাপে তুফান তোলার জন্য নয়।

ফলে সিদ্ধান্তের কথা যদি সে না বলতে পারে তাহলে উপরোক্ত সবকটি ক্ষেত্রের আত্মবিশ্বাসের ভিত্তি শ্লথ হয়ে যাবে। কিন্তু সেই পরিস্থিতি না ভেবে সেলসম্যানটি অন্যক্ষেত্রে অন্যতর কৌশল অবলম্বন করতে চাইল। সে হয়ত বলল—"ঠিক আছে মিঃ সরকার—আপনিত ব্যস্তও রয়েছেন কম না। আপনি একটু ভাবুন ব্যাপারটা নিয়ে ভালো করে—আমি বরং সামনের সপ্তাহের কোন সময়ে এসে যাব একবার—"

কিন্তু একজন ক্রেতা যখন ওই বিষয়ে অতটা সময় দিয়েছে, যখন তার মনে এই বিষয়টিই ঘোরাফেরা করছে, তখন তাকে ছেড়ে দিলে সেই ব্যস্ত লোকটি অন্য বিষয়ে দ্রুত চলে যাবে। পরের বারে

সেলসম্যানটি এসে দেখবে ক্রেতা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানেই রয়েছে। হয়ত আবারও কেঁচেগণ্ডুষ করতে হতে পারে তাকে। সুতরাং তৃতীয় স্তরের কথাবার্তা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্তের কথা বলাটাই অত্যন্ত জরুরী কাজ।

সিদ্ধান্তের কথা এ ভাবে বলবেন না

তৃতীয় স্তরের কথাবার্তা শেষ করে সেলসম্যানটি যদি ইস্তস্তত করতে থাকে ক্রেতাকে সিদ্ধান্তের কথা যদি এমনভাবে বলে—

"ঠিক আছে মিঃ সরকার—ডজন তিনেক নিয়ে চেষ্টা করে দেখুন না। কি হয়"—

এরকম বললে পুরো ব্যাপারটাই গোলমাল হয়ে গেল। কারণ ইতস্তত করা ক্রেতাকে ঠিক আছে বলে এই মুহূর্তে সিদ্ধান্ত না নিতে সাহায্য করল যে তারপর "ডজন তিনেক নিয়ে দেখুন না বলে জিনিষটা সম্পর্কে সন্দিহান করে তোলা এবং সর্বোপরি "দেখুন না হয়"—অর্থাৎ বিক্রী হয় কি না সে ব্যাপারে সন্দেহের উদ্রেক করা। সব মিলিয়ে ক্রেতা আরও গোলমালে পড়ে যাচ্ছে।

সোজাসুজি প্রশ্ন করাটা ঠিক নয়

সোজাসুজি প্রশ্ন করাটা বিপজ্জনক। যেমন এই সেলসম্যানটি যদি প্রশ্ন করে—

"—আচ্ছা মিঃ বিশ্বাস—আপনার কি মনে হয় না জিনিষগুলা রাখা উচিৎ আপনার।"

কিংবা—"বরং ডজন তিনেক পাঠিয়ে দিচ্ছি কি বলেন"—

অথবা—"কি ঠিক ত, এতগুলো টাকার সাশ্রয় হচ্ছে বুঝলেন ত"—

এই সবকটি প্রশ্নের মধ্যেই ক্রেতাকে সিদ্ধান্তের ব্যাপারে হ্যাঁ কিংবা না দুটোর যে কোন একটা বলার সুযোগ করে দেওয়া হল ! যে ক্রেতা ইতস্তত করছিল অর্থাৎ হ্যাঁ করে নি, সে সঙ্গে সঙ্গে না করার জোর পেয়ে যাচ্ছে।

"ক্রেতা-মানসিকতার পর্যালোচনা"

বর্তমানের বাজারে চার ধরনের ক্রেতার সঙ্গে সেলসম্যানদের দেখা করতে হয়। ভালভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে এই চার ধরনের ক্রেতার মানসিকতাই সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের।

১। একটু ভাবুক প্রকৃতির ২। আবেগ প্রধান

৩। যুক্তি প্রধান ৪। নির্ভরশীল

ভাবুক প্রকৃতির ক্রেতা

যুক্তি এবং বুদ্ধি খুব তীক্ষ্ণ এখানে। আবেগের প্রশ্রয় খুবই কম। স্পষ্ট সংক্ষেপে কথাবার্তা পছন্দ করেন। পছন্দ করেন টু-দি পয়েন্ট আলোচনা। শান্ত, হিসেবী ধরনের মানসিকতা, খুব দ্রুত সবকিছু ধরে ফেলতে পারেন। অন্তর্মুখীন মন। বলতে গেলে বিক্রীর ব্যাপার এই ধরনের ক্রেতাদের কাছে কাজ গুছিয়ে নেওটা খুবই কঠিন কাজ।

সেলসম্যান এরকম ক্রেতার মুখোমুখি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটি মুহূর্ত সময়ও নষ্ট না করে সোজাসুজি কাজের কথায় চলে আসবে, ধীর স্থির ভাবে, টু-দি-পয়েন্ট আলোচনা করবে সে। এখানে সেলসম্যানের যা কিছু কৌশল সবই হবে যুক্তিনির্ভর। সম্ভব হলে দুএকটা মনীষিদের বানী প্রয়োগ করতে পারলে মন্দ হয় না।

যুক্তিপ্রধান

কিছু ক্রেতা আছেন যারা তাদের ব্যক্তিগত মানসিকতা সন্তঃর্পনে দূরে সরিয়ে রেখে কাজের কথা ভাবতে ভালবাসেন। এরা সাধারণতঃ অত্যন্ত যুক্তিপ্রধান হয়ে থাকেন। ব্যক্তিগতভাবে কি ভাবছেন সেখানে আসতে দিতে চান না। এরা সঠিকভাবে কাজ করতে চান। সঠিকভাবে চিন্তা করতে চান। সঠিকভাবে শুনতেও চান সবকিছু।

সেলসম্যানের কাছে ক্রেতার মানসিকতা ভালরকম বিশ্লেষণ করার মত শিক্ষা থাকার দরকার। ঠিকমতন মানসিকতা অন্-দি-স্পট বুঝতে পারলে সবধরনের ক্রেতার কাছ থেকেই কাজ গুছিয়ে নেয়া সেলসম্যানের কাছে কিন্তু কঠিন নয়।

নির্ভরশীল ক্রেতা

অনেক ক্রেতা আছেন যারা সর্ববিষয়ে অন্য কোন ওপরওয়ালার কথায় নির্ভরশীল। সে নিজে কিছু সিদ্ধান্তে নেয়ার কথা ভাবতেই পারে না। এইসব ক্ষেত্রে সেলসম্যানকে ক্রেতার কাছে দুটো মানসিকতা বিশ্লেষণ করে কথা বলতে হচ্ছে। একটা ক্রেতা যিনি সমানে রয়েছেন এবং অন্য একজন-যিনি পিছনে।

আবেগপ্রধান ক্রেতা

ভাবুক প্রকৃতির ক্রেতার ঠিক উল্টো মানসিকতা এদের। জীবন খুব সহজ সরল ভাবে নিতে চান এরা। পরিশ্রম পছন্দ করেন না এরা। যেহেতু এরা সব সময়েই অন্যদের সঙ্গে ভালোরকম মানিয়ে চলতে সক্ষম সেইহেতু খুব দ্রুত এরা প্রোমোশন পেয়ে পরিচালনা ক্ষেত্রে উন্নীত হয়ে থাকেন। খেতে ভালবাসেন এরা। খুব স্বাভাবিকভাবে জীবনটা নিতে চান।

সাধারণতঃ এদের চিন্তা ভাবনা খুবই শ্লথ, ফলে সেলসম্যানকে খুব সাবধানে ধীরে না কথা বলতে হবে, হলে কথার খেই হারিয়ে যেতে পারে।

সাধারণভাবে আবেগদ্বারা পরিচালিত হন এরা যুক্তিতর্কের চাইতে। সেলসম্যান যেহেতু চেষ্টা করবে এই ক্রেতাটির আবেগ প্রধান দিকটাকে লক্ষ্য করে। বস্তুত যদি সেলসম্যান এই ধরনের ক্রেতার একটু ভালো নজরে পরতে পারে, তাহলে অনেক সুবিধা অনায়াসেই পেতে পারবে সে। সর্বোপরি যদি সেলসম্যানটি এমন কোন জিনিষের প্রস্তাব নিয়ে আসে, যে জিনিষ কিনলে ক্রেতার পরিশ্রমের দিকটা লাঘব হবে তাহলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে খুব একটা দেরী হবে না—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

মন জয় করার সহজ উপায়

ডেল কার্নেগী রচিত

THE QUICK AND EASY WAY TO EFFECTIVE SPEAKING

অবলম্বনে

ভাষান্তরিত সম্পাদনা

অচিন চৌধুরী

মনোমোহন প্রকাশনী * কলিকাতা-তিয়াত্তর

যিনি স্থিরচিত্র ও চলচ্চিত্র শিল্পে যুগান্তকারী বিপ্লব
ঘটিয়েছেন সেই রঙীন ফিল্মের আবিষ্কারক
ও ডেল কার্নেগীর একান্ত ভক্ত
জর্জ ইষ্টম্যান-এর
স্মৃতির উদ্দেশ্যে—

ডরোথী কার্নেগীর বক্তব্য

নিউইয়র্ক সিটির একশো পঁচিশ নম্বর রাস্তার দুধ-সাদা রংয়ের সেই বিশাল বাড়িটার সামনে দাঁড়ালেই, আমার হৃদয়ে, সমস্ত অনুভূতিতে, এক ভূ-কম্পন টের পাই। এক করুণ বিষাদময়তার রেশ আমার চোখ-কান আর জিহ্বাকে আড়ষ্ট ও আচ্ছন্ন করে ফেলে। নিউইয়র্কের আকাশে তখন সোনা গলানো রোদ্দুর। রাস্তায় চলমান মানুষের স্রোত। অথচ ডেল কার্নেগী আর আমাদের মধ্যে নেই, ইনস্টিটিউশনে ক্লাশ নিতে আসবেন না আর কখনও। কিন্তু ডেল বেঁচে রইলো, তার কাজকর্মে, বই-পত্রে সারা পৃথিবীতে স্থাপিত ডেল কার্নেগী শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে। আপনারা—যারা জীবনে বড় হতে চান, উন্নতি করতে চান, নিজের পায়ে দাঁড়াতে চান, তাদের অবশ্যই জানতে হবে, কেমন করে সহজেই লোকের মন জয় করা যায়। ব্যবসা-বাণিজ্য আর বেচা-কেনা বাড়িয়ে, আয় উন্নতির নতুন নতুন পথ খুঁজে পেতে হলেও এ বইটি আপনার অবশ্যই পড়া উচিত। ডেল কার্নেগীর সারা জীবনের কঠোর পরিশ্রমলব্ধ অভিজ্ঞতা আর অনুশীলনের ফসল এই বই। মানুষের জীবনে উন্নতির নব নব সোপান তৈরী করার ব্রত নিয়েই তিনি এ বই লিখেছেন।

—ডরোথী কার্নেগী।

উনিশ বছর বয়সে আমার জীবনের প্রার্থনা বদলে যায়। একটি বই আমার হাতে এসেছিলো। সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদ আর মালমশলার বারুদে ঠাসা বিচিত্র বিবরণ আমাকে যেন হাজার হাজার মাইল পরিভ্রমণ করিয়েছিল। লেখকের অভিজ্ঞতার উত্তাপে, নতুন চেহারা ও নতুন চরিত্রের সৃজনশীল মনের এক অনবদ্য অর্ঘ্য ছিল সেটা।

গ্রীনল্যাণ্ড থেকে সাহারা মরুভূমি, অ্যারিজোনা থেকে অষ্ট্রেলিয়া—পৃথিবীর সবকটি মহাদেশের মানুষ তাঁকে চেনেন, জানেন, শ্রদ্ধা করেন। জগৎ-বিখ্যাত এই ব্যক্তিটি আর কেউ নন—ডেল কার্নেগী।

এ পর্য্যন্ত বাইশটি ভাষায় ডেল কার্নেগীর লেখা অনূদিত হয়েছে। প্রায় দেড় কোটি বই বিক্রি হয়েছে বিগত কয়েক বছরে।

পৃথিবীর বিভিন্নপ্রান্তে ডেল কার্নেগী ইনস্টিটিয়্যুশন থেকে পাঠ্যক্রম শেষে কাজে সফলতা লাভ করেছেন এক কোটিরও বেশী ছাত্র-ছাত্রী।

আপনারা যারা জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফলতার চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছুতে আগ্রহী—তাদের কাছে এ বইটির মূল্য অপরিসীম।

প্রকাশক প্রবীর ভট্টাচার্য বয়সে নবীন হলেও ডেল কার্নেগী প্রকাশনার দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে বিচক্ষন এক প্রবীণের ভূমিকা পালন করেছেন।

বইটির অনুবাদের সময় দেবযানী মজুমদারের সুচিন্তিত মতামত আর সাহায্যের জন্যে আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ।

শুধু মাত্র মুখের কথা দিয়ে মানুষের মন জয় করা—এ পর্যায়ে ডেল কার্নেগীর লেখা সেরা ফসল, চয়ন করে আপনাদের হাতে তুলে দিতে উদ্যোগী হলাম। আপনারা গ্রহণ করলে কৃতার্থ হবো।

—অচিন চৌধুরী

এ বই কেন আপনি পড়বেন * এ বই আপনাকে কি দেবে—

* *

বক্তা, বক্তব্য, শ্রোতা একসূত্রে গেঁথে ফেলুন—

* *

অন্যলোকের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিন—

* *

প্রথমে আপনার লক্ষ স্থির করুন—

* *

মনে দৃঢ় বিশ্বাস রাখুন, আপনি সফল হবেনই।

* *

কী ভাবে আত্মবিশ্বাস বাড়ানো যায়, আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর সহজ পন্থা—

* *

সঠিক ভাবনায় নিজেকে তৈরী করুন—

* *

স্মৃতি হাতড়ে শব্দ বা কথা খুঁজবেন না—

* *

চিন্তার সূত্রগুলোকে একত্রিত করুন—

* *

পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাস নিয়ে কাজ করুন—

* *

সংকোচ, গাম্ভীর্য্য আর আত্মসচেতনতার শক্ত খোলস ছেড়ে বেড়িয়ে আসুন—

* *

আসন্ন জয়লাভের জন্য প্রস্তুত হোন—

আমাদের বলুন জীবন থেকে কি শিখলেন আপনি—

*　　　　　　　*

কার্যকরীভাবে কথা বলার দ্রুত ও সহজ উপায়—

*　　　　　　　*

কথা বলার বিশেষ অধিকার অর্জন করুন—

*　　　　　　　*

বিষয় বস্তুকে অযথা বাড়াবেন না—

*　　　　　　　*

নিজে শ্রোতার সঙ্গে একীভূত হন—

*　　　　　　　*

শ্রোতার সঙ্গে বক্তব্য বিনিময় করুন—

*　　　　　　　*

শ্রোতার ভালোলাগার দিকে লক্ষ রেখেই বক্তব্য রাখুন—

*　　　　　　　*

শ্রোতার মন কাড়তে সৎ ও আন্তরিক হন—

*　　　　　　　*

সজীব ও প্রাণবন্ত কথা বলুন—

*　　　　　　　*

আপনার অভিজ্ঞতায় প্রাণ সঞ্চার করুন—

*　　　　　　　*

নিজে শ্রোতার সঙ্গে একীভূত হন—

*　　　　　　　*

কার্যকরী ভাবে কথা বলার দ্রুত ও সহজ উপায়—

প্রথম অধ্যায়

মন জয় করার সহজ উপায় সম্পর্কে প্রাথমিক কথা

জনসাধারণের সামনে কি ভাবে বক্তৃতা দিতে হয় এই সম্পর্কে আমি প্রথম শিক্ষা দিতে শুরু করেছিলাম ১৯১২ সাল থেকে। সে বছরেই বিখ্যাত 'টাইটানিক' জাহাজ উত্তর আটলান্টিকের বরফের চাঙড়ে ধাক্কা খেয়ে ডুবে যায়। এ পর্যন্ত সাতশো পঞ্চাশ হাজারেরও বেশী ব্যক্তিকে আমি শিক্ষা দিয়েছি ডেল কার্নেগী শিক্ষাক্রমে।

প্রতিটি শিক্ষার্থীকেই আমি বলার সমান সুযোগ দিতাম, কেন বা কী উদ্দেশ্যে তারা এখানে পড়তে এলেন। এ বিষয়ে তাদের অধিকাংশের বক্তব্যই ছিলো সহজ সরল এবং মূলত একই পর্যায়ের। এতে অবাক হবার কিছু নেই যে সত্যিকারের চাহিদা ছিলো তাদের, কী করে রুজী রোজগার বাড়ানো যায় বা কর্মক্ষেত্রে পারদর্শিতা অর্জন করতে সক্ষম হবেন। কি ভাবে সুনিয়ন্ত্রিত করা যেতে পারে মানবিক সম্পর্ক। কী করে ধ্যান ধারণাকে ঠিকমতো ব্যক্ত করতে পেরে নেতৃত্ব গ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করবেন এবং সহজেই অপরকে অনুপ্রাণিত করে অন্য সবার চাইতে অনেক বেশী অর্থ সংগ্রহ করতে সক্ষম হবেন।

এবার আসা যাক শিক্ষার্থীদের নিজেদের কথায়। যেমন ধরুণ একজন ব্যবসায়ী আমাকে বললেন, "সভা-সমিতি-লোকজনের সামনে কিছু বলতে গেলেই আমি বড় বেশী আত্ম-সচেতন হয়ে পড়তাম, ভয়ে সব কিছু গুলিয়ে যেতো কোন কথাই গুছিয়ে বলতে পারতাম না। আমি আমার দৃঢ় আত্মবিশ্বাস ফিরে পেতে চাই। ভাব-ভাবনা এবং বক্তব্যকে স্পষ্ট করে কার্যকরী ভাবে প্রকাশ করতে

চাই। এককথায় আমি চাই কথা বলার যোগ্যতার দক্ষতা অর্জন করতে।

এ-কথাগুলো কি আপনার খুব চেনা মনে হচ্ছে না। আপনি নিজেও কি ভুক্তভোগী নন, আপনার কি ইচ্ছে হয়না সুন্দরভাবে গুছিয়ে কথা বলতে; চমৎকার বক্তৃতা দিয়ে শ্রোতাদের মুগ্ধ করে রাখতে? আমি খুব ভাল করেই জানি আপনার মনের গোপন বাসনা। আমি বলছি আপনি পারবেন তা করতে। যে মুহূর্তে থেকে আপনি এই বই পড়তে শুরু করেছেন তখন থেকেই আপনি ভাবছেন কী ভাবে কথা বলার দক্ষতা লাভ করবেন। আমি জানি আপনি কি বলবেন। এখন আমি যদি আপনার সামনে থাকতাম, আপনি হয়তো বলতেন—কিন্তু মিঃ কার্নেগী আমি কি পারবো আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে সাবলীলভাবে অনর্গল বলে যেতে?

আমি আমার জীবনের বেশীর ভাগটাই ব্যয় করেছি জন-সাধারণের সাহায্য কল্পে। তারা যাতে ভয় কাটিয়ে সাহস আর আত্মবিশ্বাস ফিরে পেতে পারে এই ভেবে। আমি আমার প্রতিটি বইতে জীবিকা অন্বেষণকারীর প্রয়োজনীয় শিক্ষণীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি। এ বইতে যা বলেছি এ শুধু আমার ব্যক্তিগত চিন্তা নয়। আমি আমার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা লব্ধ শিক্ষা থেকেই বলছি—আপনি পারবেন প্রকৃত স্বাবলম্বী হতে, যদি আপনি সব নির্দেশ যথাযথভাবে অনুশীলন করেন, প্রতিটি মতামত মেনে চলেন নিষ্ঠার সঙ্গে।

এ বই আপনাকে আপনার লক্ষ্যে পৌঁছে দেবে। এ বইকে যেন সাধারণ পাঠ্য পুস্তক ভাববেন না দয়া করে। বইটি পড়ুন। বার বার পড়ুন। সর্বদা হাতের কাছে রাখুন। এ বইয়ের মতে চললে ম্যাজিকের মতো ফললাভ হবে আপনার। অবিশ্বাস্য বা অলৌকিক মনে হতে পারে কিন্তু এটা সত্যি, ঠিকমত নির্দেশ ও শিক্ষণীয় কর্তব্য মেনে চললে, আপনার জীবনে আমূল পরিবর্তন আসবেই আসবে।

*

*　　　　*

১। অন্যালোকের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিন

একবার ফিলাডেলফিয়ার সবচেয়ে ধনী ব্যবসায়ী মিঃ জনসন-এর সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজনের আমন্ত্রণ এলো আমার। খাবার টেবিলে আমার দিকে ঝুঁকে, লাজুক গলায় তিনি জানালেন—নানারকম সভা-সমিতিতে যেতে হয় আমাকে, বক্তব্য রাখার অনুরোধে আমি খুবই বিব্রত বোধ করি। নানারকম অজুহাত দেখিয়ে দায়সারাভাবে কাজ করতে হয়। কিন্তু এবারে ভীষণ মুশকিলে পড়েছি। কলেজ ট্রাষ্টীবোর্ডের চেয়ারম্যান করা হয়েছে আমাকে। আমাকে এখন থেকে ওদের প্রতিটি সভায় সভাপতিত্ব করতে হবে। আপনি কি মনে করেন এ বুড়ো বয়সে নূতন করে বক্তৃতা করা শেখা সম্ভব হয়ে উঠবে আমার পক্ষে। আমার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে আমি তাকে জানালাম—হ্যাঁ সম্ভব হবে যদি আপনি আমার কথামত প্রশিক্ষন নেন, নিয়মিত অনুশীলন করে করে যান প্রতিটি পাঠ।

তিন বছর পরের কথা। সেই একই হোটেলের খাবার টেবিলে মুখোমুখি বসে কথা বলছিলাম আমি ও মিঃ জনসন। তিনি হঠাৎ বলে উঠলেন—জানেন তো মিঃ কার্নেগী, ফিলাডেলফিয়ার গীর্জা-সমিতির আমন্ত্রণে ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী আসছেন এখানে। দীক্ষান্ত সভায় তিনিই পৌরহিত্য করবেন। ফিলাডেলফিয়ার অভিজাত সমাজ থেকে আমাকে নির্বাচিত করা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রীর অভ্যর্থনা সভায় ভাষণ দেবার জন্য।

ভাবতে অবাক লাগে, এই সেই লোক যিনি পূর্বে বক্তৃতা দেবার নাম শুনলেই ভয়ে মূর্চ্ছা যেতেন।

শুনতে অবাক লাগলেও এ ঘটনা পুরোপুরি সত্যি। বিংশ শতাব্দীর অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা হল ভয়কে জয় করতে পারা।

(আপনিও আজ থেকে মনের সব ভয়কে দূরে সরিয়ে রেখে কাজে নেমে পড়ুন। আন্তরিকর ভাবে এটা করুণ। দেখবেন এতে যাদুর মত কাজ হবে। মনে রাখবেন আপনিও মানুষ, যাদের সামনে বক্তব্য রাখছেন তারাও আপনার মতই মানুষ)

২। প্রথমে আপনার লক্ষ্য স্থির করুন

লোকের মন জয় করার প্রথম সোপান হল, সুন্দর কথা বলতে পারার ক্ষমতা অর্জন করা। জন সমাবেশে কিছু বলার পূর্বে প্রথমেই ঠিক করুণ আপনি কি বলতে চান। সেটা জানা থাকলেই আপনার চিন্তাকে, যুক্তি-তর্কের জাল বুনে দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে শ্রোতাদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারবেন।

আপনি সমস্ত মন-প্রাণ ঢেলে অনুশীলন শুরু করু। প্রথমে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে ঘরোয়াভাবে কথা বলা অভ্যাস করুন। তাড়াহুড়ো না করে গুছিয়ে বলার দিকে লক্ষ্য রাখুন। আগামী দিনে হাজার লোকের সামনে আপনি বক্তৃতা দিচ্ছেন, মনশ্চক্ষে এ ছবিটা দেখার চেষ্টা করুন। তাহলেই আত্মবিশ্বাস ফিরে পাবেন। সাহসী হবেন ক্রমাগত নিরলস অনুশীলনে আপনার স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত হবেই হবে। একমাত্র কিছু বলার মাধ্যমেই সত্যিকার জনসংযোগ ঘটে এবং কার্য্যকরী হয় সর্বতোভাবে। এ সম্পদকে কাজে লাগিয়ে কেউ কেউ রাতারাতি তার ভাগ্যকে ফিরিয়ে ফেলেন। কি বিশ্বাস হচ্ছে না? তাহলে একটা দৃষ্টান্ত দি—আমেরিকার একটি বহুল প্রচারিত দৈনিক 'ন্যাশানাল ক্যাশ রেজিষ্টার কোম্পানী' এবং ইউনেসকোর চেয়ারম্যান মিঃ ক্লেয়ার ডোলান "স্পিচ্ এণ্ড লিডারশীপ ইন দি বিজনেস" নামে একটি আলোড়ন তোলা নিবন্ধ লিখে ছিলেন। তাতে এক জায়গায় বলেছেন—আমাদের ব্যবসা বাণিজ্যের ইতিহাসে অনেকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলো বক্তৃতামঞ্চে

ভালো বক্তৃতা পেশ করার জন্যই। অনেককাল আগে কানসাসের ছোট্ট অফিসে বিক্রির দায়িত্বভার ন্যস্ত ছিল একটি ছেলের হাতে। একবার সে মঞ্চে কিছু বলার সুযোগ পেলো। ছেলেটি সম্পূর্ণ আলাদাধরণের সম্মোহনকারক বক্তব্য রেখে বিস্মিত করে তুলে ছিলো উপস্থিত হোমরাচোমরাদের। উন্নতির সোপান খুলে গেলো ছেলেটির সামনে। আজ সেই ছেলেটিই হল 'ন্যাশানাল ক্যাশ রেজিষ্টার কোম্পানীর ভাইস চেয়ারম্যান। পরে তার খোঁজ নিয়ে জেনে ছিলাম, পরবর্তীকালে ভাইসচেয়রাম্যান থেকে প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হয়ে ছিল সেই ছেলেটি।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্তত্বের অধ্যাপক হেনরী জেমসের কথা দিয়েই বলা যাক—যে কোন বিষয়ে আপনার নিষ্ঠাই আপনাকে বাঁচাবে। যদি আপনি ভালো ফল পেতে আগ্রহী হন তবে একাগ্রতার সংগে করনীয় কাজ করুন। যদি আপনি চান সাফল্য- তবেই সাফল্য আসবে। যদি আপনি ধনী হবার জন্য একাগ্রচিত্তে কামনা করেন, তবে আপনি ধনী হবেনই। যদি আপনি মন দিয়ে চান পণ্ডিত হতে, তবেই পণ্ডিত হতে পারবেন। সমস্ত মনপ্রাণ ঢেলে চাইতে পারলেই একমাত্র তা কাজে রূপায়িত হবে, অন্যথায় নয়। একশোভাগ ইচ্ছের মধ্যে একশোভাগই নিষ্ঠা আর অনুশীলনে যিনি ব্যয় করেন তিনি সফল হন অতি সহজেই। আরো সহজ করে বলা যায়—আমাদের প্রত্যেকের ভেতর যে শক্তি, ক্ষমতা এবং নানারকম যোগ্যতা রয়েছে সে সম্পর্কে আমাদের কোন রকম পুরোপুরি ধারনা নেই। একটু আধটু বা বড়জোর অর্ধেকটা আমরা ভাসভাসা জানি—স্বচ্ছ নয়। তাই আমরা যা হতে পারি তা হইনা। আমাদের যে পরিমান শারীরিক এবং মানসিক শক্তি আছে আমরা তার মাত্র কিছুটাই কাজে লাগাই। কোন মানুষই গর্ব-ব্যক্তিত্ব নিয়ে জন্মায় না, সে অলসতা বশতঃ নিজেই নিজেকে খর্ব-রুগ্ন করে রাখে। বিচিত্রময় এবং বহুমুখী কর্মশক্তির মালিক হয়েও ব্যক্তি মানুষ খুব

কমই সারাজীবনের ব্যবহার করতে পারে। শক্তি ও ক্ষমতা আপনার মস্তিষ্কেই রয়েছে—অব্যবহৃত এবং অসংস্কৃত মরচে পড়া অবস্থায়।

এ্যামেরিকান মেডিক্যাল এ্যাসোসিয়েসনের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট এবং অধুনা আটলান্টিক সিটি সার্জন ডাঃ ডেভিস নিকসন একবার আমাকে বলেছিলেন—এমনভাবে হৃদয় আর মস্তিস্কের ব্যবহার করুন যাতে করে লোকেরা আপনার দিকে মনোযোগী হয়। আপনার চিন্তাভাবনাকে সহজ করে অন্যকে বোঝানোর চেষ্টা করুন। একজন লোক অধিক লোক বা হাজার লোকের মাঝখানেও এমন সুচিন্তিত মতামত রাখুন যা তাদের প্রভাবিত করবে, ভাবাতে থাকবে-এমনটিতো আগে শুনিনি বলে।

(প্রথমে আপনার লক্ষ্য স্থির করুন। তারপর সমস্ত মন-প্রাণ ঢেলে বিশ্বাস করতে শিখুন আপনি সফল হতে চলেছেন)

৩। মনে দৃঢ় বিশ্বাস রাখুন, আপনি সফল হবেন

একবার রেডিওর এক অনুষ্ঠানে আমাকে বলতে বলা হয়েছিল, আমি যেন সারাজীবনে যা শিখেছি তা তিন লাইনে বলে দিই। আমি বলেছিলাম—এ পর্য্যন্ত আমি যা শিখেছি তার সারকথা হল, আমাদের সবার উচিত যা আমরা ভাবি তার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা। যদি আমি বুঝতে পারি আপনি কি চিন্তা করেন তাহলে আমি সহজেই চিনে নেবো আপনি কে। একমাত্র আপনার চিন্তাই আপনাকে পরিচিতি দেবে। তাই চিন্তা-ভাবনার গতিপথ পালটে আমরা আমাদের পুরো জীবনকেই পালটে ফেলতে পারবো অতি সহজে।

(আপনিও আশাবাদী হোন। কোন অবস্থাতেই-বিশ্বাস হারাবেন না। মনে দৃঢ় বিশ্বাস রাখুন যে আপনি সফল হবেনই।)

৪। বার বার অনুশীলন করুন

জর্জ বার্নাড শ যৌবনে ছিলেন খুবই লাজুক আর ভীতু। একবার একজনের বাড়ির সামনে কুড়ি মিনিট পায়চারী করার পর, সাহস করে দরজার কড়া নাড়তে পেরেছিলেন। তাঁর দুর্বলতম দিকটা সবলতম করে তুলতে তিনি একা ঘরে আয়নার সামনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বক্তৃতার অনুশীলন করতেন, ভাবতেন এ নিয়ে। অথচ পরে তিনিই বিংশ শতাব্দীর একজন বিদগ্ধ বক্তা হিসাবে সাড়া জাগিয়ে তুলেছিলেন।

যে কোন রকম বিতর্ক অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহন করার সুযোগ নিন। নিজেকে নিজে যাচাই করুন। তর্ক-বিতর্কের মধ্যেমে, সুচিন্তিত মতামত তৈরী করতে সাহসী হোন। তবেইনা আপনি জনপ্রিয় হবেন, চিত্ত জয় করতে পারবেন অন্য সবার।

(এ বই পড়ার সাথে সাথে প্রতিটি নির্দেশ বাস্তবে পালন করুন। বারবার অনুশীলন করুন। দেখবেন আপনার ভেতরে ও বাইরে পরিবর্তন আসবে। চিন্তার স্বাধীনতা আর স্বচ্ছ দৃষ্টিভংগীর মাধ্যমেই আপনার নতুন ব্যক্তিত্ব তৈরী হবে)

দ্বিতীয় অধ্যায়

কীভাবে আত্মবিশ্বাস বাড়ানো যায়

পাঁচ বছর আগের সে দিনটির কথা আমি কোন দিনই ভুলতে পারবো না মিঃ কার্নেগী। আপনি তখন ক্লাশ নিচ্ছিলেন। আমি আলোচনা সভার সেই ঘরের সামনে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকেও ভেতরে ঢুকতে সাহস পাইনি। আমার গলা শুকিয়ে কাঠ, হাত-পা ঠাণ্ডা, মাথা ঝিম ঝিম করে উঠল ভয়ে, আমি জানতাম ভেতরে ঢুকলেই আমাকে আলোচনা সভায় আপনার সামনে কিছু না কিছু বলতে হবে। আমি ভীরু খরগোসের মত পালিয়ে বাঁচলাম যেন। অথচ যদি আমি জানতাম কী করে ভয় সংকোচ কাটিয়ে শ্রোতাদের মুখোমুখি হতে হয়, তবে হয়তো জীবনের মূল্যবান পাঁচ-পাঁচটা বছর এ ভাবে নষ্ট হতনা।"

টেবিলে আমার সামনে বসে কথা বলছিলনা কেউ। উপরের কথাগুলো যার, তিনি সেটা বলছিলেন কয়েকশো লোকের সামনে বক্তৃতা মঞ্চে দাঁড়িয়ে। আজ তিনি একজন সফল ব্যবসায়ী। আত্মবিশ্বাস আর উদ্দীপনায় ভরপুর। পাঁচ বছর আগেকার ভীরু লোকটিকে চেনাই যায় না আজ।

একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক বলেছেন—পৃথিবীতে ভয়ে যত লোক পরাজিত হয়, অন্য কোন কিছুতে তা হয় না। তাই ভয় আর হীনমন্যতা বোধ কাটাতে হবে।

১। ভয় পাবার কারন খুঁজে বার করুন

যখন যেখানে সুযোগ পাবেন কিছু বলার—সঙ্গে সঙ্গে তা কাজে লাগান। জড়তা কাটিয়ে ওঠার সব চেয়ে সোজা এবং সহজ উপায় হল

কথা বলা। কারণ, লোকের সামনে কথা বলার অনভ্যাসই আপনাকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে তোলে। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন বাড়িয়ে দেয় নাড়ির গতি দ্রুততর করে—আপনি ঘামতে থাকেন। সব কিছু তালগোল পাকিয়ে যায় আপনার।

(নিয়মিত কিছু বলার অনুশীলনই হল ভয় ভীতি থেকে মুক্তি পাবার একমাত্র উপায়)

২। সঠিক ভাবনায় নিজেকে তৈরী করুন

একবার নিউ ইয়র্ক রোটারী ক্লাবের একজন হর্তাকর্তা মিঃ ব্রাউনিং বক্তৃতা-মঞ্চে উঠে অদ্ভুত আচরণ করলেন। তাঁকে রোটারী ক্লাবের অগ্রগতি সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে বলা হয়েছিলো। তিনি বার বার ঢোকে গিলে থতথম খেলেন। বিড়বিড় করে কি যে বলার চেষ্টা করলেন নিজেই জানেন। টেবিলের উপর থেকে জলের গ্লাস টেনে নিলেম কাঁপা হাতে, পড়ে ভাঙলো গ্লাসটা। অপ্রস্তুত হয়ে কয়েকমিনিট যেন বাছাই করা শব্দ খুঁজে বেড়ালেন —কিছুই মনে এলোনা তার। অসহায় অপ্রস্তুত লজ্জিত মুখে 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' মুখ করে হঠাৎই বসে পড়লেন। তিনি নিজেই বুঝতে পারলেন না কি দিয়ে আরম্ভ করেছিলেন আর কেমন করেই বা শেষ করলেন।

এ পর্যন্ত হিসেব করলে আমাকে এক বছরে গড়ে সাড়ে চার হাজারের মত বক্তৃতা করতে হয়। অমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি কেনই বা মিঃ ব্রাউনিং ওরকম আনাড়ী ব্যবহার করলেন। মূল কারণ একটাই —কোনরকম মানসিক ও ব্যবহারিক প্রস্তুতি ছাড়াই তিনি বক্তৃতা করার দুঃসাহস দেখিয়েছিলেন। একমাত্র একজন প্রস্তুতি নেওয়া বক্তাই বক্তৃতা মঞ্চে অবিচল ভঙ্গিতে মনোগ্রাহী বক্তব্য রাখতে পারেন

—অন্য কেউ নয়। কী করে, কেমন করে একজন ভাবতে পারে, পুরোনো মরচে ধরা বন্দুক আর গুলি বারুদ দিয়ে ভয়ের দুর্ভেদ্য দুর্গ জয় করে নেবে। অথবা অস্ত্রশস্ত্র ছাড়াই দুর্গে ঢুকে পড়া সহজ হবে।

লিংকন একবার বলেছিলেন—আমি বিশ্বাস রাখি, এমন কোন দিন আমার আগামী বার্ধক্যের দিনে আসবে,—যখন কোন কিছু বলার কথা খুঁজে না পেলেও আমি অপ্রস্তুত হবে না শ্রোতাদের সামনে।

এ রকম আত্মবিশ্বাস অর্জন করা লিংকনের পক্ষে সম্ভব হয়েছিলো দীর্ঘদিনের প্রস্তুতি আর অনুশীলনের ফলেই। যদি আপনি আত্ম-বিশ্বাস বাড়াতে চান—সে চাবিকাঠি আপনারই হাতে। শ্রোতারাই আপনার নিরাপত্তার রক্ষা কবচ হবে—যদি আপনি তাদের আন্ত-রিকভাবে ভালবাসেন, তাদের চাওয়াটা অনুভব করতে পারেন হৃদয় দিয়ে।

একজন ঐতিহাসিক ও প্রখ্যাত বক্তা একবার বলেছিলেন—শ্রোতাদের ভালোবাসো—তাহলেই ভয় কুকুরের মত পালিয়ে যাবে তোমার সামনে থেকে।

(তাহলে মোদ্দা কথা হল: বক্তৃতা করার চেয়েও মনে মনে ভাবনা চিন্তাও সত্যিকারের মানসিক প্রস্তুতি অনেক বেশী জরুরী।)

৩। স্মৃতি হাতড়ে শব্দ খুঁজবেন না

একটা কথায় খট্‌কা লাগতে পারে আপনার মনে, 'সত্যিকারের প্রস্তুতি' বলতে কি বোঝাতে চাইছি। আপনি যদি ভেবে নেন যে পুরো বক্তৃতাটা পূর্বে লিখে নিয়ে মুখস্থ করে নেবেন—পরে মঞ্চে উঠে গড়গড় করে বলে যাবেন। তাহলে আমি একশো বার উচ্চরণ করবো—না ··না···না···

কখনোই এ ধরণের আত্মহত্যা করতে যাবেন না। বলার সময় দেখবেন আপনার মুখস্থ করা কথারা পাখির মত ডানা ঝাপটে কেটে কেটে পড়ছে। কালো ব্লাকবোর্ডের মত হবে আপনার স্মৃতি- এক বর্ণও মনে না পড়াটা স্বাভাবিক হবে। ফলে আপনি ডুববেন।

এ্যামেরিকান নিউজ কমেনটেটর্স্‌এর ডীন মিঃ ফোর্ড তখন হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। একবার তিনি একটি গল্প বলার প্রতিযোগিতায় অংশ নেন। তিনি একটি গল্প বেছে নেন— কষে মুখস্থ করে ফেলেন দাঁড়ি-কমা, শুদ্ধু। গল্পটার নাম ছিল— 'এক যে ছিল মহৎ রাজা।' যখন তিনি মঞ্চে উঠলেন বলার জন্য, তখন যথারীতি তিনি গল্পের নামটি গম্ভীর নিটোল উচ্চারণে ঘোষণা করলেন। মুশকিল হলো তারপরেই। হাজারবার মুখস্থ করা গল্পের একটা লাইনও মনে পড়লো না তার। চোখের সামনে সব অন্ধকার। তিনি ভীত হলেন। মরীয়া হয়ে তিনি নিজের মত করে সহজ ভাষায় সাদামাটাভাবে গল্পটি বলতে শুরু করলেন। বলা শেষও করলেন। অনুষ্ঠান শেষে বিচারক মণ্ডলী যখন তাকেই শ্রেষ্ঠ পুরস্কারে ভূষিত করলেন তখন তিনি বিস্ময়ে বোবা হয়ে গেলেন। সেইদিন থেকে আর কখনও মিঃ ফোর্ড মুখস্থ বা মনে রাখার চেষ্টা আদৌ করেন না। আজ এ্যামেরিকার বেতার ও টেলিভিসনের মাধ্যমে মিঃ ফোর্ডের মত বক্তা খুবই কম আছেন। এটাই তার জীবিকা। বেতার-টি-ভি অনুষ্ঠান প্রচারকালীন তিনি কোন রকম লেখা কাগজ ছাড়াই মন থেকে বক্তব্য রাখেন।

যারা লিখে নিয়ে মুখস্থ করতে চেষ্টা করেন তারা অযথা সময় নষ্ট করেন—শক্তির অপচয় করেন। সারা জীবন ধরে আমরা যে অফুরন্ত কথা বলে চলেছি তা কি আমরা লিখে নিয়ে মুখস্থ করে বলি —না মন থেকে স্বতস্ফূর্ত ভাবে বলি। আমরা শব্দ খুঁজেও বেড়াই না। আমরা শুধু মূল বিষয় বা প্রসঙ্গটাই মনে রাখি ভাবনার গভীরে। যদি আমার ধারণা পরিস্কার থাকে বক্তব্য বিষয়ে, তাহলে

বাতাস টেনে নেবার মতই, নিঃশ্বাস নেবার মতই সহজ হয়ে উঠবে কথা বলাটা।

এমনকি উইনস্টন চার্চিলের মত তুঁদে ব্যক্তিকেও অনেক ঠোকর খেয়ে এটা শিখতে হয়েছিলো। প্রথম যৌবনে চার্চিল বক্তব্য বিষয় পুরোটা লিখে ফেলতেন আর মুখস্থ করতেন তোতা পাখির মত। একবার হোল কি, বৃটিশ পার্লামেন্টে বক্তৃতা করার সময় মুখস্থ বক্তৃতার একটা অক্ষরও মনে পড়লো না। মনের ক্ষমতাটাই যেন অকেজো হয়ে গেলো। চোখের সামনে কেউ যেন বিস্মৃতির কালো পর্দা টাঙিয়ে দিলো। তিনি প্রচণ্ড অপ্রস্তুত হলেন। ঘামতে শুরু করলেন। ঘুরে ফিরে একটা লাইনই বার বার বলতে থাকলেন। লজ্জায় অপমানে মুখ কালো করে বসে পড়লেন কোন উপায় না দেখে। সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত আর কখনও উইনস্টন চার্চিল মুখস্থ করার কোন চেষ্টাই করেন নি।

যদি আমরা বক্তৃতাটা আগে লিখে নিয়ে দাঁড়ি-কমা শুদ্ধ মুখস্থও করে ফেলি, তাহলেও বলার সময় সবই ভুলে যেতে পারি। যদি ভুলে নাও যাই, তাহলেও বক্তৃতাটা হয়ে উঠবে এক ঘেয়ে বিরক্তিকর আর যান্ত্রিক। কেন এটা হয়? কারণ হ'ল হৃদয়ের গভীর থেকে আন্তরিকভাবে বলা হয়ে ওঠে না, বক্তব্যটা হয়ে যায় কথার কথা—ফাঁকা বুলি মাত্র।

(তাই মুখস্থ করবেন না। মূল বক্তব্য বিষয়টা নিয়ে আন্তরিকভাবে ভাবুন। বারবার ভাবুন।)

৪। চিন্তার সূত্রগুলোকে একত্রিত করুন। একসংগে গেঁথে ফেলুন

তাহলে ভালো বক্তৃতা দেবার সহজ উপায় কী দাঁড়ালো? সহজ কথায়ঃ আপনার অভিজ্ঞতা থেকে বলার উপাদান বেছে নিন। কিছু না কিছু অভিজ্ঞতা আপনার থাকবেই। শুধু ঠিকমত বেছে

কাজে লাগাতে হবে এই যা। তাহলেই সহজ সোজা কথায় জোরালো সাড়া ফেলতে পারবেন শ্রোতার হৃদয়ে। সত্যিকার প্রস্তুতি নিন—বক্তব্যের সার কথা নিয়ে। মূল বিষয়গুলোকে পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করে নিন অল্প কথায়। মনে রাখার সুবিধার জন্য একটা দুটো শব্দে পরিকল্পিত করুন। এটা করা কি খুব কঠিন মনে হচ্ছে ?

(শুধু দরকার হবে গভীর মনোনিবেশ করা এবং বক্তব্যের মূল সূত্রকে ঘিরে আন্তরিক অনুশীলন)

৫। বন্ধুদের সংগে বক্তৃতা দেওয়া অভ্যাস করুন

আপনার চারপাশের বন্ধুবান্ধবদের ভেতরেই অভ্যাস করতে শুরু করুন। প্রথমে মূল বক্তব্য বিষয়টা ঠিক করে নিন। কি নিয়ে বক্তব্য রাখবেন আপনি, সেটা ঠিক করতে ভুল হলেই সবই গণ্ডগোল হয়ে যাবে—তালগোল পাকিয়ে যাবে চিন্তার অসংগতি আর বিচ্ছিন্নতায়। যাতে বন্ধুরা বিরক্ত না হয় এভাবে একটু কায়দা করে শুরু করুণ। বুঝলে রিচার্ড, আজ এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হল আমার···গল্পের গন্ধ পেলেই রিচার্ড আগ্রহ বোধ করবে আপনার কথা শুনতে—নইলে বিরক্ত হয়ে হাই তুলবে। বলার সময় রিচার্ডের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য রাখুন—সে কীভাবে নিচ্ছে গল্পটা—কতটা আগ্রহ নিয়ে শুনছে, কোন মতামত দিলে সেটা গ্রহণও করতে পারেন। রিচার্ডতো আর জানেন না যে আপনি বক্তৃতা দেওয়ার মহড়ার চালিয়ে যাচ্ছেন ওর সামনে।

বিখ্যাত একজন ঐতিহাসিকের মন্তব্য হল—এমন বন্ধু বাছুন, যে বিষয়ে আপনি জানেন পড়াশুনা আছে আপনার, সে বিষয়ে তিনি জানতে আগ্রহী। এবারে নানারকমভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে বক্তব্য রাখতে সক্ষম হবেন আপনি ভুল ত্রুটি ও শুধরে নেবার অফুরন্ত সুযোগ পাবেন।

(অনুশীলন করুন বন্ধু-বান্ধবের সংগে কথাবলার মহড়া চালান। নিজেকে তৈরী করে নিন সঠিক ভাবে)

৬। আসন্ন জয়লাভের জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখুন

কি কি উপায়ে তা আপনিকরতে পারেন ?
প্রথমতঃ বিষয়বস্তুর গভীরে ডুব দিন।

(বিষয় নির্বাচন হওয়া মাত্রই, ভাল করে ভাবনা চিন্তা করুন তা নিয়ে। নিজের অভিজ্ঞতাকে মিশিয়ে দেবার চেষ্টা করুন। অপর অপর বক্তা কী বলেন সেটা খেয়াল করুন মনোযোগ দিয়ে। তা হলেই আত্মবিশ্বাস দৃড হবে।)

৭। পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাস নিয়ে কাজ করুন

মনস্তত্বের প্রফেসর মিঃ মাটিনের কথায় বলতে হয় ভাবনা আগে, কাজ পরে, যদিও এটাই আমরা সবাই জানি তবুও প্রকৃত ভাবে ভাবনা আর কাজ পরস্পর হাত ধরাধরি করে হাঁটে। যদিও ভাবনার হাতেই থাকে কাজের নিয়ন্ত্রন ভার, আবার ইচ্ছা শক্তির অধীনেই থাকে ভাবনার রাশি টানার ভার। আমরা পরোক্ষভাবে যদিও ভাবনাকে নিয়ন্ত্রণ করি কিন্তু আসলে তা ঠিক নয়। তাই নিজেকে সাহসী ভাবতে শিখলেই কাজের বেলাও সাহসী হয়ে উঠতে পারবেন। সমস্ত ইচ্ছাশক্তি দিয়ে 'সাহসী' ভাবতে পারলেই ভয়-ভীতি সত্যি সত্যি কেটে যাবে।

প্রফেসর মিঃ মার্টিনের উপদেশকে কাজে লাগান। শ্রোতার সামনে বলার সময় নিজেকে সাহসী ভেবে ফেলুন। অবশ্য প্রস্তুতি বিহিন চেষ্টাতে এরকম ভাবাটা কার্যকরী হবে না। শুধু ভেবে নিতে হবে কি বিষয়ে আপনি বলতে চলেছেন। সোজা হয়ে দাঁড়ান।

বুক ভরে নিঃশ্বাস নিন তিরিশ সেকেণ্ড। তাজা বুকভরা অক্সিজেন টেনে নেবার পর দেখবেন শরীর ও মন চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। আপনি সাহসী হয়ে বলার জন্য তৎপর হয়ে উঠেছেন। সোজা টানটান হয়ে দাঁড়ান। চোখের দৃষ্টি হবে সোজা। সরাসরি শ্রোতাদের চোখের দিকে তাকান। পুরো আত্মবিশ্বাস নিয়ে বক্তব্য রাখুন।

একজন বিখ্যাত এ্যামেরিকান তাঁর নিজের লেখা আত্মজীবনীতে লিখেছন ঃ আমি ছিলাম রুগ্ন। সবসময়ই ভয়ে ভয়ে থাকতাম। আমার ক্ষমতার ওপর একদমই বিশ্বাস ছিলোনা। আস্তে আস্তে শরীর ও মনের উপর বিশ্বাস জন্মানোর চেষ্টা চালিয়ে সফল হলাম।

একদিন সারা আমেরিকার লোক তাকে জানতো সাহসের প্রতীক' বলে। সত্যনিষ্ঠা-দৃঢ়চেতা-মনোজ্ঞ বক্তা আর অসম-সাহসী শিকারী হিসাবে যিনি সারা আমেরিকাবাসীর হৃদয়ে অধিকার স্থাপন করেছিলেন তিনি আর কেউ নন, প্রেসিডেন্ট থিওডোর রুজভেল্ট।

ভয়-ভীতিকে দূরে সরিয়ে দিয়ে জন সমক্ষে ভালো বক্তা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার এমন অনেক নজির আছে। যা পরবর্তী সময়ে, তাদের জীবনের আলাদা-মূল্যায়নে রূপান্তরিত হতে সাহায্য করেছিল।

একজন সেলসম্যান আমাকে লিখেছিলো—কিছুদিন আপনার নির্দেশাবলী আন্তরিকভাবে পালন করার পর এমন হল যে, আমি এখন যে কোন লোকের মোকাবিলা করতে পারি। একদিন সকালে আমি একজন না-ছোড়বান্দা-কাঠ গোঁয়ার মক্কেলের কাছে আমার মাল বিক্রির জন্য গেলাম। যে বহুবার আমাকে মুখের ওপর রূঢ়-ভাবে 'না' বলে ফিরিয়ে দিয়েছি। আমি কিন্তু মক্কেলটি 'না' করে দেবার পূর্বেই সমস্ত স্যাম্পল ফাইল দিয়ে দিয়ে তার দেরাজ ভর্তি করে দিলাম, মুখে কিছুই বললাম না। বিশ্বাস করবেন না, এবারে

কিন্তু আমাকে অনেক টাকার অর্ডার দিলো সেই মক্কেলটি যা ছিল আশাতীত।

একজন বাড়ীর গৃহ-বধু, তিনি জানালেন—আমি সর্বদা ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকতাম। ভালো করে গুছিয়ে কথা বলতে পারতাম না লোকজনের সঙ্গে। তাই বাড়িতে নেমতন্ন করতে ভয় পেতাম প্রতিবেশী-বন্ধুদের। পাছে ওদের সঙ্গে ঠিকমত আলাপ আলোচনা চালিয়ে যেতে না পারি। আপনার উপদেশ নির্দেশ ভালো করে অনুশীলন করার পর সাহসে উদ্যোগী হয়ে বাড়িতে পার্টি দিলাম, বিশ্বাস করবেন না পার্টি খুব জমে ছিলো সবাই আমার অতিথেয়তা এবং সুন্দর আপ্যায়নের জন্য প্রশংসা করেছেন। অতিথিদের কথার সূত্র ধরে কথা চালিয়ে যেতে আমার একটুও অসুবিধা হয় নি।

বেসরকারী বানিজ্যিক অফিসের একজন কেরাণী একবার লিখলো —আগে খদ্দের এলে আমি ভয় পেতাম। বার বার ভুলের জন্য ক্ষমা চেয়ে মনমরা হয়ে থাকতাম। আপনার কথামত চলে আমি চাঙ্গা হয়ে থাকতাম। আপনার কথামত চলে আমি সতেজ-সপ্রাণ হয়ে উঠলাম। হীনমন্যতা বোধ আর অপরাধী-অপরাধী ভাব একেবারেই কাটিয়ে ফেললাম। খদ্দেরদের সকল অসন্তোষের জবাব দিতে শুরু করলাম ধীর স্থির ভাবে আর পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্বের সঙ্গে। আমার বিষয়ে আমি যে খদ্দেরদের চাইতে বেশী ভালো জানি, এ আত্মবিশ্বাসে ভরপুর থেকে চারিত্রিক সবলতা খুঁজে পেলাম। এক মাসের ভেতর আমার বিক্রির হার শতকরা পঁয়তাল্লিশ ভাগ বেড়ে গেলো।

আগে ভয় আর উদ্বিগ্নতা তার সফলতার পক্ষে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। এখন দূর করতে পেরেছে এসব, স্বাবলম্বী হতে পেরেছে একজন বক্তা হিসেবে।

আপনার দৈনন্দিন জীবনের হাজারো বাধা বিপত্তি আর

ঝামেলাকে আপনি যখন হাসি মুখে দৃঢ়তার সংঙ্গে মোকাবিলা করার শক্তি অর্জন কররেন তখন দেখবেন আপনার জীবন আরও আনন্দময় হয়ে উঠবে অনায়েসে।

(ভয়-ভীতি কাটিয়ে পূর্ণ আত্মবিশ্বাস নিয়ে কাজ করুণ। আপনি সফল হবেনই।)

তৃতীয় অধ্যায়

কার্যকরীভাবে কথা বলার দ্রুত এবং সহজ উপায়

আমি খুব কমই টেলিভিসন অনুষ্ঠান দেখে থাকি। কিন্তু আমার এক বন্ধুর অনুরোধে বাড়ির গৃহিণীদের জন্যে নির্দ্ধারিত মধ্যাহ্নের অনুষ্ঠান দেখে আমি চমৎকৃত হলাম। খুবই ভালো লাগলো আমার। আমার বন্ধুও সেটাই আশা করেছিলো। শ্রোতা ও দর্শকদের ভেতর থেকেই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের নির্বাচন করা হয়েছিলো। এদের মধ্যে প্রত্যেকেই ছিল অতি সাধারণ, কথা বলার কোন রকম প্রশিক্ষণই এদের ছিলোনা। কোনরকম মতামত বিনিয়োগ করার সুযোগও এরা কখনও পায়নি। মোটকথা জনসংযোগ মূলক কোন অনুষ্ঠানের ধারে কাছেও যায়নি এরা। ভুল ব্যাকরণের প্রয়োগে, উচ্চারণের অপভ্রংশেও খুব সুন্দর ও মনোজ্ঞ হয়ে উঠেছিলো অনুষ্ঠানটি। কিন্তু অংশগ্রহণকারীরা সকলেই ছিলো কৌতূহল উদ্দীপক। তারা যখন অনাড়ম্বর সাদামাটাভাবে কথা বলতে শুরু করলো, তখন তারা সহজেই ভুলে যেতে পেরেছিলো শক্তিশালী ক্যামেরার উপস্থিতি। আন্তরিকভাবে দর্শকদের মধ্যেই মন প্রাণ ঢেলে দিতে পেরেছিলো অংশগ্রহণকারীরা। কি করে এটা সম্ভব

হল? এর উত্তরও আমার জানা। দীর্ঘদিন ধরে বহুলোককে এ ব্যাপারে কার্যকরী ও অন্যান্য কৌশল শিখিয়ে আসছি আমি। লোকগুলো নতুন কিছু বলছিলোনা। এরা ছিলো অতি সাধারণ সব পুরুষ ও মহিলা। এরা এদের নিজেদের জীবনের স্মরণীয় মুহূর্ত-গুলোর কথাই বলেছিলো সহজ সরল ভাষায়। কেউ বা বলেছিলো তার স্ত্রীর কথা—কেউ বা তার স্বামীর বিষয়ে। এখানে ভূমিকা বা পরিচিতি দেওয়ার কথা খুব একটা ভাবেনি তারা। চমকপ্রদ বক্তৃতা বা কায়দাকানুনের দিকে নজর দেওয়া বা বাক্যের অভূতপূর্ব গঠন-শৈলীর দিকে মনোযোগ দেওয়ার কথা জানাতোই না এরা। তবুও দর্শকের হৃদয়ে ভালো লাগার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছিলো ওরা। পুরোপুরি মনোযোগ আকর্ষণ করতে পেরেছিলো। এ নাটকীয় প্রমাণ থেকেই আমি এবারে বলবো কার্য্যকরীভাবে কথা বলার দ্রুত এবং সহজ কয়েকটি উপায়।

১। এমন বিষয়ে বক্তব্য রাখুন যা আপনার জানা বা আপনি পড়েছেন সে বিষয়ে বা বিষয়টিতে আপনার মূল্যবান অভিজ্ঞতালাভের সুযোগ হয়েছে।

পূর্বোল্লিখিত টেলিভিসন অনুষ্ঠানটি প্রাণ-প্রাচুর্য্যে জীবন্ত হয়ে উঠেছিলো, দর্শকদের ভালো লেগেছিলো। কারণ অংশগ্রহণকারীরা নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকেই বক্তব্য রেখেছিলো। তারা এমন কথা-বার্তা বলেছিলো যা তারা ভালোভাবে জানে, যা সত্যি এবং বিশ্বাসযোগ্য।

অথচ একবার ভাবুন দেখি কী বিরক্তিকর নিষ্প্রান অনুষ্ঠানই না হতো, যদি এই লোকগুলোকে কম্যুনিজম বা অ্যামেরিকার সাং-বিধানিক সাংগঠনিক গঠনতন্ত্র বিষয়ে বলতে বলা হত। তাহলেই কর্তৃপক্ষ বিরাট ভুল করতেন বিষয় নির্বাচনে, ঠিক যেমন করে অসংখ্য

বক্তা প্রতিদিন ভুল করে চলেছে শক্ত শক্ত দাঁত-ভাঙ্গা বিষয় নিয়ে অযথা বক্তব্য রাখার কষ্ট কল্পিত প্রয়াস চালাতে গিয়ে। বেশারভাগ বক্তাই এমন বিষয় নির্বাচন করেন, যে সম্পর্কে তিনি খুবই কম জানেন এবং খুবই কম পড়াশুনা আছে তার। তারা বিষয় বাছতে গিয়ে অবলীলায় বেছে নেন—দেশপ্রেম, গণতন্ত্র, ন্যায়-বিচার, ইত্যাদি··· ইত্যাদি। লাইব্রেরীতে কয়েকঘণ্টা বই ঘেঁটে হাত নোংরা করে যত গাদা গুচ্ছের উদ্ধৃতি জোগার করেন, কলেজে পড়া রাষ্ট্র বিজ্ঞানের জ্ঞান কাজে লাগানোর ব্যর্থ চেষ্টা করেন, মনোজ্ঞ শব্দ বা ব্যাকরণে বুৎপত্তি দেখানোর সুযোগ নেন। পরিশেষে বক্তৃতাকালীন সময়টাই দীর্ঘতর হয় শুধু আর শ্রোতারা ভয়ানক ভাবে বিরক্ত হন। ব্যাজার মুখে ক্লান্তিকর পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা হজম করেন, নিরুপায় হয়ে মনে মনে গালাগালি করতে করতে। অথচ ব্যাপারটা সহজ স্বাভাবিক হলে কত সুন্দরই না হতে পারতো, শ্রোতারা কত খুশীইনা হতো। কর্ণাড হিলটন হোটেলে বছর কয়েক আগে ডেল কার্নেগী ইন্‌স্টিটিউশনের এক বার্ষিকী সম্মিলনী সভায়, একজন তরুণ ছাত্র হঠাৎই বলতে শুরু করলো—স্বাধীনতা, সাম্য, আর সৌভ্রাত্র হল, মানব ইতিহাসের অভিধানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর প্রয়োজনীয় বিষয়। স্বাধীনতা ছাড়া বেঁচে থাকা অর্থহীন। কল্পনা করুণ তো, আপনি বেঁচে আছেন, পরাধীনতার নাগপাশের শেকলে আপনার হাত পা বাঁধা। কোন কিছু করার স্বাধীনতা নেই আপনার। চতুর্দিকে শুধু নিষেধের প্রাচীর তুলে দেওয়া হল। অনুষ্ঠানটাই না নীরস বক্তৃতা দিয়ে মাটি করে দেয় ছাত্রটি—এই ভেবে একজন প্রশিক্ষক কৌশলে জানতে চাইলেন ছাত্রটির কাছে, কেন ছাত্রটি এ ধরণের বক্তব্যে বিশ্বাস করে? ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বা প্রত্যক্ষ কোন প্রমাণ ছাড়া উপরোক্ত বিষয় নিয়ে অনর্থক বকে সময় নষ্ট করে কী লাভ ছাত্রটির। তখন নিজের বক্তব্যের সমর্থনে ছেলেটি এক হৃদয় বিদারক ঘটনা বর্ণনা করলো।

যুদ্ধের সময় নাৎসীদের বিরুদ্ধে ছেলেটি ছিলো ফরাসী মুক্তিসেনার পাতালবাহিনীর একজন সক্রিয় যোদ্ধা। নাৎসীদের জঘন্য নির্দয় আইনের হাঁড়িকাটে বলি হয় ছেলেটির পরিবার। ছেলেটি মর্মস্পর্শী ভাবে বলেছিলো কেমন করে হিটলারের বিশেষ পুলিশ বাহিনীর চোখে ধুলো দিয়ে সে আমেরিকাতে পালিয়ে আসতে পেরেছিলো। ছেলেটি তার বক্তব্য শেষ করেছিলো এই বলে—আজ আমি যখন মিচিগান এ্যাভিনিউ দিয়ে হেঁটে হেঁটে এই হোটেলে এলাম, আমি ছিলাম স্বাধীন। আমি যখন খুশি আসতে বা যেতে পারি। কেউ বাধা দেবে না, আপত্তি তুলবেনা আইডেন্টিফিকেশন কার্ডের দোহাই তুলে। এ অনুষ্ঠান শেষ হলে চিকাগো শহরের যেখানে খুশী আমি যেতে পারি। কেউ আমার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবেনা। বিশ্বাস করুণ আপনারা, স্বাধীনতা হচ্ছে এমন জিনিস, যার জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতেও আমি ভয় পাবো না। পিছিয়ে যাবো না।

সকল শ্রোতাদের কাছ থেকে অকুণ্ঠ চিত্তে সাড়া পেয়েছিলো ছেলেটি। ভালবাসা অর্জন করতে পেরেছিলো।

২। আমাদের বলুন জীবন থেকে কী শিখলেন আপনি

বক্তা যদি তার জীবন থেকে শেখা অভিজ্ঞতার কথা বলতে শুরু করে তবে শ্রোতারা তা ভালো মনেই গ্রহন করে। আমি বেশ ভালো করেই জানি বেশীর ভাগ বক্তা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলতে পছন্দ করেন না। তারচাইতে শক্ত দর্শন-ইতিহাস বা সাধারন চলতি ধ্যান-ধারণা নিয়েই বক্তৃতা করতে বেশী আগ্রহী হন। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বা ঘটনা এড়িয়ে চলেন। ব্যাপারটা যেনএ রকম। যখন সংবাদের জন্য মুখিয়ে থাকছি, তখন যেন কেউ সম্পাদকীয় শোনাতে লাগলো।

মোদ্দা কথা হল, সেই সম্পর্কেই কথা বলুন, যা আপনার জীবন থেকে নেয়া। তাহলেই মুগ্ধ শ্রোতা পাবেন আপনি। ডব্লু, ডি, ইম্পসন সম্পর্কে বলা হত, তিনি নাকি সর্বদা সবার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন, বিরক্ত হতেন না। ছোট-বড় কোনপ্রকার ভেদাভেদ তাঁর ছিলো না। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন যে প্রত্যেক লোকের কাছ থেকে কিছুনা কিছু শেখার আছে। ব্যক্তিগত জীবনে আমি ও বহুলোকের জীবনের নানা ঘটনা মনোযোগ দিয়ে শুনেছি, তাতে লাভ ছাড়া লোকসান হয়নি। খুলে বলছি—কয়েক বছর আগে আমাদের কার্নেগী প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে, নিউ ইউর্ক সিটি ব্যাংকের প্রাজ্ঞ অফিসারদের জন্য 'বক্তৃতা শেখানোর' ক্লাস নিতে হয়েছিলো। তাদের দীর্ঘ ব্যাঙ্কের কাজকর্মের অভিজ্ঞতা, জীবনের চলার পথের পেরিয়ে আসা চল্লিশ বছরের জমানো কথা থেকে বলার মত কিছুই খুঁজে পেলো না তারা। নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে বলাটা বর্জন করলো একেবারেই। একদিন একজন অফিসার একটি পত্রিকা সঙ্গে নিয়ে ঢুকলো। পত্রিকাতে ছাপা একটি নিবন্ধ সে জোরে জোরে পড়তে শুরু করলো। এই নয় যে সে এতে খুব আগ্রহী। আসলে এ বিষয় নিয়ে সে কিছু বলার সুযোগ করে নিলো। ফল হল খুবই খারাপ। কারন প্রবন্ধটা সে নিজেই হজম করতে পারে নি, তাই অন্যকে বুঝিয়ে শুনিয়ে সাড়া জাগানোতে পুরোপুরি ব্যর্থ হল। প্রত্যেকেই বিরক্ত হল। শুধু উদ্ধৃতি দিয়ে অমুকে এই বলেছে অমুকে তাই বলেছে বলে প্রাণহীন দায়সাড়া ভাবে বক্তব্য রাখার চেষ্টা করলে তাই হয়। কারণ সে নিজেও বিশ্বাস করেনি নিবন্ধের বক্তব্য। তখন একজন প্রশিক্ষক তাকে থামিয়ে দিলেন। আমার পর সেই অফিসারকে প্রশিক্ষক বললেন—দেখুন মিঃ ব্রাউন, ওই নিষ্প্রাণ প্রবন্ধে আমরা আগ্রহী নই, ক্ষীণ ব্যক্তিত্ব নিয়ে লেখা ভাসা-ভাসা চিন্তাভাবনা নিয়ে যিনি প্রবন্ধ লিখেছেন তার উপর আমাদের কোন ভরসা নেই। প্রবন্ধকার সামনে উপস্থিতও নেই, কিন্তু আপনি

আছেন। আপনার ব্যাপারে আমরা আগ্রহী। আপনার নিজের কথা বলুন, শুনবো মনোযোগী হয়ে। এই প্রবন্ধের বক্তা ও তার বক্তব্যের সঙ্গে আপনি একমত কিনা তাই বলুন। যদি একমত হন আপনার অভিজ্ঞতা দিয়ে যুক্তি-তর্ক আর চিন্তার গভীরতা দিয়ে তার সঠিক মূল্যায়ণ পরিমাপ করুন। যদি আপনি একমত নাও হন, তাহলেও কারণ দেখান আমাদের, কেন আমরা আপনার কথা মেনে নেবো। ঠিক আছে এবারে ওই প্রবন্ধ দিয়েই আপনি আপনার বক্তব্য শুরু করুন।

মিঃ ব্রাউন একাধিকবার মনোযোগ দিয়ে প্রবন্ধটি পড়লেন। অবশেষে সিদ্ধান্তে এলেন, লেখকের সঙ্গে কোন দিক থেকেই তিনি একমত নন। তিনি স্মৃতির মনিকোঠা থেকে মূল্যবান সব প্রমাণপত্র পেশ করতে থাকলেন কেন তিনি একমত নন। তার স্বপক্ষে সহজ প্রমাণসাপেক্ষ একাধিক ঘটনার উল্লেখ করলেন তিনি। তিনি যেন খনি থেকে ধাতু তুলতে থাকলেন। ছাপানো নোট আর মুদ্রা বের করে চললেন যেন নিজের টাঁকশাল থেকে।

তাহলে এবারে নিজেরাই বুঝে দেখুন—কী ধরণের বক্তব্যে শ্রোতাদের মন জয় করা সহজ হয়।

(নিজের জীবন থেকে নেয়া ঘটনা বলুন। তাহলে খুব সহজেই শ্রোতাদের মনে প্রভাব ফেলতে পারবেন।)

৩। বিষয়বস্তুর জন্য অতীতের দিকে ফিরে তাকান

একবার ডেল কর্নেগী ইনস্টিটিউশনের প্রশিক্ষকদের বলা হয়েছিল তারা যেন লিখিতভাবে জানায়—সবচেয়ে বড় সমস্যা কোনটা, যখন নতুন ছাত্রদের বক্তৃতা শেখানো শুরু হয়। যখন লেখা কাগজগুলো একত্রিত করে খোলা হল দেখা গেল প্রত্যেকে প্রশিক্ষকই একমত হয়েছেন একটি বিষয়ে। তা হল—শিক্ষার্থীরা কিছুতেই

সঠিক বিষয় নির্বাচন করতে পারেন না। সঠিক বিষয় বলতে এখানে বোঝানো হচ্ছে? যা আপনি জানেন, চেনেন, পড়েছেন বা অভিজ্ঞতা দিয়ে সঞ্চয় করেছেন। কেমন করে আপনি সঠিক বিষয় খুঁজে বার করবেন? স্মৃতির অতীতে পদচারণা শুরু করুণ। দেখ-বেন অনেক উজ্জ্বল স্মৃতির শস্য আপনার ভাঁড়াড়ে জমা হয়েছে। অনেক স্মরণীয় দিন আর স্মরণীয় ঘটনা পরিব্যপ্ত হয়ে। শৈশব থেকে কৈশোর এবং পরবর্তী দিনগুলো থেকে বলার মত অনেক উপাদান মিলতে পারে। পারিবারিক জীবন, স্কুলজীবন, ছোট বয়সের স্মৃতি, নানারকম বাধাবিপত্তি পেরিয়ে বড় হওয়া, এসব থেকেও খুব ভালো বক্তব্য বাছা যেতে পারে। প্রায় সবারই জীবনে এরকম স্মৃতি থাকে, তাই বক্তা যখন বলে চলে তখন অধিকাংশ শ্রোতাই নিজের জীবনের সঙ্গে তা মিলিয়ে নেন।

ভালো খেলা দেখার স্মৃতি, ভালো ছবি দেখা, ভালো গল্প আস্বাদনের ভাগও অপরকে দেওয়া যেতে পারে। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি শ্রোতারা এসব পছন্দ করে।

প্রচণ্ড সংগ্রাম আর প্রতিকূল দিন পেরিয়ে যারা জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন তাদের পক্ষে বিষয়বস্তুর জন্য ভাবনা নেই। কি কি কাজ করেছেন আপনি অতীতে, যদিও আজ আপনি ধনী-ব্যক্তি তবুও অতীতের সেইসব কষ্টকর গ্লানিময় দিনগুলোই এখন আপনার সফলতার দিকচিহ্ন। কি ভাবে কোন ঘটনাতে আপনার জীবন ও জীবিকার মোড় ঘুরে গেলো—আপনি সফলতার সিঁড়িতে পা রাখার সুযোগ পেলেন, এসবই শ্রোতাদের কাছে মূল্যবান দলিল সম-মনে হবে। সর্বোপরি কঠোর বাস্তবের ভয়ংকর আর তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বীতার মাঝখানে কেমন করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলেন, এসব শোনার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকবে শ্রোতারা।

আপনার কোন বিশেষ সখ বা আমোদ-প্রমোদ থেকেও বক্তৃতার

উপাদান খুঁজে পেতে পারেন। এছাড়া কোন বিশেষ ক্ষেত্রে দীর্ঘ-দিনের কাজ করার অভিজ্ঞতাও কম মূল্যবান নয়। আপনি নিজের কর্মক্ষেত্রে একজন বিশেষজ্ঞ, যদি আপনি আপনার জীবিকা বিষয়ক বিচিত্র অভিজ্ঞতা শ্রোতাদের ঘটনা-পঞ্জীর মাধ্যমে, গুছিয়ে বলতে পারেন তাহলে শ্রোতারা আগ্রহী হবে জানতে।

এছাড়া একটু ভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতা হলেতো আরও ভালো। যেমন যুদ্ধের সময় আপনি অগ্নিদগ্ধ বাড়িতে চাপা পড়েও কেমন করে প্রাণে বাঁচলেন বা ঐশ্বরিক কোন কাজকর্ম যদি আপনার জীবনে থাকে। এসব বিষয়ের উপাদান থেকেই আপনি বক্তৃতার মাল-মশলা সংগ্রহ করতে পারেন।

(যে বিষয়ে আপনি বক্তব্য রাখবেন, সে বিষয়ে অন্য সবার চেয়ে আপনার বেশী জানা উচিত। তাহলেই শ্রোতারা আগ্রহী হবে, আপনার চিন্তাভাবনা সংক্রামিত হবে তাদের মধ্যে। ভাসা-ভাসা জ্ঞান শ্রোতাদের আকৃষ্ট করবেনা কিছুতেই। আপনার নিজের গভীর বিশ্বাস আর ভালোলাগা থেকেই সুন্দর বক্তব্যের জন্ম হবে।)

৪। আপনি আগে সিদ্ধান্তে আসুন, পছন্দমত বক্তব্য খুঁজে পেয়ে আপনি কতটা উত্তেজিত হবেন।

উত্তেজিত হওয়ার মত বিষয়বস্তু খুব কমই মেলে, যদিনা নিজের অভিজ্ঞতা লব্ধ জ্ঞানের সঙ্গে বিষয়বস্তু মিলে যায়। আমাকে যদি বাসন ধোয়া সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে হয়, আমি মোটেই ভালো বলবো না। প্রথমতঃ বাসন ধোয়ার ঘটনার কথা আমার মনেই নেই। অথচ বাড়ির গৃহিণীরা এ সম্পর্কে দারুণ বলবে, উত্তেজিত হয়ে উঠবে সহজেই।

এ বিষয়ে একটা প্রশ্ন করলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে বক্তব্য কতটা আপনার পছন্দমত সেটা বোঝা যাবে তখনই, যখন আপনার বক্তৃতার সময় কেউ যদি আপনার মতামতের তীব্র সমালোচনা করে কথা বলে। আর আপনি যদি যুক্তি-তর্ক দিয়ে প্রতিপক্ষকে থামিয়ে দিতে পারেন তাহলেই আপনার জিৎ, বিষয়বস্তু নির্বাচিত ও কার্যকরী হয়েছে।

ইতিমধ্যে ১৯২৬ সালে লেখা নিজের কিছু আলোচনার ওপর চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিলাম। সে বছর আমি জেনেভাতে লীগ অফ নেশনস্ এর সপ্তম অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলাম। সেখানকার কিছু ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছিলাম। পরপর তিন থেকে চারজন বক্তা প্রাণহীন ভাবে দেখে দেখে বক্তৃতা লিপি পাঠ করলেন। স্যারজর্জ ফস্টার বলার সময় কোন কাগজপত্র হাতে নিলেন না। তার প্রতিটি কথা প্রতিটি বক্তব্য নিজের বিশ্বাস আর একগ্রতা দিয়ে তৈরী ছিল যেন। জেনেভার হ্রদ চোখে পড়ছিলো হল থেকে। হ্রদের জলের মতই সহজ সরল হৃদয়ে নিংড়ানো ছিলো তার বক্তব্যের বিষয় বস্তু। এ পর্যন্ত আপনাদের আমি একজন বক্তা সম্পর্কে যা বলে এসেছি —সমস্ত গুণাবলীর সংমিশ্রন ঘটেছিলো স্যার জর্জ ফস্টারের বক্তৃতায়। আমি যেন এখনও চোখ না বুজেই দেখতে পাই জর্জ কিভাবে হাত নেড়ে বক্তৃতা করে চলেছেন। তিনি ছিলেন আন্তরিক গভীর অনুভূতি সম্পন্ন। সমস্ত মনপ্রাণ ঢেলে তিনি বলে ছিলেন।

এ্যামেরিকার আলোড়ন তোলা বক্তা বিশপ মার্লো তার স্মৃতি কথায় লিখেছিলেন—কলেজের বিতর্ক অনুষ্ঠানের আগের দিন আমাদের বিতর্ক বিষয়ক অধ্যাপক আমাকে ডেকে বললেন, "তোমার মাথায় গোবর পোরা। এ কলেজের ইতিহাসে তোমার চেয়ে বাজে ছাত্র আর বিতর্কে অংশগ্রহণ করেনি। তোমার চেয়ে মাথা-মোটা বক্তা আমি জীবনে দেখিনি মার্লো।

যদি তাই হয় স্যার, আমাকে ডেকেছেন কেন বিতর্ক অংশ নেবার জন্য।

কারণ হল—তুমি ধরে নিতে পার, "বলতে পারার জন্য মোটেই ডাকিনি। ওই কোণে বসে, বক্তৃতার বিশেষ অংশটা মনোযোগ দিয়ে পড় গিয়ে"। আমি পুনঃ পুনঃ এক ঘণ্টা ধরে একটা অনুচ্ছেদই শুধু পড়ে গেলাম।

'তুমি কি লেখাটিতে কোন ভুল খুঁজে পেলে?' অধ্যাপক অনুসন্ধিৎসু হলেন জানতে।

'না। কোন ভুলই চোখে পড়ছে না আমার।'

পুনরায় দু'ঘণ্টা কেটে গেলো। ক্রমাগত পড়ে চলেছি আমি। আড়াই ঘণ্টা কেটে গেলে পর আমি যেন নিঃশেষিত হলাম। খুবই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়লাম। তিন ঘণ্টার মাথায় অধ্যাপক পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'এখনও কোন ভুল চোখে পড়ছে তোমার'? এতক্ষণ পর আমি বুঝতে পারলাম তিনি কি বোঝাতে চাইছেন। আমি বলে উঠলাম, 'হ্যাঁ, ধরতে পেরেছি ভুল। আমি আমার বিতর্ক বিষয়ে আন্তরিক নই। আমি নিজেকে পুরোপুরি প্রস্তুত করিনি নিজের মধ্যে। আমি তেমন করে বলতে পারব না যেমন করে ব্যাপারটা বুঝে নিয়েছি।'

এই প্রথম অধ্যাপক বলে উঠলেন, 'এবারে, তুমি বক্তৃতা দেবার জন্য তৈরী হলে।'

সারা জীবন ধরে বিশপ মার্লো একটি নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন, তা হ'ল-তিনি নিজে পুরোপুরিভাবে বক্তব্যের গভীরে ডুবে যেতেন। আন্তরিকভাবেই তা করতেন।

একবার কার্নেগী ইনষ্টিটিউশনের শিক্ষার্থীদের মধ্যে একজন জানালো, সে কোন বিষয়েই উত্তেজিত হয়না, নীরস একঘেয়ে জীবন যাপনে অভ্যস্ত সে। আমাদের শিক্ষামত প্রশিক্ষক জানতে চাইলো ছেলেটি তার অবসর সময় কী ভাবে কাটাতে পছন্দ করে। কেউ বা সিনেমা

দেখে, কেউ বা নাচের আসরে যায়, কেউ বা বাগানের গোলাপ গাছের পরিচর্য্যা করে; কেউ বা খেলাধুলো করে ক্রিকেট মাঠে— ছেলেটি জানালো সে অবসর সময়ে এসব কিছুই করে না, তবে সে দেশলাইয়ের খোল জমাতে ভালবাসে। পৃথিবীর সবদেশের দেশলাই-এর বাক্স জোগাড় করা ছেলেটির একমাত্র নেশা। ইতিমধ্যেই সে সমস্ত দেশের দেশলাই-বাক্স জোগাড় করে ফেলতে পেরেছে।

কার্নেগী ইনষ্টিটিউশনের প্রশিক্ষক তখন তাকে তার প্রিয় নেশা সম্বন্ধে বক্তব্য রাখতে বললো। ছেলেটি প্রথমে মুখ খুলতে ইতস্ততঃ করলো। তার ধারনা জন্মেছিলো এসব তুচ্ছ বিষয় নিয়ে কেউ শুনতে আগ্রহী হবে না। এতক্ষনে তার প্রিয় শখ নিয়ে শুনতে সবার আগ্রহ দেখে সে খুবই উত্তেজিত হয়ে পড়লো। ছেলেটি গভীর আন্তরিকতার সংগে সমস্ত খুঁটিনাটি বলে গেল তার শখ- সম্পর্কে— কিছুই বলতে ভুললো না সে। শ্রোতাদের কাছে বিষয়টি খুবই চিত্তাকর্ষক হয়েছিলো। কারন বৌশর ভাগ শ্রোতাই এ বিষয়ে কিছুই জানতোনা পুর্বে।

(ওপরের দৃষ্টান্তগুলো থেকে কার্য্যকরী ভাবে দ্রুত ও সহজে কথা বলার পদ্ধতি বলা হল। বিষয়টি বার বার পড়ুন। অনুশীলন করুন নিজে নিজে। কিছুতেই হাল ছেড়ে দেবেন না। পড়তে পড়তে থামুন এবং মন দিয়ে ভেবে দেখুন আপনি কি পড়ছেন।)

৫। উদ্যোগী হন, কেমন করে আপনার চিন্তার ভাগ শ্রোতাদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া যায়।

যে কোন কিছু বলার জন্য উঠে দাঁড়ালেই তিনটি মূল-প্রতিপাদ্য বিষয় ঘুরে ফিরে আসবেই। তারা হল—(১)বক্তা (২)বক্তৃতা বা বিষয়বস্তু (৩) শ্রোতৃবৃন্দ ।

এ পর্য্যন্ত যা বলেছি তাতে বক্তা ও তার বক্তব্যের অন্তর্নিহিত বিষয় সম্পর্কে একটা পরিস্কার ধারনা তৈরী হয়েছে নিশ্চয়ই আপনাদের। এ পর্য্যন্ত কোথাও তেমনভাবে বক্তৃতাকালীন পরিবেশ সম্পর্কে কিছু বলিনি। একমাত্র তখনই বক্তৃতাকালীন পরিবেশ সৃষ্টি হয়, যখন বক্তা জীবন্ত শ্রোতার সামনে তার বক্তব্য নিবেদন করতে শুরু করে। তখনই যে প্রাণ সঞ্চার হয় পরিবেশে, অন্যথায় নয়। বক্তৃতার বিষয়বস্তু পূর্বেই ভালো করেতৈরী থাকতে পারে, এমন কোন বিষয়েও বক্তৃতা থাকতে পারে যা বক্তাকে উত্তেজিত করে তুলতে পারে। কিন্তু পরিপূর্ণ সফলতার জন্য এসবই যথেষ্ট নয়, অন্য এক উপাদান থাকা খুবই জরুরী, বক্তার যা কথা বলার ভংগীর মধ্যে ঢুকে যাবে। বক্তাকে শ্রোতাদের মনে বিশ্বাস আনতে হবে, অনুভব করাতে হবে,-সে যা বলছে তা খুবই জরুরী আর প্রয়োজনীয়। বক্তাকে শুধু নিজের বক্তব্য বিষয় নিয়ে উত্তেজিত হলেই চলবেনা সংগে সংগে শ্রোতাদের মধ্যেও তার উত্তেজনা ছড়িয়ে দিতে হবে সমানভাবে গভীর উৎসাহের সংগে। প্রায় প্রতিটি ঐতিহাসিক বক্তা—যারা জনসমক্ষে বক্তৃতা দিয়ে বাকপটুতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পেরেছেন তাদের প্রত্যেক্যের ভেতরেই ছিলো নিভুর্ল-হিসেবী মনের দক্ষতা আর বিক্রয় বিদ্যার সমস্ত গুনাবলী।

পুরানো দিনের খৃষ্টের বাণী প্রচারকের অধিকাংশ গুনই আপনি সেইসব বক্তার মধ্যে আবিষ্কার করতে পারবেন খুব সহজে। একজন ভালো বক্তা তার কার্য্যকরী বক্তৃতাকে নিজের মাথার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেনা। চিন্তা-ভাবনাকে তড়িৎ প্রবাহের মত ছুঁড়ে দেয় দর্শকদের বা শ্রোতাদের মনের সীমায়। নিজের ভাবনাকে তাদের মধ্যেও সংক্রামিত করে দেয় এবং সেই সঙ্গে তৃপ্তির স্বাদখুঁজে পায়। বক্তাকে সব সময় শ্রোতা-কেন্দ্রিক ভাবতে হবে, আত্ম-কেন্দ্রিক কোন ভাবনারই সেখানে জায়গা নেই। কারন অভিজ্ঞ কুশলী বক্তা মাত্রই জানেন তার বক্তৃতা খারাপ বা ভালো কিনা এ বিচারের ভার তার নয়।

এ সিদ্ধান্ত নেবার একমাত্র যোগ্যতা রয়েছে দর্শকদের মনের গভীরেই।

নিউইয়র্ক সিটিতে 'এ্যামেরিকান ইনস্টিটিউট অফ ব্যাঙ্কিং' এর 'সঞ্চয় ও মিতব্যয়ীতা' বিষয়ক প্রচারকার্য্য চলাকালীন আমি বহু লোককে প্রশিক্ষণ দিয়েছিলাম। একজন লোক কিছুতেই কিছু শিখছিলোনা। আসলে তার আগ্রহই ছিলোনা বিষয়টিতে। আমি তাকে বললাম, লোককে সঞ্চয় করাতে উদ্বুদ্ধ করানোর মধ্যে সমাজ সেবা মূলক মহৎ আদর্শ রয়েছে। আমি লোকটিকে আরও জানালাম নিউইয়র্ক প্রবেট কোর্টের রেকর্ড অনুযায়ী শতকরা পঁচাশি জন মানুষ মৃত্যুর পূর্বে কিছুই রেখে যায় না। শতকরা মাত্র তিন দশমিক তিন ভাগ লোকই দশহাজার স্টার্লিং বা তার ওপরে সঞ্চয় রেখে যায়। লোকটির মনে বদ্ধমূল ধারণা ছিল, সে কিছুতেই জনসাধারণের কাছে কোনরকম অনুগ্রহ ভিক্ষা করবে না সঞ্চয় করানোর জন্য, তাদের ক্ষমতায় না কুলোলে না করবে। শুধু সাধারণের মঙ্গলের কথাই সে ভাবছে, যাতে বৃদ্ধ বয়সে তাদের খাবার আর বাসস্থানের কষ্ট না হয়। তারা যেন রুটি-মাংস আর জামা কাপড় কেনার মত অর্থ সঞ্চয় করতে পারে শেষের দিনের কথা ভেবে।
লোকটি সর্বদা মনে রেখে ছিল, সে জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য সামাজিক কাজের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে, সঞ্চয় একটা মাধ্যম মাত্র।

এভাবে কথাবার্তা চালানোর ফলে ব্যাঙ্ক-কর্মচারীটির নিজের ওপর আস্থা বেড়ে গেলো অনেকখানি। মহৎ কাজ করার অনুপ্রেরণায় জনসাধারণের কাছে তার প্রভাব বেড়ে গেলো অনেক-খানি।

(তাহলে মোদ্দা কথা হল: সহজ সরলভাবে কথা বলার

চেষ্টা করুন। আপনার বক্তব্যের সরলতা যেন শ্রোতার হৃদয় ছুঁয়ে যায়, এবং তাকে আগ্রহী করে তোলে আপনার সম্পর্কে)

দ্বিতীয় পর্ব

বক্তব্য, বক্তা এবং শ্রোতা

বক্তব্য, বক্তা এবং শ্রোতাকে তিনবাহু ধরে যদি আমরা একটি ত্রিভুজ কল্পনা করি তাহলে এই পর্বে আমরা ত্রিভুজের তিনবাহু নিয়ে আলোচনা করবো। অর্থাৎ শ্রোতার সামনে একজন বক্তার বক্তৃতা দেওয়ার সময় যে অবস্থা তৈরী হয়, সে বিষয়ে আলোকপাত করবো।

প্রথমতঃ আলোচ্য বিষয় বক্তব্য। নিজেই জোরালো হবে, যদি আমরা বক্তৃতার মূল বিষয়বস্তুকে ধরতে পারি। যা সুস্বাদু ও আদরণীয় হয়ে উঠতে পারে কেবলমাত্র আমাদের অভিজ্ঞতার মশলার ঠাস বুনন আর গ্রন্থি মোচনে।

দ্বিতীয়তঃ আসছে বক্তার পালা। আমরা এখানে বক্তার দেহ, মন এবং গলার আওয়াজ এর বিভিন্ন ধর্ম অংশ গুণ ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া নিয়ে বিশাদ আলোচনা করবো।

তৃতীয়তঃ বিষয় হল শ্রোতা যাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন একজন বক্তা শ্রোতার মনে বক্তৃতার দ্বারা প্রভাবিত করে মন জয় করে নিতে পারাব ওপরেই নির্ভর করেছ বক্তার সাফল্য-অসাফল্য।

চতুর্থ অধ্যায়

কথাবলার বিশেষ অধিকার অর্জন করা

অনেকবছর পূর্বে একজন দর্শনের অধ্যাপক, যিনি বৃটিশ নৌবাহিনীতে তার যৌবন কাটিয়েছেন, আমাদের ইউইয়র্কের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এসে ভর্তি হলেন। তার ইংরাজী ছিলো খুবই ভালো আর উন্নত মানের। আমাদের শিক্ষকদের চাইতেও ভাল বলতে পারতেন তিনি। তিনি ছিলেন শহুরে। কৃষ্টিবান-সংস্কৃতি সম্পন্ন। মার্জিত ও পরিশীলিত উচ্চারণে কথা বলতেন তিনি। তার বক্তব্য ছিলো যুক্তিবান আর আদব-কায়দা ঘেঁষা। এতসব গুণাবলী থাকা স্বত্বেও তার বক্তৃতা জমাট বাঁধতোনা। তার বক্তব্য হতো সাধারণ আর প্রানহীন। কোন ঘটনা বলা না দৃষ্টান্ত দিতে পারতেন না তিনি অভিজ্ঞতার ঝুলি থেকে। ধারাবাহিক তাত্ত্বিক আলোচনার মতই নীরস আর প্রাণহীন দুর্বোধ্য আর বিমূর্ত আদর্শ ঘেঁষা ছিল তার বক্তৃতা।

অপরদিকে এক অর্থ লেনদেনকারী সংস্থার কর্ণধারও আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র ছিলেন। তার বক্তৃতা ছিল সুনির্দিষ্ট, মাপা, বক্তব্যের ঠাস বুননে ঘটনার বিবৃতিতে ছবির মতই উপভোগ্য। তিনি দৈনন্দিন জীবনের নানা ঘটনার পরিপেক্ষিতে বক্তব্যের সূতো গাঁথতেন। ব্যবসার ক্ষেত্রে তিনি নিজে যে সব অসুবিধা বা সুবিধার সম্মুখীন হতেন, তিনি শ্রোতাদের সংগে খুবই অন্তরঙ্গ ভঙ্গীতে তা আলোচনা করতেন। টাটকা তাজা ঘটনার স্বাদে তিনি শ্রোতাদের প্রাভবিত করে ফেলতেন গভীর ভাবে। শ্রোতারা গভীর আগ্রহ আর আনন্দের সংঙ্গেই তার বাস্তব নির্দেশ বহুল বক্তৃতাকে পছন্দ করতো।

পাশাপাশি, একজন অধ্যাপক আর এই লেনদেনকারীর মধ্যে আলোচনার কী তফাৎ থাকতে পারে তা বুঝলেন আপনারা। একথা আলোচনা করার মূল উদ্দেশ্য হল—কী করে বা কেমন করে একজন বক্তা শ্রোতার মনে সাড়া জাগাতে পারে, প্রভাবিত করতে পারে শুধুমাত্র বক্তব্যে গুরুত্ব আর বর্ণনাবহুল ঘটনা সমৃদ্ধ কথা বলতে পারার গুনে।

বক্তব্যকে জোরদার আর সমৃদ্ধ করার জন্য বেশ কয়েকটি উপায় রয়েছে, যা ঠিকমত অনুশীলন করলে শ্রোতার মন জয় করা যাবেই যাবে। শ্রোতা গভীর আগ্রহ আর উৎসুক্য নিয়ে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করবে আপনার পরবর্তী কণ্ঠস্বর শোনার জন্য।

১। বিষয় বস্তুকে অযথা বাড়াবেন না। সংক্ষিপ্ত করুন।

বিষয় বস্তু নির্বাচিত হয়ে গেলে আপনি সিদ্ধান্ত নেবেন, যাতে কোন অবস্থাতেই আপনি নির্দ্ধারিত বিষয়ের আওতার বাইরে পা না বাড়ান। বিরাট পটভূমি টেনে অনেক বিষয়বস্তু নিয়ে বক্তব্য রাখার চেষ্টা না করাই আপনার পক্ষে শ্রেয় হবে। না হলে সব কিছু গুলিয়ে যাবে, তালগোল পাকিয়ে হাসির খোরাক হয়ে উঠবেন শ্রোতাদের চোখে, যদিও আপনি নিজে ভাববেন, কত গুরুগম্ভীর পাণ্ডিত্যময় বক্তৃতা দিচ্ছি অথচ শ্রোতারা তা বুঝতেই পারছে না।

একবার একজন যুবক বক্তা নিজের দোষে হাসির খোরাক হয়ে উঠেছিল শ্রোতাদের কাছে। মাত্র দু মিনিটের জন্য বলতে উঠে, সে বিষয় বেছেছিল—'খৃঃ পূঃ ৫০০ সালের এথেন্স থেকে আজকের কোরিয়ার যুদ্ধ।' কী মুর্খতার পরিচয় দিল বক্তা বিষয় নির্বাচনে! এথেন্সের গোড়া পত্তনের শুরু হতে না হতেই সময় ফুরিয়ে গেলো বলার, ছেলেটি মুখ চুন করে বসে পড়তে বাধ্য হল।

এ ধরনের হাজারটা বক্তৃতা আমি শুনেছি। অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করতে গিয়ে, একাধিক প্রসঙ্গ টেনে আনতে গিয়ে, এরা সবাই মূল লক্ষ্য থেকে, আলোচ্য বিষয় থেকে যেন হাজার মাইল দূরের এক শুকনো মরুভূমিতে মুখ থুবড়ে পড়েন আচমকা। শ্রোতারা আকর্ষিত হওয়াতো দূরের কথা, গভীর আগ্রহে অপেক্ষা করেন কখন বক্তার বলা শেষ হবে, বিরক্তকর পরিস্থিতির হাত থেকে নিস্তার পাবেন তারা। কেন এরকম হয়? কারন কী?

উত্তর হল, কারন মানুষের মন ধারাবাহিক একঘেয়ে বিরক্তকর তথ্যবহুল হিসেব নিকেশের রসকষহীন শুকনো কচকচি শুনতে একদম পছন্দ করে না—বিরক্ত হয় খুব।

যদি কোন বক্তা বলতে উঠে, সারা পৃথিবীর বর্ষ-পঞ্জীকা নিয়ে বলতে থাকেন, তাহলে চোখ বুজে বলে দেওয়া যায়; অধিকাংশ শ্রোতা বাইরে চলে যাবে চা সিগারেট খেতে, বাকী শ্রোতা হয় ঝিমোতে থাকবে হাই তুলতে তুলতে, না হয় অন্য কিছু ভাববে মশগুল হয়ে।

আর একটা সহজ উদাহরণ দেওয়া যাক। ধরুণ, আপনি বেড়াতে গেছেন ইয়েলোস্টোন পার্কে। দেখবেন দর্শক যেন মৌমাছির মত গুঞ্জনে গুঞ্জনে সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে সৌন্দর্য্যের মধু আহরনে। কোন দৃশ্যাবলী বা সুন্দর নিসর্গ থেকেই বঞ্চিত হতে চায়না তারা।

কিন্তু সববিছু দেখার শেষে তাদের স্মৃতিতে গাঁথা থাকে জল-প্রপাতের শব্দঃ ঘূর্ণীয়মান জলস্তম্ভ, মৌনবিধুর পাহাড় আর উষ্ণ প্রস্রবণে সন্তরণের আরামদায়ক অভিজ্ঞতার কথা। যদি কোন বক্তাকে ইয়েলোস্টোন পার্ক বিষয়ে বলতে দেওয়া হয়, তাহলে তার বক্তৃতা হয়ে উঠবে স্মরণীয় এবং বরণীয়, যদি তিনি বহুবিধ দৃশ্যাবলী আর নিসর্গ শোভা থেকে একটি বা দুটি বিষয়কে বেছে নেন। তিনি নির্বাচন করতে পারেন নিজের সবচেয়ে ভাললাগা প্রিয় দৃশ্যটিকে। তাহলেই তিনি সক্ষম হবেন খুঁটিনাটি বিবরণ দিয়ে

বক্তব্যকে বর্ণণাময় দৃশ্য-গ্রাহ্য করে তুলতে। শ্রোতরা মনোযোগী হবে শুনতে, কারণ তাদের মনে হবে প্রতিটি বর্ণনা তারা শুধু শুনতে পাচ্ছে না—চোখের সামনে যেন দেখতেও পাচ্ছে। নান রকম বৈচিত্রের সম্ভারে প্রাণময় উজ্জ্বল হয়ে উঠবে বক্তৃতা। অতি সহজেই শ্রোতার হৃদয় জয় করতে সক্ষম হবেন বক্তা।

যে কোন বিষয়েই এই কথা খাটে। তা বিক্রয়-দক্ষতা, পাউরুটি-কেক তৈরী,করদানে অব্যাহতিলাভ, স্বয়ংক্রিয় ক্ষেপ-ণাস্ত্র-ইত্যাদি যাই হোকনা কেন।

বক্তৃতা দেওয়ার পূর্বে নির্দ্ধারিত বক্তব্য কেটে সংক্ষিপ্ত করুণ, পাঁচ মিনিটের কম সময়ে যেন শেষ হয়। ধরুন আপনাকে ওই সময়টাই বলার জন্য দেওয়া হয়েছে। তাই আপনাকে একটি দুটি প্রধান সূত্র নিয়েই বলে যেতে হবে, বেশী নয়। দীর্ঘসময়কালীন বক্তৃতা ধরা যাক আধ ঘণ্টা সময় সীমার মধ্যে খুব কম বক্তাই পারেন চার পাঁচটার বেশী সূত্র নিয়ে সফল বক্তৃতা দিতে।

(তাহলে প্রধান কথা হল ; বিষয়বস্তু সংক্ষেপ করুন। অযথা টেনে বাড়াবেন না।)

*

* *

২। সংরক্ষিত ক্ষমতা বাড়ান।

ভাসাভাসা ওপর ওপর কোন কিছু বিষয়ে বলা খুবই সহজ। বক্তব্যের গভীরে না ঢুকে দায়সারাভাবে বলা যাকে বলে। এ ধরণের কথা বলা কোনকাজে লাগেনা। শ্রোতার মনে আদৌ কোন ছাপ পড়েনা। কম কথা হবে অথচ বক্তব্য হবে জোরালো। আপনি যখন কোন একটি বক্তব্য বিষয় নির্বাচন করবেন, তখন ভালো করে

নিজেকে প্রশ্ন করুন এ বিষয়গুলো দিয়ে কেন আপনি তা বিশ্বাস করবেন ? বাস্তব জীবনের সঙ্গে কেমন করে মিল খুঁজে বের করবেন ? সত্যিকথা ভাবতে চেষ্টা করুন, আপনি কী প্রমান করতে চাইছেন ? বাস্তবে কেমন করেই বা এসব ঘটবে ?

এসব প্রশ্ন সম্পর্কিত উত্তর একটাই। ক্ষমতা কে ংরক্ষণ করুণ। এলোপাথাড়ি ক্ষমতার অপব্যহার করবেন না। তাহলেই আপনার বিশেষ সংরক্ষিত ক্ষমতার বলে শ্রোতাকে মনোযোগী করে তুলতে পারেন, চুপ করে বসিয়ে রাখতে পারেন।

একবার একজন প্রখ্যাত উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী আমাকে বলেছিলেন—আমি কয়েক লক্ষ গাছপালা নিয়ে কাজ করে, গবেষনা চালিয়ে একটি বা দুটি উন্নত মানের গাছের সন্ধান পেয়েছি মাত্র। একশো চিন্তার মধ্যে নব্বইটিকে তাড়িয়ে দিয়ে মাত্র দশটিকে ধরে রাখুন, যত্ন করুণ।

আর একজন অধিক-বিক্রিত জন-সংযোগকারী তথ্য সমৃদ্ধ পুস্তক প্রণেতা আমাকে জানিয়েছিলেন—আমি আমার প্রয়োজনীয় খবর, যা আমার কাজে লাগাতে পারবো তা সংগ্রহ করি প্রয়োজন থেকে দশ গুণ বা একশোগুণ বেশী।

এখানে লেখক আসলে বই লেখার তথ্য সংগ্রহ করার বাস্তব অভিজ্ঞতার দিক থেকে একথা বলেছিলেন। আরও একবার সেই লেখক যখন পাগলাগারদ এবং পাগলদের সম্পর্কে বই লেখার বা বক্তৃতা দেবার জন্য তথ্য অনুসন্ধান ও সংগ্রহ করেছিলেন তখন, তার একনিষ্ট সহকারী আমাকে অনেক কথা জানিয়েছিল। কয়েকশো পাগল গারদ, হাসপাতালের ডাক্তার, রুগী, পরিচালক, নার্স, পরিচালনা বিভাগের বিভিন্ন কর্মীকে নিয়ে তিনি হাজারো প্রশ্ন করেছিলেন তথ্যের জন্য। দিনের পর দিন হাসপাতাল চত্বরে ঘোরাফেরা করে জুতোর শুকতলা খুইয়ে লেখক ভদ্রলোক মোটা মোটা খাতা ভর্তি করে ফেলেছিলো। এছাড়া স্বাস্থ্য-দপ্তর,

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন পত্র পত্রিকা, রির্পোট, বুলেটিনও সংগ্রহ করেছিলেন তিনি।

অবশেষে তিনি মাত্র চারটে ছোট ছোট নিবন্ধ লিখে ছিলেন যা শ্রোতার সামনে সুন্দর সংক্ষিপ্ত চিত্ত জয়কারী বক্তৃতা দিতে সহায়ক হয়েছিলো। কয়েক কিলো ওজনের না।থি পত্র থেকে তিন আহরন করেছিলেন এমন শক্তি বা সংরক্ষিত ক্ষমতা—যা শ্রোতাদের হৃদয় স্পর্য করেছিল আন্তরিক মুগ্ধতায়।

আমার এক সার্জন বন্ধু আমাকে একবার বলেছিলো—কী ভাবে কেমন করে এ্যাপেনডিক্স-কে অস্ত্রোপচার করে বাদ দিতে হয়, আমি তা তোমাকে মাত্র দশ মিনিটেই শিখিয়ে দিতে পারি। কিন্তু যদি কিছু খারাপ হয় কাটা ছেঁড়ার সময়, তা হলে কী করতে হবে—সেটা সেখাতে আমার কম করে সময়:লাগাবে চার বছর।

সুতরাং যখনই কিছু বলার জন্য বক্তৃতা মঞ্চে উঠবেন তখনই মনকে প্রস্তুত করে নেবেন যেকোন প্রতিকূল অবস্থার মোকাবিলা করার জন্য। যেকোন জরুরী অবস্থার মুখোমুখি হতে পারেন আপনি। যেমন ধরুন, আপানার পূর্বতম বক্তা এমন কিছু বক্তব্য রাখবেন যে আপনাকে তার জবাব দিতে হবে বা আপনার বক্তব্যের মূল কাঠামোর পরিবর্তন করতে হতে পারে। আপনি যেন কিছুতেই ঘাবড়ে যাবেন না। আপনিও দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে বিষয় পরিবর্তন করুন—তাহলেই সংরক্ষিত ক্ষমতা ব্যবহার করার উপযুক্ত হবেন।

দু'তিন দিন পরে কোথাও বক্তৃতা দেওয়ার কথা আছে আপনার, আপনি ভাবলেন পরে দেখে নেবো সময়তো রয়েছেই হাতে। তাহলেই সর্বনাশ হবে। যত তাড়াতাড়ি বক্তব্য-বিষয় নির্বাচন করে ফেলবেন—তত দ্রুত আপনার মন এ বিষয়ে ভাবনা চিন্তা শুরু করে দেবে। আপনার অজ্ঞাতসারে আপনি অভীষ্ট সিদ্ধির দিকে এগিয়ে যাবেন। যখন আপনার হাতে অবসর আসবে কাজের ঝামেলা থাকবে না—তখন নির্জনে বসে বিষয়টি নিয়ে ভাবুন। চিন্তার ডানা

মেলে খুঁজে দেখুন নতুন কোন ঘটনার সংগে বা অতীতের কোনকিছুর সংগে দেখুন কোন মিল আবিষ্কার করতে পারেন কিনা। নিজে যত বেশী করে, যত ভালোভাবে বিষয়টি বুঝবেন জানবেন, তত বেশী সফল হবেন আপনার চিন্তাকে শ্রোতাদের মনের তরঙ্গে পৌঁছে দিতে। যখন আপনি গাড়ি চালিয়ে বাড়ি ফিরছেন বা বাসের জন্য অপেক্ষা করছেন বা সাবওয়ের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠছেন তখন ইচ্ছে করেলই আপনি নির্বাচিত কোন বিষয় নিয়ে ভাবনার নিমগ্ন হতে পারেন। এরকম ভাবতে শিখলেই নতুন নতুন যুক্তি ও ভাবনার তরঙ্গ আপনাকে বিদ্যুৎ সংকেত দেবে, এগিয়ে নিয়ে যাবে কাছের বাস্তব সাফল্যের দিকে।

একজন প্রখ্যাত রাজনৈতিক বক্তার এবিষয়ে একমত। তাঁর মত হল—মঞ্চে ওঠার পূর্বে পথ চলতে, খবরের কাগজে পড়তে পড়তে,বিছানায় ঘুম আসার আগে, সকালে প্রাতঃ রাশের পূর্বে যে বক্তা যত বেশী গুরুত্ব সহকারে নির্বাচিত বিষয় নিয়ে ভাববেন, তিনিই তত বেশী দর্শকের দরবারে সম্বর্ধনা লাভ করতে পারবেন। মাঝারি গোছের ভাবনা চিন্তা থেকে মাঝারি থেকে বড়ো কোন কিছু আশা করা যেতে পারে কিন্তু ফল লাভ হয় মাঝারি গোছের বা তারও নিম্নমানের।

যদি কোনদিন লেখা বা বলার ব্যাপারটাই আপনার জীবিকা হয়ে ওঠে, তখন দেখবেন পাতার পর পাতা জুড়ে লেখার লোভ কিছুতেই সংবরন করে উঠতে পারছেন না আপনি। চেষ্টা করুন—যাতে এ লোভ থেকে মুক্ত হতে পারেন। বরঞ্চ চিন্তাটাকে কার্যাকরী ভাবে গুরুত্বপূর্ন পরিনতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করুন। নিজের মনে মনে বক্তব্য বিষয়ে গুরুত্ব ও মর্য্যাদা অনুসারে একটী নিরেট-দুর্ভেদ্য কাঠামো তৈরী করুন। কিন্তু সাবধান। কখনই কোন কিছু মুখস্থ করা বিষয় থেকে মনে করার চেষ্টা করতে যাবেন না

যেন। পাণ্ডুলিপি বা খসড়া বক্তৃতা মুখস্থ করে ফেলার বাতিক যেন কখনই আপনার না হয়।

প্রখ্যাত কথা শিল্পী অভিজ্ঞতা সমুদ্র যিনি লঙ্ঘন করেছেন বেঁচে থাকার আগের মুহূর্ত পর্য্যন্ত—সেই মার্ক টোয়েন একবার বলেছিলেন-লেখা কোন কিছু কখনই বলার মত সাবলীল ভঙ্গীর হতে পারে না-বক্তৃতা দেওয়াতো দূরের কথা। কার্যত লেখ্য বিষয়ে বা প্রবন্ধে সাহিত্যের গন্ধ বড় বেশী থাকে। তারা একটু শক্ত হয়, অনমনীয় হয়, বলার সময় জিভ খুবই আড়ষ্টভাবে তা উচ্চারন করার দায়িত্ব পালন করে। কিছুতেই সহজ স.বলীল প্রাণপ্রাচুর্য্যে ভরা টগবগে বক্তব্য হয়ে পড়েনা শ্রোতার কাছে। যেখানে বক্তার কাজ হল, শ্রোতাকে খুশী করা, আনন্দ দেওয়া, নতুন নতুন তথ্যের জগতে ঘটনার জগত থেকে ভ্রমন করিয়ে আনা; সেখানে মুখস্থ করা গালভরা কাঠখোট্টা রসকষ ও প্রাণগন্ধবিহীন বক্তৃতা শ্রোতাদের মুগ্ধ করাতো দ.রের কথা—বিরক্তে অস্থির ও চঞ্চল করে তোলে। এ যেন প্রতিটি শ্রোতার হাতে গোলাপ ফুল তুলে দিয়ে বলা হল সুগন্ধ আস্বাদন করার জন্য—অথচ ফুলগুলি হলো কাগজের তৈরী' কৃত্রিম। প্রানহীন।

মোটর গাড়ী নির্মান শিল্পে যার নতুন নতুন চিন্তা আর উদ্ভাবনী শক্তি আবিষ্কারের বহুমুখী দরজা খুলে দিয়েছে অসংখ্যবার, এমন একজন পৃথিবীখ্যাত মানুষ একবার আমাকে বলেছিলেন—মিঃ কার্নেগী ব্যপারটা কী জানেন—আমি যা ভাবি, তা লিখে রাখতে পছন্দ করি! আমি বিশ্বাস করি আমার চিন্তার সঠিক মূল্যায়ন না হলে সম্ভব হয়ে উঠবে না। তবে হ্যাঁ, কাগজের ওপর হিজিবিজি লেখার ওপর কোন গুরুত্বই আমি দিই না—শ্রোতার হৃদয়ে মনের পাতায়, বক্তব্যের কালির আঁচড়ে লিখতেই অমি পছন্দ করি। সারাজীবন ধরেইআমি এরকম লেখাই লিখে চলেছি। আমি দঢ়ভাবে বিশ্বাস করি একখণ্ড সাদা কাগজ কখনই আমার ও শ্রাতার চিন্তার আদান প্রদানের সেতু

হতে পারে না। যারা এরকম সেতু তৈরী করার চেষ্টা করেন-তারা ব্যর্থ হন শ্রোতার মনে প্রভাব ফেলতে। মাঝপথেই সে সেতু ভেঙ্গে পড়ে।

(তাহলে ওপরের উপমাগুলো থেকে এশিক্ষাই আমরা পেলাম- ক্ষমতা সংরক্ষন করুন এবং সংরক্ষিত ক্ষমতা বাড়ান।)

৩। আপনার বক্তব্যকে বর্ণনা বহুল-বর্ণনা মূলক চিত্র-ধর্মী করে তুলুন।

একবার 'টাইম' এবং 'রিডার্স ডাইজেস্ট' পত্রিকায় প্রকাশিত একটী প্রবন্ধ খুবই সাড়া জাগিয়েছিল। প্রবন্ধটি লিখেছিলেন একজন দিকপাল-অধিকবিক্রিত পুস্তকের লেখক। তাতে তিনি লিখেছিলেন-পাঠযোগ্য লেখার পেছনে কী রহস্য থাকে? পাঠক কী ধরনের লেখা পড়তে ভালোবাসে? প্রবন্ধের শেষে চুম্বক কথাটি বলেছিলেন—হ্যাঁ। এতে কোন দ্বিমত নেই, সন্দেহের কোন অবকাশ নেই, যে পাঠক একমাত্র গল্প পড়তেই সত্যিকার ভাবে পছন্দ করেন, পাঠযোগ্য ভাবেন।

আর একজন পাত্রী লেখকের কথা বলছি। যার ধর্মোপদেশ রেডিও-টি.ভি. মারফৎ কয়েক কোটি শ্রোতার হৃদয়ের দুয়ারে ঘা দিতে সক্ষম হয়েছিলো, তিনি একবার এক সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানে আমাকে বলেছিলেন, 'জানো, আমি বক্তৃতার সময় সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিই উপমার ওপরে, গল্প বলার ভেতর দিয়েই আমি প্রভুর বানী শোনাই শ্রোতাদের।

আমার লেখা 'প্রতিপত্তি ও বন্ধুলাভ' পুস্তকের সার কথা লেখা হয়েছে মাত্র দেড়পাতাতে। বাকী দুশো তিরিশ পাতা জুড়ে ছিল গল্প

আর উদাহরন সমূহ এবং কেমন করে কী ভাবে বাস্তব জীবনে আমার উপদেশ ও শিক্ষাকে কাজে প্রয়োগ করে নিজ নিজ ক্ষেত্রে উন্নতির চরম শিখরে উন্নীত হয়েছিলো আমার ছাত্ররা।

তাহলে কীভাবে কেমন করে আমরা সেই প্রয়োজনীয় কলা-কৌশল শিখতে পারবো ঘটনার উপাদান থেকে? কোন উপায় আছে কি শেখার? উপরোক্ত প্রশ্নগুলি আমাকে সামনে পেলে যে আপনারা করতেন তা আমি ভালোভাবেই জানি। তাহলে সেই স্বর্নখনির সন্ধান বলে দিচ্ছি।

আপনার ইচ্ছে থাকলেই যত খুশি স্বর্ন উত্তোলন করতে পারবেন আপনি।

নীচের কথাগুলোকে হেলাফেলা করে পড়বেন না। যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে পড়ুন। ভাবুন। ব্যাখ্যা করুন। কথাগুলো গুরুত্ব অনুসারে সাজিয়ে লিখছি :—

(১) মানবতাকরন
(২) ব্যক্তিগত ভাবনার আদানপ্রদান
(৩) বিন্যাসকরণ
(৪) নাটকীয়তা আনয়ন
(৫) দৃশ্য গ্রাহ্যতা।

এবারে উপরোক্ত বিষয় সমূহ নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করছি চোখ কান মন-প্রাণ খোলা রেখে পড়ুন। বুঝুন। বারবার পড়ুন। শুধুমাত্র পড়ার জন্যই পড়বেন না।

৪। আপনার বক্তৃতাকে মানবতার পথে চালিত করুন।

একবার প্যারিসে বসবাসকারী অ্যমেরিকান ব্যবসায়ীদের আমন্ত্রণে, প্যারিসে যেতে হয়েছিলো বক্তৃতা দেবার জন্য। বক্তব্য বিষয় ছিল কী করে সফলতা অর্জন করা যায়?

প্রথমে আমি সবাইকে এক এক করে এ বিষয়ে নিজেদের বিশ্বাসও ধারনা সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে বললাম।

বক্তারা প্রায় সকলেই নিগূঢ়-দুর্বোধ্যতত্ত্ব মূলক ধাঁচে বলে চললো। কঠোর পরিশ্রম, অধ্যবসায়, ধৈর্য্য আর অনমণীয় সংকল্প নিয়ে। পরিশেষে আমার বক্তব্যে আমি বললাম, 'আমার কেউ-ই উপদেশ বা জ্ঞান শুনতে পছন্দ করি না। কেউ তা উপভোগ করে না। বরঞ্চ অতিমাত্রায় বিরক্ত হয়। সব সময় এটা মনে রাখতে হবে আমাদের, আপনি শ্রোতাদের এমন কিছু বলুন যা তাদের শুনতে ভালো লাগে আগ্রহ বাড়ায় না হলে শ্রোতারা মনোযোগী হবেনা, আপনার কথা শুনতে পৃথিবীতে সবচেয়ে আশ্চর্য্যতম জিনিস হচ্ছে —যা কিছু মহীয়ান গরীয়ান সর্বোত্তম শ্রদ্ধাঞ্জলীর উচ্চ ধরণা সম্বলিত এবং উজ্বল উদ্যম আর ভাবাবেগের প্রদীপ্ত আলোকে আলোকিত প্রচলিত গল্প-গাথারা। তাই সেই প্রাচীন কিংবদন্তী আর গল্পের হাজার বছর পরমায়ুর দিকে তাকিয়ে আপনাদের অনুরোধ করবো, যাতে করে আপনারা চেনাজানা কাছের দু'জন লোক সম্পর্কে কিছু বলতে পারেন আমাদের। বলুন, কেন একজন উন্নতি করলো আর একজন ব্যর্থ হল। আমরা গভীর আগ্রহ নিয়ে তা শুনবো। তা মনে রাখবো। আর সেই থেকে জীবনের চলার পথের শিক্ষা নেবো। উপকৃত হবো।

সেই বক্তৃতা-বাসরে এমন কোন ব্যক্তি ছিলেন না, যিনি নিজের সম্পর্কে বা চেনাজানা কারুর সম্পর্কে বলতে আগ্রহী নন এবং সেই সঙ্গে শ্রোতাদেরও দূরে বসিয়ে না রেখে কাছে টানতেও আপত্তি হলোনা কারুর।

একজন বক্তা বক্তব্যকে গুছিয়ে কাটছাঁট করে, মানবতাধর্মী করে সুন্দর বললো তার চেনা দু'জন প্রতিবেশী সম্পর্কে। তাদের মধ্যে একজন ছাত্র জীবনে ইঞ্জিনীয়ারিং পড়াকালীন তার সহপাটি ছিল। সে ছিল খুবই গোঁড়া আর গোঁয়ার, সে শহরের সমস্ত দোকান থেকে

শার্ট কিনতো—কে কোন দামে কত ভালো শার্ট দেয় তার চার্ট তৈরী করতো। কেউ যেন তাকে ধমকানোর দুঃসাহস না দেখায় এই ভেবে সে সর্বদা সংকিত থাকতো। কী করে টাকা দিয়ে কেনা শার্টের প্রতিটি পয়সা উসুল করা যায় এ নিয়েই তার সময় কাটতো। সে কারুর সঙ্গে কথা বলার প্রয়োজন অনুভব করতো না, মিশতোনা। সব সময় শুধু নিজেকে নিয়েই মগ্ন থাকতো—নিজের ভালো ছাড়া অন্য কিছু সে ভাবতেই পারতোনা। পাশ করেবেরুনোর পর অন্য সবাই যখন হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ নিয়ে নিজেকে ঝালিয়ে নিচ্ছে, পরস্পর মতের আদান প্রদান করে নিজেদের ভুল ত্রুটি সংশোধন করে নিচ্ছিলো, নিজেরাই উপকৃত হচ্ছিল এ মেলামেশায়; তখন সেই প্রাচীন-পন্থী গোঁড়া সার্থপর ছাত্রটি কলেজের গোটা তিনেক সমাবর্তন উৎসবের কোনটাতেই আসার প্রয়োজম মনে করলো না—সে তখন জামা-কাপড়ের দোকানের চার্ট কাজে তৈরীর ব্যস্ত রইলো। এভাবে নিজেকে গুটিয়ে রেখে মেলামেশা না করে সেই ছাত্রটি নিজেকে শুধু এক কূয়োর ব্যাঙ এ রূপান্তরিত করে ফেললো। মাঝখানে লাভের মধ্যে এটাই হল— সে জীবনে কোন উন্নতিই করতে পারলো না লোকের অপ্রিয় ভাজন হয়ে ছোটপদেই কাটিয়ে দিতে হলোতাকে। যেখানে একই সঙ্গে পাশকরা অন্য বন্ধুরা দশ ধাপ এগিয়ে গেছে পদ-মর্য্যদা এবং অন্যান্য বিষয়ে। জীবনের দুই-তৃতীয়াংশ ব্যয় করে আজ সেই ছাত্রটির জীবনে, দুঃখ-হতাশা-তিক্ততা আর গ্লানির বিষ জমা হওয়া ছাড়া,অন্য কোন সঞ্চয় নেই আর।

তার পরেই বক্তা একজন সফল সহপাঠির বিষয়ে বলে গেলো। এই ছাত্রটি ছিলো হৃদয়বান, উদার। সবার সঙ্গে মিলেমিশে থাকতো। নিজের বলে সব সময় আত্মকেন্দ্রিক ভাবনা ভাবতোনা। সকলেই তাকে পছন্দ করতো, সে ছিলো উচ্চাশাসম্পন্ন। তাই সামান্য ড্র্যাফট্‌সম্যান থেকে জীবন শুরু করতেও ইতস্তত, করেনি। কিন্তু সে সদাসর্বদা উন্নতির সোপান খুঁজতে—সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে

চাইতো। নিউ-ইয়র্কে বিশ্ব-বানিজ্য মেলা অনুষ্ঠিত হবার পূর্বে সে চাকরী ছেড়ে নিয়ে একজন অংশীদার দিয়ে স্বাধীন ব্যবসা শুরু করলো। ফিলাডেলফিয়া ছেড়ে নিউইয়র্কে এলো, সে জানতো বানিজ্যমেলাতে মেধা অনুযায়ী কাজের লোকের প্রচুর সুযোগ রয়েছে। সেখানে গৃহ-নির্মাদের প্রকল্পের কণ্ট্রাক্টরী নিয়ে সে খুবই সুনাম অর্জন করে ফেললো। পরে টেলিফোন কোম্পানীর হয়ে এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে দিলো, যাতে সবার মনোযোগ আকর্ষিত হল।

সেই টেলিফোন কোম্পানীই প্রচুর টাকা মাইনে আর উচ্চ পদ দিয়ে সেই ছেলেটিকে লুফে দিলো তার প্রতিষ্ঠানে।

বক্তা যা বলেছিলো তার মূল সত্যগুলোই আমি বললাম এতক্ষণ। পূর্বে এই একই বক্তার তিন মিনিটের বক্তৃতা চলাকালীন সময়ে শ্রোতারা অধৈর্য্য-বিরক্ত হয়ে উঠেছিলো। অথচ মজার কথা হল সেই একই বক্তার ঘটনাময় বর্ণনাবহুল বক্তৃতা চলেছিলো দশমিনিটেরও বেশী সময় ধরে—শ্রোতারা অধীর আগ্রহে তা শুনেছিলো।

প্রত্যেক মানুষের পক্ষেই, তার নিজের জীবনের ঘটনাকে কাজে লাগিয়ে অনেক কিছু করার আছে। মানবতাগুণ সমৃদ্ধ কোন ঘটনা বা উদাহরণময় বক্তৃতা শ্রোতাকে অনেক বেশী কাছে টানে, হৃদয়ে ছাপ ফেলতে সমর্থ হয়। বক্তাকে নিজের জীবনের ঘটনা থেকে উপাদান বেছে নিয়ে গল্পের ঢং-এ তা বলতে হবে। আর আমি বিশ্বাস করি প্রত্যেক মানুষেরই অভিজ্ঞতার স্বর্ণখনি রয়েছে নিজের মধ্যে, যে তা উত্তোলন করতে জানেন এবং কেমন করে কাজে লাগাতে হয় জানেন, তিনি সফল হন।

(শ্রোতার মন জয় করার সহজ উপায় হল নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বক্তৃতার মালমশলা সংগ্রহ করা। ঘটনাগুলো সাধারণ বলে অবজ্ঞা না করা)

৫। ব্যক্তিগত ভাবনাকে প্রাধান্য ও বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য নাম-ধাম ও পরিচয় দিন।

যখনই হোকনা কেন, যখন গল্প বলবেন তাতে জড়িত লোকজনদের সঠিক নাম—পরিচয় দিন। এতে বক্তব্য খুবই চিত্তাকর্ষক ও আদরনীয় হয়ে ওঠে শ্রোতাদের কাছে। তবে আপনি যদি কোন কারনে নাম-পরিচয় গোপন করার প্রয়োজন বোধ করেন, তাহলে ডাক নাম বা মিঃ স্মিথ, জো, কিটস, ব্যাব, বলে সম্বোধন করুন। অমুক-তমুক বা সে ব্যবহার করার চেয়ে বড় বোকামী আর কিছুতে হয় না। এতে শ্রোতারা বিরক্ত হয়—একঘেয়ে লাগে বক্তব্য।

অ্যামেরিকার একজন বিখ্যাত বক্তা একবার আমাকে বলেছিলেন, 'বক্তব্য বিষয় ও গল্পকে, নাম-পরিচয়-এ উল্লেখে অনেকবেশী মনোগ্রাহী আর শ্রুতিমধুর করে তোলে। এমন একটা গল্প পড়ছেন কি—যার নায়কের কোন নাম নেই।'

(আপনার বক্তৃতা শুনতে লোকে আগ্রহী হবে তখনই, যখন বিবিধ ঘটনা আর উদাহরণের মাল মশলায় আপনার বক্তব্য প্রাণময় হয়ে উঠবে)

৬। ঘটনাকে বিশ্বাস গ্রাহ্য করুন, বিন্যাস করুন, ছোট খাটো ঘটনার বিবরন রসে, সমৃদ্ধ করুন।

ওপরের লেখাটা পড়েই আপনি মনে মনে যা ভাবছেন সেটা হল,—আমি কী করে অত তথ্য জোগাড় করবো? বা ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরন দেবো আমার বক্তৃতায়? সেটা তো অসম্ভব মনে হচ্ছে মিঃ কার্নেগী?

এর একটা সুন্দর উপায় আছে। 5-S ফর্মুলার সাহায্যে এটা সম্ভব হয়ে উঠবে আপনার কাছে। এই 5-S পদ্ধতি—যার সাহায্য নেয় পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি সাংবাদিক। যেমন করে একজন সাংবাদিক তার সংবাদের মাল মশলা সাজিয়ে সংবাদ-গল্প লেখে।

এভাবে লিখতে বা ভাবতে শুরু করে সাংবাদিক। কে? কী? এবং কেন? কখন? কোথায়? —যদি আপনি এই পদ্ধতির ছকে ফেলে আপনার জানা উদাহরণকে সাজাতে পারেন, তা হলে তা হয়ে উঠবে বর্ণনাময়, উজ্জ্বল আর প্রানবন্ত।

আমি আমার জীবনের একটি ঘটনা বলছি: কলেজ থেকে বেরুনোর পর বছর দুয়েক আমি একটি বিখ্যাত কোম্পানীর ভ্রাম্যমান বিক্রিয় প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করেছিলাম। আমাকে প্রায় সব সময়ই অ্যামেরিকা চষে ফেলতে হতো। সাধারণতঃ ট্রেনে চড়েই বেশী ভ্রমন করতাম আমি। একবার রেডফিল্ড এস. ডি. স্টেশন দিয়ে। যাচ্ছিলাম ট্রেনে চড়ে। পথে ঘণ্টা দুয়েকের বেশী সময় ট্রেনটি থামার কথা ছিল এই স্টেশনে। রেডফিল্ড জায়গাটা আমার কাজের সীমারেখার বাইরে থাকায় আমার পক্ষে বিক্রি বিষয়ক কাজ করা সম্ভব ছিলোনা। হঠাৎই মনে হল, তাইতো, এক বছরের মধ্যে আমি তো এ্যামেরিকান এ্যাকাডেমী অফ ড্র্যামাটিক আর্টস এ পড়তে যাচ্ছি। তাই আমি ঠিক করলাম বাকী সময়টা অযথা নষ্ট না করে কথা বলা অভ্যাস করবো। আমি ট্রেন থেকে নেমে একটু নির্জনে হেঁটে গিয়ে 'ম্যাকবেথ' এর একটি দৃশ্য থেকে আবৃত্তি করতে শুরু করলাম অঙ্গভঙ্গি সহকারে, নাটকীয় ভাবে কণ্ঠস্বরের ওঠানামার ঘাত-প্রতি ঘাতে। কোন কোন অংশে চেঁচিয়ে উঠলাম দুর্দমনীয় ক্রোধে, আবার কোথায়ও বা কান্নায় ভেঙ্গে পড়লাম নতজানু হয়ে। এমনি করে আমার ব্যক্তিত্বকে ভেঙ্গে চুরে ফেলে আমি সেই ঐতিহাসিক ম্যাকবেথে রূপান্তরিত হলাম। আমি ভুলে গেলাম পরিবেশ-স্থান-কাল-পাত্র। হুঁশ ফিরলো চারজন পুলিশের কর্কশ কণ্ঠস্বরে।

তারা আমার হাত চেপে ধরলো। জানতে চাইলো আমি চেঁচিয়ে কেন ভয় দেখাচ্ছি মেয়েদের। আমি খুব একটা অবাক হতাম না, যদি শুনতাম পুলিশরা আমাকে পুরোটা ট্রেন ডাকাতির জন্য অভিযুক্ত করছো।

তারাই আমাকে জানালো যে একজন বাড়ির গৃহিনী তার রান্না ঘরের পর্দার আড়াল থেকে অনেকক্ষন ধরে লক্ষ্য করছিলো। সে আমার কাছ থেকে একশো গজের বেশী দূরত্বে ছিল। সে নাকি আমার মত বিপদজনক খুনী পাগলা দেখেনি—তাই ভয়ে ভীত হয়ে পুলিশে খবর দিয়েছে। ওরা আমাকে এও বললো ছুরি দিয়ে আমি কার যেন রক্তপাত করতে চাইছিলাম আর ছুরিটাই বা কোথায় লুকোলাম। আমি পুলিশদের যখন বল্লাম, আমি সেক্সপীয়রের 'ম্যাকবেথ' থেকে আবৃত্তি করা অনুশীলন করছিলাম—তারা মোটেই বিশ্বাস করলো না সে সব। ছোঁদোকথা বলে হেসে উড়িয়ে দিলো—থানায় যাবার হাত থেকে রেহাই পেতে আমাকে আমার কোম্পানীর দেওয়া অর্ডার-বই আর পরিচয় পত্র দেখিয়ে অনেক কষ্টে বাঁচাতে হয়েছিলো নিজেকে।

লক্ষ্য করুন উপরের এই ক্ষুদ্র সত্য ঘটনা থেকেই আপনি আপনার ৫-৫ ফর্মুলার পাঁচটি প্রশ্নেরই সদুত্তর পেয়ে যাবেন।

তবে এটাও সত্যি যে, বেশী খুঁটিনাটি বর্ণনা আবার অনেক সময় ভালো করার চেয়ে ক্ষতি করে বেশী। আমরা কষ্ট কল্পিত ঘটনা আর তার উদ্দেশ্য বিহীন হাল্কা বর্ণনাতে বিরক্ত হই।

তাই বক্তব্যকে বেশী মনোগ্রাহী বর্নন বহুল করতে গিয়ে আপনার শ্রোতাদের ভীত-সন্ত্রস্ত করবেন না যেন।

(মোটকথা হলঃ বক্তব্যকে ঘটনাবহুল করতে হবে পরিমিতি-বোধ মেনে।)

৭। সংলাপ যুক্ত করে আপনার কথাবলাকে নাট্যরস সমৃদ্ধ করে তুলুন।

ধরুন আপনি একজন দোকানদার। নানারকম ক্রেতাকে সন্তুষ্ট রাখতে হয় আপনাকে, মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে অনুরোধে-উপরোধের মাধ্যমে। ধরুন আপনার একদিনের ঘটনার কথা বর্ণনা করছেন আমাদের-'একদিন একজন মক্কেল বা খদ্দের প্রচণ্ড রেগেমেগে হৈ-চৈ বাধিয়ে তুললো; কারণ তাকে যে কাপড় ধোয়ার যন্ত্র বিক্রি করা হয়েছিলো তা কাজ করছিলো না। মাত্র এক সপ্তাহ আগেই সেটি তাকে বিক্রি করা হয়েছিলো। আমি তার কাছে মার্জনা চেয়ে বল্লাম এরপর আর কখনও এমন ভুল হবে না। আমি তার যন্ত্রটিকে তক্ষুনি সারিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দেওয়াতে খদ্দেরটি খুশি মনে চলে গেলো। আর, আমরা উটকো ঝামলার হাত থেকে বাঁচলাম।

আপনার মুখ থেকে যে ঘটনাটি আমরা জানলাম তা যদিও সত্যি ঘটনা—খুঁটিনাটি বিবরনও দিয়েছেন আপনি ভালো, তবুও কতক-গুলো ত্রুটি থেকে গেছে। যেমন সত্যিকার নাম-ধাম, ঘটনার বিন্যাসের অগাগোড়া বিবরন, সবচেয়ে যেটার বেশী অভাব ছিল তা হল সংলাপের অনুপস্থিতি। যা ওই সত্যিকার ঘটনাটিতে প্রাণ সঞ্চার করতে পারতো, এবারে সংলাপ জুড়ে দিয়ে ঘটনাটিকে কীরকম স্বাদ পাল্টে দেওয়া যায় দেখা যাক। বিশেষ ওই গুনকে কাজে লাগিয়ে অর্থাৎ সংলাপ জুড়ে এবারে পুনরায় ঘটনাটিকে বিবৃত করা যাক।

গত মঙ্গলবারে আমি আমার দোকানের অফিসঘরে বসে কাজ করছিলাম। এমন সময় দড়াম করে আমার ঝোলানো-দরজা খুলে গেলো রাগে গরগর করতে করতে ঘরে ঢুকলো চার্লস ব্রাউস্ক।

চার্লসের মুখ থমথমে, রক্ত চাপে ফেটে পড়তে চাইছে যেন। দেখেই বুঝলাম, কিছু একটা গণ্ডগোল বেধেছে কোথাও। চার্লস আমার অনেক দিনের পুরানো খদ্দের। আমি তাকে বসতে বলার আগেই ক্রুদ্ধ গর্জনে ফেটে পড়লো চার্লস। "দেখো এড, আমার শেষ কথা বলছি, ভালকরে শোন। এক্ষুনি ট্রাক পাঠাও, লোক গিয়ে যেন আমার বাড়ী থেকে তোমার পচাধচা লজঝড়ে যন্ত্রটা নিয়ে আসে। না হলে হুলুস্থুল করবো বলে দিলাম। জেনেশুনে একটা বাজে মাল আমাকে গছিয়েছো তুমি!" 'কী হয়েছে ব্যাপারটা বলবে?

ব্যাপার আবার কী? যন্ত্রটা খারাপ—চলছে না একদম। মাঝখান থেকে আমার আর স্ত্রীর একগাদা জামা কাপড় ছিঁড়ে ফর্দা-ফাই। তোমার মত বদ লোকের দোকান থেকে আর কখনও কোন জিনিস কিনছি না আমি। এই শেষ! —কথা শেষ করেই টেবিলে প্রচণ্ড জোরে চাপড় মারলো চার্লস—আমার স্ত্রীর ফটোটা হাত দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিলো রাগে।

'একটু ঠাণ্ডা হয়ে বসো চার্লস। ঘটনাটা ঠাণ্ডা মাথায় খুলে বলো আমাকে—আমি আমার যতদূর সাধ্য তোমার জন্য করার চেষ্টা করবো। আমার এ কথায় চার্লস একটু ইতস্ততঃ করে বসলে পর বুঝিয়ে সুঝিয়ে আমি তাকে শান্ত করলাম।

হয়তো সব সময় কথাবলার ফাঁকে সংলাপ রাখা সম্ভবপর নয়, তবে এটা ঠিক ভালোভবে সংলাপ ব্যবহার করতে পারলে গল্পের বা ঘটনার মেজাজই পুরো পাল্টে যাবে।

পুরো বক্তব্য একটা নাটকীয় আমেজ তৈরী করে দেবে। দৈনন্দিন জীবনের ফাঁকে কত সংলাপই না ব্যবহার করি আমরা। সংলাপ কাজে লাগাতে জানলে আপনি কি খাবার টেবিলে, কি জ্ঞানী-গুণীর সভায়, অথবা মাইক্রোফোনের সামনে বক্তব্য রাখার সময় আপনার বক্তব্য জনপ্রিয় করে তুলবে অতি সহজেই।

৮। বক্তৃতাতে কোন ঘটনার বর্ণনা দেবার সময় এমন ভাবে আবেদন তৈরী করুন, যাতে দর্শকরা চোখের সামনে তা দেখতে পায়।

একবার একজন পৃথিবীখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ কথাপ্রসঙ্গে আমাকে বলে ছিলেন, মানুষ সারা জীবনে যতটা শেখে তার শতকরা পাঁচাশি ভাগই শেখে চোখ দিয়ে যা দেখে তা থেকে। টেলিভিশনের জনপ্রিয়-তাই তার উজ্জল প্রমান। জনসাধারণের সামনে কথা বলার ক্ষমতাটা শব্দ-গ্রাহ্য এবং দৃশ্য-গ্রাহ্য করে তুলতে পারাটাই হল বক্তার সবচেয়ে বড় সফলতা। যিনি তা পারবেন—তিনিই কর্মক্ষেত্রে জয়ী হবেন। সাফল্যর জয়মাল্য তার জন্য অপেক্ষা করবেই করবে।

একবার আমাদের যন্ত্রসম্পর্কিত শিক্ষাক্রমে একজন যন্ত্রবিশারদ বড় সুন্দর বক্তব্য রেখেছিলেন। আজও তা আমার চোখে লেগে আছে। হাত-পা-চোখ মুখ কে কাজে লাগিয়ে মূকাভিনয়, মাঝে মাঝেই তার বক্তব্যকে গতিময় করে তুলেছিলেন পশু-পাখির ডাকের সাহায্যে। তাতে বক্তার প্রতিটি কথাই শ্রোতারা যেন গিলছিলো—তর সইছিলনা মোটেই।

এখানে শ্রোতাকে প্রভাবিত করেছিল যেটা সেটা হল বক্তা তার বক্তব্যকে দৃশ্য-গ্রাহ্য করে তুলতে পেরেছিল। তাহলে এ পর্যন্ত যা শেখা হল তার মূল কথা হল :—আপনি কি করে আপনার বক্তব্যকে দৃশ্য গ্রহ্য করে তুলবেন?

তাহলে হাত পা চোখ মুখের সহজ ভংগী দিয়ে বক্তব্যকে বুঝিয়ে বলা অভ্যাস করুন—এমন শব্দ ও ভাবের সাহায্য নিন যা বক্তৃতা-বিষয়কে দর্শকের দরবারে দৃশ্যগ্রাহ্য করে তুলতে সহায়ক হবে।

(একটি প্রাচীন চীনা প্রবাদ মনে রাখুন সর্বদা : একটি সার্থক ছবি দশ হাজার শব্দ দিয়ে লেখা বিবরণীর চেয়েও বেশী দামী।)

৯। দর্শকের কাছে, শ্রোতার চোখে, শব্দ দিয়ে ছবি আঁকার জন্য সহজ-পরিচিত যথার্থ কথা খুঁজে নিন।

সাধারনতঃ বেশীর ভাগ বক্তাই একটি বিষয়ে প্রায়শইঃ ভুল করে। অথচ সেই ভুলের মাশুল গুনতে গিয়ে শ্রোতার মন জয় করার কাজে ব্যর্থ হয়, অসফল হয়। যেই সূত্রটি পালন করলে, ঠিকমত অনুশীলন করে কাজে লাগাতে জানলে, ম্যাজিকের মতই ফললাভ হয়। জেনে শুনেও অনেকে অবহেলা করেন পুরো ব্যাপারটা নিয়ে। এবারে ব্যাপারটাতে আসছি। কিছুই নয় এমন শব্দ শ্রোতাদের কাছে বলুন, যা তৎক্ষনাৎ তাদের চোখের সামনে সুন্দর করে ছবি এঁকে দিতে পারে। যে সমস্ত প্রতীক ব্যবহারে ইমেজের প্রভাব শ্রোতাকে সচেতন করে তার প্রয়োগ করুন। এমন প্রতীক বা ইমেজের আশয় নেবেন না যা দুর্গন্ধ, ধোঁয়া, অন্ধকার, কুয়াশাচ্ছন্ন, বর্নহীন দৃশ্যের কথা শ্রোতাদের মনে করিয়ে দেয়। ছবি—ছবি—শুধুই ছবি এঁকে চলুন শব্দ দিয়ে—সঠিক ও যথার্থ শব্দপ্রয়োগেই তা একমাত্র সম্ভব হয়ে উঠতে পারে। আপনার নিঃশ্বাসে বাতাস টানার মতই সহজ সবল সুন্দর শব্দের ছবি ছড়িয়ে দিন দর্শক-শ্রোতার চোখের পর্দাতে। তাহলেই আপনার বক্তৃতা হয়ে উঠবে অধিক মনোরঞ্জনকারক আর অত্যাধিক প্রভাবকারী।

হার্বার্ট স্পেন্সার তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ 'ফিলজফী অফ স্টাইলে' অনেকদিন পূর্বেই লিখেছিলেন, কীভাবে শব্দ প্রয়োগের কৌশিল্যে উজ্জ্বল বর্নাঢ্য ছবি আঁকা সম্ভব।

যেমন সাদামাটা প্রাণহীন বক্তব্য বিরক্তিই বাড়ায় শুধু। নীচের লেখায় এ ধরনের বাক্যের ব্যবহার বর্জন করাই শ্রেয়ঃ। যেমনঃ—

'কোন জাতির আচার আচরন আদবকায়দা এবং আনন্দ প্রকাশের ভঙ্গীর তারতম্য অনুসারে বিচার করা যেতে পারে যে তারা কতটা নিষ্ঠুর, পৈশাচিক বা বর্ব্বর। জাতীয় দণ্ডবিধিতে এ ধরনের নৈতিক

আচরণের' জন্য কঠোর কঠিন ও ভয়ংকর শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে।—

উপরের লেখার পরিবর্তে আমরা নীচে এভাবে লিখতে পারি যেমনঃ—

'যদি কোন জাতি প্রকাশ্য দিবালোকে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় বা ষাঁড়ে-মানুষের লড়াই নিয়ে মাতামাতি করে বা গ্ল্যাডিয়েটরদের হিংস্র লড়াইতে আনন্দ খোঁজে তাহলে তাদের অপরাধজনিত আনন্দ বিনোদনের তারতম্য অনুসারে যথাক্রমে জাতীয় দণ্ডবিধিতে ফাঁসী, আগুনে পুড়িয়ে মারা বা যন্ত্রনাদায়ক কঠোর শাস্তিবিধানের ব্যবস্থা করা হবে।'

এভাবে আমরা অসংখ্য চিত্র-কল্পী শব্দের ব্যবহার পাবো বাইবেল ও সেক্সপীয়রের রচনাবলীতে। যেমন পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার এক জায়গায় লিখেছেন—

'পরিশোধিত স্বর্নকে অনাবশ্যক অলঙ্করন করতে নেই, লিলি ফুলের উপর তুলি চালানো নিরর্থক' এবং ভায়োলেট পুষ্পের ওপর সুগন্ধী নির্য্যাস ঢালার মত বোকামো করা একমাত্র মূর্খেরই সাজে। (সেক্সপীয়র)

এভাবে সুদূর অতীতের দিকে যদি আমরা একবারও ফিরে তাকাই, তাহলে অনেক-অনেক উজ্জল গন্ধময় প্রবাদ বাক্যর আস্বাদ পাবো আমরা।

উদাহরণ দিচ্ছিঃ

(১) নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো

(২) শিয়ালের চেয়ে ধূর্ত্ত

(৩) পাথরের মত শক্ত

(৪) আপনি বাঁচলে বাপের নাম

(৫) যত গর্জে তত বর্ষে না

(৬) অল্প বিদ্যা ভয়ংকরী

কত অর্থবহ ওপরের প্রতিটি প্রবাদ

প্রেসিডেণ্ট লিঙ্কন একবার বলেছিলেন—'যখন আমি কোন লোককে একটি ঘোড়া কেনার জন্য পাঠাই, তখন ঘোড়ার ল্যাজে কতগুলো লোম আছে জানতে চাইনা। শুধু তার কাছ থেকে প্রয়োজনীয় মূল সূত্রগুলোকেই জানতে চাই।

আপনার বক্তেব্যর আবেদন যেন নির্দিষ্ট এবং স্থির হয়, এটাই লক্ষ্য রাখবেন সর্বদা যেমন ধরুন, 'কুকুর' শব্দটি বললেই একটি ছবি আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

কিন্তু আরও ভালো ছবি ফুটে উঠবে শ্রোতার কাছে যদি বলি পা ভেঙে যাওয়া খোঁড়া সেই বুলডগটি। শুধু 'ঘোড়া' বলার চেয়ে বেশী ফল হবে যদি, সাদা পনিটা বড় প্রভুভক্ত ঘোড়া। শুধু 'পেঁচা' না বলে যদি বলি 'কালো অন্ধ পেঁচা ডাকছে' তাহলে অনেক বেশী চিত্রধর্মী হবে। উইলিয়ম স্ট্রাঙ্ক 'দি এলিমেণ্টস অফ স্টাইল' নিবন্ধে লিখেছিল—শ্রোতার মন জয় করার সহজ উপায় হল, নির্বাচিত সঠিক চিত্রধমী শব্দের প্রয়োগ করা। হোমার, দান্তে, সেক্সপীয়ার তারা যে মহৎ সৃষ্টি করতে পেরেছেন তার মূল কারণ হিসাবে বলা যায় অসাধারণ চিত্রকল্পতা। নাটকীয়তা। তাঁদের লেখা পড়ার সংগে সংগেই চোখের সামনে যেন দৃশ্যগুলি ভেসে ওঠে। লেখা বা বলার উৎকর্ষ সাধনের এটাই হল সত্যিকথা।

কথা বলার বিমূর্ত ভঙ্গী খুবই খারাপ। এ যেন লোহা-লক্কড় ইঁট-পাথর, চেয়ার টেবিল, জীব-জন্তু মানুষ আর স্ত্রীলোক প্রসঙ্গ নিয়েই সর্বক্ষণ বকর-বকর করার মতন হয়ে দাঁড়ায়। —বলেছিলেন একজন বিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক।

একথা দৈনান্দ্যন জীবনের প্রতিটি কথাবলার মাঝেও সমান অর্থবাহী এবং চরম সত্য। এ পর্যন্ত বিশদভাবে আলোচনা করলাম কেমন করে কী ভাবে প্রাণবন্ত ঝকঝকে. বক্তৃতা করা যায়। যদি কেউ নিজেকে বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব-ব্যাঞ্জক বক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চান তাহলে উপরোক্ত নির্দেশ-উপদেশকে ধর্মীয় অনুশাসনের

মত অনুশীলন করুন। শুধুমাত্র পড়ার জন্য পড়বেন না, আন্তরিক ইচ্ছার সংগে পড়ুন। বারবার পড়ুন যতক্ষণ না ক্লান্তি আসে। আপনি যদি বিক্রয়-প্রতিনিধি হন—ব্যবসা বাড়াতে না পেরে অসফল হচ্ছেন, তাহলে এই বইয়ের প্রতিটি নির্দেশ—উপদেশ যথাযথ পালন করুন। দেখবেন, অতি দ্রুত আপনি ম্যাজিকের মতই ফল পাবেন।

যারা পদমর্যাদায় অফিসার বা বাড়ির গৃহস্থবধু বা স্কুল শিক্ষক তারাও উপরে বর্ণিত শিক্ষা থেকে স্থায়ী ফল পাবেনই পাবেন।

আপনি একনাগাড়ে অনেকক্ষন ধরে ধৈর্যসহকারেএই বই পড়ে চলেছেন এখন একটু বন্ধ করুন। বইতে চিহ্ন দিয়ে পাশে মুড়ে রাখুন। আরাম করে বসুন। বিশ্রাম করুন। এই বইতে লেখা নিয়মগুলো কেমন করে কী ভাবে কাকে কোথায় প্রয়োগ করা যায় এ সম্পর্কে ভাবুন। আমি একটা কথা বলবো? বলছিলাম কি—আপনার সবচেয়ে কাছে যিনি আছেন তাঁর উপরই প্রথমে এই উপায়গুলি প্রয়োগ করে দেখুন না!

পঞ্চম অধ্যায়

সজীব প্রাণবন্ত কথা বলতে হবে।

প্রথম মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরের কথা। আমি তখন লণ্ডনে টমাস শ্যাননের সংগে কাজ করছি। তিনি তখন এলেনবী এবং লরেন্স অফ এ্যারাবিয়ার জীবন ও কাজ কর্মের উপর এক যুগান্তকারী তাৎপর্যপূর্ণ বিশ্লেষণ ধর্মী বক্তৃতা দিচ্ছিলেন।

একদিন বিকেলে হাতে কোন কাজ না থাকায় হাঁটতে হাঁটতে হাইড পার্কের শ্বেতপাথর নির্মিত প্রধান প্রবেশ পথের কাছে এসে দাঁড়িয়ে ছিলাম। এখানে আইনের তোয়াক্কা না রেখে যে কেউ আইন-শৃঙ্খলা, ধর্ম, মানবতা, রাজনৈতিক বা কোন বিষয়ের ওপর খোলা-খুলি বক্তব্য রাখতে পারেন। বিভিন্ন বক্তা যথারীতি বক্তৃতা করে চলেছিলো ···

আমি প্রথম বক্তার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। একজন ক্যাথলিক তার ধর্মের অনুশাসন আর পোপ সম্পর্কে বলছিলেন...

আমি দ্বিতীয় বক্তার কাছে গেলাম। একজন স্যোসালিস্ট কার্লমার্ক্সীয় দর্শন বিষয়ক জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য রাখছিলেন ···

আমি তৃতীয় বক্তার কাছে এগিয়ে গেলাম।

বক্তার আলোচ্য বিষয় ছিলো বহুগামীতা। একজন মানুষের এমন অধিকার থাকা উচিত যাতে করে সে কম পক্ষে চারজন স্ত্রী রাখতে পারে...

আপনারা কি বিশ্বাস করবেন? চারটি বিয়ে করার পক্ষে যিনি বক্তব্য রাখছিলেন তার ওখানে সবচেয়ে কম শ্রোতা ছিলো। ভীড়

ছিলোনা একদম। অথচ অন্য দু'জন বক্তার চারপাশে পিঁপড়ের মত পিলপিল করে লোকের ভীড় বাড়ছিলো। কেন এমন হল? কারন কী? নিজের কাছেই প্রশ্ন করলাম আমি। আমি খুব ভালো করেই তিনজন বক্তা এবং তাদের বক্তব্য বিষয় শুনেছিলাম। তাতে বেশ পরিষ্কার বুঝতে পারলাম কেন তৃতীয় বক্তার একদম লোক হচ্ছিল না।

মূল কারন হল :
যে বক্তা, বহুগামীতা এবং চারজন স্ত্রী রাখতে বিশ্বাসী বলে বক্তব্য রাখছিলেন; তার নিজেরই সে বিষয়ে মোটেই আস্থা ছিলোনা। বিশ্বাস ছিলো না। দায়সারাভাবে ভাসাভাসা অস্পষ্ট ছিলো তার বক্তৃতা। নিষ্প্রাণ লাগছিলো শুনতে।

কিন্তু অপর দু'জন বক্তা তাদের বক্তব্য বিষয়কে মনে প্রাণে বিশ্বাস করেছিলেন তারা ছিলেন সে বিষয়ে সৎ আর প্রাণবন্ত। নাটকীয় ভাবে হাত মুখ এবং চোখের ব্যাঞ্জনায় তারা তাদের বক্তব্যকে অতি মাত্রায় বিশ্বাস যোগ্য আর সজীব করে তুলে ছিলেন। তারা শ্রোতাকে প্রভাবিত করে বক্ত্যবকে শ্রোতার মনে গেঁথে দিতে সমর্থ হয়েছিলেন।

সজীবতা, প্রাণবন্ততা, উদ্দীপনা—এই তিন গুণের সমন্বয় সাধন করার দিকে প্রতিটি বক্তারই মনোযোগী হওয়া আবশ্যক।

জনসাধারণ একজন সজীব প্রাণবন্ত আর উদ্দীপ্তময় বক্তাকেই কেবলমাত্র পছন্দ করেন। ঠিক যেমন বন্য তুর্কীরা খুশী হয় পাকা গমের ক্ষেত দেখতে পেলে।

১। এমন বিষয় নির্বাচন করুন যা আপনি ভালো করে অবহিত আছেন।

যে বিষয়ে আপনার নিজেরই বিদ্যেবুদ্ধি সাধারন মাপের,সেখানে আপনি কি করে অসাধারন বক্তব্য পেশ করবেন বলে আশা করেন?

তাই এমন বিষয় বাছুন, যা আপনার শ্রোতাকে আনন্দ দেবে, আগ্রহী করবে, মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখবে বক্তব্যের গভীরতায়। তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াল এই যে,আপনি ঠিক করে নিন তেমন বিষয়বস্তু যাতে আপনার পুরো মাত্রায় অধিকার আছে অনেক কিছু বলার। যার ভেতর এবং বাইরের সব কিছুই সম্পূর্ণভাবে আপনি ওয়াকিবহল। তাহলেই দেখবেন আপনার ঘরে আপনি জমা করতে পারবেন অভিজ্ঞতা এবং সফলতার ফসল।

আমি আমার নিজের জীবন থেকে একটি শিক্ষা নিয়েছি যা আমি সারা জীবন পালন করে চলব বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, তাহল—যদি কোনও বক্তা পরিপূর্ণভাবে অবহিত থাকেন কি বিষয়ে কতটা কি বলছেন তিনি, তার ফলই বা কি দাঁড়াচ্ছে যদি তিনি সেটাও পরিমাপ করতে পারেন তাহলে তিনি নিশ্চিন্ত হতে পারবেনই শ্রোতারা তার বক্তব্যে বশীভূত হবেই। তিনি ক্রমশ: এ নিয়ম পালন করলে এমন একটি সফলতার পাদপীঠে গিয়ে দাঁড়াবেন যে তখন তিনি নোংরা ধুলোবালি বা ময়লা চুন বালি সিমেন্ট সুড়কি থেকেও সবুজ ঘাস ফলাতে পারবেন।

ভাল বক্তব্যের গুণে এমনও হতে দেখা গেছে-যুক্তি তর্কও বক্তার আবেগমুখর হৃদয়স্পর্শকারী বক্তৃতার বাণে ভেসে গেছে। বেশীর ভাগ বক্তাই যে ভুলটা করেন তাহল তিনি ভেবে নেন যে তিনি সব বিষয়েই ভাল বলবেন। এ ধরনের ভ্রান্ত ধারনায় বশবর্তী হয়ে অনেক বক্তাকেই শ্রোতার সামনে লেজে-গোবরে হয়ে তোতলাতে দেখা যায়।

রিচার্ড বুশনেল ছিলেন ইটালীতে অ্যামেরিকার রাষ্ট্রদূত। একবার তাঁর সঙ্গে নৈশ ভোজের টেবিলে আমি অনেকক্ষন গল্পগুজব করার সুযোগ পেয়েছিলাম। আমি তাঁকে কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "আপনার অনুমতি পেলে আমি একটি একান্ত ব্যক্তিগত প্রশ্ন করতে পারি আপনাকে"—তিনি অনুমতি দিলেন। "আপনার রাষ্ট্রদৌত্য সম্পর্কিত কাজের বাইরেও কিকরে আপনি একজন সার্থক লেখক

হলেন ?" তিনি উত্তর দিলেন, "আমি আমার নিজের জীবন এত সংঘাতময় আবেগপ্রবন উত্তেজনার মধ্যে দিয়ে কাটাই যে অন্য কাউকে সে অভিজ্ঞতার রসাস্বাদন করাতে না পারলে নিজেকে অতৃপ্ত অসুখী মনে হয়। আমার সার্থকতার মূল প্রেরনার জন্ম এ থেকেই।"

পাঠকরা নিজের জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন,দেখবেন কথাটা বর্ণে বর্ণে সত্যি।

একবার লণ্ডনে বিখ্যাত লেখক বেনসন সাহেবের বক্তৃতা শোনার অভিজ্ঞতা আমার হয়েছিল। তিনি ছিলেন তেমনি বক্তা যেমন শক্তিশালী লেখক। লেখক হিসাবে তার বিদগ্ধ এবং মননশীলতা সারা পৃথিবীর রুচিশীল পাঠকের কাছে তাৎপর্যপূর্ন আবেদন রাখতে সক্ষম হয়েছিল।

তাঁর জীবনের সাফল্যের চাবিকাঠি জানতে চাইলে তিনি বলেছিলেন—আসলে আমার লেখার মধ্যে, অভিজ্ঞতার মধ্যে পাঠক নিজেকেই খুঁজে পান। স্বাধীনভাবে আমার লেখার মধ্যে-ইতস্ততঃ ভ্রমন করেন। তাই বুঝতেই পারছেন আনন্দ উৎসাহ আর উদ্দীপনার খোরাক থাকে বলেই পাঠকেরা আমার লেখা পছন্দ করেন।

অনেকদিন আগের কথা। ওয়াশিংটন ডি. সি, তে আমাদের ডেল কার্নেগী ইনষ্টিটিউশানে মিঃ হেমিংওয়ে বলে একজন মজার ছাত্র ভর্তি হয়েছিল। তিনি প্রতিদিনই বক্তব্য রাখতেন নীরস যুক্তিতর্কের তথ্যের গালভরা পরিসংখ্যানের কচকচানিতে। নিজের সম্পর্কে মিঃ হেমিংওয়ের অদ্ভুত কিছু বাতিক বা ধ্যান ধারনা ছিল। যেমন, তিনি দীর্ঘদিন ধরে ওয়াশিংটনের বাসিন্দা, সেই হেতু এই শহর সম্পর্কে দুনিয়ার তথ্যযুক্তি পরিসংখ্যানের পাথর তিনি অবলীলায় শ্রোতাদের ছুঁড়ে মারতেন। একবারও ভেবে দেখতেন না যে শ্রোতারা এতে অধৈর্য, বিরক্ত এবং ক্রুদ্ধ হচ্ছেন। কোনদিনও ভুলেও তিনি এই শহর সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সম্বলিত কোনও ঘটনার কথা

বলতেন না, যা কিনা হয়ে উঠতে পারত মনোগ্রাহী ও আদরণীয়।

এভাবেই চলছিল। চার পাঁচদিন পরের কথা, সেদিন বক্তব্য রাখার সময় হেমিংওয়ে খুবই উত্তেজিত ও আবেগপ্রবন হয়ে উঠলেন। আসলে ঘটনাটা হয়েছিল কি—হেমিংয়ে রাস্তার ধারে গাড়ী পার্ক করে রেষ্টুরেণ্টে দুপুরের খাবার খেতে ঢুকেছিলেন। খাওয়া দাওয়া সাঙ্গ করে রেষ্টুরেণ্ট থেকে বেরিয়ে রাস্তায় পা দিতে না দিতে একটি গাড়ী উল্কার বেগে ছুটে এসে তার গাড়ীকে ধাক্কা মেরে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিয়ে পালিয়ে যায়। ঘটনাটা তাঁকে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় করে তুলেছিল। রাগে দুঃখে শোকে তিনি শ্রোতাদের সামনে ফেটে পড়লেন, যা কিনা প্রতিটি শ্রোতার হৃদয় তন্ত্রীতে করাঘাত করেছিল। এই প্রথম শ্রোতারা তাঁকে ভালবাসল, গ্রহন করল।

এ ঘটনা থেকে আপনারা শিক্ষা নিন। সত্যিকার ভাবনা বিষয় নিয়েই শ্রোতার সামনে উপস্থিত হন। তাহলেই শ্রোতার মন জয় করতে সক্ষম হবেন। একটা কথা সর্বদা স্মরণ রাখবেন—আপনি শ্রোতার জন্য ভাবলেই শ্রোতাও আপনার জন্য ভাববে।

একশ বছর পেরিয়ে গেছে বহুদিন। ওয়াশিংটনের ফোর্ড থিয়েটারে নাটক দেখতে দেখতে আততায়ীর গুলিতে নিহত হয়েছিল স্মরণীয় এবং বরণীয় প্রেসিডেণ্ট আব্রাহাম লিংকন। তবু আজও প্রতি মুহূর্তে আমরা আমাদের বাক্যে, ব্যবহারে, কাজের উদ্দীপনার মধ্যে লিংকনকেই প্রতিনিয়ত আবিষ্কার করে চলেছি। তাঁর বেঁচে থাকাকালীন ইতিহাসে তাঁর ব্যক্তিত্বকে ম্লান করতে পারার মত আর কেউ ছিলেন না। যদিও তাঁর বক্তব্যে আভিজাত্য, নমনীয়তা বা পরিশীলতা ছিল না কিন্তু তাঁর বক্তব্য পাহাড়ের মত উদ্দীপনার আগুন সঞ্চার করতে পারত।

আমার বইয়ের পাঠকরা—যারা অনেকক্ষণ ধরে এ বই পড়ে চলেছেন তাঁদের অনেক শিক্ষা নেওয়ার আছে, প্রেসিডেণ্ট লিংকনের জীবন থেকে।

আপনারা মনে মনে যা ভাবছেন সেটা আমি জানি—আমার তো কোনও বিষয়েই ভাল জানা নেই, পড়াশোনা নেই। তাহলে কি করে বিষয় নির্বাচন করব ?

আপনার প্রশ্নের উত্তরে আমার বার বার একটি ছাত্রের কথা মনে পড়ছে। ছাত্রটি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল—কি বিষয় ঠিক করব ? উত্তর দিয়েছিলাম—কেন ? —'পায়রা'! ছাত্রটি অবাক হয়ে উচ্চারণ করেছিল—পায়রা ? আমি তাকে বললাম—যাও—পায়রা সম্পর্কে ভাল করে জেনে এস, লাইব্রেরীতে গিয়ে পড়াশোনা করে তৈরী হয়ে নাও বক্তৃতা দেওয়ার জন্য।

অবাক কাণ্ড, বক্তৃতার দিন ছেলেটি আধ ঘণ্টা অনর্গল 'পায়রা' সম্পর্কে মজার মজার কথা বলেছিল। শ্রোতারা মুগ্ধ হয়েছিল। কারন ছেলেটি 'পায়রা' সম্পর্কে তথ্য নিয়েছিল চল্লিশটিরও বেশী বই ঘেঁটে। সেখানে নিষ্ঠা ছিল, ফাঁকি ছিলনা। তার সাফল্যের চাবিকাঠি ছিল সেটাই।

এবার যা পড়বেন তা খুবই জরুরী। বার বার পড়ুন। মনে রাখুন।

(ক) বিষয় নির্বাচন শেষ হলে সে বিষয়ে যত বেশী পারেন পড়াশোনা করুন। জানুন। চিন্তুন। শিখুন। ভাবুন।

(খ) যত বেশী জানবেন তত বেশী ভাল বলবেন।

(গ) পড়াশোনার সময় নিষ্ঠার যেন অভাব না হয়।

আপনি যদি বিক্রয়ের প্রতিনিধি হন তাহলে আপনি যে জিনিস বেচেন সে জিনিস সম্পর্কে খুঁটিনাটি বিশদ জানার চেষ্টা করুন। তাহলেই মাল বিক্রী করতে আপনি অনেক বেশী সফল হবেন।

(যত বেশী জানবেন তত বেশী ভাল বলবেন।)

২। আপনার অভিজ্ঞতায় প্রাণ সঞ্চার করুন।

ধরুন, আপনি গাড়ী চালিয়ে যাচ্ছেন, নিজের অজান্তেই নির্দ্ধারিত গতিসীমার বাইরে চলে গেছেন, আইনলঙ্ঘনের অপরাধে পুলিশ আপনার গাড়ী থামাল। আপনাকে ধমক দিয়ে ছেড়ে দিল যাতে ভবিষ্যতে আপনি কখনও আইন অমান্য না করেন। এ ঘটনাটি যখন আপনি শ্রোতাদের কাছে বললেন তখন যদি আপনি আগ্রহ উদ্দীপনায় প্রাণবন্ত ভাবে পুরো সত্যি ঘটনাটা অবিকৃতভাবে বলে যেতে পারেন তাহলেই শ্রোতার মন জয় করতে পারবেন। পুলিশে ধরার সময় আপনার যে মনের অবস্থা হয়েছিল তার যত সঠিক বর্ণনা আপনি দিতে পারবেন, তত বেশী শ্রোতারা প্রত্যেকেই আপনার সেই সময়-কার মনের অবস্থা জানতে আগ্রহী হবে।

(তাহলে মোদ্দা কথা হল—যখনই কিছু বলবেন-প্রাণ ঢেলে, অবিকৃত ভাবে বলবেন। সৎ ও আন্তরিকভাবে বলবেন। তাইলেই আপনার ব্যক্তব্য বিষয়বস্তুতে অপরের মন জয় করতে পারবে।)

৩। নিষ্ঠার সঙ্গে বলুন।

যখনই আপনি শ্রোতার সামনে কিছু বলছেন মন প্রাণ ঢেলে নিষ্ঠার সঙ্গে তা বলুন। কারন আপনি যা বলবেন তাতে যদি আপনারই আগ্রহ না থাকে তাহলে শ্রোতার আগ্রহ কি করে হবে? আপনার কথায় যদি ঝর্ণাধারার গতিশীলতা থাকে তাহলে তা শ্রোতার মনকেও গতিময়তা দেবে। আপনি যা বলতে উৎসুক তা যদি আন্তরিক হয় তাহলে শ্রোতারাও তা শুনতে আগ্রহী হবে।

(ক) বলার শুরুতেই প্রাণভরে পুরোদমে মুক্ত বাতাস টেনে নিন। তাহলে দেখবেন ঝরঝরে লাগছে।

(খ) মঞ্চের উপরকার আসবাবপত্র, মাইকের হাতল থেকে নিজেকে দূরে রাখবেন।

(গ) মাথাকে সোজা এবং শক্ত রাখুন। চিবুক যেন কিছুতেই নিম্নমুখী না হয়।

(ঘ) পরিষ্কার, নির্ভুল উচ্চারণে এবং দৃঢ় আত্ম-বিশ্বাসের সঙ্গে বক্তব্য রাখবেন।

(ঙ) আপনি নিজে যত ভাল আচরণ করতে পারবেন তত ভাল আচরণই কেবলমাত্র শ্রোতাদের কাছে থেকে আশা করতে পারেন।

মোটের উপর আপনার সদাচারই আপনাকে নিষ্ঠাবান করবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

শ্রোতার সঙ্গে বক্তব্য বিনিময় করুন।

কিভবে একজন বক্তা সফল হন শ্রোতার সংগে সংযোগ স্থাপন করবে ? কিভাবে বক্তা ব্যক্তব্য এবং শ্রোতার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার সম্ভব ?

তাহলে একজন খ্যাতনামা বক্তার রোজনামচা দিয়েই আরম্ভ করা যাক—আমি যখনই কোনও নতুন শহরে যাই তখনই সময় করে ঘুরতে বেরোই, দেখে নিই পোষ্টমাষ্টার, দাড়ি কামানোর নাপিত-হোটেলে ম্যানেজার, ছাত্র-পড়িয়ে স্কুলের হেড মাষ্টার, মন্ত্রী মণ্ডলী, বিভিন্ন দোকান পসরা আর লোকজনের গতি বিধি-চলাফেরা, কথাবার্তা, বাচনভঙ্গী এবং উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য। তারও পরে হাতে সময় থাকলে বিভিন্ন লোকের সঙ্গে মেলামেশার চেষ্টা করি, কথা বলি। এতে করে আমি যা শিখি তা আমার বাস্তব জীবনের নানা পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োগ করি।

তাহলে উপরোক্ত বক্তার বক্তব্য থেকে আমরা দুটি প্রশ্নেরই উত্তর পেয়ে গেলাম।

৪। শ্রোতার ভাল লাগার দিকে লক্ষ্য রেখেই বক্তব্য রাখুন।

বিখ্যাত বক্তা জর্জ হ্যারিস ঠিক তাই করেছিলেন। তিনি একবার স্থানীয় লোকের উপর একটি গবেষনা করেছিলেন। পরে তিনি যখন জনসাধারনের সামনে বক্তব্য-রাখলেন তা ছিল জনসাধা-

রনের দৈনন্দিন জীবনের ঘাত প্রতিঘাত, সুখ দুঃখ এবং ভালমন্দ বিষয়ের। সুতরাং সহজেই বুঝতে পারছেন শ্রোতারা তাঁর বক্তব্যে অভূতপূর্ব সাড়া দিয়েছিল। কারন শ্রোতারা নিজেদের কথাই শুনতে পাচ্ছিল মিঃ জর্জ হ্যারিসের কাছ থেকে।

অনেক কাল আগে ফিলাডেলফিয়ায় এক নৈশ ভোজের আসরে মাইক রবিন্সের বক্তৃতা শোনার সুযোগ হয়েছিল। খাদ্য এবং পানীয় ভরা ব্যাঙ্কোয়েট হলের সুসজ্জিত নরনারীরা বেশীর ভাগই ছিলেন পরিশীলিত এবং এক মর্যাদাসম্পন্ন। মিঃ মাইক রবিন্সের সফলতা ছিল সেখানেই, তিনি আলাদা আলাদাভাবে প্রত্যেকটি শ্রোতার সম্পর্কেই কিছু না কিছু প্রশংসাসূচক বক্তব্য রাখতে পেরেছিলেন। মানুষ নিজের প্রশংসা শুনতে ভালবাসে এটা তিনি জানতেন। তাই সস্তা চাটুকারীতা না করেও তিনি শ্রোতার মন জয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

৫। শ্রোতাদের মন কাড়তে সৎ ও আন্তরিক হন।

সব সময় মনে রাখতে হবে প্রতিটি আলাদা আলাদা শ্রোতা মিলেই একটি বিশাল শ্রোতৃমণ্ডলী গড়ে ওঠে। সুতরাং একদিক থেকে প্রত্যেকটি শ্রোতাই আলাদা আলাদা ব্যক্তিত্ব। তাই আপনার সৎ এবং আন্তরিক প্রশংসা শ্রোতার মনে রেখাপাত করবেই। তাই বক্তৃতাকালীন সময়ে মাঝে মাঝেই সরাসরি শ্রোতাদের মতামত জানার চেষ্টা করতে পারেন। তাই বলে অনেক উর্বর মস্তিস্ক বক্তার মত যেন ভুল করেও বলবেন না—বিশ্বাস করুন এত বুদ্ধিমান বিচক্ষন শ্রোতা আমি এ পর্যন্ত কোথাও দেখিনি।

যে মুহূর্তে উপরের কথাটি বলবেন শ্রোতারা বুঝে ফেলবে আপনি মিথ্যে চটকারীতায় তাদের মন ভোলাতে চাইছেন। সুতরাং যা

আপনি নিজে বিশ্বাস করেন না তেমন কথা শ্রোতার ঘাড়ে চাপানোর চেষ্টা আদৌ করবেন না।

৬। নিজে শ্রোতার সঙ্গে একীভূত হন।

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনার প্রথম কথাটি শ্রোতাকে খুশী করবে, তত তাড়াতাড়ি আপনি শ্রোতার সঙ্গে একাত্ম হবেন।

ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড ম্যাকমিলান অ্যামেরিকার একটি নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে ভাষন দিতে গিয়ে বলেছিলেন—আপনাদের আমন্ত্রনে এখানে এসে কিছু বলতে পারার সুযোগ পেয়ে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। কারণ আমার মা-তিনি ছিলেন অ্যামেরিকান। এই ইণ্ডিয়ানাতেই তিনি জন্মেছিলেন। আর আমার মায়ের পিতা, আমার মাতামহ-তিনি ছিলেন আপনাদের এই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। সুতরাং আমি গর্বিত হচ্ছি এ কথা ভেবে যে আমার নাড়ীর সঙ্গে, হৃদয়ের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে মিশে আছে আপনাদেরই বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞানের আলোক বর্তিকা। আর আমি ধারক বাহকের ভূমিকা পালন করছি সেই প্রাচীন পরিবারের মহান ঐতিহ্যকে। সুতরাং বুঝতেই পারছেন ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় সফরের বাইরে আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণের উপরেও আপনাদের সঙ্গে আমার এক সুপ্রাচীন বন্ধুত্বপূর্ন ঐতিহ্যমণ্ডিত সম্পর্ক বিদ্যমান।

তাঁর এই বক্তৃতার প্রভাব ম্যাজিকের নত সমস্ত ছাত্র ছাত্রীর হৃদয় কাড়তে সক্ষম হয়েছিল।

সরাসরি শ্রোতাকে সম্বোধন করে বক্তব্য রাখলে অসাধারন ফল হয়। যেমন একজন বক্তা সালফিউরিক এ্যাসিড সম্পর্কে বলতে উঠে এত সুন্দর বলেছিলেন অতি নীরস এই বিষয়টি সম্পর্কে। আর শ্রোতার সঙ্গে এত দ্রুত মানসিক সংযোগ সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন যা

মনে রাখার মত। যেমন—শ্রোতারা, আপনাদের দৈনন্দিন জীবনে সালফিউরিক এ্যাসিড আপনাদের সর্বক্ষণই ঘিরে আছে। সালফিউরিক অ্যাসিড না হলে গাড়ী চলবে না কারণ কেরোসিন বা গ্যাসোলিন পরিশোধনে সালফিউরিক অ্যাসিড লাগে। বাড়ীতে বা অফিসে আলো জ্বলবে না সালফিউরিক অ্যাসিড না হলে, কারণ বালব তৈরীতে এ্যাসিড লাগে। চান করার সময় আপনি যে বাথটাবে বসেন তার প্লেটিং করার সময় সালফিউরিক অ্যাসিড লেগেছে, আপনি যে সাবান মাখেন সেটা তৈরীতেও এই একই অ্যাসিড লেগেছে। আপনার চিরুনী, চুলের ব্রাশ, দাড়ি কামানোর ক্ষুর—সব কিছু তৈরীর গোড়াতেই আছে সালফিউরিক অ্যাসিড। আপনার প্রাতঃরাশের টেবিলে ছুরি, কাঁটাচামচ এবং সুন্দর সুন্দর কাপ ডিশ সব কিছুর পেছনেই রয়েছে এই অ্যাসিডের বিশেষ ভূমিকা। সুতরাং যেখানেই আপনি যান না কেন এই অ্যাসিড থেকে আপনার মুক্তি নেই।

এখানে বক্তা নীরস অ্যাসিডের সঙ্গে শ্রোতার দৈনন্দিন জীবনকে টেনে এনে বক্তব্যকে হৃদয়গ্রাহী করে তুলতে সক্ষম হয়েছিল।

৭। শ্রোতাকে আপনার কথার অংশীদার করুন।

আমার খুবই প্রিয় বিষয় হল শ্রোতার সঙ্গে কথা বলা। কিছু জিজ্ঞেস করে জেনে নেওয়া। এভাবে শ্রোতার কাছ থেকে সাড়া পেলে আমি খুব সহজেই তাদের সঙ্গে মানসিক সংযোগ ঘটাতে পারি। শ্রোতারাও আমাকে নিজেদেরই একজন বলে ভাবতে পারে, বক্তা হিসেবে দূরে সরিয়ে রাখে না। যদি কোনও বিষয়ে আপনার

বক্তব্যে শ্রোতাদের অংশ গ্রহণও করাতে পারেন তাহলে শ্রোতারাও আপনার বক্তব্যের ভাগীদার হয়ে পড়বে অচিরেই।

৮। নিজেকে কখনও শ্রোতার সামনে সবজান্তা পণ্ডিত বলে ভাববেন না

অ্যামেরিকার একজন সিনেটার একবার আমাকে জানিয়েছিলেন, যখনই আমি শ্রোতার সামনে কিছু বলতে উঠি আমি কখনই নিজেকে হোমরা চোমরা বলে ভাবি না। আমি নিজেকে শ্রোতাদের একজন বলে ভাবি। ক্ষমা না চেয়েও আমি ভদ্র সুন্দরভাবে অনুরোধের ভঙ্গীতে বক্তব্য রাখি। একমাত্র ভদ্রতা এবং সৌজন্যতাই শ্রোতার সামনে বক্তার আত্মবিশ্বাস ও সদিচ্ছা ফিরিয়ে আনে। আপনার কথা বলার সামান্যতম বাক্‌চাতুর্য্যও মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে যদি তা শ্রোতার আত্মমর্য্যাদায় আঘাত হানে। আপনি যে মুহূর্তে বলতে শুরু করেন—আপনার সমস্ত কিছু শ্রোতার সামনে প্রদর্শিত হওয়ার জন্য রাখা হয়, কিছুই গোপন থাকে না। কোনও ছল চাতুরীই খাটে না নিজেকে আচ্ছাদিত রাখার জন্য।

এই প্রসঙ্গে শেষ এবং সবচাইতে জরুরী নির্দেশটি দিয়ে গেছেন একজন চীনা ধর্মগুরু। তাঁর নাম কনফুসিয়াস। কয়েক হাজার বছর আগে তিনি বলেছিলেন—কখনও মানুষের কাছে জ্ঞান গরিমার বাক্‌বিতণ্ডায় চোখ ধাঁধিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে না। মানুষকে একমাত্র সততা নিষ্ঠা এবং আন্তরিক সমবেদনা পূর্ণ বক্তব্য এবং ব্যবহারেই তুমি আপন করে নিতে পার, সারা জীবনের জন্য কাছে টেনে নিতে পার। অন্য কিছুতে নয়।

(তাহলে মোদ্দা কথা হল—বক্তব্য, বক্তা এবং শ্রোতা এই ত্রিমুখী সূত্রকে মনের মধ্যে গেঁথে যিনি বারবার বিধি-নির্দেশ অনু-শীলন করবেন তিনিই অতি সহজে লোকের মন জয় করতে পারবেন।)

তৃতীয় পর্ব

প্রস্তুতি এবং প্রস্তুতিহীন বক্তৃতার উদ্দেশ্য

আমরা এ পর্য্যায়ে ভাল বক্তৃতা দেওয়ার দুটি মূল সূত্র বিশদভাবে আলোচনা করব। অর্থাৎ পূর্ব প্রস্তুতিবিহীন অবস্থায় তাৎক্ষণিক প্রস্তুতির প্রয়োজনীয়তা এবং পরিপূর্ণভাবে তৈরী হওয়ার প্রয়োজনীয় উপযোগীতা কোথায় ?

সপ্তম অধ্যায়

কম কথা গুছিয়ে বলুন। অযথা ফেনাবেন না

একজন বিখ্যাত ইংরেজ বিশপকে জানি, যিনি প্রথম মহাযুদ্ধে একটি সৈন্যদল পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন। প্রতিটি যুদ্ধেই তিনি গো-হারা হেরেছিলেন। কারণ সৈন্যদের সামনে তিনি শুধু বিদ্যে-বুদ্ধির অযাচিত পাণ্ডিত্য ফলাতেন যাতে সৈন্যদের এক বিন্দুও আগ্রহ ছিল না। তারা কেন এবং কি জন্য লড়াই করতে চলেছে সে সম্পর্কেও তাদের ধারণা ছিল অস্পষ্ট। বক্তা বিশপ তাঁর বক্তব্য এবং কাজকর্ম সম্পর্কে নিজেই বিশেষ ওয়াকিবহাল ছিলেন না বলে তাঁর পতন হয়ে উঠেছিল অবশ্যম্ভাবী। কথা বলার মূল উদ্দেশ্য কি? বক্তব্যের গভীরতায় একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো অন্য কিছু না।

আরও বিশদ করে বলতে হলে—

(১) কথায় কাজ হওয়া চাই

(২) কথার মাধ্যমে কিছু জানানো চাই

(৩) শ্রোতার মনে প্রভাব বিস্তার করানো চাই

(৪) শ্রোতাকে আনন্দ দেওয়া চাই

আব্রাহাম লিংকনের জীবনের কিছু উদাহরণ থেকে আমরা উপরোক্ত বিষয়ে শিক্ষা পেতে পারি। জীবনে যত বক্তব্য লিংকন রেখেছিলেন তার প্রত্যেকটিরই মূল উদ্দেশ্য ছিল শ্রোতার মনে প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তার করা।

তাঁর কথার ভেতর, তিনি যখন জুরীদের সামনে বলতেন, যখন তিনি নির্বাচনী প্রচার অভিযানে নামতেন, তাঁর রাজনৈতিক বক্তব্যে তাঁর নির্বাচনে জয়লাভ সমস্ত কিছুর পেছনেই মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রতিটি কার্য্যে সফলতা অর্জন করা।

প্রেসিডেণ্ট হওয়ার-দু'বছর পরের ঘটনা। একটি সভায় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের উপর লিংকনকে বলতে হয়েছিল। সেখানে তিনি মূল লক্ষ্য ঠিক করে নিয়েছিলেন শ্রোতাদের আনন্দ দেবেন। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে তিনি মূলতঃ ব্যর্থই হলেন। একজন শ্রোতাও তাঁর বক্তব্যে খুশী হল না। কারণ জনমানসে লিংকন সম্পর্কে লোকের ধারণা ছিল—লিংকন খুব বড় বক্তা। তাঁর বাগ্মীতার যাদুকরী ক্ষমতা দর্শক শ্রোতার চোখে লেগে থাকত সবসময়। তবু প্রেসিডেণ্ট লিংকন সার্থকতার চরম শিখরে উন্নীত হতে পেরেছিলেন কেবলমাত্র ভাল বলতে পারার জন্যই। কারণ তিনি জানতেন তাঁর বক্তৃতার উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য কি। তার অধিকাংশ বক্তৃতাই মানব সভ্যতার ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হয়ে থাকবে। সেটা সম্ভব হয়েছিল তাঁর বক্তব্যের বিষয়বস্তু নির্বাচন, বক্তৃতার উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি পুরোমাত্রায় ওয়াকিবহাল ছিলেন বলেই।

বেশীর ভাগ বক্তাই বক্তৃতা মঞ্চে অসফল হন কি বলছেন, কাকে বলছেন এই বিষয়গুলি গুলিয়ে ফেলেন বলেই! এমন কি একটি নির্দিষ্ট বক্তব্য বিষয় নিয়ে বলতে শুরু করে অতি দ্রুত প্রসঙ্গান্তরে চলে যান। যেটা অমার্জনীয়ভাবে অসফলতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

আর একটি চমৎকার উদাহরণ দিচ্ছি ঃ—

একজন অ্যামেরিকার সিনেটর বক্তব্য রাখতে গিয়ে সচেতনভাবেই মূর্খের মত শুধুই তথ্য বহুল একঘেয়ে বিরক্তিকর ঘ্যানর ঘ্যানর বক্তৃতা করে চলতেন। শ্রোতারা এ ধরণের উপদেশ আদৌ শুনতে পছন্দ করত না। তারা পছন্দ করত চিত্তবিনোদনকারী বক্তব্য। তবুও প্রথম দিকে তারা বিনীত ভাবে ধৈর্য্য ধরে দশ / পনের মিনিট বক্তব্য শুনল। কিন্তু তার পরেও বক্তার একঘেয়ে নীরস বক্তব্যের প্রাণবন্ত মোড় ফিরল না দেখে তারা অধৈর্য্য হয়ে উঠল। কেউ কর্কশ গলায় বাহবা জানাতে থাকল। মুহূর্তের মধ্যে সকল শ্রোতা একত্রিত হয়ে হৈ হট্টগোল চেঁচামেচি জুড়ে দিল। এসব সত্বেও

আমাদের সেই ভয়ঙ্কর বক্তা নিরাশ না হয়ে পুরোদমে বক্তৃতা চালিয়ে যেতে লাগলেন। তারপর চিৎকার এমন পর্যায়ে পৌঁছল যে বক্তা তার নিজের বক্তব্যই ভাল করে শুনতে পেলনা। কানে তালা লাগা অবস্থায় নানা রকম বিশেষণে ভূষিত হয়ে আমাদের বক্তাটি অচিরেই অধোবদনে সভাগৃহ ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন।

এই উদাহরণ থেকে আমরা এই শিক্ষা লাভ করলাম—উদ্দেশ্য পরিবেশ এবং শ্রোতার ভাল লাগার বিভিন্ন দিক নিয়ে ভাল করে ভাবনা চিন্তা করতে ববে। তাহলেই বক্তৃতার যা মূল লক্ষ্য বক্তব্য পেশ করা—কথার মাধ্যমে শ্রোতার মন জয় করা—সেই লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হয়ে উঠবে। এর অন্যথা হলেই উপরেব ঘটনার সেই সিনেটর বক্তার মতই নাজেহাল অবস্থায় পড়তে হবে। উপরের বক্তৃতা করার মূল উদ্দেশ্য বিষয়ক চারটি কারণ বাব বার পড়ুন, অনুশীলন করুন। শুধু মাত্র পড়ার জন্যেই পড়বেন না, বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করবেন, কাজে লাগাতে সক্ষম হবেন এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই পড়ুন।

প্রয়োজনীয় কথা হল—কম কথা বলুন। কাজেব কথা বলুন। অকাজের কথা ঘন্টার পর ঘন্টা বকে গিয়েও কোন লাভ নেই।

চিকাগো, লস-এঞ্জেলস, নিউ-ইয়র্কের বিভিন্ন প্রান্তে আমি বহুবার নানারকম পরীক্ষামূলক বক্তৃতা-আসরের আয়োজন করে ছিলাম। তাতে করে বিভিন্ন বক্তার বক্তব্যের সারাংশ থেকে একটা স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পেরেছিলাম। তা হল—ভাল বক্তৃতা করার ম্যাজিক-ফরমূলা কি হতে পারে? খুবই সোজা উত্তর ঠিক করা হয়েছে আপনাদের প্রয়োজনের কথা ভেবে।

ধরুন আপনি ডেল কার্নেগী ইনষ্টিটিউশ্যনে উপস্থিত রয়েছেন। সেখানে আমাদের সভার সামনে আপনাকে বলতে বলা হল। আপনি একদম ঘাবড়ে যাবেন না। টান টান চিবুকে দৃঢ়তা ও আন্তরিকতার সংগে কথা বলা আরম্ভ করুন।

এক—আপনার নিজের জীবনের স্মরণীয় কোন ঘটনার বিবরণী দিয়ে সুন্দরভাবে বলতে শুরু করুন। আপনার মনের ভাব, ঘটনার সময় আপনি কি অনুভব করছেন তা ভাল করে শ্রোতার মনে গেঁথে দিন।

দুই—পরিষ্কার করে গুছিয়ে নিয়ে অল্প অল্প করে বক্তব্যের সূতো ছাড়ুন।

তিন—আপনি যা বলতে চান শ্রোতাকে উদ্দেশ্য করে, সেটা ভুলে যাবেন না। শ্রোতাদের যা জানানো দরকার আপনার—সেটা জানাবেনই সময় সুযোগ করে। যুক্তি-তর্ক দিয়ে শ্রোতাকে কোন বিষয়ে আগ্রহী করতে চাইলে ধীরে ধীরে সেই পথে এগোন।

আমাদের দ্রুত-গতিশীল জীবনে কোন শ্রোতাই আপনি পাবেন না—যে আপনার বক্তব্য শোনার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় দেবে আপনাকে। প্রত্যেকেরই হাতে সময় খুব কম—এটা মনে রেখে কথা সংক্ষিপ্ত করুন।

সুতরাং অযথা কথা না বাড়িয়ে সোজাসুজি কায়দা করে কাজের কথায় আসুন। আপনার প্রত্যেকটি কথা-প্রতিটি শব্দ যেন দামী ওজন-দার হয়—একটি নির্গত শব্দও যেন অপচয়ের খাতে না যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখুন। সব কথাই সমান গুরুত্বপূর্ন হয়না কখনও। সংবাদ পত্রের খবর যেমনভাবে গুরুত্ব অনুযায়ী সাজানো হয়ে থাকে ঠিক সেভাবে আপনার কথাকেও গুরুত্ব অনুসারে সাজিয়ে ভাগ করে নিন। অর্থাৎ কোন কথার পর কোন কথা বলা যেতে পারে, বললে আপনার কাজে আসবে সেটা ঠিক করে নিন।

আর একটা কথা সব সময় মনে রাখতে হবে শ্রোতারা কখনই ভুল করা, ক্ষমা চাওয়া, সত্যি-মিথ্যের সাক্ষ্যপ্রমান শুনতে পছন্দ করেনা। তারা নাটকীয়-কাজকর্ম আর দ্রুত গতিশীল বক্তব্যের দিকেই বেশী ঝুঁকতে চায়। সুতরাং আমাদের ম্যাজিক ফর্মুলা অনুযায়ী প্রথম উচ্চারিত শব্দটি যেন শ্রোতার মনে রেখাপাত করে সেদিকে নজর দিন।

তবে এটা ঠিক, ছোটখাটো বক্তব্যের পক্ষে; এ ধরনের নাটকীয় প্রভাবযুক্ত কথা বলা সোজা হবে, দর্শকের মনে কৌতূহল জাগিয়ে রাখা সোজা হবে।

বিজ্ঞানের জগতেও আমাদের ম্যাজিক ফর্মূলা খুবই কার্য্যকরী হয়। কম কথায় বেশী আবেদন জাগিয়ে তোলাই হল বিজ্ঞাপনের মূল লক্ষ্য।

একটি নামকরা ব্যাটারী কোম্পানী রেডিও ও টেলিভিশনের মাধ্যমে খুব ভালো বিজ্ঞাপন প্রচার চালাতো। প্রথমে ঘোষক একটি রোমহর্ষক গাড়ি দুর্ঘটনার বর্ণনা করতো।

২। পূর্ব প্রস্তুতিহীন অথবা উপস্থিত মত কিছু বলার জন্য মানসিক প্রস্তুতি রাখুন।

যখনই আপনাকে কোনও পূর্বপ্রস্তুতিহীন বিষয় সম্পর্কে বলতে ডাকা হবে তখন আশা করা হবে আপনি কোনও বিষয় সম্পর্কে বেশ ভালই বলতে পারবেন। সমস্যা হল, আপনাকে যত কঠিনই হোক না কেন এই বক্তৃতা দেওয়ার পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে এবং ঠিক করে নিতে হবে আপনার বক্তব্যের স্বল্প সময়ের মধ্যে আপনি ঠিক কোন্ কোন্ পয়েন্টগুলো নিয়ে আলোচনা করবেন। প্রথমে মানসিক প্রস্তুতি আনুন। নিজেকে জিজ্ঞেস করুন কি , বলবেন বিষয়টি সম্পর্কে আপনাকে কিছু বলতে বলা হলে। কোন পয়েন্ট বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য এই স্বল্প সময়ের মধ্যে। ঠিক করে নিন কিভাবে মঞ্চে উঠে শ্রোতাদের যুক্তিতর্কের সমস্যার সমাধান করবেন।

সুতরাং প্রথম কথা হল সকল সময়েই কোনও কিছু পূর্বপরি-কল্পনাহীন বিষয় সম্পর্কে বলার জন্য মানসিক দিক থেকে প্রস্তুত হুন।

কিন্তু এই মানসিক প্রস্তুতির মূল চাবিকাঠি হল চিন্তার গভীরতা—যা কিনা পৃথিবীর সব থেকে কঠিনতম গুণ। কিন্তু আমার স্থির বিশ্বাস এমন কোন ব্যক্তি নেই যিনি পূর্ব প্রস্তুতহীন বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করেছেন অথচ চিন্তার রাজ্যে যাঁর কোনও শৃঙ্খলা নেই অথবা মঞ্চে বক্তৃতা দেওয়াকালীন সময়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে নিজেকে চিন্তার বেড়াজালে আবিষ্ট রাখেননি এমন বক্তার নজির অন্তত আমার তালিকায় নেই। একজন সুদক্ষ পাইলট যেমন তাঁর আকাশ ভ্রমন কালে কোনও বিপদের গন্ধ পেলে নামমাত্র বিচলিত না হয়ে অতি সুস্থিরভাবে ধীর মস্তিষ্কে সমস্ত ব্যাপারটা আয়ত্বে আনার চেষ্টা করেন, একজন অ-পূর্বপরিকল্পিত বিদ্যায় ব্যুৎপত্তি অর্জনকারী বক্তা তেমন নানা ভাবে তাঁর আলোচ্য বিষয়টিকে বিশেষভাবে মনযোগ আকর্ষণের লীলাক্ষেত্র করে তোলেন। এইরকম বক্তৃতাকে অবশ্য অ-পূর্বপরিকল্পিত বক্তৃতা বলা চলে না এবং সাধারণ প্রস্তুতির বক্তৃতা বা আলোচনা বলা যায়।

আপনি যখন আপনার আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে জেনে গেলেন, তখন আপনার সমস্যা হল কি করে তা যুক্তিসম্মত এবং সময়সম্মত হবে। একজন অ-পূর্বপরিকল্পিত বক্তা হিসেবে আপনাকে নির্দিষ্ট সময় দেওয়া হবে এবং এই স্বল্প সময়ের মধ্যেই আপনাকে সব গুছিয়ে বলতে হবে। আপনি কোন আঙ্গিকে বলতে শুরু করবেন আগে ঠিক করুন। আপনি প্রস্তুতবিহীন বলে ক্ষমা চাইবেন না যেন। যেন যে বিষয়টা আপনার ভাগ্যে পড়েছে তা মোটেই অপ্রত্যাশিত নয় এমনভাবেই অযথা সময় নষ্ট না করে সুন্দরভাবে গুছিয়ে বলে চলুন দেখবেন তা শ্রোতার মনজয়ী ত হবেই এবং আপনিও কালজয়ী বক্তারূপে স্বীকৃতি পাবেন।

৩। যত দ্রুত সম্ভব উদাহরণ দিন

বলতে শুরু করেই মাথা খাটিয়ে সঠিক উদাহরণ টানুন। তাহলেই আপনি অনেক বেশী সক্রিয় হয়ে উঠবেন। বাচনভাঙ্গী হয়ে উঠবে সপ্রতিভ আর জড়তা বা আড়ষ্টতা থেকে পাবেন সত্যিকারের

সব চাইতে লাভবান হবেন শ্রোতার মনোযোগ আকর্ষণ করতে পেরে। শুধুমাত্র কথার কচকচি কেউ পছন্দ করেনা—সেখানে সুন্দর উপমা আর ঘটনা শ্রোতাদের শুনতে আগ্রহী করে তোলে—ক্লান্ত করেনা।

তাহলে মোদ্দা কথা হল :

(উদাহরণ দিন বক্তৃতার মাঝখানে। তাহলে শ্রোতারা এক-ঘেয়েমী কাটিয়ে আপনার প্রতিটি কথা শুনতে আগ্রহী হবে।)

৪। প্রাণবন্ত ভাবে কথা বলুন। আত্মবিশ্বাস রাখুন।

আপনি নিজেই যদি নির্জিব, ক্লান্ত আর প্রাণশূন্য ভাবে শ্রোতাদের কাছে বক্তব্য রাখেন তাহলে আপনি কি করে আশা করেন যে—শ্রোতারা আপনার কথা শুনতে আগ্রহী হবে।

(তাহলে মোদ্দা কথা হল—শক্তি ও প্রাণ প্রাচুর্য্যে ভরা আত্মবিশ্বাসে পরিপূর্ণ হয়ে কোন কথা যদি আপনি বলেন—তক্ষুণি তা শ্রোতার মনেও সংক্রামিত হবে।)

৫। যে কোনও মুহূর্তে আপনাকে কিছু বলতে হতে পারে

ধরুন আপনি একটা সভায় অথবা কোনও ঘরোয়া পরিবেশে সকলের বক্তব্য শুনে মাথা নাড়ছেন। তক্ষুণি আপনার মনে হল আপনি বেঁচে গেলেন। আপনাকে কিছু বলতে হল না, আপনি বেশ উল্লাসিত হয়ে উঠলেন, সেই মুহূর্তেই আপনার পাশে বসা কোনও বন্ধু আপনার কাঁধে হাত রেখে বলে উঠল—এই যাঃ, তোমার কথাত শোনা হল না, তুমি ভাল বলবে তা ত জানি।

আপনার অবস্থাত এমন হয়ে উঠল যে পারলে আপনি মাটি ফুঁড়ে পাতালে প্রবেশ করেন। কিন্তু তাতে কি আপনি রেহাই পাবেন, কারণ ততক্ষণে ঘরের সব লোকজন আপনার দিকে তাকিয়ে আছে, আপনাকেই দেখছে। সুতরাং আপনাকে কিছু বলতেই হবে।

কীভাবে কেমন করে বলবেন:

(১) শ্রোতাদের বন্ধু বলে ভাবুন। আপনি বলতে শুরু করেই কোনও নির্দিষ্ট উদাহরণের মধ্যে ঢুকে যান।

(২) সব সময় উপলক্ষ্যটা মাথায় রাখুন এবং সে সম্পর্কে ভাবুন এবং বলার চেষ্টা করুন।

(৩) ভাল বলার আগে আপনাকে অবশ্যই মনোযোগী শ্রোতা হতে হবে। কারণ আপনার পূর্ববর্তী বক্তারা হাতি ঘোড়া কি বললেন সে সম্পর্কে আপনি যদি অবহিত না হন তাহলে আপনি বলতে উঠেই বিশবাঁও জলের তলায় পড়বেন।

সুতরাং মোদ্দা কথা হল: মনোযোগী শ্রোতা হন তাহলেই ভাল বক্তা হবেন।

৬: উপস্থিত মত বক্তব্য রাখুন এবং সেই সঙ্গে উপস্থিত খাপ খাওয়ানো উদাহরণ দিন

উপস্থিত মত বক্তব্য রাখার সময়ে আপনার সামনে যে নির্দিষ্ট আলোচ্য বিষয় থাকবে সেটার সঙ্গে সামঞ্জস্য আছে এমন উদাহরণ টানুন এবং পরিশেষে উদাহরণকে এমন একটি মূল লক্ষ্যের দিকে ধাবিত করান যাতে করে চোখে আঙ্গুল দিয়ে না দেখালেও যা সুন্দরভাবে আপনার বক্তব্য বিষয়কে প্রতিফলিত করবে। সবচেয়ে আগে যেটা মনে রাখতে হবে, ধরে নিন ভাল করে কথা বলা এবং মন জয় করার সোনার খনির চাবি আমি আপনার হাতে তুলে দিচ্ছি।

মন জয় করার গোপন রহস্য হল :

(১) খুব সুন্দর আকর্ষণকারী প্রস্তাবনা
(২) কম কথায় বেশী ভাব প্রকাশ করা
(৩) উদাহরণ টেনে প্রসঙ্গান্তরে চলে যাওয়া

চতুর্থ পর্ব

অষ্টম অধ্যায়

কথার মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপনের কলা কৌশল

কেমন করে কথা বলবেন

আমি যখন আপনাদের বলবো মাত্র চারটি উপায় আছে কথা বলার—কথা বলতে পারার, তাহলে আপনি হয়তো বিশ্বাস করতে চাইবেন না। আমি যদি আপনাদের সামনে থাকতাম, তাহলে নিশ্চয়ই বলতেন, 'বলছেন কি মিঃ কার্নেগী ? এত সহজে শুধুমাত্র কথা দিয়ে লোকের মন জয় করা যায় ?'

উত্তরে আমি বলবো—হ্যাঁ ? মাত্র চারটি সহজ উপায়েই তা সম্ভব। আপনি যদি প্রতিদিন যথাযথভাবে নিষ্ঠা, একাগ্রতা আর ধৈর্য্যসহকারে অনুশীলন করেন—আপনি সফল হবেনই হবেন।

এবারে চারটি গোপন রহস্যের কথা আপনাদের বলছি—

(১) আমরা কি করি

(২) আমরা কি দেখি

(৩) আমরা কি বলি

(৪) কেন করে আমরা তা বলি

১। সংকোচ গাম্ভীর্য্য আর আত্ম সচেতনার শক্ত খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসুন

আমার প্রথম শিক্ষাদানের দিনটি থেকে আজ পর্য্যন্ত যত ছাত্র আমি পেয়েছি—তাদের মধ্যে বেশীর ভাগই ছিলো সত্যিকার শিখতে

আগ্রহী। জানা ও শেখার জন্য তাদের তৃষ্ণা আমাকেও অনুপ্রাণিত করেছিলো যাতে ওদের জন্য কিছু করতে পারি।

চাকুরী, ব্যবসা, অধ্যাপনা জীবিকার যে প্রাঙ্গনেই তারা ছিলো —সেখানে তারা ছিলো অসফল। তাই আমার ছাত্রদের জীবনের বিভিন্ন পটভূমিতে জীবিকার সংগ্রামে জিতিয়ে দেবার অলিখিত দায়িত্ব কাঁধে নিতে আমি কখনও কুণ্ঠিত হতাম না।

আমি আমার ছাত্রদের পরিচয়-পর্ব মিটে গেলেই বারবার একটি কথা বলতাম তা হল—তারা যেন সহজ স্বাভাবিক হয়, যতদূর সম্ভব সংকোচ, গাম্ভীর্য্য আর আত্মসচেতনার শক্ত খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করে। না হলে অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে তাদের।

অবশ্য সহজ হতে বলা যত সহজ, সহজ হওয়া তত সহজ নয়, বরং বেশ কঠিন। দর্শক-শ্রোতার সামনে সহজ হওয়া যে কত শক্ত একজন অভিনেতা তা হাড়ে হাড়ে জানেন।

অথচ ভাবতে অবাক লাগে—যখন আপনি ছোট ছিলেন, বয়স মাত্র চার, কত সহজেই না মঞ্চে উঠে সহজভাবে দর্শকদের সামনে ছড়া বলতেন বা গান গাইতেন। কিন্তু সেই আপনি-ই যখন চব্বিশ বা চুয়াল্লিশে বক্তৃতা মঞ্চে ওঠেন— সহজ-সরল-স্বতস্ফূর্তভাব কোথায় হারিয়ে যায়, পরিবর্তে সংকোচ জড়তা, অনাবশ্যক গাম্ভীর্য্য আর আত্মসচেতনতার শক্ত খোলসে আপনি ঢুকে পড়েন—যেমন ভাবে কাছিম তার মাথা ঢুকিয়ে নেয় খোলার ভেতরে।

ডেল কার্নেগী ইনস্টিটিউশনের ক্লাশ চলাকালীন এ পর্য্যন্ত কয়েক শো বার আমি আমার ছাত্রদের বলার মাঝখানে থামিয়ে দিয়েছি, বলতে বাধ্য হয়েছি, একজন মানুষ যেভাবে কথা বলে সে ভাবে কথা বলুন। সহজ হোন। রাতের পর রাত আমি প্রায় অধৈর্য হয়ে উঠেছি—আমার ছাত্রদের কথা বলার অভিষ্টতা

কাটিয়ে সহজ করে তুলতে। কিন্তু বিশ্বাস করুন যত সহজে এটা লিখছি তত সহজ ছিলোনা ব্যাপারটা।

আমি আমার ছাত্রদের প্রায়ই কবিতা বা নাটকের অংশ বিশেষ, বিশেষত সংলাপ, নাটকীয় আবেগ, কণ্ঠস্বরের ওঠানামার বিশেষ উৎক্ষেপন সহযোগে পড়তে বলতাম। অনেকে এতো বাজে পড়তো যে সে নিজেই হেসে ফেলতো বোকার মত।

একবার যদি আপনি সংকোচের জাল কেটে সহজ হতে পারেন তবে নিজেকে মনে হবে শেকল ছেঁড়া মুক্ত বিহঙ্গের মত। ঠিক এসব কারণেই সিনেমা, থিয়েটারে লোক ভীড় করেন যা তারা পারেন না করতে, কত সহজেই না কান্না হাসি আর ক্রোধের প্রতিফলন ঘটান অভিনেতা-অভিনেত্রীরা।

২। অন্যাকে নকল করবেন না। নিজের মত করে বলুন

একজন বক্তার নিজস্ব কিছু ধরণ-ধারণ, কথা বলার বিশেষ ভঙ্গী, উচ্চারণ, বিভিন্ন মুদ্রা, হাত-পা নাড়া, মুখভঙ্গীমা এ সবকিছুই তার নিজের মত—একান্তই আলাদা। এখন কেউ যদি একজন বিখ্যাত বক্তার ভাব-ভঙ্গী অনুকরণ করে—তাহলে ব্যাপারটা হয়ে উঠবে হাস্যকর। ব্যক্তিত্ব-বিকাশের পক্ষে বাধা স্বরূপ। নিজেকে প্রকাশের পক্ষে বাধাস্বরূপ। প্রত্যেকেই যে প্রত্যেকের চেয়ে আলাদা এমন একটি ঘটনার কথা বলছে। আপনারা ভালো বুঝতে পারবেন তা থেকে—

প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হয়েছে মাত্র। অস্ট্রেলিয়া সরকার একটি বিমান চালানো প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিলো। প্রতিযোগী

যদি বিমান চালিয়ে লণ্ডন থেকে অষ্ট্রেলিয়া পর্য্যন্ত টানা যেতে পারে তাহলে পঞ্চাশ হাজার ডলার পুরস্কার দেওয়া হবে।

দুজন ইংরেজ বৈমানিক—সহোদর ভ্রাতা চতুর্দিকে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলো এ প্রতিযোগিতায় জিতে। ইংলণ্ড সরকার থেকে তাদের 'স্যার' উপাধি দেওয়া হল।

আর একজন নামীদামী 'ক্যামেরা-ম্যান'-যাকে লোকেরা জানতো খামখেয়ালী আধপাগলা বলে, সে কিন্তু কাজের কাজ করেছিলো। আর্ধেক পথ পর্য্যন্ত সে বৈমানিক ভ্রাতাদের সংগে পাড়ি দিয়েছিলো, আর পুরো রাস্তার ভ্রমন-বৃত্তান্ত তুলে নিয়েছিলো মুভী-ক্যামারাতে।

দিনে দু'বার করে চার মাস পর্য্যন্ত লণ্ডনের ফিলহারমনিক হলে, বৈমানিক ভাইদের ধারা বিবরণীর সংগে জনসাধারণকে তা দেখানো হত।

যে কথা বলার জন্য ঘটনাটা বলা তাহল, আমি বৈমানিক ভাইদের ভালো করে বক্তব্য রাখার বিষয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ দিয়েছিলাম।

সাধারণতঃ দুপুরে একভাই আর রাত্রে অন্য ভাই শ্রোতাদের সামনে দাঁড়িয়ে, চলচ্চিত্র চলাকালীন ধারাবিবরণী দিত।

যদিও একই অভিজ্ঞতার বিষয়ে দুভাই বলতো। একই সংগে পাশাপাশি বসে একই দূরত্ব তারা পাড়ি জমিয়েছিলো, তথাপিও তাদের বলার ভঙ্গী ছিলো সম্পূর্ণ আলাদা। কারুর সংগে কোনই মিল ছিলোনা। যদিও একই শব্দ একই জায়গা ও বিভিন্নরকম ভৌগোলিক প্রতিশব্দ যা দুজনেই ব্যবহার করেছিলো। অথচ তবুও তা হত দু'জন আলাদা আলাদা লোকের বক্তৃতা।

বহুবছর পূর্বে যখন ইংল্যাণ্ড ছিলো রোমের এক উপনিবেশ মাত্র, তখন একজন বিখ্যাত বক্তা বলেছিলেন: প্রত্যেকটি দুর্গই প্রায় একরকম।

কিন্তু কখনও দু'জন মানুষ একরকম হয়না। এই পৃথিবীর

মাটিতে সূর্যের নীচে কোন জিনিসই এরকম ছিলোনা বা এরকম থাকবেও না।

এ পৃথিবীতে প্রতিটি মানুষই আলাদা। আপনার মত কেউ নেই—আপনি অপর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। হাজার লক্ষ্য কোটি জনতার ভীড়েও আপনাকে আলাদা চিহ্নিত করা যাবে—যদিও অন্যসবার মত আপনারও দুটি চোখ, দুটি হাত ও পা রয়েছে তবুও আপনি সবার থেকে আলাদা আপনার মানসিক গঠন, চিন্তা, বুদ্ধির বিকাশই আপনার আলাদা ব্যক্তিত্ব তৈরী করে।

(তাই অনুরোধ আপনারা, যারা এতক্ষন ধরে এ বই পড়ে চলেছেন—কখনও যেন কারও অনুকরণ করবেন না, কারুর মত হওয়ার চেষ্টা করবেন না। এতে করে আপনার স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিত্ব ধ্বংস হয়ে যাবে।)

৩। অন্তরঙ্গভাবে শ্রোতাদের সঙ্গে কথা বলুন।

একবার সুইটজারল্যাণ্ডের এক হোটেলে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা হল। বলরুমে নাচের ফাঁকে একজন বিখ্যাত সাহিত্যিকের সংগে আলাপ আলোচনর সুযোগ এলো। তিনি অতি উন্নাসিক বাচনভঙ্গীতে শ্রোতাদের দিকে না তাকিয়ে, ঘরের দেয়াল-ছাদ, অন্যান্য সাজ -সরঞ্জামের দিকে তাকিয়ে নির্লিপ্ত গলায় আন্তরিকতাহীন বক্তব্য রাখলেন। স্বভাবতঃই উপস্থিত শ্রোতারা বিরক্তই হল, খুশী বা আগ্রহ দেখানোতো দূরের কথা।

এ যেন রুক্ষ, শুষ্ক, ধূ-ধূ বালিময় গোবিমরুভূমিতে

বক্তব্য রাখা—এক ফোঁটা জলের জন্য মৃতপ্রায় অবস্থায় পতিত হওয়া।

অথচ তার কিছুক্ষণ পরেই একজন পদার্থ বিজ্ঞানী 'এ্যাটম এবং বিশ্ব' এই পর্যায়ে বক্তব্য রাখলেন। প্রথম দিকে শ্রোতারা সবাই নীরস বক্তৃতাতে মোটেই আগ্রহী ছিলোনা। কিন্তু বক্তার এ বিষয়ে পঞ্চাশ বছরের পড়াশুনো আর নিরলস সাধনার কঠিন শ্রমলব্ধ পাকা ফসলের ঘ্রাণ দর্শকের বা শ্রোতার হৃদয়তন্ত্রীতে ঘা দিতে সক্ষম হলো। বক্তার আন্তরিকতা, বিশ্বাস, শ্রোতার প্রতি সম্মানবোধ আর ভালোবাসা প্রতিটি শ্রোতাকে মুগ্ধ করে তুললো, শ্রোতার মন জয় করতে সক্ষম হলো।

(প্রাণবন্তময় আন্তরিক বক্তৃতার জন্যই এটা সম্ভব হল, শ্রোতার সংগে মানসিক যোগাযোগ করা গেল। এতক্ষণ ধরে যা পড়লেন শিখলেন বা জানলেন—তা হল নিজের মত করে আন্তরিক ভাবে শ্রোতার সংগে মানসিক যোগাযোগ করা, তা পারলেই আপনি সফল হবেন লোকের মন জয় করতে। অন্যথা নয়।)

৪। সমস্ত মন প্রাণ ঢেলে কথা বলুন।

যখন একজন বক্তা তার সমস্ত অনুভূতি আর আত্ম-বিশ্বাসকে একত্রিত করে কিছু বলেন তখন তার সামনে লৌহশলাকার দুর্ভেদ্য প্রাচীর নমনীয় হয়ে ওঠে। পাথর-হৃদয় শ্রোতার মনও গলে যায়। শ্রোতারা নিজের অজান্তেই বক্তাকে সমর্থন করে, গ্রহণ করে। বক্তার আবেগের উত্তাপে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে শ্রোতারা। এক্ষেত্রে

বক্তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বক্তব্য রাখেন, শ্রোতাও শোনে কারণ বক্তা সেখানে আন্তরিক।

তাহলে একথা আপনাদের ভোলা উচিত হবে না যে হৃদয়-হীন-আন্তরিকতাহীন শূন্যগর্ভ বক্তৃতা ফাঁকা মাঠে তলোয়ার ঘোরানোর মতই নিষ্ফল হাস্যকর। আমি যখন বিখ্যাত পাদ্রী মাইকেল ম্যাকডোনাল্ডের ধর্মোপদেশ শুনতাম তখন ভেবে অবাক হতাম কেমন করে তিনি একজন নাস্তিকের মন জয় করতে সক্ষম হন। এখন বুঝতে পারছি তাঁর হৃদয় তাঁর কাজের দ্বারা অপ্লুত হত। তাঁর প্রতিটি কথা শ্রোতার মনে রেখাপাত করত এক অনাবিল সৌন্দর্য্যে যা সম্ভব হয়েছিল তাঁর বিশ্বাস, ভক্তি এবং পবিত্র জীবন যাপনের জন্যই।

তাই অসংখ্য নাস্তিককেও তিনি ঈশ্বরের পথে পরিচালিত করতে সক্ষম হতেন, কোনও রকম আদেশ উপরোধে নয়, শুধুমাত্র গভীর ভালবাসার দ্বারাই শ্রোতাদের মন জয় করতে সক্ষম হতেন। অথচ বিখ্যাত বক্তা এডমণ্ড বার্ক শুধুমাত্র একজন আলঙ্কারিক কৌলিন্যে পরিশীলিত সমাজে পোষাকী বক্তা হিসেবেই চিহ্নিত হয়ে রইলেন। আজ তার ফলশ্রুতি ছাত্রদের পাঠ্যপুস্তকের পাতায়, পরীক্ষার খাতায়; সাধারণ মানুষের হৃদয় জয় করা ত দূরের কথা, সফল বক্তা হিসাবে বার্কের বক্তৃতা লিপির দু'চার লাইন পড়তেও তারা উৎসাহ বোধ করে না। আদর করে হাউস অব কমন্সের কিছু ভদ্রলোক বার্ককে সম্বোধন করতেন "নৈশ ভোজের ঘণ্টাধ্বনি" (ডিনার-বেল) বলে।

আসলে ব্যাপারটা হল, বার্ক বলতে শুরু করলেই হলঘর ফাঁকা হয়ে যেত। খেতে, নস্যি বা সিগারেট এ মৌজ করতে, ঘুমাতে বা নাক ঝাড়তে, বা মূত্রত্যাগে ব্যস্ত হয়ে পড়তো সমবেত শ্রোতারা।

এ যেন লৌহ বর্মে আবৃত কোন লোককে গুলি করে মারার অযথা

চেষ্টা। অথচ বর্মাচ্ছাদিত না হলে কোন মানুষকে বারুদের পুঁটলি ছুঁড়েও আহত করা হয়ে ওঠে খুবই সহজ।

তাহলে মোদ্দা কথা হল :—সমস্ত মন-প্রাণ ঢেলে কথা বলুন, শ্রোতাকে আন্তরিক ভাবে ভালবাসুন, শ্রদ্ধা করুন।

৫। বারবার অনুশীলন করুন, গলাকে প্রয়োজন মত দৃঢ় এবং নমনীয় করে তুলতে।

আমরা যখন বক্তা হিসেবে শ্রোতার সামনে দাঁড়াই, কথা বলতে শুরু করি, আমার নিজের অজান্তেই কণ্ঠস্বরের ওঠা নামা করি, আকারে ইঙ্গিতে অনেক কিছু বোঝানোর চেষ্টা করি, কখনও বা কাঁধ ঝাঁকাই, চোখ নাচাই, হাত নেড়ে গলা কাঁপিয়ে, ওঠা নামার মাধ্যমে শ্রোতাকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করি। এটা বক্তব্যকে অনেক বেশী জোরালো এবং প্রাণবন্ত করে তোলে। এ ধরণের অঙ্গভঙ্গী এবং কণ্ঠস্বরের তারতম্য প্রত্যক্ষভাবে ও জোরালোভাবে শ্রোতার হৃদয় স্পর্শ করে। আমরা যত বেশী আমাদের বক্তব্যকে শ্রোতাব মাঝখানে ছড়িয়ে দিতে পারব, গ্রহণ করতে পারব, তত বেশী সফল হব শ্রোতার মন জয় করতে, সার্থক বক্তা হয়ে উঠতে।

আমাদের মধ্যে কারো কারো অভ্যাস আছে খুব জোরে কথা বলার, খুবই আস্তে বলার অথবা অতি দ্রুত ঝড়ের গতিতে বলার। তিনটিই ক্ষতিকারক। আমরা যদি পরিষ্কার উচ্চারণে আবেগ প্রবন গলায় সুনির্দিষ্ট শব্দ তরঙ্গে কথাকে ওঠানামা করাই এবং ধীর স্থির ভাবে কথা বলি তাহলে তা অবশ্যই শ্রুতিগ্রাহ্য হয়ে উঠবে। শ্রোতার কানে একঘেয়ে হয়ে উঠবে না, শুনতে আগ্রহী হবে।

আপনার কথাবার্তা, ভাবভঙ্গী, আচার আচরণই যদি দীন হীন গরীব ভিখিরীর মত হয়—তাহলে আপনি কি করে আশা করেন শ্রোতারা আপনাকে ধনী জাহাজ ব্যবসায়ী বলে ধরে নেবে ?

বারবার অনুশীলন করুন, বারবার ভাবুন এবং পড়ুন। এ পর্য্যন্ত যা শিখলেন তা বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখুন। তাহলেই অপরের মন জয় করাটা আপনার পক্ষে সহজ হয়ে উঠবে।

*

আপনি অনেকক্ষণ ধরে এ বইটি পড়ে চলেছেন। দয়া করে বইটি এখন বন্ধ করুন। আপনি একটু বিশ্রাম নিন। খুবই ক্লান্ত মনে হচ্ছেত ? চোখ বুঁজে থাকুন কিছুক্ষণ। এবারে ভাবতে থাকুন এ বইতে লেখা নিয়ম কানুনগুলো কিভাবে অনুশীলন করবেন আর কেমন করেই বা প্রয়োগ করবেন ? আমি আপনাকে একটু সাহায্য করছি ঃ এক কাজ করুন না, আপনার সব থেকে কাছে যিনি আছেন—তার ওপরেই এই উপায়গুলো প্রয়োগ করুন। আমি শতকরা একশ ভাগ গ্যারান্টি দিচ্ছি—দেখবেন এতে যাদুর মত কাজ হবে।

পঞ্চম পর্ব

কার্যকর ভাবে কথা বলার জন্য চ্যালেঞ্জ গ্রহন করুন।

নবম অধ্যায়

বক্তার পরিচয় প্রদান, বক্তৃতা পেশ করা, পুরস্কার লাভ করা।

যখন আপনাকে জনসাধারণের সামনে বক্তৃতা দিতে ডাকা হবে, আপনি অন্য আর একজন বক্তাকে পরিচিত করে দিতে পারেন অথবা আপনার বক্তৃতাকে বোধগম্য মনোজ্ঞ এবং কার্য্যকরী করে তোলার জন্য বিস্তৃত বক্তব্য রাখুন। হয়ত আপনি কোনও সামাজিক সংস্থার অনুষ্ঠান সভাপতি অথবা কোনও মহিলা সমিতির সদস্য এবং আপনার কাজ হল পরবর্তী বক্তৃতা সভায় প্রধান বক্তাকে পরিচিত করানো অথবা কোনও স্থানীয় সংবাদ সংস্থার বা কোনও বিক্রয় সংস্থার অথবা কোনও ইউনিয়ণ সভা বা রাজনৈতিক দলের কাছে বক্তৃতা দেওয়ার সময় আপনি সময়-স্বল্পতা হেতু বার বার ঘড়ি দেখছেন হয়ত—কারণ আপনি জানেন আপনার পেছনে অনেক বক্তা লাইন দিয়ে রয়েছে, বক্তৃতা দীর্ঘ করা চলবে না। কিন্তু এমনও হতে পারে দীর্ঘ বক্তৃতাই করতে হবে। কারণ সেখানে আপনি প্রতিযোগী, আপনাকে ছিনিয়ে নিতে হবে শ্রেষ্ঠ পুরস্কারটি। তাহলে প্রথমেই যেটা করবেন তা হল কখনও বলতে উঠে শ্রোতাদের কাছে মার্জনা চাইবেন না বা দুঃখ প্রকাশ করবেন না। একজন বিখ্যাত বক্তার কথায় বলা যায়—আয়েস করুন, স্বচ্ছন্দ ভঙ্গীতে কথা বলুন, কোনও বক্তাকে পূর্বপ্রস্তুত বক্তব্য রাখতে হবে এটা আমি আদৌ

বিশ্বাস করি না। এটা খুবই সহজ ব্যাপার, একদমই কার্য্যকরী নয়। বক্তব্যের আকর্ষণ আর মাধুর্য্যকে খুন করে দেয় পূর্বপ্রস্তুতি। আমি অপেক্ষা করি শ্রোতার তরফ থেকে সাড়া আর উদ্দীপনা পাওয়ার জন্য। আর আমি কখনও তা পেতে নিরাশ হই না।

(ধরুন, এই বক্তার নাম মিঃ এক্স।)

আমাদের এই পূর্বতন বক্তার নিজের লেখা বই থেকে একটি ঘটনার কথা বলছি—আমি একবার একটি সভায় আমন্ত্রিত হলাম বক্তা হিসাবে। বসে আছি ত আছিই। আমার আর ডাক পড়ে না। এমন সময় একজন কথা-বলিয়ে অনুষ্ঠান ঘোষক মঞ্চে উঠে শ্রোতাদের কাছে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন—এবং আমাকে আমার বক্তব্য রাখতে আহ্বান জানালেন।

উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণ, অনুগ্রহ করে আপনারা একটু শুনুন। আমি আপনাদের কাছে কিছু দুঃসংবাদ শোনাতে এসেছি। বিখ্যাত বক্তা এমারসনের বক্তৃতা দেওয়ার কথা ছিল, অনিবার্য কারণ বশতঃ তিনি আসতে পারছেন না, কারণ তিনি অসুস্থ। আমরা দুঃখিত ও লজ্জিত। পরবর্তী বক্তা ছিলেন সিনেটর ডেভিড মেকাচ্চন কিন্তু হঠাৎ জরুরী কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় তিনিও আসেননি। আমরা এজন্য দুঃখিত,এরপরে অবশ্য আমরা প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলাম উইলিয়াম হেনরীকে আনার জন্য—কিন্তু তিনি আসতে পারেননি। অগত্যা আমরা বাধ্য হয়ে আমাদের এখানে উপস্থিত মিঃ এক্সকে বক্তব্য রাখতে বলছি।'

এভাবে যদি কাউকে অপ্রস্তুত অবস্থায় বক্তৃতা দিতে হয় তাহলে তার মনের অবস্থা কেমন হবে বুঝতেই পারছেন। তবে এধরণের পরিস্থিতির মধ্যে যদি, পড়েন—তবে শ্রোতাদের সাহায্য নিন, তাদের কাছে খোলাখুলি ভাবে বক্তব্য পৌঁছে দিন—তাহলেই তারা আপনাকে গ্রহণ করবে। শ্রোতারাই আপনাকে উৎসাহ-উদ্দীপণা দেবে। ঠিক যেমন দিয়েছিল মিঃ এক্সকে।

১। আপনি যা বলতে চেয়েছেন তা পরিষ্কারভাবে বুঝুন তৈরী হোন।

২। T. I. S. ফর্মুলা অনুসরণ করুন।

উপরের T. I. S ফর্মুলা আপনার সত্যিকারের বন্ধুর কাজ করবে। এ পর্যান্ত আপনি যা শিখলেন তার বাস্তব প্রয়োগে সাহায্য করবে।

(১) T = T হল গিয়ে বিষয়।

(২) I = I হল গিয়ে বক্তব্য - বিষয়ের গুরুত্ব নির্ধারণকারী

(৩) S = S হল গিয়ে বক্তা। বক্তার নাম ধাম পরিচয়, ঠিকানা, পেশা ইত্যাদি···

যখনই আপনার ওপর দায়িত্ব বর্তাবে কোন বক্তাকে দর্শকের বা শ্রোতার সামনে পরিচয় করিয়ে দেবার—তখনই ওপরের তিনটি ফর্মুলা মাথায় গেঁথে রাখবেন। বিষয়টা কি? বিষয়ের শিরোনামাই বা কি? প্রথমে বক্তার বক্তব্য বিষয় সম্পর্কে পরিচয় করাবেন শ্রোতাদের।

এবার হল বিষয়বস্তুর গুরুত্ব। যাদের কাছে বক্তা বক্তব্য রাখছে—তারা বিষয়বস্তুর কোন কোন অংশে বেশী গুরুত্ব দিতে পারে বা দেবে সেটা ভেবে নিয়ে আলোকপাত করুন বিষয়টির অংশবিশেষে।

বক্তার নাম পরিষ্কার করে ঘোষনা করুন। তার শিক্ষাগত বা অন্যান্য যোগ্যতার উল্লেখ করুন। সম্ভব হলে এমন কোন কিছু খুঁজে নিয়ে বলুন—যা কিনা বক্তার বক্তব্য বিষয়কে গুরুত্ব দেবে—একটা মিল খুঁজে পাওয়া যাবে।

এবারে একটি উদাহরণ দিচ্ছি, যা থেকে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে উঠবে আপনাদের কাছে।

ধরুন: 'নিউইয়র্ক শহরে টেলিফোনের অগ্রগতি' এ বিষয়টির

উপর বক্তব্য রাখবেন কোন বক্তা। আপনি তাকে পরিচয় করিয়ে দেবেন— এরকম ঠিক করা আছে।

আপনি প্রথমে টেলিফোন সম্পর্কে দু'চার কথা বলতে পারেন। পরে সরাসরি বক্তার পরিচয় দিন। টেলিফোন সম্পর্কে তার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার কথা বলে সরাসরি তার নাম ঘোষনা করুন। এবারে আপনার সামনে উপস্থিত হবেন মিঃ এক্স, প্রেসিডেন্ট-নিউইয়র্ক টেলিফোন কোম্পানী। এবারে আর একটি উদাহরণ দিচ্ছি। আপনি এভাবেও শুরু করতে পারেন কোন বক্তাকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য—আমি খুব আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি আজ আমরা আমাদের মাঝে পেয়েছি মিঃ কে-কে। তিনি আপনাদের তাঁর জীবনের স্মরনীয় কিছু ঘটনার কথা বলবেন। এমনি নানাভাবে আপনি বক্তাকে শ্রোতার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে পারেন, শুধু মনে রাখবেন পরিচয় পর্বটা যেন অন্তঃসারশুন্য, রসকষহীন কাঠখোট্টা না হয়ে দাঁড়ায়। এবং সবচাইতে যেটা জরুরী তা হল t-i-s ফর্মূলা অনুসরন করে চলা। তাহলেই দেখবেন কাউকে পরিচয় করিয়ে দিতে আপনার কোন অসুবিধেই হচ্ছে না।

৩। সবচেয়ে আগে দরকার হল নিজেকে উদ্দীপ্ত করা।

ধরুন আপনি যদি কোনও বক্তার নাম প্রথমে না বলে তার পেশা, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও নানারকম কর্মদক্ষতা সম্পর্কে শ্রোতার মনে সুন্দর ধারনা গড়ে তুলতে পারেন এবং তারপরেই ধীর স্থির গলায় পরিষ্কার উচ্চারণে বক্তার নাম ঘোষনা করেন, তাহলে দেখবেন আপনার শ্রোতারা শতগুনে আগ্রহী হয়ে উঠবে বক্তা সম্পর্কে।

বক্তার নাম ঘোষনা করার সময় তিনটি শব্দ সর্বদা মাথায় রাখবেন —(১) থামা (২) সুসামঞ্জস্য (৩) দৃপ্তভঙ্গী।

(১) থামা—এর মানে হল কোনও বক্তার নাম ঘোষনার পূর্বে একটু থামুন। তাতে ফল হবে এইযে নৈঃশব্দ ভঙ্গ করে বক্তার নাম শ্রোতার মনে একটা রিন্‌রিনে ছন্দের সুর এনে দেবে।

(২) সুসামঞ্জস্য—এর অর্থ হল শ্রোতার নাক এবং পদবীর উল্লেখ করার সময় সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে একটু থামুন যাতে বক্তার নাম শ্রোতার অন্তরের অন্তরতমস্থলে সুগভীর আবেগের সৃষ্টি করে।

(৩) দৃপ্ত ভঙ্গী—এর অর্থ হল বক্তার নাম ঘোষনায় কণ্ঠস্বরে উদ্দীপনা এবং দৃঢ়তা আনুন। মিনমিনে বা অস্পষ্ট উচ্চারণে কখনই যেন বক্তার নাম ঘোষণা করতে যাবেন না।

৪। আপনার উষ্ণ আন্তরিকতা যেন শ্রোতার হৃদয় স্পর্শ করে।

যখনই বক্তাকে শ্রোতার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে যাবেন তখন যেন শ্রোতার চাইতে বক্তাকে বেশী গুরুত্ব দিয়ে শ্রোতাকে আহত করে তুলবেন না। হাস্যরস বা কোনও ঘটনার কথা বলতে গিয়ে এমন কোনও শব্দ বা কথা উচ্চারণ করবেন না যাতে করে শ্রোতাদের অশিক্ষিত, হৃদয়হীন বা অজ্ঞ বলে মন্তব্য করার পর্য্যায়ে না চলে যায়। তাহলে আসল কথা হল আন্তরিকতা শ্রোতা এবং বক্তা দুই-এর প্রতি।

প্রত্যেকটি মানুষের গোপন আকাঙ্খা হল সম্মানলাভ করা, পুরস্কৃত হওয়া।

* * * * *

পুরস্কার যিনি পান, তিনি তা পাওয়ার যোগ্য এটা যতটা ঠিক' প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহন করাটাও কোন অংশে কম সম্মানের নয়। তাই যখনই কোন পুরস্কার বিজয়ী সম্পর্কে, শ্রোতাদের কিছু বলতে

যাবেন-তখন যেন পুরস্কার না পাওয়া প্রতিযোগিদের কোন ভাবে ছোট বা হেয় প্রতিপন্ন করতে যাবেন না।

তাই পুরস্কার বিতরনী সভাতে বক্তব্য রাখার সময় বিজয়ীদের পুরস্কৃত করার সময় প্রতিটি শব্দ নির্বাচনে যথেষ্ট গুরুত্ব দেবেন সতর্ক থাকবেন। নীচে বহু পরীক্ষিত একটি ফর্মূলা বলে দেওয়া হল :—

(১) কীভাবে পুরস্কার দেওয়ার রেওয়াজ হল সে সম্পর্কে বলুন। হয়তো এটা হতে পারে যে দীর্ঘদিন যোগ্যতার সংগে কাজের জন্য, অথবা কোন প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানে বিজয়ী হওয়ায়, বা ব্যক্তি-গত কোন সৃজনশীল কাজের জন্য এরকম পুরস্কার দেওয়া হতে পারে।

আপনি সহজ সরল অন্তরঙ্গতায় শ্রোতাকে তা বলুন।

(২) পুরস্কার বিজয়ীর কাজকর্ম বা জীবনের কিছু স্মরনীয় ঘটনা সম্পর্কে আলোকপাত করুন।

(৩) পুরস্কারটি কিভাবে দেওয়া হয় এর আর্থিক এবং সম্মানিক মূল্য কত এবং পুরস্কার বিজয়ী এটা জয় করে কতটা কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, সম্মানিত হয়েছেন সে সম্পর্কে বিশদ বলুন।

পুরস্কার বিজয়ীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান এবং সমবেত শ্রোতৃ-মণ্ডলীর শুভেচ্ছা তাকে যেন ভবিষ্যতে আরও উন্নতির শিখরে নিয়ে যায় এটা জানাতে ভুলবেন না যেন।

পরিশেষে আর একটি কথা স্মরণ রাখবেন, পুরস্কারটি যারা দিচ্ছেন সে সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে এবং ধন্যবাদ জানতে ভুলবেন না যেন।

৫। আপনি যদি পুরস্কার বিজয়ী হন তাহলে আপনারা উষ্ণ আন্তরিক ধন্যবাদ শ্রোতাদের জ্ঞাপন করতে ভুলবেন না।

এ বিষয়ে গুটি চারেক অব্যর্থ ফর্মূলা আপনাদের বলছি।

(১) উপস্থিত, শ্রোতৃমণ্ডলীকে উষ্ণ আন্তরিক কণ্ঠস্বরে 'অসংখ্য ধন্যবাদ জানান।

(২) পুরস্কার পেতে বিভিন্ন দিক থেকে আপনাকে যারা সহায়তা করে-ছিল তাদের প্রত্যেকের কাছে বিভিন্ন দিক থেকে আপনার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করুন। যেমন ধরুন এদের মধ্যে থাকতে পারে আপনার পরিবার, বন্ধুরা, সহকর্মীরা এবং আপনার সহযোগীরা।

(৩) পরিস্কার করে সবাইকে বলুন কি পুরস্কার আপনি পেয়েছেন, যদি পুরস্কারটি খোলা অবস্থায় থাকে, বিশেষ মোড়কে না থাকে তাহলে পুরস্কারটি হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সবাইকে দেখান। শ্রোতাদের আন্তরিকভাবে বলুন জিনিসটা কতটা মজবুত, কতদূর আপনার কাজে লাগবে। কি দিয়ে তৈরী, গায়ে নক্সা বা কারুকাজ রয়েছে।

(৪) পরিশেষে উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে উষ্ণ আন্তরিক ধন্যবাদ এবং সবিনয়ে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে বিদায় নিন, বক্তব্যে ইতি টানুন।

এ পর্য্যন্ত যা বললাম আপনারা অনুগ্রহ করে আন্তরিক সদিচ্ছার সঙ্গে তা অনুশীলন করুন। একবার নয়, দুবার নয়, বার বার, করুন। ভাবুন; বাস্তবক্ষেত্রে সুযোগ মত প্রয়োগ করুন। তাহলেই দেখবেন আপনি অচিরেই খুব সহজে লোকের মন জয় করতে পারছেন। যা কিনা আপনার নিজের কাছেই যাদুবিদ্যার ভেল্‌কিবাজি বলে মনে হতে পারে।

দশম অধ্যায়

কেমন করে কিভাবে দীর্ঘক্ষণ বলতে সক্ষম হবেন।

পৃথিবীতে এমন কোনও ব্যক্তি নেই যিনি কোনও রকম নক্সা ছাড়াই পূর্বপ্রস্তুতি ছাড়াই একটি মনোরম প্রাসাদ তৈরী করে ফেলতে পারেন। নেপোলিয়ন—ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়ন—অমিতবিক্রমশালী যোদ্ধা নেপোলিয়ন—তাঁর লেখা চিঠিতে একবার জোসেফাইনকে লিখেছিলেন "যুদ্ধ হচ্ছে সম্পুর্ণভাবে কলাকৌশল, বিভিন্ন প্রস্তুতি আর নানা রকম নক্সার সমাহারে এক অত্যাশ্চর্য্য বিজ্ঞান। যার প্রতিটি পদক্ষেপ চালিত হয় সুনিয়ন্ত্রিত চিন্তা এবং বুদ্ধির সতর্ক দৃষ্টিপাত মূলক পদক্ষেপে।

এ সম্পর্কে গুটিকয়েক বিশেষ ফর্মূলা আমি আপনাদের বলব। কিন্তু দোহাই আপনাদের, যারা বইটি এতক্ষণ ধরে পড়ে চলেছেন, শুধুমাত্র পড়ার জন্যই যেন পড়বেন না, সদা সর্বদা মনে রাখবেন এসব অনুশীলন মেনে চললে আপনি অতি সহজেই লোকের মন জয় করতে পারবেন। আপনি যদি ব্যবসায়ী হন বাড়িয়ে তুলতে পারবেন আপনার ব্যবসা, যদি আপনি ইঞ্জিনীয়ার হন আপনার সহকর্মী'রা আপনাকে ভালবাসবে। যদি ডাক্তার হন রুগীরা আপনাকে পছন্দ করবে যদি অধ্যাপক হন তবে যে সব ছাত্রছাত্রীরা আপনার ক্লাস করতো না তারা আগ্রহী হবে আপনার ক্লাস করতে। সবশেষে আপনি যদি হন সেল্‌স্‌ম্যান্ তাহলে যেন এক যাদুকাঠির ছোঁয়ায় আপনার বিক্রী বেড়ে উঠবে হু হু করে।

তাহলে আসুন পুনরায় শুরু করা যাক্

১। প্রথম পদক্ষেপেই শ্রোতার মনোযোগ আকর্ষণ করতে চেষ্টা করুন।

আমি একবার ইণ্ডিয়ানা ইউনিভার্সিটির প্রেসিডেন্টকে জিজ্ঞেস করেছিলাম তাঁর দীর্ঘ বক্তৃতা বহুল জীবন থেকে একজন বক্তা হিসেবে সবচেয়ে জরুরী বিষয় বলে কি মনে হয়েছে। উত্তরে তিনি বলেছিলেন যদি চমকপ্রদ উদ্দীপনাময় ভঙ্গীতে শুরু করা যায় এবং সেই সঙ্গে শ্রোতাকে বক্তৃতা শুনতে মনযোগী ও আগ্রহী করে তোলা যায় তাহলে তার চাইতে বড় কিছু বিজয় বক্তার কাছে হতে পারে না।

অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট বলতে চাইছেন—আপনার প্রথম কথাগুলো যেন শ্রোতার মন জয় করতে সক্ষম হয়।

২। কোন ঘটনা বা উদাহরণ দিয়ে বক্তব্য শুরু করুন।

একবার অ্যামেরিকার চলচ্চিত্র শিল্পের একজন দিকপাল পুরুষ, লরেন্স অব্ অ্যারোবিয়া সম্পর্কে বলতে গিয়ে এভাবে শুরু করেছিলেন :—

একদিন দুপুরবেলা রুক্ষ পাথুরে জেরুজালেম শহরের খেজুর গাছের ছায়ায় ছায়ায় আমি হাঁটছিলাম—ক্রীশ্চান ষ্ট্রীট রাস্তাটি দিয়ে। এমন সময়ে একটি অদ্ভুত দৃশ্য আমার চোখে পড়ল, যা সারাজীবনে আমি চেষ্টা করেও ভুলতে পারব না। একজন দীর্ঘকায় শ্বেতবর্ণ ইওরোপীয়ান হেঁটে যাচ্ছিলেন রাস্তা ধরে। তাঁর প্রাচ্য-দেশীয় দীর্ঘ জোব্বা-আলখাল্লাতে সোনা-রঙের কারুকাজ, কোমরে বাঁধা সুচারু দড়ি যেন সোনা গালিয়ে চুবিয়ে নেওয়া হয়েছে। আর তাঁর কোমরে দোদুল্যমান উলঙ্গ বাঁকানো সোনার তরবারী পদক্ষেপের তালে

তালে যেন নাচছিল। এ ধরণের পোষাক সাধারণতঃ নবী মহম্মদের অনুসরণ কারীরাই পরে থাকেন। আমি একজন ইসলাম ধর্মাবলম্বী পথচারীকে ডেকে ঐ ইওরোপীয় ভদ্রলোকের পরিচয় জানতে চাইলাম। এবং জেনে খুবই আশ্চর্য্য হলাম যে তিনি একজন ইংরেজ আর তিনি হলেন বহু বিতর্কিত সেই বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব—লরেন্স অব অ্যারোবিয়া।

তাহলেই দেখুন এরকম নাটকীয় ভাবে বর্ণনাবহুল ঘটনা দিয়ে শুরু করলে শ্রোতারা শুনতে আগ্রহী না হয়ে পারে? সুতরাং বক্তব্যকে প্রাণবন্ত করার জন্য স্মরনীয় ঘটনা বা বিভিন্ন উদাহরনের আশ্রয় নিন। তাহলেই শ্রোতারা শুনতে আগ্রহী হবে, একঘেয়েমীতে ভুগবে না, আপনিও বলে আনন্দ পাবেন।

৩। শ্রোতার আগ্রহকে শতগুণে বাড়িয়ে তোলার কথা ভাবুন। ঠিকমত করুন।

একবার বিখ্যাত শিল্পপতি মিঃ নেরুদা লস্ এঞ্জেলসে একটি ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা দিবসে বক্তৃতা করতে উঠে এভাবে বলতে শুরু করেছিলেন—"বিরাশী বছর আগে লণ্ডনের একটি প্রকাশক একটি ছোট্ট পুস্তিকা প্রকাশ করেছিলেন। বইটি বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে প্রথম দিনেই বিক্রী হয়েছিলো হাজার কপি। পনেরো দিনের মধ্যে প্রকাশকের কাছে পুস্তকের চাহিদা এসেছিল পনেরো হাজার কপি। তারপর থেকে ঐ বইটির একহাজার পুনর্মুদ্রন হয়েছিল। প্রায় পঁয়ত্রিশটি ভাষায় পৃথিবীর নানা দেশেই বইটি অনূদিত হয়েছিল। মাত্র বছর দুয়েক আগে আর একজন পৃথিবী বিখ্যাত প্রকাশক লেখকের মূল পাণ্ডুলিপিটি মোটা টাকার বিনিময়ে হস্তগত করেও লাভবান্ হবার আশা করছেন।

তাহলে এই যে কুবেরের ধন বা সোনার ডিম পাড়া হাঁসের মত

মূল্য এই বই—তার নামটি কি—এটা নিশ্চয় জানার আগ্রহ হচ্ছে আপনাদের ? বইটির নাম হল......"

তাহলে নিজেই বুঝুন বক্তা শ্রোতার মনে কি পরিমান আগ্রহের সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছিলেন।

৪। বক্তব্যের মাঝখানে সত্যিকার পরিসংখ্যান মূলক তথ্য দিন।

যেমন আপনি বলতে শুরু করলেন—আজকাল আমাদের দেশে যুব সমাজের ভিতর বিয়ে করে সুখী হওয়ার ঘটনা একেবারেই কমে যাচ্ছে। বিগত কয়েক বছরে যে পরিমাণ বিবাহ বিচ্ছেদ বেড়েছে সেটা জাতি এবং সমাজের পক্ষে খুবই ভয়াবহ এবং বিপজ্জনক। যেমন ধরুন ১৯৪০ এ প্রতি পাঁচটি বা ছটি বিয়ের মধ্যে একটি বিয়েই ভেঙ্গে গেছে। কিন্তু ১৯৫০এ চারটি বিয়ের ভিতর একটি মাত্র টিকেছে।

আর একটি উদাহরন দিচ্ছি তথ্যবহুল বক্তৃতা দিয়ে শুরু করার যেমন যুদ্ধবিভাগ মনে করছে যদি অ্যামেরিকাতে পরমানু যুদ্ধ হয় তাহলে কুড়ি মিলিয়ন অ্যামেরিকান নিহত হবে প্রথম রাত্রেই।"

৫। দর্শক-শ্রোতার হাত ওপরে তুলিয়ে সম্মতিসূচক সমর্থন আদায় করুন।

মাঝে মাঝে অপ্রত্যাশিত ভাবে ফল পাবেন যদি আপনি শ্রোতার কাছ থেকে সম্মতি বা সমর্থন আদায় করে নিতে পারেন। অর্থাৎ কনা শ্রোতা হাত তুলে আপনার বক্তব্য অনুমোদন করবে। একটি উদাহরনের সাহায্যে পরিষ্কার করে বলছি।

একবার একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে শ্রমিকদের মাঝখানে আমাকে বক্তব্য রাখতে হয়েছিল।

বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল 'কিভাবে ক্লান্তি দূর করা যায়।' আমি শুরুতেই এভাবে আরম্ভ করেছিলাম—আপনাদের সামনে কিছু বলার আগে দয়া করে আপনারা আমাকে একটি জিনিস জানান যে আপনাদের মধ্যে কতজন খুব তাড়াতাড়ি ক্লান্ত হয়ে পড়েন? হাত তুলে আপনারা আমার দিকে তাকান, আমি সংখ্যা গুণে নেব।

এতে করে খুব ভাল ফল হয়। দর্শকরা চটপট মাথার উপর হাত তুলতে থাকেন সমর্থনের ভঙ্গীতে। এ পদ্ধতি আপনারা প্রয়োগ করে দেখবেন এটা আমি আশা করব।

শ্রোতার সামনে যখনই বক্তা হিসাবে আপনি কিছু বলতে উঠবেন তখন নীচের ফর্মূলাগুলো মাথায় রাখবেন। এবং অবশ্য পালন করবেন।

(১) শ্রোতার কাছে প্রতিজ্ঞা করুন তারা যাতে আপনার বক্তব্য থেকে কিছু গ্রহণ করতে পারে।

(২) সম্ভব হলে কোনও কিছু দেখিয়ে বক্তব্য পেশ করুন।

(৩) সর্বদা খেয়াল রাখুন যাতে করে বাধ্যতামূলকভাবে শ্রোতার মনযোগ আকর্ষণ না করতে হয়।

(৪) কখনই ক্ষমা চেয়ে বক্তব্য শুরু করবেন না।

(৫) বানিয়ে বানিয়ে আষাঢ়ে গল্প ফেঁদে বলতে শুরু করবেন না কখনও।

(৬) আপনার মূল বক্তব্যগুলোতে বেশী জোর দিন।

(৭) বক্তৃতার ভেতরে পরিসংখ্যানমূলক তথ্য পেশ করুন।

(৮) বিখ্যাত লোকের উদ্ধৃতি টানুন।

(৯) বক্তব্য বিষয়ের সঙ্গে সাদৃশ্যমূলক উপমা দিন।

(১০) কোন কিছু দেখিয়ে বা না দেখিয়ে হাতে কলমে শিক্ষা দিন।

(১১) বক্তৃতার মধ্যে কার্য্যকরী আবেদন রাখুন।

(১২) বক্তব্য যথা সম্ভব সংক্ষেপ করুন, অযথা বাড়াবেন না।

(১৩) আপনার বক্তব্য যাতে শ্রোতারা বাস্তবে প্রয়োগ করে সেজন্য আবেদন করুন।

উপরের তেরটি ফর্মূলাকে বারবার পড়ুন। ভাবুন। আবার পড়ুন। অনুশীলন করুন। বাস্তবে কিভাবে প্রয়োগ করা যায় সে সম্পর্কে চিন্তা করুন। ফর্মূলাগুলোতে যাদু আছে। আর যদি সত্যি সত্যিই চান যে লোকেরা আপনাকে পছন্দ করবে, আপনি সহজেই তাদের মন জয় করতে পারবেন তাহলে মূল কথা হল অন্য লোকের প্রতি সত্যি-সত্যিই আগ্রহ দেখান।

এ পর্য্যন্ত যা পড়লেন, জানলেন, শিখলেন, তা প্রয়োগ করুন।

একাদশ অধ্যায়

*

* *

আপনি পূর্ব্বে বহুবার হয়ত লক্ষ্য করেছেন একজন সফল বক্তা তার বক্তব্যকে বর্ণে-বৈচিত্র্য নানা নাটকীয় ঘটনা প্রবাহে খুঁটিনাটি-বিবরণে ছবির মত করে তোলেন শ্রোতার সামনে। তাতে করে খুব সহজেই তিনি শ্রোতার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হন ও মন জয় করেন।

আপনিও আপনার দৈনন্দিন জীবনের কথাবার্তার মধ্যে বৈচিত্র আনার চেষ্টা করুন এবং এই বইয়ের নির্দেশাবলী মনে প্রাণে অনুশীলন করে চলুন বাস্তব প্রয়োগের মাধ্যমে। এভাবে প্রতিনিয়ত অনুশীলন করলে আপনার কাজকর্মের ক্ষেত্র অনেক বেশী প্রসার লাভ করবে।

ওয়াশিংটনের এক বাড়ির গৃহিনী—যিনি ডেল কার্নেগী ইনস্টিটিউশনের শিক্ষাক্রম নেবার পর আমাকে চিঠিতে জানিয়েছিলেন—

আগে ৪/৫ জন অচেনা লোকের সামনে কোনও রকম সামাজিক অনুষ্ঠানে কথা বলার সময় আমি ঘেমে নেয়ে উঠতাম। কোনও শব্দই খুঁজে পেতাম না, অথচ এখন সেই আমিই চারশ লোকের সামনে অবলীলায় বলতে পারছি, শ্রোতাদের খুশী করতে পারছি।

*

* *

সেল্‌স্‌ম্যান, ম্যানেজার, কেরাণী, সওদাগরের অফিসের বড়বাবু, ছোট ছোট দলীয় নেতা, শিক্ষক, রাজা-গজা-মন্ত্রী-অফিসার, নার্স

ডাক্তার, আইনজীবি, হিসাব রক্ষক এবং ইঞ্জিনীয়ারা—আপনারা যে যেখানে যেমনভাবে যে রকম দায়িত্বেই নিয়োজিত থাকুন না কেন এ বইতে শেখা নিয়মকানুনগুলো নিজের বাস্তব কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করে আপনার কাজের পরিধি বাড়িয়ে তুলুন। ভালভাবে বক্তব্য রাখতে পারাটা আজকের পৃথিবীতে যোগযোগ রাখার মূল সোপান এবং সরকারী বেসরকারী কর্মক্ষেত্রে শিল্পোদ্যোগে এবং নানা রকম ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের কর্মমঞ্চে একমাত্র কার্য্যকরী আলোচনার মাধ্যমে পারস্পারিক যোগাযোগ বজায় রাখা সম্ভব হয়ে ওঠে।

*

* *

জনসাধারণের সামনে কিছু বলার সুযোগ খুঁজুন—এ কথাটি আপনার কানের কাছে কেউ উচ্চারণ করলেই সঙ্গে সঙ্গে মনে প্রশ্ন জাগবে, কেমন করে তা সম্ভব হবে। আমি জনসাধারনই বা পাব কোথায় ???

সমাধান আছে। আপনাকে খুঁজে নিতে হবে কোনও একটি ক্লাব বা সংস্থা এবং তার সক্রিয় সভ্যপদ গ্রহন করুন। সম্ভব হলে ক্লাবের অনুষ্ঠান পরিচালক, সভাপতি, যিনি সাংস্কৃতিক বিভাগগুলি দেখাশোনা করেন তাঁকে প্রভাবিত করে মঞ্চে ওঠার সুযোগ করে নিন। প্রথমে আপনার উপর ভার পড়বে উপস্থিত ক্লাবের গণ্যমাণ্য, হোমরাচোমরা ব্যক্তি এবং সমবেত বক্তাদের শ্রোতার সঙ্গে পরিচয় দেওয়ার। পরে আস্তে আস্তে নিজেই বলার সুযোগ পাবেন বক্তা হিসাবে।

সানফ্রান্সিসকোর একজন স্কুলশিক্ষক তাঁর ক্লাবের মাধ্যমে ছোট ছোট বক্তব্য রাখার ফাঁকে ফাঁকে নিজেকে এমনভাবে তৈরী করে ফেলতে পেরেছিলেন যে তিনি খুব দ্রুতই আত্মীয়স্বজন, বন্ধু বান্ধব, ছাত্রছাত্রী,

নিজের পরিবারের চৌহদ্দি ছাড়িয়েও সুনাম অর্জন করে ফেললেন ভাল বক্তা হিসাবে। এভাবে তিনি ক্রমশই আমন্ত্রিত হতে থাকলেন সান্‌ফ্রান্সিসকো শহরের বড় বড় সভা সমিতিতে। জ্বালাময়ী বক্তব্য রাখতে পারেন বলে হু হু করে তার নাম চতুর্দিক ছড়িয়ে পড়ল। তাঁর জীবনের পট পরিবর্তন হল। তাঁর একদিনের সখ তাঁকে নিয়ে গেল এক অন্য জগতে।

নাম বলতে একটু অসুবিধে আছে। সেদিনের সেই শিক্ষকটি আজ অ্যামেরিকান টি,ভি,তে সবচাইতে জনপ্রিয় সংবাদ পাঠক ও টি,ভি তারকা।

কে বলতে পারে আপনার জীবনের এমন কোনও পরিবর্তন আসবে না ?

*

* *

যখন আমরা কোনও নতুন জিনিস শিখতে যাই, যেমন ধরুন ফরসী শেখা, গল্‌ফ্‌ শেখা অথবা বক্তৃতা করা শেখা, আমরা কিন্তু মনেপ্রাণে সে বিষয়টি শিখতে আগ্রহী হই না। দৃঢ়তার সঙ্গে এগোই না। যদি বা হঠাৎ করে উদ্দীপ্ত হয়ে যাই, দ্রুত উন্নতির দিকে এগিয়ে যেতে থাকি একদিন তেমনিই দ্রুতভাবে পিছনে হটে আসি, থেমে যাই। এবং এইভাবে পুরো থেমে যাওয়া মাঝ-রাস্তায় থামা বা টিমে তালে চলতে গিয়ে আমরা শুধুই অনর্থক সময় আর অর্থের অপচয় করি।

এমনি করে বিক্ষিপ্তভাবে অধ্যবসায়হীন কাজ অর্থহীন হয়েই দাঁড়ায়। কিন্তু যদি আপনার ভেতরের পুরো শক্তি ঢেলে আন্তরিকতা বুদ্ধি আর অধ্যবসায় দিয়ে আপনি কথা বলা অভ্যাস করেন তাহলে কোনও প্রতিকূলতাই আপনার সফলতাকে থামিয়ে রাখতে পারে না।

তবে হ্যাঁ, গোড়ার দিকে শ্রোতার সামনে বলতে গিয়ে অনভিজ্ঞতার ফলস্বরূপ কিছুটা ভয় ভীতি, একটু স্নায়বিক দৌর্বল্য আপনাকে সামান্য কাবু করে দেবে ঠিকই কিন্তু শ্রোতার সামনে দাঁড়ানোর কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই আপনি আপনার স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা, কণ্ঠস্বরের সুস্বাস্থ্য এবং মনের উদ্দীপনা খুঁজে পাবেন। এ ধরনের ভয় ভীতিকে গুরুত্ব না দিয়ে আবার একেবারে অবজ্ঞা, বা নস্যাৎ না-করে বলতে পারলে আপনি শ্রোতার মন ঠিকই জয় করবেন।

পূর্বে আমি একবার লিখেছিলাম, আমার নিজেরও প্রতিবার মঞ্চে ওঠার আগে একটু ভয় লাগে। বলতে শুরু করলে তা কেটেও যায়। সুতরাং এ নিয়ে মাথা ঘামানোর কিছু নেই।

পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ পিয়ানো বাদকেরও মঞ্চে ওঠার পূর্বে হাত পা কাঁপত। মুখ রক্তশূন্য হত। কিন্তু যে মুহূর্তে মঞ্চে উঠে পিয়ানোতে হাত দিতেন সেই মুহূর্তেই প্রখর সূর্য্যালোকের মত ঝলমলে হয়ে উঠতেন তিনি।

একবার একজন যুবক লিংকনের কাছে চিঠি লিখে জানতে চেয়েছিল, আইনজীবি হতে হলে তাকে কি করতে হবে। উত্তরে লিংকন লিখেছিলেন—"যদি তুমি সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস কর যে তুমি আইনজীবিই হবে, তাহলে তোমার আদ্দেক কাজ এগিয়ে গেল। বাকি আদ্দেক নির্ভর করবে তোমার আত্মবিশ্বাস, পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের উপর।" লিংকন এটা ভাল করে জানতেন ধৈর্য্য এবং অধ্যবসাই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র মূলমন্ত্র। তাঁর সারা জীবনে এক বছরের বেশী তিনি নিয়মিত স্কুল করতে পারেন নি। আর বইপত্র? একটি বইও তার নিজের কেনার ক্ষমতা ছিল না। তাঁর বাসস্থানের পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে থেকে তিনি তা জোগাড় করতেন। অগ্নিচুল্লীর গনগনে কাঠের আগুনের আলোতেই চলত তাঁর পড়াশোনা।

শুনলে অবাক হবেন কোনও কোন দিনে পঁচিশ থেকে ত্রিশ মাইল

দূরে তিনি নামকরা কোনও বক্তার বক্তৃতা শুনতে ছুটে যেতেন। এবং বাড়ী ফিরে সেইসব বিষয়ে বক্তৃতা করার অনুশীলন করতেন। কলকারখানা, বন জঙ্গল, হাটে বাজারে সুযোগ পেলেই, তিনি বক্তৃতা দেওয়ার অভ্যাস করতেন। প্রেসিডেণ্ট থিওডোর রুজভেল্টও আব্রাহাম লিংকনের কঠোর অধ্যবসায়, কষ্ট সহিষ্ণুতা ও অসীম ধৈর্যশীলতা থেকে অনুপ্রাণিত হতেন, প্রায়শঃই শিক্ষা নিতেন।

*

*   *

এই বই প্রায় শেষ হয়ে এল। এবারে আমি আপনাকে অনুরোধ করব—আপনি যখন সকালে প্রাতঃরাসের টেবিলে বসে কফিতে চিনি মেশাবেন সে সময় প্রতিদিন অন্ততঃ নীচের লেখাটিতে চোখ বুলিয়ে নেবেন। এ বইতে যা পড়লেন বা শিখলেন অতি অবশ্যই স্মরণ রাখার চেষ্টা করবেন।

অ্যামেরিকার সব চাইতে বড় মনস্তাত্ত্বিক তাঁর এক বিখ্যাত প্রবন্ধে লিখেছিলেন :

সে যে বিষয়েই হোক্ না কেন কোনও যুবকেরই শিক্ষার ফলাফল কি হতে পারে তা নিয়ে বিশেষ উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণ নেই। যদি সে তার কর্মবহুল দিনের প্রতিটি ঘণ্টা ব্যস্ত থাকার চেষ্টা করে সে পরিনতিতে যে সফলকাম হবেই এতে সন্দেহের অবকাশ নেই। এইভাবে চালিয়ে যেতে পারলে, কোনও একদিন মনোরম প্রাতঃকালে সে নিজেকে আবিষ্কার করবে এ যুগের একজন সুযোগ্য বংশধররূপে। যে বিষয় সম্পর্কে তার ছিল একরূপ নিষ্ঠা এবং কঠোর অধ্যবসায় সে বিষয়ে সে যে অবিস্মরণীয় প্রতিষ্ঠা লাভ করবে এ সম্পর্কে সন্দিহান হবার কোনও আশংকা নেই।

আর একটি উদাহরণ দিই : একজন প্রাক্তন গভর্নর একবার ট্রেনটনে আমাদের ক্লাস শেষ হওয়ার মুখে বক্তৃতা দিতে উঠেছিলেন

তিনি বললেন এ পর্য্যন্ত এই সভায় তিনি যে সুন্দর সুন্দর বক্তৃতা শুনেছেন তা হাউস আস রিপ্রেজেন্টিটিভ বা সিনেট হলে বলিয়ে সুদক্ষ বক্তাদের মতই অপূর্ব। ট্রেনটনের ঐ সভায় বেশীর ভাগ বক্তাই ছিলেন পেশায় ব্যবসাদার, যাঁরা একমাস আগেই বক্তৃতা দিতে গিয়ে জিভে আটকে গলা শুকিয়ে তোত্‌লাতে শুরু করতেন। তাঁরা কেউ এক একজন বিখ্যাত বক্তা সিসারো নন, সাধারণ ব্যবসাদার মাত্র। কিন্তু বারবার অনুশীলনের দ্বারা তাঁরা নিজেদেরকে একদিন সত্যি-সত্যিই আবিস্কার করে ফেললেন এক একজন মনোজ্ঞ বক্তা হিসেবে, প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেলেন শহরের অন্যতম সুদক্ষ বক্তাদের মধ্যে।

এই বইতে এ পর্য্যন্ত যা বলা হল—তা সবই আপনাদের জন্য।

কিন্তু এই বই পড়া শেষে, অনুশীলন শেষে, বাস্তব ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করে, জীবনের নানা প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে, যখন আপনারা সফল হবেন তখনই আমার এই বই লেখা সার্থক হয়ে উঠবে।

কারণ আমি নিজে শিক্ষা নিয়েছি হার্বার্ট স্পেনসারের কাছ থেকে, আমি বিশ্বাস করি যে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য কেবলমাত্র জ্ঞান আহরণ করা নয়, সে জ্ঞানকে কাজেও রূপান্তারিত। করা হলেই সে জ্ঞানের সার্থকতা, অন্যথায় নয়। প্রতক্ষ্য কাজের জন্য আপনি যাতে পুরো-পুরি তৈরী হয়ে উঠতে পারেন এই বইখানার মূল উদ্দেশ্য সেটাই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই বইয়ের কথামত চললে আপনি অতি সহজেই লোকের মন জয় করতে সক্ষম হবেন।

যদি বড় হতে চান

ডেল কার্নেগী রচিত

Biographycal Round up thtrtynine Famous Peaple

অবলম্বনে ভাষান্তরিত সম্পাদনা

মুকুল গুহ

মনোমোহন প্রকাশনী * কোলকাতা তিয়াত্তর

সেই সব পাঠক পাঠিকাদের হাতে যাঁরা কর্নেগীর লেখা তাঁদের কর্মজীবনের বীজ মন্ত্র বলে মানেন—তাদের হাতে ডেল কার্নেগীর এই নতুন ধরনের বইটি তুলে দেওয়া হল—

আজকের দুনিয়ায় খেটেখাওয়া মানুষের কাছে ডেল কার্নেগী একটি অতি পরিচিত নাম। এই বইটি **Biographycal Round up Thirtynine Famous Peaple** ডেল কার্নেগীর সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের বই। পাঠকের কাছে এর স্বাদই আলাদা হবে বলে আমাদের ধারণা। মূল বইটিতে মোট উনচল্লিশ জন খ্যাতনামা ব্যক্তির জীবনী আছে, যাতে তাঁদের জীবনের উত্থান-পতনের চমকপ্রদ ঘটনা অতি-চমকপ্রদ ভাবে পরিবেশন করেছেন ডেল কার্নেগী। বইয়ের কলেবর অহেতুক বৃদ্ধি না করে গত মহাযুদ্ধের কয়েকজন মার্কীন ও বৃটিশ সমর নায়কের (যেমন রোমেল, মাউণ্টব্যাটেন বা মণ্টোগোমারী নন এমন কয়েকজনের) জীবন কথা বাদ দেওয়া হল। আশা করি এই বইটিও পাঠকদের কাজে পাঠকদের কাছে সমানভাবে সমাদৃত হবে।

॥ প্রকাশক ॥

জর্জ বার্ণার্ড শ

বন্ধুদের কাছে উপস্থিত হতে লজ্জা পেতেন, অথচ সেই সময়ের চমৎকার বক্তা হয়েছিলেন তিনি।

*   *   *   *

জেনারেল জেমস ডুলিটল

চমক সৃষ্টি করার বিপজ্জনক নেশায় যিনি উন্মত্ত ছিলেন। চমক সৃষ্টির বিপজ্জনক নেশাই যাঁর সফলতা এনে দিয়েছিল।

*   *   *   *

মাদাম কুরি

পৃথিবীর সবচাইতে বিখ্যাত মহিলা বৈজ্ঞানিক। এক সময়ে চেয়ারের তলায় ঘুমোতেন শুধু শরীর গরম রাখার জন্য।

*   *   *   *

মার্ক টোয়েন

তিনি নতুন একটা জিনিস—টেলিফোন শিল্পে অর্থলক্ষী করতে রাজী হন নি।

*   *   *   *

উইনস্টান চার্চিল

অংক ভয়ংকর অপছন্দ করতেন তিনি, অথচ সবাই তাকে অর্থমন্ত্রীর পদটি নিতে বলেছিলেন।

*   *   *   *

যোসেফ স্টালিন

ভৃত্য, সার্ফ বংশোদ্ভুত হয়েও তিনি ছিলেন সোভিয়েত জাতির মহান নেতৃত্বে

*   *   *   *

ক্লার্ক গেবল্

সেচ্ছায় যিনি স্বর্ণসজ্জা ত্যাগ করে তৃণ সজ্জা বেছেনিয়েছিলেন।

*   *   *   *

লর্ড লুই মাউণ্টব্যাটেন

রাণী ভিক্টোরিয়ার প্রপৌত্র, যুদ্ধক্ষেত্রে অকুতোভয় সৈনিক।

* * * *

মাদাম চিয়াং কাইশেক

তিনি নির্ভয়ে একলক্ষ উত্তেজিত সৈন্যের মোকাবিলা করেছিলেন নিজের স্বামীকে রক্ষা করতে।

* * * *

রাইট ভাইরা

ওরা ১২ সেকেণ্ডে ইতিহাস তৈরী করেছিল।

* * * *

হেনরী জে কাইজার

তিনি স্টুডিওতে কাজ ঢুকেছিলেন কিন্তু অতঃপর পৃথিবীর সবচাইতে বড় এবং বিখ্যাত জাহাজ প্রস্তুত কারক হয়ে উঠেছিলেন।

* * * *

জেনারেল চার্লস ভ্য গ্যল

জীবিত অথবা মৃত যে ভাবেই হোক তাঁকে ধরার জন্য ৪০,০০০ পাউণ্ড পুরস্কার ঘোষিত হয়েছিল।

* * * *

লর্ড বেভারব্রুক

একজন কার্টুনিষ্টকে তিনি বছরে দশ হাজার পাউণ্ড পারিশ্রমিক দিয়েছিলেন নিজেকে হাস্যাস্পদ করে তুলতে।

* * * *

জেনারেল বার্ণাড মণ্টোগোমারী

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তাঁকে কবরখানার কবরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল অথচ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তিনিই ছিলেন সব চাইতে বিখ্যাত সেনাধ্যক্ষ।

* * * *

করডেল হাল

সতেরো বছর বয়স পর্যন্ত তিনি রেলগাড়িতেই উঠেন নি, অথচ পৃথিবীর প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন তিনি।

*　　*　　*　　*

বব হোপ

একটা সময় ছিল যখন তিনি গুদামঘরের চাকরীর অনুপযুক্ত ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনিই আমেরিকার প্রিয় কমেডিয়ানের কাজটি কিন্তু সার্থকভাবেই করেছিলেন।

*　　*　　*　　*

মুসোলিনি

তিনি আদেশ করেছিলেন সশস্ত্র ইতালিয়ানদের এই বলে যে—"বিপজ্জনকভাবে বাঁচো"—অথচ তিনি নিজেই অন্ধকার রাতে বাড়ি ফিরতে ভয় পেতেন।

*　　*　　*　　*

জেনারেল জর্জ-সি-মার্শাল

তিনি খবর সৃষ্টি করতেন বটে, কিন্তু কোনদিন শোনার জন্য অপেক্ষা করেন নি।

*　　*　　*　　*

জেনারেল চার্লস উইনগেট

লোকে বলত সুইসাইড ব্রিগ্রেড পরিচালনা করতেন তিনি, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সবাইকে ঘরে ফিরিয়ে এনেছিলেন।

*　　*　　*　　*

জ্যাক ডেম্প্‌সে

একটা সময় ছিল যখন তাঁকে গাঁয়ের স্কুল থেকে গাধা চরানোর উপদেশ দেওয়া হয়েছিল।

অথচ পরবর্ত্তিকালে তিনি চার মিনিটে একলক্ষ পাউণ্ড রোজগার করেছিলেন।

*　　*　　*　　*

জেনারেল ক্লেয়ার শেনল্ট

ওরা তাকে ভাড়া করে নিয়ে যেত স্কুলের শিক্ষক হিসেবে, কারণ সে লড়াই করতে পারত।

* * * *

এলি কালবার্টসন

তিনি পাত্রীর জন্য বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন এবং তিনশোর বেশী দরখাস্ত পেয়েছিলেন।

* * * *

গ্লেন এল মার্টিন

একসময় তিনি রান্না ঘরে বসে ঘুড়ি বানাতেন—পরে নিজের কারখানায় বোমারু বিমান বানাতেন।

* * * *

ক্যাপ্টেন এডি রিকেনরেকার

তিনি ছিলেন দু-দুটো মহাযুদ্ধের হিরো—অথচ "শুভদিন" বলতেও লজ্জা পেতেন।

* * *

জন ব্যারিমুর

দিনে এক হাজারেরও বেশী পাউণ্ড তিনি রোজগার করেছিলেন বটে—অথচ তার পোষা শকুনটার জন্য ডাষ্টবিন থেকে খাবার কুড়িয়ে বেড়াতেন।

জর্জ বার্ণাউ শ

বন্ধুদের কাছে উপস্থিত হতে পর্যন্ত লজ্জা পেতেন অথচ সেই সময়ের চমৎকার বক্তা হয়েছিলেন তিনি

পৃথিবীতে পুরো নামের বদলে শুধুমাত্র নামের আদ্যাক্ষর দিয়েই যথেষ্ট পরিচয় হয়ে যায় এমন মানুষ কদাচিৎ মেলে। আয়ার্ল্যাণ্ডের একজন অধিবাসী এইরকম দুরুহ সম্মানের অধিকারী হয়েছিলেন যাকে বিশ্বজোড়া লোক জি-বি-এস নামেই চিনে ফেলে। পৃথিবীর সাহিত্যে যার স্থান স্থায়ী হয়ে আছে। এই চমৎকার ব্যক্তিত্বটির জীবনী লেখক কেবলমাত্র তার নামের আদ্যক্ষরের ব্যবহার করেছেন মলাটে, পুরোনাম ব্যবহার করার কথা ভাবেন নি। অদ্ভুত বৈপরিত্যে ভরা জীবন ছিল বার্ণার্ড শ-য়ের। জীবনে মাত্র বছর পাঁচেক স্কুলে পড়াশুনা করছিলেন তিনি। তা সত্বেও জীবনের স্বাভাবিক পদ্ধতি অর্থাৎ স্কুল কলেজের শিক্ষা গ্রহণ না করা সত্বেও পৃথিবীর শিক্ষা এবং সাহিত্য জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান, নোবেল পুরস্কার পেতে কোন অসুবিধাই হয় নি তার। নোবেল পুরস্কারের সমস্ত টাকাই তিনি এ্যাংলো সুইডিশ লিটারারি এ্যালিয়েন্স কে দান করেছিলেন, কারণ তার ধারনা ছিল যে পুরস্কার অথবা টাকা কোনটারই তেমন দরকার নেই তার।

সম্ভ্রান্ত আইরিশ পরিবারে জন্মেছিলেন শ-য়ের বাবা। শ-য়ের ঠাকুর্দা তার মা বাবার বিবাহ মেনে নিতে পারেন নি বলে পারিবারিক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন তার মা। ফলে শ পরিবারের আর্থিক অবস্থা এত খারাপ হতে সুরু করে যে শ কে পনেরো বছর বয়সে কাজে নেমে অর্থ উপার্জনের পথ খুঁজতে হয়। কাজের প্রথম বছরে মাসে এক পাউণ্ডেরও কম টাকায় কেরানীর কাজ নিয়েই সন্তুষ্ট

থাকতে হয়েছিল তাকে। ষোল বছর থেকে কুড়ি বছর পর্যন্ত তিনি একদিন বেশ গুরুত্বপূর্ণ লোকের কাছে ক্যাশিয়ারের কাজ করতে থাকেন সপ্তাহে পঁয়ত্রিশ টাকা বেতনে। কিন্তু সারাজীবন তিনি অফিসের কাজ ঘৃণা করে এসেছিলেন। তার কারন এমন একটি পারিবারিক মানসিকতার মধ্যে তিনি বড় হয়েছিলেন যেখানে সাহিত্য, সঙ্গীত এবং শিল্পের নামে পুজো করা হত। সাত বছর বয়সে বার্নার্ড শর শেক্সপীয়ার, বেনিয়ান, আরব্য রজনীর উপকথা এবং বাইবেল পাঠ শেষ করেছিলেন। বছর বারো বয়সেই বায়রনকে নিয়ে তিনি মেতে ওঠেন। তারপর ডিকেন্স, ডুমা, এবং শেলী তার জীবনে আসতে দেরী করে না। আঠারো বছরে পা দিতে না দিতেই তিনি পড়ে ফেলেছিলেন টিণ্ডাল, স্টুয়ার্ট মিল এবং হার্বার্ট স্পেন্সার। ঐ সব বিখ্যাত লেখকদের লেখার সংস্পর্শে আসার সঙ্গে সঙ্গে তার মনের কল্পনার জগৎটি উন্মুক্ত হয়ে যায়। স্বপ্নের স্পর্শ তাকে ক্রমশঃ মুগ্ধ করতে থাকে। তাই পরবর্তী সময়ে যখন তিনি বেশ বড় একটি ব্যাংক এবং জমিদারীতে গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্রতী তখনও দেখা যায় তিনি সেইসব কাজ একেবারেই পছন্দ করছেন না। তার কল্পনা এবং মানসিক অবস্থানকে সবসময়েই ঘিরে থাকত সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান এবং ধর্ম।

কুড়ি বছরের জন্মদিন আসার আগেই জি-বি-এস নিজেকে আশ্বাস দিয়েছিলেন এই বলে—"আমারত একটাই মাত্র জন্ম রয়েছে এবং সেটা আমি অফিসের কাজে খরচ করতে যাচ্ছি না" ১৮৭৬ সালে তিনি চাকরী এবং নিরাপত্তার সব রকমের প্রয়াস নিজে হাতে নষ্ট করে লণ্ডনে চলে আসেন, যেখানে তার মা গান শিখিয়ে জীবীকা নির্বাহ করছিলেন। সেখানেই বার্নার্ড শ তার সাহিত্য জগৎ সুরু করলেন, প্রবেশ করলেন শিল্প সাহিত্যের নন্দনকাননে—বলা বাহুল্য যে প্রবেশ পরবর্তী কালে তাকে অতুলনীয় সম্মান এবং ঐশ্বর্যের কাছে পৌঁছে দিয়েছিল।

কিন্তু সাহিত্য জীবনের প্রথম নটি বছর শয়ের অত্যন্ত কষ্টের মধ্যে কাটে লিখে জীবিকা নির্বাহের কোন সম্ভাবনাই ছিল না সেই দুঃসহ নটি বছরে। তিনি অক্লান্তভাবে লিখে যেতেন। শত কষ্ট হলেও দিনে অন্ততপক্ষে পাঁচ পাতা লিখতে বাধ্য করতেন নিজেকে। অনুশাসনে মনকে চাবুক মারতেন অহর্নিশি। পছন্দ হোক না হোক। ইচ্ছে থাক বা না থাক দিনে পাঁচ পাতা তাকে লিখতে হতই। হ্যাঁ-পাঁচ পাতা মাত্র, বেশী নয়—শ বলতেন "আমার মধ্যে ইস্কুলের ছাত্রটি এবং কেরানীটি এত বেশী পরিমানে বেঁচে ছিল যে আমার পাঁচ পাতা লেখার হিসেবে যদি একটি বাক্যের অধিক অবস্থায় গিয়ে পাতার শেষ হত তাহলে আমি সেখানেই থেমে যেতাম, বাক্যটি পর্যন্ত শেষ করতাম না পরদিন ছাড়া।"

তিনি পাঁচটি বড় উপন্যাস লিখেছিলেন। একটির নাম ছিল—"শিল্পীদের মধ্যে ভালবাসা"—এবং এই উপন্যাসটির পাণ্ডুলিপি ইংলণ্ডে এবং আমেরিকায় বিখ্যাত প্রকাশকদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তারা প্রত্যেকেই তার পাণ্ডুলিপি সঙ্গে সঙ্গেফেরৎ দিয়ে দেয়। কিন্তু এদের মধ্যে সবচাইতে যে প্রকাশনা সংস্থাটি বিখ্যাত, তারা জানায় যে তারা শয়ের পরবর্তী লেখাটি দেখতে আগ্রহী। যতই তিনি বারবার তাদের কাছে উপস্থিত হন ততই তারা বারবার তাকে প্রত্যাখ্যান করতে থাকে। তাদের ধারনা খুবই ভালো ছিল শয়ের সাহিত্য কীর্তি সম্পর্কে, শুধু শয়ের বক্তব্য তারা অনুধাবন করতে পারতেন না। সেই সময় বার্নার্ড শয়ের আর্থিক দুরবস্থা এমন একটা চরমে পৌঁছেছিল যে পাণ্ডুলিপি প্রকাশকের কাছে পাঠানোর জন্য সামান্য পোস্টাল স্ট্যাম্পের পয়সা ভিক্ষা করতে হত তাকে। সেই নয় বছর লেখা বাবদ শয়ের রোজগার ছিল বছরে মাত্র কয়েক পাউণ্ড। জামা কাপড় বিবর্ণ পুরনো হয়ে গেলে ছেঁড়া জুতো ছেঁড়া প্যান্ট পড়ে দিনের পর দিন তিনি লণ্ডনের রাস্তায় চলাফেরা করতেন। অবশ্য ক্ষিদের জ্বালা তাকে সহ্য করতে হয়নি

কারণ তার মা দোকানদারদের কাছ থেকে পর্যাপ্ত পরিমানে ধারে জিনিষপত্র সংগ্রহ করতে পারতেন।

এই দীর্ঘ ন বছর ধরে যখন তিনি উপন্যাস লিখছিলেন তখন একবার কাগজে একটি ছোট প্রবন্ধ লিখে পাঁচ পাউণ্ড পেয়েছিলেন মাত্র, তার প্রবন্ধের বিষয় ছিল—পেটেন্ট মেডিসিন। তাছাড়া আর একবার নির্বাচনে ভোট গোনার জন্য পাউণ্ডখানেক পেয়েছিলেন।

তাহলে শ বেঁচে থাকার মতন টাকা কোথায় পেতেন। খোলাখুলি ভাবেই তিনি স্বীকার করতেন যে পরিবারে তার রোজগারের টাকা খুবই প্রয়োজন ছিল কিন্তু তিনি স্বয়ংক্রিয় ভাবে সেই প্রয়োজনের অনুকুলে কিছুই করেন নি। বরঞ্চ তিনি চেয়েছিলেন যে পরিবার তাকে প্রতিপালন করুক। শ নিজেই বলেছেন এক জায়গায়—"জীবন সংগ্রামে আমি নিজেকে ছুঁড়ে দিই নি। ছুঁড়ে দিয়েছিলাম আমার মাকে।

শয়ের জীবনে অর্থনৈতিক স্বয়ং নির্ভরতা এসেছিল শিল্প সমালোচক হিসেবে। জীবনে প্রথম তিনি যে অর্থজনিত সাফল্যলাভ করেছিলেন তা উপন্যাস লিখে নয়, নাটক লিখে। শয়ের জীবনে প্রথম দিককার লেখা সবকটা নাটকই ব্যর্থ হয়েছিল। বস্তুত প্রায় একুশ বছর ধরে ক্রমাগত লেখার পরেই কেবল শ স্বয়ংনির্ভর হতে পেরেছিলেন। সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছিলেন ধনী একজন মহিলাকে বিয়ে করার। বিয়ের ব্যাপারে রোমান্টিক কিছু করার সময়ে ছিল না তার।

অবিশ্বাস্য মনে হবে ভাবলে যে যে জর্জ বার্নার্ড শ অসংখ্য শ্রোতাদের সামনে অকুতোভয় দাঁড়িয়ে বিবাহের আইনকানুন অস্বীকার করে বক্তৃতা দিচ্ছেন। অস্বীকার করছেন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান-গুলিকে, গণতান্ত্রিক সংস্থাগুলোকে এবং এসবগুলো ছাড়াও অন্যান্য ঐতিহ্যমণ্ডিত সামাজিক রীতিনীতি লৌকিক প্রথাগুলিকে। সেই জি-বি-এস লজ্জায় আর ভয়ে কুঁকড়ে যেতেন। ইনফিরিয়িটি

কমপ্লেক্স এবং ভয়ের তরাসে। কিন্তু, তার নিজের ভয় পাওয়া চেহারাটি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন তিনি। উদাহরণ স্বরূপ তিনি কখনও-সখনও লণ্ডনের টেমস নদীর পাশে থাকা কোন বন্ধুর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতে যেতেন। কি তার মনোভাব থাকত সেইসময়, সেই প্রসঙ্গে শ নিজেই বলেছেন এক জায়গায়—

"আমি এত লজ্জা পেতাম যে নদীর ধারে অন্ততপক্ষে কুড়ি মিনিট ধরে পায়চারী করেই কাটিয়ে দিতাম কোন বন্ধুর বাড়িতে কড়া নাড়ার আগে। অনেক আগেই যা করা উচিৎ, তা করতে পারতাম না।
মনে হচ্ছিল ছুটে পালিয়ে যাই। এত কষ্ট পাওয়ায় দরকারটা কি যদি পালিয়ে গেলেই ল্যাটা চুকে যায়। যদি ঠিক সেই মুহূর্তে আমার মনে না হত যে এরকম ভাবে পালিয়ে বাঁচা যায় না তাহলে হয়ত আমি পালিয়েই যেতাম, কৈশোরে কেবলমাত্র কাপুরুষ স্বভাবের জন্য আমি যতটা কষ্ট পেয়েছি এরকম কষ্ট খুব কম লোকই পেয়ে থাকে।"

পরবর্তী সময়ে এই ভয় এবং লজ্জা পেয়ে যাওয়ার ব্যাপারটাতে এত বেশী হতাশ হয়ে পড়ছিলেন তিনি যে বাধ্য হয়েছিলেন সেগুলো থেকে নিজেকে রেহাই দিতে। অনেক পড়াশুনা করে কিছু না হওয়ার পরে তিনি একটি Debating socity কে লিখে ছিলেন। প্রথম প্রথম তিনি কথা বলতে উঠে এমন নার্ভাস হয়ে পড়তেন সে লজ্জায় লাল হয়ে উঠতেন। রেজিস্টারে নাম সই করতেই তার হাত কেঁপে উঠত। কিন্তু তিনি দাঁতে দাঁত চেপে লেগে রইলেন। তার আত্মবিশ্বাস এবং গোঁ এমন ছিল যে লণ্ডন শহরের কোথাও কোন পাব্লিক মিটিং থাকলেই তিনি সেখানে ছুটতেন। ছাব্বিশ বছর বয়সে শ কার্ল মার্কস এর Das kapital পড়ে চমৎকৃত হয় বলে উঠলেন—"—he made man of me",

হৃদয়ের অতৃপ্ত আকাঙ্খা শায়ের বেড়েই চলছিল। এখন আর সেই লাজুক ভীতু ভাবটি নেই। এখন উদ্দেশ্য ছাড়া আর কিছুই

তার সামনে নেই। পাখির ডান চোখ ছাড়া কিছুই লক্ষ্য করেন না তিনি। এবং দীর্ঘ বারো বছর শ সারা লণ্ডনের এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে পাব্লিক মিটিং গুলিতে দাপিয়ে বেড়াতে লাগলেন। কোন বক্তৃতার জন্য পয়সা নিতেন না তিনি। হয়ত যাদের জন্য বক্তৃতায় আয়োজন তাদের জন্য টুপি খুলে দান গ্রহণ করতেন কিন্তু নিজের জন্য কখনই নয়। অথচ ততদিনে শ বক্তা হিসেবে এত নাম করেছিল যে সব বক্তৃতামঞ্চ তার থেকেই ডাক আসে। ১৮৯৬ সালে তিনি যখন বিয়ে করলেন তখন বছরে ২০,০০০ পাউণ্ড রোজগার করছেন আমেরিকার একটি নাটকের প্রদর্শনী থেকে। বিয়ের ব্যাপারে শ বলতেন—আমি মিস্ শালটি, পাত্রন টাউনসেণ্ডকে বিয়ে করলাম যে কারনে সেই কারন যে কোনদিন ঘটবে ভাবতেও পারিনি—সেটি হল আমাকে আমার নিজের চাইতে অন্য কারো সম্পর্কে ভেবে ওঠা—

১৮৫৬ সালে জন্ম হলেও শ চিরকালই চিরযুবার মতন জীবন যাপন করেছেন। তিনি বলতেন—আমি আহ্লাদিত, জীবন সম্পর্কে শুধু বেঁচে থাকার জন্যই, জীবন আমার কাছে পদ্মপাতে নীড় নয় যেন বা একটি মনোহর আলোকরশ্মির মতন, যেটা এ মুহূর্তে আমার হাতে রয়েছে" - ভবিষ্যৎ বংশধরদের দিয়ে যাবার আগে আমি চাই এই টর্চের আলোটা আরও উজ্জ্বল হয়ে, উঠুক"—

জেনারেল জেমস ডুলিটল

চমক স্থষ্টি করার বিপজ্জনক নেশায় যিনি উন্মত্ত ছিলেন।
চমক স্থষ্টির বিপজ্জনক নেশাই যাঁর সফলতা এনে দিয়েছিল।

জাপানিরা যেবার পার্ল হারবার আক্রমন করেছিল, সেই সময়ে জিম ডুলিটল এয়ার ফোর্সের মেজর পার্ল হারবার আক্রমনের খবর শুনেই তিনি বন্ধুদের বলেছিলেন—দেখো খুব শিগ্‌গিরই টোকিওতে এক বস্তা বোমা ফেলে আসব আমি।

কথাটা ফলেছিল তার। মাস চারেকের মধ্যেই ডুলিটল জাপানে জাপানের ২১০০ বছরের ইতিহাসে যখন বোমা ফেলে এল। ধ্বংস হয়ে গেল স্থর্যের দেশের দুটি অঙ্গ। ধ্বংস হয়ে গেল বিমান কারখানা, যুদ্ধজাহাজ, ভয়ে আতংকিত হয়ে পড়েছিল জাপানী সরকার। ডুলিটল প্রোমোশন পেয়ে ব্রিগেডিয়ার-জেনারেল হলেন, উত্তর আমেরিকায় বিমান বাহিনী পরিচালনার দায়িত্ব পড়ল তার উপর। সিসিলিতে পদাতিক বাহিনী নামার সময়ে এবং ইটালীকে আত্মসমর্পন করতে বাধ্য করেছিল তার বিমান বাহিনী।

চমৎকার মানুষটি ছিলেন ডুলিটল। তার সম্পর্কে সবচাইতে মজার যে ঘটনাটি "চিলি"তে (দক্ষিন আফ্রিকা) ঘটেছিল সেটা বলি। উত্তর আমেরিকা এবং ইয়োরপের কিছু বৈমানিক একটি হোটেলে আমোদ—স্ফূর্তি করছিল। সকলেই কিছু না কিছু কৃতিত্ব প্রদর্শন করছিল। জিমি লাফ দিয়ে জানলার আলসেতে উঠে গেল দোতলা পর্যন্ত, তারপর আলসের উপরে ভর রেখে সমান্তরাল ভাবে শরীরটা রাস্তার দিকে বাড়িয়ে ধরল। এখন সেই হোটেলটির পুরনো আমলের কাঠ ছিল নরম। হঠাৎ সেই কাঠটা গেল ভেঙ্গে। জিমি জানলার কোনাটা কোনমতে ধরে ঝুলতে লাগল পঁচিশ ফুট ওপরে।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই হাত ভর সহ্য করতে না পেরে ছেড়ে দিল এবং জিমি পঁচিশ ফুট নীচে পড়ে ভাঙ্গল তার পা দুটো। ওরকম পরিস্থিতিতে আমি নিজে বাঁচাও-বাঁচাও বলে চীৎকার করে তুলকালাম লাগিয়ে দিতাম। পরবর্তী কালে জিমির স্ত্রীকে প্রশ্ন করেছিলাম-কেন জিমি সেদিন চীৎকার করে ওঠে নি। জিমির স্ত্রী আমাকে উত্তর দিয়েছিল—"জিমি সাহায্য চাওয়ার চাইতে বরং মরেই যাবে"
চিলিতে ডুলিটলের কাজ ছিল ইয়োরোপিয়ান প্লেনের বদলে আমেরিকান প্লেনের বিক্রী বাড়ানো। চিলির প্রেসিডেন্টের সামনে সবদেশের বৈমানিকদেরই প্লেন চালিয়ে দেখাতে হতো। কেউ আশা করেনি যে জিমি প্রতিযোগীতায় অংশ নিতে পারবে, কারণ তখন জিমির দুই পায়ে প্লাষ্টার লাগানো। কিন্তু জিমি সবাইকে বোকা বানিয়ে প্রতিযোগিতার আসরে উপস্থিত হলেন। একটা হাক্-স্ ব্লেড দিয়ে জিমি প্লাস্টার কেটে কেটে আবার ফিরে এল তার প্লেন চালিয়ে সবাই কে তাক্ লাগিয়ে দিয়ে। প্লেনের অর্ডার ঠিকই পেয়ে গেলেন তিনি, শুধু তাই নয় প্লেনগুলি বিক্রীর বন্দোবস্তও করেছিলেন। নেমে আসার পরে ডাক্তাররা ভয়ংকর বিরক্ত হয়ে আবার প্লাস্টার করে দিতে অস্বীকার করে। জিমি তখন নিজেই পোশাকের ভেতর থেকে লোহার পাত বের করে পায়ে বেঁধে নিলেন। এবং একটুও দেরী না করে আবারও প্লেনে চড়ে বলিভিয়ার দিকে রওনা দিলেন,, প্রায় পনেরশো মাইল দুরত্বের পাড়ি। উদ্দেশ্য, যাতে বলিভিয়া সরকারকে প্লেন বিক্রী করতে পারেন। বলিভিয়া সরকার এই অপরিচিত লোকটিকে পছন্দ না হওয়ায় স্পাই ভেবে বসে আছে। ফলে যখন জিমি দেখল যে নেমে পড়লে বাঁচার কোন রাস্তা থাকছে না। তখন তিনি আর প্লেন না নামিয়েই আবারও পনেরোশো মাইল চালিয়ে চিলিতে ফিরে আসেন। এই এতটা পথ তিনি প্লেন কিন্তু চালিয়েছিলেন ভাঙা দুপা নিয়ে।

বৈমানিক হিসেবে জিমি ডুলিট্ল এর পাঁচটি রেকর্ড রয়েছে।

২। তিনিই প্রথম-যিনি বিপজ্জনক "Outside loop" এ বিমান উড়িয়েছিলেন। স্থানটি এত বিপজ্জনক যে সবাই ভাবত যে চেষ্টা করবে সেই মারা যাবে। জিমি অবশ্য মারা যায় নি, কিন্তু হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল বেশ কয়েকদিন।

৩। তিনিই প্রথম প্রমাণ করেছিলেন যে যন্ত্রপাতির ওপর নির্ভর করে সমস্ত ওড়াটাই সফল করা যায়। চোখ খুলে কিছু দেখার দরকার নেই।

৪। তিনিই প্রথম যিনি ঘণ্টায় ৩০০ মাইলের বেশী স্পীডে প্লেন চালিয়েছিলেন রানওয়েতে।

৫। তিনিই জাপানে প্রথম বোমা বর্ষণ করেছিলেন।

জিমির চরিত্রের যে গুণটি খুবই মজার সেটি হল কখনই অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপাতে চেষ্টা করতেন না তিনি। নিজের দোষে একটা প্লেন ভেঙে পড়লে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন।—ভুলভাবে পাইলটিং-এর জন্যই দুর্ঘটনা ঘটেছে।

কোন প্রতিবেদন লেখার সময়ে খুবই সহজ এবং সংক্ষিপ্তভাবে লিখতেন তিনি। তার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করে জানা গিয়েছিল যে—"আমি জিমিকে কোনদিন কোন ব্যাপারেই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হতে দেখিনি—ভয় পেতেও দেখিনি কখনও"।

এই যে সাহস এবং স্থৈর্য তার সবটাই কিন্তু তিনি পেয়েছিলেন—জ্ঞান—পাণ্ডিত্য এবং অভিজ্ঞতা থেকে।

১। তিনিই প্রথম-যিনি একদিনে আমেরিকা মহাদেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে উড়ে গিয়েছিলেন।

মাদাম কুরি

পৃথিবীর সবচাইতে বিখ্যাত মহিলা বৈজ্ঞানিক একসময়ে চেয়ারের তলায় ঘুমোতেন শুধু শরীর গরম রাখার জন্য।

মাত্র দু-চারজন মহিলা যাদের নাম হাজার বছরের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে মাদাম কুরি তাদের মধ্যে অন্যতম। ভীরু স্বভাবের. অপ্রতিভ পোলিস মে.য়টি যা আবিষ্কার করেছিল বৈজ্ঞানিকরা সেটাকে প্রায় অসম্ভব বলেই ভেবে বসেছিল। নতুন একটি 'c'ement", বৈজ্ঞানিক অভিধানে সম্পূর্ণ নতুন একটি জিনিষ যা থেকে অফুরন্ত শক্তি বিচ্ছুরিত হয়ে থাকে তিনি সেটার নাম দিয়েছিলেন—"রেডিয়াম"। পৃথিবীতে রেডিয়ামের সবচাইতে বহুল ব্যবহার হচ্ছে ক্যানসারের চি ৎসায়। অসংখ্য ক্যানসারের রুগী হয়ত চিরকালের জন্য সেরে উঠেছে রেডিয়ামের সাহায্যে, অথবা রোগের যন্ত্রনা কমাতে পেরেছেন এবং বেঁচে থাকার সময়টা বাড়াতে পেরেছেন। ভবিষ্যতের বৈজ্ঞানিক মাদাম কুরি ছাত্রী অবস্থায় অত্যন্ত দারিদ্রের মধ্যে জীবন কাটিয়েছেন। প্যারিস ইউনিভার্সিটিতে ফিজিক্স এবং অংক পড়ার সময়ে ক্ষিধের চোটে অজ্ঞান হয়ে যেতেন অনেকবার। সেইসব সময়ে তিনি যদি জানতেন যে আর বছর পঞ্চাশেক পরে একটি সিনেমা কোম্পানি তার জীবনী চলচ্চিত্রে রূপ দিতে গিয়ে দুশো হাজার পাউণ্ড খরচ করবে। সেইসব সময়ে তিনি যদি জানতেন যে তিনিই একমাত্র বৈজ্ঞানিক যিনি দু-দুবার পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান 'নোবেল পুরস্কার' পাবেন। ১৯০৩ সালে প্রথমবার পদার্থ বিদ্যায় অতুলনীয় গবেষনার নতুন কাজের জন্য এবং দ্বিতীয়বার ১৯১১ সালে রসায়নবিদ্যায় অতুলনীয় গবেষনার জন্য।

অথচ তার এই সব সাফল্য জীবনে হয়ত নাও আসতে পারত যদি না খুব ছেলেবেলায় তার দেশ পোলাণ্ডে ধনী একটি পরিবারের কাছে তিনি অপমানিত হতেন।—কি হয়েছিল সেদিন।

মাদাম কুরির যখন উনিশ বছর বয়স, তখন পোলাণ্ডের একটি ধনী পরিবার তাদের দশ বছর বয়সের মেয়েটিকে দেখাশুনা করার জন্য মাদাম কুরিকে কাজে বহাল করেছিল। মেয়েটিকে পড়াশোনা করানোর দায়িত্বও ছিল মাদাম কুরির। বাড়ির বড় ছেলেটি যখন ছুটিতে হোস্টেল থেকে বাড়িতে এল তখন সে নতুন এই গভর্নেসের সঙ্গে (মাদাম কুরি) দহরম মহরম করতে চাইল। মাদাম কুরির চেহারা দেখে মুগ্ধ হয়েছিল সে। মুগ্ধ হয়েছিল তার চমৎকার ব্যবহারে, কবিতা শুনে, সুন্দর কথার জন্য। ছেলেটি তার প্রেমে পড়ে গেল অচিরেই। কিন্তু ছেলেটির মা রেগে আগুন হয়ে গেলেন সব শুনে। বাবাও রাগে চীৎকার চেঁচামেচি শুরু করে দিল। বলে কি তাদের ছেলে, বংশ গোত্রহীন, কপর্দকহীন একটি মেয়েকে বিয়ে করবে. যে মেয়েকে অন্য বাড়িতে কাজ করতে হয় খাওয়া পড়ার জন্য। মাদাম কুরি এই ঘটনায় বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। ব্যাপারটা তাকে এতটা ব্যথিত করেছিল যে তিনি জীবনে আর বিয়েই করবেন না এবং প্যারিসে পড়াশুনার মধ্যেই কাটিয়ে দেবেন এরকম একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন।

১৮৯১ সালে এই পোলিস মেয়েটি 'মানিয়া ক্লোদোয়াস্কা' প্যারিস বিশ্ববিত্মালয়ে এলেন পড়াশুনা করতে। ভীরু লাজুক প্রকৃতির গ্রামের মেয়ে একটি। বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতেন না তিনি, পাছে পড়াশুনার ক্ষতি হয়। দিনের প্রত্যেক মুহূর্তে তিনি ব্যবহার করতে চাইতেন। বাড়িতে কাজ করার সময় যে দুচার টাকা তিনি জমিয়েছিলেন সেই টাকার মধ্যেই তাকে চালাতে হত। ঠাণ্ডা আলোবাতাসহীন একটা ঘরে তিনি থাকতেন। সবচেয়ে বিপজ্জনক হল সেই ঘর গরম রাখার ব্যবস্থা ছিল না। মাসে দু বস্তা কয়লা

কেনারই মাত্র ক্ষমতা ছিল তার। বিদ্যুৎ ছিল না। গ্যাস ছিল না, সুযোগ সুবিধা পাওয়ার মতন কিছুই ছিল না।

কয়লা বাঁচানোর জন্য অনেক সময় শীতকালের রাত্রেও তিনি আগুন জ্বালাতেন না। শীতে ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে তিনি দুরুহ সব অংকের হিসেব মেলাতে বসতেন। তারপর গভীর রাত্রিতে শুতে যাওয়ার সময়ে তিনি ট্রাংক খুলে যাবতীয় জামাকাপড় বিছানার ওপর বিছিয়ে দিতেন, কোন সময় একটি চেয়ার টেনে নিয়ে বিছানার ওপর রাখতেন। যদি অন্তত তাতেও একটু শীত মানে। এইভাবে কাঁপতে কাঁপতে শুয়ে থাকতেন তিনি। অল্প খাবারের আয়োজন ছিল তার। যতটুকু থাকত তাও তিনি রান্না করতে চাইতেন না। পাছে পড়াশুনা থেকে সেই সময়টুকু নষ্ট করতে হয়। অনেক সময়ে ক্লান্তিতে, ক্ষুধায়, অনিদ্রায় তিনি অজ্ঞান হয়ে যেতেন।

যাই হোক প্যারিসে আসার বছর তিনেকের মধ্যে তিনি পিয়ের কুরি নামে একজন বৈজ্ঞানিককে বিয়ে করেন। যেদিন তাদের বিয়ে হয় সেদিন তাদের পার্থিব সম্পত্তির মধ্যে ছিল দুটো সাইকেল। সেই সাইকেল করে তারা হনিমুন করতে বেরিয়ে পড়েন গ্রামের দিকে। শুকনো রুটি, কিছু চিজ বা ফল খেয়েই তাদের হনিমুন করতে হয়। রাত হলে কোন গাঁয়ের সরাইখানায় আশ্রয় নিতেন তারা, যেখানে হালকা আলোয় রঙ চটে যাওয়া ওয়ালপেপারের ওপরে তাদের ছায়া শরীর আলপনা এঁকে দেয়।

বছর তিনেক পরে মাদাম কুরি তার ডক্টরেটের জন্য থিসিস রচনায় হাত দেন। তার বিষয় ছিল সদ্য আবিষ্কৃত একটি ধাতু-'ইউরেনিয়াম' থেকে সবসময় আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে কেন। অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা পরে তিনি বললেন যে এই আলো নতুন কোন "element" এর থেকেই বিচ্ছুরিত হচ্ছে। এরকম সময়ে নিজের গবেষনার বিষয়টি মূলতুবি রেখে পিয়ের কুরি মাদাম কুরির সেই বিস্ময়কর নতুন "element" টি খুঁজে বের করার কাজে লেগে

পড়েন। মাস চারেকের মধ্যেই সমস্ত বিজ্ঞান জগতকে স্তম্ভিত করল তাদের একটি ঘোষণা। এই ঘোষনাতে কুরিদম্পতি বললেন যে সম্ভবতঃ তারা একটি নতুন ধাতুর আবিষ্কার করেছেন। যে ধাতুটি থেকেই ওই আলো ক্রমাগত বিচ্ছুরিত হয়ে চলেছে। ওরা ধাতুটির নাম রাখলেন 'রেডিয়াম'।

পরবর্তীকালে কুরি দম্পতিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল,—যে তারা বড়লোক হবেন কি না। ততদিনে জানা গিয়েছিল যে ক্যানসারের চিকিৎসায় রেডিয়ামের ব্যবহার অপরিহার্য্য। এই সময় একটা প্রস্তাব এল, কুরি দম্পতি ছাড়া রেডিয়াম বের করার নিয়ম অন্য কেউ জানে না। এবং রেডিয়াম যেহেতু বানিজ্যিক ভিত্তিতেই তৈরী করা হবে সেইহেতু know how দিয়ে একটা রয়ালিটির বন্দোবস্ত রাখলে কুরী পরিবার সারা জীবনের মত নিশ্চিন্ত থাকার নিরাপত্তা পেতে পারতেন। কিন্তু তারা এই প্রস্তাবে রাজী হন নি। বৈজ্ঞানিক সাফল্যের পরিবর্তে একটি পয়সাও নিতে চান নি মাদাম কুরি। তিনি বলেছিলেন—"অসম্ভব" —বৈজ্ঞানিক গবেষণার পরিপন্থী হয়ে যাবে ব্যাপারটা। তাছাড়া রেডিয়াম ত ব্যবহার করা হবে চিকিৎসার জন্য। সে ব্যবস্থায় আর্থিক সুবিধা কি করে নেওয়া যায়।"

সুতরাং প্রায় যীশুখৃষ্টের মতন নিরাসক্তভাবে, নিজের কোলে ঝোল টানার বদলে তিনি বেছে নিয়েছিলেন ধনদৌলত এবং তুলনামূলকভাবে দারিদ্র্যের মধ্যে দারিদ্র্য—স্বচ্ছন্দপূর্ণ অলস জীবন এবং সেবামূলক জীবনের মধ্যে সেবামূলক জীবন।

মার্ক টোয়েন

তিনি নতুন একটা জিনিষ—টেলিফোন শিল্পে অর্থ লগ্নী করতে রাজী হন নি।

তিনি ছিলেন এমন একজন ঐতিহাসিক চরিত্র যে হলিউডের সিনেমাওয়ালারা তার জীবনী নিয়ে ছবি করার জন্য ৪০০,০০০ পাউণ্ড খরচ করেছিল। তার সময়ে পৃথিবীর সবচাইতে স্রষ্টা পুরুষ হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছিলেন তিনি। বলা বাহুল্য তার সেই খ্যাতি দেশকাল ভূগোলের সীমারেখা অতিক্রম করেছিল অনায়াসে। বিশেষতঃ তার পরিহাস এবং ব্যঙ্গমুখর সাহিত্য-কীর্তির ক্ষুরধারা।

তার সারা জীবনের শিক্ষায়তনে পড়াশুনার ইতিহাসটি মাত্র বারো বছর বয়স পর্যন্ত। দূরে গ্রামের একটি কাঠের দরমা ঘেরা স্কুলে তিনি পড়াশুনা করেছিলেন বছর বারো বয়স পর্যন্ত। তারপর শিক্ষায়তনের সঙ্গে ছাত্রের সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়েছিলেন বটে কৈশোরের সোনালি দিনগুলিতে, কিন্তু পরবর্তীকালে অক্সফোর্ড এবং ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় তাকে সম্মানিত করেছিল হরেক রকমের ভারী ভারী ডিগ্রী এবং ডিপ্লোমা দিয়ে। এবং সেই বারো বছরের কিশোরটি যে চোখের জল লুকিয়ে ইস্কুলের বেড়া ডিঙিয়েছিল একদিন, তার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকত পৃথিবীর বিখ্যাত জ্ঞানী গুণী এবং বরেণ্য ব্যক্তিরা। শুধু বই লিখেই কোটি টাকা রোজগার করেছিলেন তিনি। এবং এই লিখে অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্রে মার্ক টোয়েন সম্ভবতঃ রেকর্ড সৃষ্টি করেছিলেন। সম্ভবত লিখে এত টাকা আজ অবধি কেউ রোজগার করতে পারেন নি। দীর্ঘকাল আগে চির শান্তির কোলে ঢলে পড়েও তার উত্তরাধিকার যাঁরা তারা আজ অবধি ক্রমাগত অর্থের যোগান পেয়েই চলেছে।

কখনও তার বইয়ের প্রকাশনার জন্য কখনও সিনেমার জন্য, কখনও টি ভি বা রেডিওতে প্রচারের জন্য।

এই লেখক, স্বনামধন্য মার্ক টোয়েনের আসল নামটি ছিল স্যামুয়েল ল্যাংগহর্ন ক্লিমেন্স।

মার্ক টোয়েনের সারা জীবন একটি বেপরোয়া, বোহমিয়ান, রোমাঞ্চকর জীবন। আজ থেকে প্রায় ১৪৬ বছর আগে জন্মেছিলেন তিনি আমেরিকার ঘটনাবহুল ঐতিহাসিক সময়ের পটভূমিতে। মিসিসিপি নদীর অদূরে মিসৌরী গ্রামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম রেল লাইন পাতার মাত্র সাত বছর পরে তিনি জন্মেছিলেন, যখন পর্যন্ত এ্যাবি লিংকন খালি পায়ে খামারে কাজ দেখাশুনা করে বেড়াচ্ছে, জমি চাষ করছে, একপাল ষাঁড়ের কাঁধে জোতা কাঠের লাঙল ঠেলে ঠেলে। দীর্ঘ ৭৫ বছর সুখী জীবন যাপন করে ১৯১০ সালে কনেকটিকাট স্থানে তিনি দেহরক্ষা করেন। সারা জীবনে গোটা পঁচিশেক মাত্র বই তিনি লিখেছিলেন, যার বেশীর ভাগই লোক আজ ভুলে যেতে বসেছে। কিন্তু দুটো বই—হাক্‌লবেরী ফিন, এবং টম সইয়ারের সম্ভবত জুড়ি নেই। যুগযুগ ধরে যতদিন পৃথিবীতে যুবক যুবতী থাকবে ততদিন পর্যন্ত এই বইদুটো বিশ্বের সাহিত্য জগতে উজ্জ্বল হয়ে আলো দান করবেই করবে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই লেখা তার এই বইদুটো। ঠিক লেখা বললে ভুল হবে। ভাল হয় যে তার মধ্যে এ লেখা দুটোর বিস্ফোরণ ঘটে গিয়েছিল। মার্ক টোয়েন ফ্লোরিডার যে দুই ঘরের বাড়িটিতে থাকতেন সেরকম কোন ঘরে আজকের দিনের কোন খামারের মালিক তার মুরগী কিংবা গরুগুলোকেও রাখতে চাইবে না। সেই দুকামরা বাড়িতে থাকতেন আটজন লোক। পরিবারের সাতজন তারা আর ক্রীতদাসী একজন। ছেলেবেলায় খুবই খারাপ স্বাস্থ্য ছিল তার। এমন খারাপ যে সবাই ভেবেছিল প্রথম শীতটাই বুঝি আর কাটবে না। স্কুল ভাল লাগত না তার। স্কুল পালিয়ে মিসিসিপির ধারে নির্জন

জনমানবশূন্য একটি রহস্যময় জগতে বিচরণ করতে ভালবাসতেন তিনি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওই নদীর ধারে বসে থাকতে ক্লান্তি থাকত না তার। তার এই স্বভাবের জন্য একবার নদীর জলে ডুবে মরার হাত থেকে কোনক্রমে বেঁচে গিয়েছিলেন। পরিহাস এবং মজার গল্প বলার রকমটি মার্ক টোয়েন পেয়েছিলেন তার মার কাছ থেকে।

স্কুল অপছন্দ করতেন মার্ক টোয়েন খুব বেশী। দূরে মিসিসিপির তীরের গাছপালা তাকে হাত নেড়ে নেড়ে যখন ডাকছে তখন চার দেয়ালের মধ্যে আটকে থাকতে যথেষ্ট আপত্তি ছিল তার। সবসময়ে পালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে হয় তার, সে সুযোগ এসে গেল তার বারো বছর বয়সে—পিতা মারা গেল।

চিরকালের জন্য বাবা মারা গেছেন, শত ডাকলেও একবারও আসবেন না। এটা চিন্তা করে খুবই কষ্ট পাচ্ছিলেন তিনি, সে যাই হোক মার আগ্রহ এড়াতে না পেরে তিনি ছাপাখানায় কাজ শেখার শিক্ষানবিশী নিলেন, দুবছরের জন্য। কোন মায়না কড়ির বালাই নেই। শুধু খাওয়া পড়ার বিনিময়ে কাজ করার ব্যবস্থা। দুবছর পরে প্রিণ্টার হয়ে বেরোলেন। এবং ঠিক সেই সময়টিতে একটি অত্যাশ্চর্য ঘটনা তার জীবনে ঘটে গেল। একদিন রাস্তায় দাঁড়িয়ে উড়ে যাওয়া একটি পাতা তুলেছিলেন তিনি। কোন একটা বইয়ের ছেঁড়া পাতা।

ছোট্ট ঘটনা। কিন্তু যত সামান্যই হোক না কেন এই একটি ঘটনাই তার জীবনে বিস্ফোরণ এনে দিল। সেই ছেঁড়া পাতাটি ছিল জোয়ান অব আর্ক এর জীবনীর একটা পাতা। রুয়েন দুর্গে একাকী আটক করে রাখা হয়েছে তাকে। এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে সেই চোদ্দবছরের শিশুটির রক্তে আগুন ধরে গেল। জোয়ান অব আর্ক কে তিনি জানতেন না। কোনদিন তার নামও শোনেননি— কিন্তু বিষয়টি তাকে এত গভীরে নাড়া দিয়েছিল যে তিনি

জোয়ান অব আর্ক সম্পর্কে যেখানে যা পেতেন গোগ্রাসে গিলে নিতেন। প্রায় অর্ধেক জীবন কোন সন্দেহ নেই, তিনি জোয়ান অব আর্কের জীবনী দ্বারা তাড়িত হয়েছিলেন এবং প্রায় ৪৬ বছর পরে একটি উপন্যাস লিখেছিলেন তিনি। নাম দিয়েছিলেন —Recollection of Joan of ark। সমালোচকরা তার এই বইটিকে খুব একটা মূল্যবান বলে মনে না করলেও মার্ক টোয়েন এই বইটিকে নিজের সব বইগুলির মধ্যে অনেক উঁচু দরের লেখা বলে ভাবতেন। স্বনামে ছাপলে লোকে লেখাটি হাসির গল্প হিসেবে ধরে নেবে তাই বিষয়টির প্রতি তেমন গুরুত্ব তিনি কোনদিনই দে'ন নি। ফলে লেখাটি নিজের নামেও লিখলেন না তিনি।

মার্ক টোয়েনের যেন কিছু ব্যবসায়িক বুদ্ধি ছিল না। অদ্ভুত অদ্ভুত সব পরিকল্পনায় অর্থ বিনিয়োগ করতেন তিনি। একটি বই পড়ে তার ধারনা জন্মেছিল যে আমাজন নদীর ধার বরাবর কোকো প্লানটেশন করে কোটি টাকা রোজগার করা যায়। নিজের কোন টাকা নেই। কোকো সম্পর্কে কোন ধারনা নেই তবু তিনি রওনা হয়েছিলেন আমাজন নদীর উদ্দেশ্যে, কয়েকটা টাকা ধার করে। কিছুদূর যাওয়ার পরে টাকাও ফুরিয়ে গেল তার, ফিরে আসতে বাধ্য হলেন তিনি।

পরবর্তী কালে তিনি বই প্রকাশের ফলে হাজার হাজার পাউণ্ড রোজগার করতে থাকেন। কিন্তু যখনই কোন পরিকল্পনায় অর্থ বিনিয়োগ করতে যেতেন সেটা ব্যর্থ হত। প্রকাশনা ব্যবসায় গিয়ে ৩২০০০ পাউণ্ড ক্ষতি স্বীকার করেছিলেন তিনি, টাইপ সেটের ব্যবসায় ৪০,০০০ পাউণ্ড খোয়ালেন। তারপর একদিন আলেকজাণ্ডার গ্রাহাম বেল বলে একটি ছেলের সংগে তার পরিচয় হল। ছেলেটি দাবী করছিল যে একটি নতুন যন্ত্র সে আবিষ্কার করেছে যার নাম টেলিফোন —যেটা ব্যবহার করলে একটা জায়গায় থেকে অনেক দূরের কোন

জায়গার সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব—কথা বলা এবং শোনা। মাত্র ১০০ পাউণ্ড বিনিয়োগ করার অনুরোধ তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এই বলে যে—আমি বোকা হতে পারি কিন্তু পাগল নই—তারের মধ্য দিয়ে কথা বলা—হাস্যকর কল্পনা—

১৮৯৩ সালে আটান্ন বছর বয়সে মার্ক টোয়েন ভয়ংকর ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। আমেরিকার অর্থনীতিতে সেই সময়ে টালমাটাল অবস্থা চলছে। এবং সেই সঙ্গে অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়লেন তিনি। অবশ্য নিজেকে দেউলিয়া বলে দিলেই তাকে আর অন্য কোন চিন্তা করতে হোত না। ঋণের টাকা নিয়ে মাথা ঘামাতে হোত না একেবারেই। কিন্তু সেটা তিনি করতে রাজী হন নি। বরং তিনি বলেছিলেন যে যারা তার কাছে টাকা পান তাদের প্রত্যেককে পাইপয়সা পর্যন্ত মিটিয়ে দেবেন। কিন্তু কিভাবে দেবেন—লিখে এবং সারা পৃথিবী জুড়ে বক্তৃতা দিয়ে যে অর্থ উপার্জন করেন তিনি তাই থেকেই ঋণ শোধ করার কথা ভেবেছিলেন তিনি। তাই অত্যন্ত অসুস্থ থাকা সত্বেও তিনি পাঁচ বছরের একটি বক্তৃতা দেবার প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। তার এই বক্তৃতার আয়োজন অস্বাভাবিক জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। যে বাড়িতেই তার বক্তৃতা দেবার কথা সেই বাড়িতে তিল ধারনের স্থান সঙ্কুলান করা ছিল অসম্ভব ব্যাপার। ঋনের সব টাকা শোধ হয়ে যাবার পরে তিনি লিখেছিলেন—আমার মনে অফুরন্ত শান্তি এখন—দায়িত্বের ভার আর চেপে বসে নেই। কাজ এখন তাই আনন্দময়—শুধুমাত্র খাটুনিই যে কেবল তা নয়।

ব্যবসাতে বারবার ব্যর্থতা থাকলেও প্রেমের ক্ষেত্রে মার্ক টোয়েন খুবই ভাগ্যবান ছিলেন সন্দেহ নেই। মহিলাটিকে দেখার আগেই তার ছবি দেখেই ভাল লেগে যায় তাঁর। একটা নৌকো করে যেতে যেতেই ঘটে যায় ঘটনাটি। একদিন মার্ক টোয়েন তাঁর তরুন বন্ধু চার্লস ল্যাংডন এর সঙ্গে দেখা করতে তার কেবিনে যান। সেখানে

চার্লস এর বোন অলিভিয়া ল্যাংগডনের ছবিটি তিনি দেখেন। দেখা মাত্রই তার মনে হল হ্যাঁ, এই সেই নারী যাকে তিনি খুঁজছেন বিয়ে করার জন্য। কয়েক মাস পরে নিউ ইয়র্কের একটি পার্টিতে মেয়েটির সঙ্গে তার পরিচয় হয়। জীবনের শেষদিকে তিনি এ সম্পর্কে লিখেছিলেন—তার সঙ্গে দেখা হওয়ার দিন থেকে আজ অবধি সে কখনও আমার মনের বাইরে চলে যায় নি। পরিচয় হাওয়ার পরেই মার্ক টোয়েনকে ল্যাংগডন পরিবার নিমন্ত্রণ করে বাড়িতে আসতে।

চলে যাওয়ার সময় হলেও মার্কের চলে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল না মোটেই। ল্যাংগডনদের কোচম্যানের সঙ্গে তিনি গোপনে পরামর্শ করে ঠিক করলেন যে বিদায় নেবার পরে গাড়িতে উঠে বসামাত্র হুড়মুড় করে গাড়িটি ভেঙে তিনি রাস্তার ওপরে পড়ে যাবেন।

যা যা ভাবা হয়েছিল সবই করা হল, ঠিকমতন বিদায় সম্ভাষণ করলেন তিনি। গাড়িতে উঠে বসলেন, কোচম্যান চাবুক হাঁকড়ালো। ব্যস, গাড়ি ভেঙে মার্ক টোয়েন রাস্তায়। ধরাধরি করে তাকে বাড়িতে নিয়ে আসা হল। দুসপ্তাহ ধরে প্রেমিকার শুশ্রূষা সুস্থ করে তুলল তাকে। আসলে তার গায়ে আঁচড়টিও লাগে নি। এই ব্যাপারটা একটা পুরোন চালাকির খেলা, যেটা মার্ক টোয়েন জানতেন তার ছেলেবেলাতেই।

মার্ক টোয়েনের স্ত্রী তার যাবতীয় পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা করে দিতেন। রাত্রিবেলা মার্ক তার সারা দিনের লেখা স্ত্রীর শিয়রে রাখা একটি স্টাণ্ডের উপর রেখে দিতেন, যাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগেই তিনি পড়ে ফেলতে পারেন। আপত্তিকর শব্দ কেটেকুটে ঠিকঠাক করে দিতেন তিনি। তিনি যাই কাটাকুটি করতেন তা নির্দ্বিধায় মেনে নিতেন মার্ক টোয়েন।

পাণ্ডুলিপি হারিয়ে যাওয়ার ভীষণ ভয় ছিল তার। সেই ভয়ে কাউকে ঘর ঝাঁট পর্যন্ত দিতে দিতেন না তিনি। মেঝেতে চকখড়ি

দিয়ে একটা লাইন টানা থাকত যার ভেতরে চাকরদের ঢোকা বারণ ছিল।

হ্যালীর ধূমকেতু মার্ক টোয়েনের জন্মদিনে আবির্ভূত হয়েছিল। প্রতি ৭৬ বছর পরপর এই ধূমকেতুটির আসার কথা। মার্কের ইচ্ছা ছিল বেঁচে থাকেন ততদিন। বেঁচেও ছিলেন। তার মৃত্যুর আকাশে জ্বলজ্বল করছিল ধূমকেতুটি। শেষ ইচ্ছায় গান শুনতে শুনতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি।

উইন স্টান চার্চিল

অংক ভয়ংকর অপছন্দ করতেন তিনি, অথচ সবাই তাকে অর্থমন্ত্রীর পদটি নিতে বলেছিল।

ক্রমশঃ একটা ধারনা আমার স্পষ্ট হচ্ছে যে ছোট ছোট ঘটনা ঘটার সময়ে গুরুত্বহীন বলে প্রতীয়মান হলেও সেই সব অত্যন্ত ছোট ঘটনাও ইতিহাসের পটপরিবর্তনের ক্ষেত্রেও কেমন যেন অস্বাভাবিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। যেমন ধরা যাক্ গৃহযুদ্ধের বছর চারেক আগে ওয়াল স্টিটের ফাটকা বাজারে লিওনার্ড জেরোমে নামে একজন হঠাৎ ২০,০০০০ পাউণ্ড লাভ করে ফেলে। লিওনার্ডের নিজের কথায় ছাড়া ঘটনাটির গুরুত্ব কারো কারো কাছে একেবারেই নেই। কিন্তু একটু খতিয়ে দেখলে হয়ত বা বোঝা যাবে যে ঘটনাটির সঙ্গে বর্তমান ইতিহাসের কোন ক্ষীণ যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিল। কারণ জেরোমে যদি ফাটকা খেলায় মোটা অংকের টাকা রোজগার না করতেন তাহলে হয়তবা উইনস্টান চার্চিলের জন্মই হত কি না সন্দেহ। তার কারণ উইনস্টান চার্চিলের মাতামহ ছিলেন লিওনার্ড জেরোমে।

সেই ফাটকাবাজারে জেতা ২০,০০০০ পাউণ্ড দিয়ে জেরোমে নিউ ইয়র্ক টাইমস্ এর শেয়ার কেনেন, আমেরিকায় প্রথম দুটো ঘোড়দৌড়ের মাঠ তৈরী করেন, সারা পৃথিবী ভ্রমণ করেন এবং বৈভবের সাফল্যচূড়ায় আরোহন করেন। তার মেয়ে জেনী জেরোমে ইংলণ্ডের লর্ড র‍্যানডল্‌ফ চার্চিলকে বিয়ে করেন। জেনী জোরোমে এবং র‍্যান্‌ডলফ চার্চিলের সন্তান উইনস্টাইন জন্ম গ্রহণ করেছিলেন ১৮৭৪ সালের ৩০ নভেম্বর ইংলণ্ডের বিখ্যাত ব্লেনহেইম প্রাসাদে।

উইনস্টান চার্চিল সেই অর্থে অর্ধেক আমেরিকান নিশ্চয়ই। কি চমৎকার ঘটনাবহুল জীবন যাপন করেছিলেন, যা অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে।

এমন আর একজনকেও মনে করা যাচ্ছে না এই সময় যি স্যার উইনস্টইান চার্চিলের মতন এমন উত্তেজনাপূর্ণ, রহস্যময়, জীবন যাপন করেছিলেন—যে জীবন ছিল আনন্দমুখর প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর সারাক্ষণ। টানা প্রায় তিরিশ বছর তিনি অসামান্য ক্ষমতা অধিকার করেছিলেন যার প্রভাব স্পষ্টই সারা ইংলণ্ডের সমাজ জীবনে পড়েছিল গভীরভাবে। ১৯১১ সালে তিনি ছিলেন বৃটিশ নৌবহরে অসামরিক কর্তাব্যক্তি, নৌবহরের গৃহীত প্রথম লর্ড। দীর্ঘ তিরিশ বছর তিনি মানুষজনের এবং সমাজ জীবনের গতি প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত করেছিলেন ক্রমাগত এবং সবসময়েই হাসিমুখে আনন্দের অভি-ব্যক্তির সঙ্গে ।

কৈশোর অবস্থাতেই চার্চিলের স্বপ্ন ছিল সৈনিক হওয়ার এবং সেই সময়ে খেলনা পুতুল নিয়ে সারাটা দিনই হয়ত কাটিয়ে দিতেন যুদ্ধের মহড়া দিতে দিতে। পরে তিনি স্যাণ্ডহার্সট মিলিটারী কলেজ থেকে গ্রাজুয়েট হলেন। ব্রিটিশ আর্মিতে পেশাদারী সৈনিকের তালিম নিলেন কয়েকবছর, এবং সেই সময় বেঙ্গল ল্যানসারদের সঙ্গে কিংবা লর্ড কিচেনারের সঙ্গে সুদান মরুভূমিতে

লড়াই চালিয়ে গেছেন। ১৯০০ সালে উইনস্টান চার্চিল বিখ্যাত হ'ন তার সাহস এবং কর্ম উন্মাদনার জন্য। বস্তুত তার সাহস এবং বেপরোয়া স্বভাব এতই বিখ্যাত ছিল যে মাত্র ২৬ বছর বয়সেই তিনি ব্রিটিশ পার্লামেন্টে নির্বাচিত হয়ে গিয়েছিলেন।

ঘটনাটি কিন্তু বড় মজার। ১৮৯৯ সালে চার্চিল দঃ আফ্রিকায় বুয়োর যুদ্ধে মর্নিং স্টারের সংবাদদাতা হিসেবে উপস্থিত হয়েছিলেন। তখন তার মাসিক বেতন ছিল ২৫০ পাউণ্ড। তখনকার দিনে এই মাহিনাটা ছিল বেশ ভালো। কিন্তু চার্চিলত যোগ্যতর লোক ছিলেন। তার কারণ বুয়োর যুদ্ধের সময়েই ব্রিটিশ সাংবাদিক হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। শুধুমাত্র যে খবর সরবরাহ তিনি করতেন তা নয়। শত্রুদের সীমানা পেরিয়ে শত্রু এলাকায় বসে তিনি খবর পাঠাতেন। এমন কি যখন বন্দী হয়ে কারাগারে বার দিন ছিলেন তখনও খবর সরবরাহের কমতি ছিল না তার। এমন কি জেল থেকে পালানোর খবরটিও সারা পৃথিবীর বেশীর ভাগ খবরের কাগজেই প্রথম খবর হিসেবে ছাপা হয়েছিল। তার পালানোটা বুয়েররা খুব একটা পছন্দ করেনি, কারণ তখন তাদের কাছে চার্চিলের মতন মূল্যবান বন্দী আর কেউই ছিল না। অনেক টাকা তার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল জীবিত অথবা মৃত অবস্থায় ধরার জন্য। বুয়োররদের হাত থেকে পালানোর পরে তাকে শত্রু পক্ষের এলাকার মধ্য দিয়ে অনেক মাইল পায়ে হেঁটে চলতে হয়েছিল কিংবা মালগাড়িতে। শোয়া ছিল যখন তখন, যত্রতত্র ছিল খাবারের ব্যবস্থা। তার মাথার ওপরে আকাশে শকুনির দল ঘুরত ফিরত সব সময়েই। মনে হোত বুঝিবা এক্ষুণি চলে যেতে পারেন।

তার পালানোর ইতিহাসটাও চমৎকার। প্রায় নিশ্বাস বন্ধ করে শুনতে হয়। তার পালানোর গল্প অবিশ্বাস্য রকমের নাটকীয়তা করে মর্নিং পোস্টে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ হতে থাকলে সারা

পৃথিবীতে হৈ চৈ পড়ে যায়। সম্ভবতঃ ১৯০০ সালের সেটাই ছিল সবচাইতে চাঞ্চল্যকর খবর। ইংলণ্ড তাকে জাতীয় বীর হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছিল। তার সেই দুঃসাহসিক এবং বেপরোয়া জীবন নিয়ে রচিত হল গান। বলা বাহুল্য অনায়াসেই তিনি ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে নির্বাচিত হয়ে গেলেন।

চার্চিলের একটি জীবনদর্শন ছিল। সারাজীবন তিনি সেই আদর্শটি পুংখানুপুংখ ভাবে পালন করে গেছেন—আদর্শটি ছিল—কখনও বিপদ থেকে পালিয়ে যেও না। ১৯২১ সালে তিনি ২৫টি বক্তৃতার জন্য আমেরিকা যান। প্রত্যেকটিবক্তৃতার জন্য তার পাওয়ার কথা ২২০ পাউণ্ড। কিন্তু স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড খবর সংগ্রহ করল যে চার্চিলের জীবনহানি করার চেষ্টা হতে পারে। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড তাকে সাবধান করে দিয়েছিল যে ব্রিটিশ কলোনীর নানান জায়গা থেকে কয়েকজন দুষ্কৃতকারী আমেরিকায় একজোট হয়েছে। এবং যেহেতু উইনস্টান চার্চিল বৃটিশ সরকারের প্রতিভূ সেইহেতু তাকে হত্যা করার চেষ্টা হতে পারে বক্তৃতা দেয়ার সময়ে—এই স্কোয়াডটিকে স্কটল্যাণ্ড ইয়াড নাম দিয়েছিল—"এ্যাসোসিয়েশন সোসাইটিজ"। কিন্তু স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের বারংবার বারণ করা সত্বেও চার্চিল তার বক্তৃতা পরিকল্পনার বিন্দুমাত্র পরিবর্তন করেন নি। যেমন ছিল তেমন ভাবেই নির্দ্ধারিত জায়গাগুলোতে বক্তৃতা দেয়া সুরু করেন। আমরিকার পশ্চিম অঞ্চলের কোন শহরে বক্তৃতা দেয়ার জন্য উপস্থিত হওয়ার পরে তিনি জানতে পারেন যে ওই 'এ্যাসোসিয়েশন সোসাইটিজ' এর কয়েকজন সভ্য তার বক্তৃতা আসরের প্রবেশ পত্র সংগ্রহ করেছে। শহরের পুলিশ কতৃপক্ষ ভয় পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে বক্তৃতা বন্ধ করার আয়োজন করতে বললেন। কিন্তু চার্চিলের ম্যানেজার—লুইস-জে-আলবার বক্তৃতা বন্ধ করতে রাজী হলেন না। চার্চিল সেসময় বলেছিলেন—তুমি ঠিকই করেছ আলবার। কারোরই উচিৎ নয় ভয়ের কাছে নতিস্বীকার করে

পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা। যদি সেটা করা হয় তাহালে বিপদও হয় দ্বিগুণ। কিন্তু যদি সাহসের সঙ্গে বিপদের মুখোমুখি দাঁড়ানো যায় তাহলে বিপদের সম্ভাবনা কিন্তু কমে যায় অর্দ্ধেক। কখনও কোনদিন কোন বিপদ থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা কোর না—কোনদিন না—

পালিয়ে যাওয়ার বদলে বরং চার্চিল বিপদের দিকেই ছুটে আসতেন অনেক সময়। যখন তাকে প্রথম লর্ড করা হল ব্রিটিশ নৌবহরের, তখন সেখানে ছিল আধ ডজন প্লেন আর আধডজন ফ্রায়ার্স। সেটা প্রায় ১৯১১ সালের কথা। উড়োজাহাজ আবিষ্কৃত হওয়ার পরে সবে আট বছর হয়েছে তখন। এবং তখন পর্যন্ত প্রত্যেকবার বিমানে আকাশে ওঠা মানেই জীবন হাতে নিয়ে ওঠা। তখন কিন্তু চার্চিল নিজে বিমান চালানোর জন্য জোর খাটাতেন। তিনি নিজের প্লেন নিজে চালাতেন। এবং দুর্ঘটনার পর দুর্ঘটনা ঘটার ফলে মাঝে মাঝেই মৃত্যুর হাত থেকে হয়তবা একচুলের জন্য রক্ষা পেতেন। সরকার তাকে বারবার প্লেন চালাতে নিষেধ করত। প্রতিবারই তিনি তা প্রত্যাখ্যান করতেন। যে রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা বিমান চালানোতে হয়ে থাকে সেইসব থেকে তিনি বঞ্চিত হতে চাইতেন না। তাছাড়া নিজে হাতে কলমে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে চাইতেন তিনি সবসময়েই। এবং সেই সময়েই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে বিমানই আধুনিক যুদ্ধ সরঞ্জামের মধ্যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনবে। ব্রিটিশ নেভীতে বিমান বহরের নির্মাণ সূত্রপাত চার্চিলের হাতেই প্রথম হয়েছিল। উইনস্টান চার্চিলের আর একটি অসাধারণ গুণ ছিল অসম্ভব গোঁ। যে ভাবে তিনি নিজেকে শিক্ষিত করে তুলেছিলেন তার উদাহরণ তিনি নিজেই। চরম একরোখা ছিল তার আচরণ। তরুণ বয়সে অবশ্য পড়াশুনায় খুব একটা ভালো ছিলেন না তিনি। নিজে তিনি ল্যাটিন, গ্রীক, অংক কিংবা ফরাসী শেখার বিরুদ্ধে ছিলেন। তার কারন চার্চিলের ধারনা ছিল সর্বপ্রথমে

ইংরেজী ভাষাটা শেখা দরকার। বিদেশী ভাষা শিখে সময় নষ্ট করার আগে বলা বাহুল্য তিনি ঠিকই ভেবেছিলেন। এবং যেহেতু তিনি অপছন্দ করতেন বিদেশী ভাষা এবং অংক, সেইহেতু প্রস্তুতি পর্বের ক্লাসে তার স্থান ছিল অনেক নীচে। মজার গল্পটা হল এই যে, যে ছেলেটি অংক দুচোক্ষে দেখতে পারতেন না। পরবর্তীকালে তাকেই দায়িত্ব নিতে হয়েছিল চ্যান্সেলর অফ্ দি এক্সচেকার এর, এবং দীর্ঘ চার বছর তাকেই সারা ইংলণ্ডের অর্থনৈতিক গুরুভার বহন করতে হয়েছিল। স্যাণ্ডহার্স্টের মিলিটারী কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্য তিনবার তিনি পরীক্ষা দিয়েছিলেন। তিনবারই পরীক্ষায় অকৃতকার্য হন। চারবারের বার অবশ্য পাশ করেছিলেন।

অতঃপর হঠাৎই এক দিন "হ্যারো" এবং "স্যাণ্ডহার্স্ট" এই দুই বিখ্যাত স্কুলের পরে যেমন অনেকেই করে থাকে তেমনিই তিনি ভাবতে সুরু করেন যে—"বস্তুত তিনি সেখানে কিছুই শেখেন নি। তখন উইনস্টান চার্চিলের বয়স পঞ্চাশ বছর। তিনি তখন ব্রিটিশ আর্মীতে ভারতবর্ষে কর্মরত। এইরকম মনে হওয়ার সংগে সংগে তিনি দৃঢ়সংকল্প করলেন যে, না :—নিজেকে শিক্ষিত করে তুলতেই হবে। মনে হওয়ার সংগে সংগে তিনি ইংলণ্ডে তার মার কাছে চিঠি লিখলেন এবং অনুরোধ করলেন কয়েকটি জীবনীপুস্তক যেন তাকে পাঠানো হয়, কিছু ইতিহাসের, দর্শনের এবং অর্থনীতির বইপত্রও। এইসব বইপত্র পাওয়ার পরই যখন অন্যান্য সঙ্গীরা চোখ বুজে বিশ্রাম নিচ্ছে তখন তিনি অক্লান্ত ভাবে বইয়ে মুখ গুঁজে পড়ে থাকতেন। অনেক বছর ধরে তিনি নিজেকে শিখিয়ে পড়িয়ে মানুষ করতে সুরু করেন। অভ্যাস করেন, শেখেন কিভাবে প্রাঞ্জলভাবে বক্তৃতা লিখতে হয়, বক্তৃতা দিতে হয় স্বাভাবিক ভাবে। তিনি ছিলেন অত্যন্ত খারাপ ধরনের ব্যর্থ একজন বক্তা, কিন্তু পরবর্তীকালে নিজেকে তিনি অদ্ভুত প্রেরণামূলক বক্তা হিসাবে সৃষ্টি করেছিলেন।

ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী যখন ছিলেন দিনে অন্তত ১৬।১৭ ঘণ্টা কাজ করতেন তিনি, সপ্তাহের সাতটা দিনই। জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত তিনি অক্লান্তভাবে, শরীরে যতটুকু পোষায় ততটুকু কাজ করে চলতেন। এইরকমেরই একটি মানসিক অবস্থার সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন, কারণ কাজ করতে করতেই তিনি বিশ্রাম করতে শিখেছিলেন। শিখেছিলেন ক্লান্ত হওয়ার আগেই কিভাবে বিশ্রাম নেয়া যায়। সকাল সাড়ে দশটার আগে বিছানা থেকে উঠতেন না তিনি। কিন্তু ওঠার আগে অন্তত তিনটি ঘণ্টা বিছানায় হেলান দিয়ে শুয়ে থাকতেন, মোটা চুরুট হুঠোঁটের ফাঁকে গুঁজে টেলিফোন করতেন, ডিকটেশন দিতেন, খবরের কাগজ পড়তেন, রিপোর্ট পড়তেন। সাড়ে দশটা বাজলে তিনি উঠে পড়তেন, দাড়ি কামাতেন। একটার সময়ে হুপুরের খাবার খেতেন তিনি। একঘণ্টা ঘুমোতেন। তারপর আবার দ্বিপ্রহরের কাজ শুরু করতেন পাঁচটার সময়ে আবার আধঘণ্টার জন্য ঘুমোতে যেতেন রাতের খাবারের পরে মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত তাঁর কাজ বেশীর ভাগ সময়েই চলতেই থাকত।

যখন ব্রিটেনের অন্যান্য অনেক রাজনৈতিক নেতারা ঘুমিয়ে রয়েছেন, অর্থাৎ আগামী যুদ্ধ সম্পর্কে কোন ধারনাই তাদের নেই, তখন কিন্তু চার্চিল হিটলারের বিপজ্জনক পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছিলেন। দীর্ঘ ছবছর ধরে ১৯৩৩ থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত তিনি প্রায় প্রত্যেকদিন চীৎকার করে বলতেন যে—"জার্মান সমরসম্ভারে সজ্জিত করছে নিজেকে। হিটলার ট্যাংক তৈরী করছে, কামান বানাচ্ছে নতুন নতুন। প্লেন আনছে অনেক। এবং ইংলণ্ডের মাটিতে বোমা ফেলাই হিটলারের উদ্দেশ্য, উদ্দেশ্য বৃটিশ নৌবহর ধ্বংস করা, এবং সঙ্গে সঙ্গে সারা পৃথিবীটা জয় করে নেয়া"। এই সব কিছুই তিনি আগে থেকেই বুঝতে পেরেছিলেন। যদি ইংলণ্ড তার এই সাবধান বানী একটু কান পেতে সেই সময় শুনত, তাহলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পাগলের প্রয়াসেই সীমাবদ্ধ থাকত, এবিষয়ে সন্দেহ নেই।

জোসেফ স্ট্যালিন

ভৃত্য, সাফ বংশোদ্ভূত হয়েও তিনি ছিলেন সোভিয়েত জাতির মহান নেতৃত্বে

আজকের দুনিয়ায় সবচেয়ে ক্ষমতাশালী, যিনি দশ কোটি লোকের শ্রদ্ধা পেয়ে থাকেন এবং এক কোটি লোকের ঘৃনা। তার পিতামাতা ছিলেন স্লেভ, সত্যি কথা বলতে কি ক্রীতদাস, যাদের জমির সংগে সংগে কেনা বেচার রেওয়াজ ছিল। কিন্তু এই ক্রীতদাস-ক্রিতদাসীর সন্তানটি সারা পৃথিবীর ছভাগ স্থলের একভাগ নিয়ন্ত্রণ করতেন, নিয়ন্ত্রণ করতেন ২০০ মিলিয়ন মানুষের ভাগ্য।

আপনার তাকে শ্রদ্ধা হতে পারে, অপছন্দও হতে পানে। কিন্তু একটা কথা নিশ্চিত যে তাকে উপেক্ষা করা যাবে না। অবশ্য আমি নিজে বুঝতে পারি না যে কিভাবে শ্রদ্ধা না করে পারা যাবে মানুষটির একটিই ধ্রুব আদর্শের জন্য, সারা জীবনের আনুগত্যবোধকে দেখেও। যে আদর্শ ছিল—তার দেশকে, দেশের মানুষের হাতে তুলে দেয়া, আর তার দেশের মানুষকে সেই দেশ পরিচালনা করার যোগ্য তৈরী করা, এবং এই দুটি কাজ চরম আত্মতৃপ্তি এবং আনন্দ উপভোগ করা।

মানুষটির নাম ছিল স্টালিন—জোসেফ স্টালিন। এটা তার আসল নাম.নয়। তার আসল নাম ছিল ইওসিফ্ ভিসারিওনোভিচ্ ৎজ্জগাসভিলি।

১৮৭৯ সালে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন স্টালিন। রাশিয়ান তৈলখনি অঞ্চলের কাছাকাছি, ছোট একটি গৃহে, বদ্ধ গলির দিকে মুখ ছোট বাড়িটার ভাড়া ছিল মাসে দু গেনী। জর্জিয়াতে জন্মেছিলেন স্টালিন, কৃষ্ণসাগর এবং কাস্পিয়ান সাগরের মধ্যবর্তী

অঞ্চলে স্থিত জর্জিয়া। যদিও প্রায় ১৫৫ বছর হল জর্জিয়া রাশিয়ার অন্তর্ভূক্ত, তবুও আজও জর্জিয়ানরা তাদের নিজেদের ভাষা ব্যবহার করে থাকে। কুড়িবছর বয়স পর্যন্ত স্টালিন নিজেও জর্জিয়ান ভাষাতেই কথা বলতেন। রাশিয়ান ভাষার চাইতে আকাশ পাতাল তফাৎ ছিল জর্জিয়ান ভাষা।

আমেরিকা থেকে ক্রীতদাস প্রথা বন্ধ হওয়ায় তিনবছর আগে জার আলেকজাণ্ডার (২) রাশিয়া থেকে ক্রীতদাস তুলে দিয়েছিলেন। ১৮৭৯ সালে যখন স্টালিন জন্মগ্রহণ করেন তখন তার পিতা মাতা দুজনেই মুক্ত—সেই অর্থে অবশ্য—কারণ দৈনন্দিন জীবিকার জন্য তাদের জুতো সেলাই এর কাজ এবং জামাকাপড় কাচার কাজ করতে হত।

পাঁচশো বছর ধরে যে জারের শাসন রাশিয়াতে চলছিল সেই সাম্রাজ্যবাদের দৃঢ় দুর্গ ভেঙেচুরে কি করে স্টালিন রাশিয়ার কর্তৃত্বে নিজেকে স্থাপিত করতে পেরেছিলেন সেটা ভেবে দেখার মতন বিষয় সন্দেহ নেই। কি করেই বা ইয়োসিফ ভিসারিওনোভিচ্ জুগাসভিলি একদিন 'জোসেফ স্টালিন' হয়ে বিশ্বের বৃহৎ শক্তিবর্গের মধ্যে প্রথম সারির নেতা হয়ে উঠলেন সেটাও ভেবে দেখার বিষয়। প্রথমেই জেনে রাখা দরকার যে, তিনি ঠিক যে ধরনের শিক্ষা পেয়েছিলেন, যে শিক্ষা তাকে দারিদ্র্যের কশাঘাত-মুখর পরিবেশ থেকে নতুন দিগন্তের স্বপ্নের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করতে পেরেছিল। স্টালিনের বাবা চেয়েছিলেন স্টালিন বড় হয়ে জুতো তৈরীর কাজটাই ঠিকমতন করুক। কিন্তু তার মা স্বপ্ন দেখতেন নতুন জীবনের, নতুন দিগন্তের। পৃথিবীর সব মায়েরাই যেমন তাদের সন্তানদের নিয়ে স্বপ্ন দেখে থাকেন শিক্ষাদীক্ষাহীন এই মহিলাটি যিনি প্রায় দীনত্বের মধ্যে জন্মেছিলেন, চেয়েছিলেন তার ছেলে একটি সুন্দরতর জগতে প্রবেশ করুক, যে জগতের দরজা বন্ধ ছিল তাদের কাছে। তিনি মাঝে মাঝেই চার্চে গিয়ে

পাদপ্রদীপের নীচে মোমবাতি জ্বালিয়ে প্রার্থনা করতেন যেন তাদের সন্তান ইয়োসিফ একজন ভালো ধর্মপ্রচারক হয়ে উঠতে পারে ভবিষ্যতে। এই মহিলাটি একেবারেই লক্ষ্য করতেন না তার দৈনন্দিন সেলাই এবং কাপড় কাচার কাজ কতটা কঠিন হয়ে উঠছে, কতটা আয়ু কেড়ে নিচ্ছে তাঁর। সারাক্ষণ তার মনে হত তিনি একটি বিশেষ কারনেই কাজ করে চলেছেন। একটি মহান কর্তব্যবোধেই।

নানান রকম চেষ্টা-চরিত্তির করে স্টালিনের মা স্টালিনের জন্য একটি বৃত্তির বন্দোবস্ত করতে পেরেছিলেন। তিফ্‌লিস্ এর থিওলজিক্যাল সেমিনারিতে। বেশ কয়েকবছর স্টালিন এই সেমিনারিতে ধর্মযাজকের কাজের শিক্ষনবিশীতে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তারপর একদিন যখন তার বয়স পনেরো, একটি ঘটনা ঘটল। ঘটনাটি খুবই সামান্য। কিন্তু বলা বাহুল্য এই ঘটনাটিই পরবর্তীকালে সারা পৃথিবীকে কাঁপিয়ে তুলেছিল। স্টালিনের হাতে একটি বই এল সম্ভবতঃ পৃথিবীর তাবৎ ধর্মবিরোধী লেখার মধ্যে সর্ব্ব বৃহৎ লেখা—বইটির লেখক কার্ল মার্কস—বইটির নাম ক্যাপিটাল অর্থাৎ এ ক্রিটিক অফ পলিটিক্যাল ইকনমি।

স্টালিন বইটি পড়ে এত বেশী মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন যে সংগে সংগে তিনি কার্লমার্কস এর অনুসরণকারিদের গোপন সংগঠনে যোগ দিলেন। এত বেশী অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তিনি যে সেই মূহুর্তেই তিনি সীদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলেন যে মানুষের জন্যই মানুষের কাজেই সারা জীবন তিনি নিয়োগ করবেন। যে দারিদ্রের মধ্যে কোটি কোটি রাশিয়ান লোক ছিল দুর্বিসহ নিপীড়নের মধ্যে মুখ বুজে দিনের পর দিন বছরের পর বছর নির্বিচারে মার খাচ্ছে তাদের নিয়ে তিনি বিদ্রোহ করবেন। সেই সময়ে রাশিয়ার লোকজনদের দারিদ্রের কথা কল্পনাও করা যায় না। রুটির সংগে লবণের কথা ভাবাও স্বপ্নের মত ছিল অনেকের কাছেই। স্টালিন বিশ্বাস করতেন যে

এই অত্যাচার এবং দারিদ্র্য দূর করার একটি মাত্র রাস্তা রয়েছে এবং সেটি হচ্ছে বিপ্লবের। তার এই বৈপ্লবিক চিন্তাভাবনা কাজকর্মের জন্য যাজক সম্প্রদায়রা তাকে বহিষ্কৃত করে দিল। জীবনের পরবর্তী বছরগুলো স্টালিন অক্লান্তভাবে তার সেই আদর্শের জন্য কাজ করে গেছেন। এমন কি তাড়া খাওয়া জন্তুর মতন জীবনযাপন করতেও কোন আপত্তি ছিল না তার। দীর্ঘ সময় তার না ছিল ঘর, না ছিল শান্তির গৃহাঙ্গন। এক একটি রাত তিনি এক এক জায়গায় কাটাতেন। এবং এই আদর্শের জন্যই আটবছর তাকে কারাগারে কাটাতে হয়।

কিন্তু এই অসহ্য কষ্টের দিনগুলিতে একটি মুহূর্তের জন্যও বিচলিত হন নি। আদর্শ থেকে হননি বিচ্যুত, মনে প্রাণে তার পাটির জন্য কাজ করে গেছেন। বৈপ্লবিক বক্তৃতা দিয়েছিলেন। খবরের কাগজ বের করেছেন সেণ্ট পিটার্সবুর্গের একটি লুকোন জায়গা থেকে। স্টালিন এমন এক ধরনের চরিত্র ছিলেন যিনি আদর্শের জন্য সুখ, স্বাচ্ছন্দ, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এমনকি জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিতে কুণ্ঠা বোধ করতেন না। ১৯০৫ সালে বিপ্লবের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে লেনিন এবং ট্রট্স্কি সুইজারল্যাণ্ডে পালিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু স্টালিন যান নি। ক্রমাগত জারের পুলিস বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে গেছেন, ধরা পড়ার ঝুঁকি নিয়ে। যে ধরা পড়ার অর্থই হচ্ছে হয়ত বা দেয়ালে দাঁড় করিয়ে গুলি করে মারা।

লেনিনের নির্বাসন কালে, লেনিন নানানধরনের লেখা সিগারেটের কাগজে লিখে মদের পিপের মধ্যে লুকিয়ে রাশিয়াতে চোরা চালান করে আনা হত। স্টালিন এইসব লেখাগুলো তার গোপন কাগজটিতে ছাপাতেন। ছবার স্টালিনকে সাইবেরিয়াতে নির্বাসিত করা হয়। এর মধ্যে পাঁচবার তিনি পালিয়ে এসেছিলেন। এবং আবারও সেই একই কাজে মেতে উঠেছিলেন। কারাবাস এবং

নির্বাসনের ষষ্ঠবার তাকে সাইবেরিয়াতে এমন একটা জায়গায় পাঠানো হয়েছিল যেখানে কয়েদখানায় থাকার দরকারই নেই। যে আসামী পালিয়ে যেতে চাইবে ঠাণ্ডা এবং অনাহারে সেখানে তার মৃত্যু অবধারিত। দীর্ঘ চারবছর স্টালিন সেই জায়গায় কাটিয়ে দিলেন। দমে যাননি। আশা ছাড়েন নি? তিনি সবসময়েই বিশ্বাস করতেন যে কোন না কোন দিন ছাড়া পাবেনই। ১৯১৭ সালের বিপ্লব সফল হওয়ার পরে তাকে মুক্তি করা হয়েছিল। স্টালিন কথাটার রাশিয়ান অর্থ লোহা। সম্ভবত স্টালিনই একমাত্র নেতা যিনি বলসেভিক পার্টিকে একত্রিত করে রেখেছিলেন যারাই শেষ পর্যন্ত বিপ্লবকে সফল করে তুলেছিল।

স্টালিন দুবার বিবাহ করেছিলেন। তার প্রথম স্ত্রী ক্যাথাবিন স্বল্পশিক্ষিত একজন কমবয়সী মহিলা। তাদের একটি ছেলে ছিল। বিবাহিত জীবন তাদের ছিল অত্যন্ত করুন। স্টালিন ছিলেন বিপ্লবী সবসময়েই পুলিস তাকে খুঁজছে। কখনও লুকিয়ে গৃহে আসেন কখনও বা দীর্ঘদিন লোকচক্ষুর অন্তরালে আত্মগোপন করে বসে থাকতে হয় তাকে। বিয়ের চার বছরের মধ্যে যক্ষারোগে ক্যাথারিন মারা যান।

তারপর দীর্ঘদিন স্টালিন আর বিয়ে করেন নি। প্রায় চল্লিশ বছর পর্যন্ত। তারপর অধিক বয়সী একটি মেয়েকে তিনি বিয়ে করেন। এই বিবাহে তাদের একটি ছেলে এবং একটি মেয়ে হয়েছিল।

নানান ধরনের পোষাক পছন্দ করতেন স্টালিন। তবে নিতান্তই সাধাসিধে জীবন যাপন করতেন। যখন কেউ স্টালিনকে প্রশংসা করতেন অকল্পনীয় কাজ করেছেন বলে তখন নিজে থেকে স্টালিন উত্তর দিতেন—"না – ' তেমন কিছুই নয়, যা আমরা করতে যাচ্ছি তার তুলনায়।"

ক্লার্ক গেবল

স্বেচ্ছায় যিনি স্বর্ণসজ্জা ত্যাগ করে তৃণ সজ্জা বেছে নিয়েছিলেন।

একটা সময় ছিল যখন তিনি মেয়েদের দারুন ভয় করতেন। আর এখন মেয়েরা সারাদিন রাস্তায় অপেক্ষা করে যাকে তাকে একবার চোখে দেখার জন্য আমেরিকান সৈন্যদলে যারা কাজ করেছেন তাদের মধ্যে ক্লার্ক গেবল সম্ভবতঃ সবচেয়ে বিখ্যাত পুরুষ। মোশন পিকচার এবং অসামান্য এই ব্যক্তিপুরুষটির গুনমুগ্ধ ভক্তের সংখ্যা কোটির সংখ্যা ছাড়িয়ে গিয়েছিল পৃথিবীর এক গোলার্ধ থেকে অন্য গোলার্ধ পর্যন্ত। দক্ষিণ আমেরিকায় একবার যখন ক্লার্ক গেবল বেড়াতে গিয়েছিলেন সেখানকার মেয়েরা তাকে একবার জড়িয়ে ধরে চুম্বন করার জন্য পাগলামির চূড়ান্ত রূপ দেখিয়েছিল। টুপি, সার্টের টুকরো ছেঁড়া সংগে সুভেনির হিসেবে রাখার জন্য গুনমুগ্ধ ভক্তদের হাতে কতবার যে তাকে শতচ্ছিন্ন হতে হয়েছে তার কোন হিসেব নেই। ৪২ বছর বয়সে যখন ক্লার্ক গেবল সৈন্যদলে যোগ দেন তখন তাকে হলিউডের একটি চুক্তি অমান্য করতে হয়েছিল যে চুক্তি অনুযায়ী বছরে ৭০,০০০ পাউণ্ড তার পাওয়ার কথা, পরিবর্তে খাঁকি জামা প্যান্ট আর মাসে ১০ পাউণ্ডের বিনিময়ে তিনি সৈন্যদলে যোগ দিতে দ্বিধা করেন নি।

ব্যক্তিজীবনে ক্লার্ক গেবল অত্যন্ত সপ্রতিভ, বন্ধুবৎসল, এবং সাধাসিধে ধরনের লোক ছিলেন। বহুবার বিশিষ্ট সমাবেশে তাকে সবচেয়ে রুচিপূর্ণ পোষাক পরিহিত বলে সম্মানিত করা হয়েছিল। তার জীবন ছিল অত্যন্ত নাটকীয়তায় পূর্ণ। ১৫ বছর বয়সে তিনি একরাতে একটি লাঞ্চ কাউন্টারে এক কাপ কফি এবং স্যাণ্ডউইচ এর জন্য থেমেছিলেন, যে ঘটনাটি তার সারা জীবনটাকেই বদলে দিয়েছিল।

সেই লাঞ্চ কাউণ্টারে তিনি কয়েকজন অভিনেতার সঙ্গে পরিচিতি হন যাদের জীবনধারণ-পদ্ধতি ক্লার্ক গেবলকে চমৎকৃত করে। মাত্র কিছুদিন আগেই তিনি এই আক্রন শহরে এসে একটা কোম্পানিতে টাইম কিপারের কাজ করছিলেন। তার আগে জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই তিনি দুধ দোয়া, পাখ-পাখালিদের খাবার দেওয়া, খড় সাজানো, লাঙল দেওয়া এইসব ধরনের ভারী এবং কষ্টকর কাজ করতেই অভ্যস্ত ছিলেন ; যে কাজগুলো বলা বাহুল্য তিনি খুবই অপছন্দ করতেন। সেদিন ওইসব অভিনেতাদের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার সাথে সাথেই স্টেজের পাদপ্রদীপের আলোর নীচে কোন কাজ পেতে উদগ্রীব হয়ে পড়লেন। সে ধরনের কাজ পাওয়া ছিল অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি চাকরের একটি কাজ পেলেন থিয়েটারে। তাঁর কাজ ছিল অভিনেতাদের ড্রেসিং রুম থেকে যথাসময়ে স্টেজে এনে তোলা। এছাড়া তাঁর কাজ ছিল অভিনেতাদের ফাইফরমাস খাটা। এই কাজ তিনি বছর দুই করেছিলেন, বিনা বেতনে শুধু কাজ শেখার জন্য। নিজের ওভারকোটটি পেতে স্টেজের পিছনে কুঁকড়ে শুয়ে থাকতেন তিনি। আর অভিনেতারা ভালবেসে দিনে দুবার সঙ্গে খেয়ে যেতে বলতেন। সেইসব সময়ে সকালের প্রাতঃরাশ করার কথা ভুলতে হয়েছিল তাঁকে। পরবর্তী কালে যখন তিনি পৃথিবীবিখ্যাত হয়েছেন এবং কোটি কোটি টাকা উপার্জন করছেন তখনও তিনি দিনে দুবারের বেশী খেতেন না। সকালে প্রাতঃরাশ না খেতে পাওয়ার জন্য কোন কষ্টই হত না তাঁর। বস্তুত কোন রকমের কষ্টেই তার কাজে শেখার কাজ ব্যাহত হত না। কারণ তখন তার বয়েস পনেরো বছর। পনেরো বছরের সেই স্বপ্নময় জগত ছিল তাঁর, একটি নতুন জগতের জন্য স্বপ্ন, যে স্বপ্নটার মধ্যে ছিল স্টেজ, আলো, পেইণ্টস, হাততালি পাওয়া এবং রোমান্স। সেই সময় ওহিও-এর কোটি পতির চাইতে বেশী খুশী ছিলেন তিনি। যখন তাঁকে প্রশ্ন করা হল যে

তিনি কি সেই বিনা বেতনে কাজ শেখার সময়ের চাইতে মাসে ২০০০ পাউণ্ড রোজগার করছেন তখন বেশী খুশী ছিলেন কিনা? উত্তরে গেবল বেশ চমৎকারভাবে বলেছিলেন—"না" টাকা কিংবা যশ কোনটাই জীবনে শান্তি দিতে পারেনা।

আক্রন থিয়েটারে বছর দুই কাজ করার পরে হঠাৎ একটি দুর্ঘটনা ঘটে যায়। ক্লার্কের মা মারা যান। মায়ের মৃত্যুতে তাঁর বাবার সাজানো গৃহটিও ভেঙে যায়। এবং সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে যায় ক্লার্কের এতকালের সযত্ন লালিত ভবিষ্যতের স্বপ্নগুলি।

ক্লার্কের বাবা তাঁদের সব খামার জমিজিরেৎ বিক্রী করে দিয়ে ওক্‌লাহোমাতে তেলের খনিতে কাজ নিয়ে চলে যাওয়ার সময়ে ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইলেন। তার কারণ ইতিমধ্যেই তার বাবা অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে গেছেন ছেলেকে বিনা বেতনে শিক্ষানবিশী করতে দেখে, যখন অনেক সহজে তেলের খনিতে দৈনিক দু পাউণ্ড দশ শিলিং রোজে কাজ করতে পারত। বাবার কথার উপরে কথার প্রশ্নই নেই। ফলে আরও দুবছর ক্লার্ক সারা শরীরে ভূষো কালি মেখে ১৮ পাউণ্ড ওজনের স্লেজ হ্যামার কাঁধে নিয়ে পাঁচফুট উচু তেলের পাইপ লাইনে উঠে গ্রীজ লাগিয়ে কাজ করত।

উনিশ বছর বয়সে ক্লার্কের মন বিদ্রোহ করে উঠল। তার মনে পড়ল শৈশবের স্বপ্নিল জগতে ফিরে যাওয়ার কথা, সেই থিয়েটারের পরিবেশে। এবারে তিনি একটি ভ্রাম্যমাণ দলের সঙ্গে জুড়ে গেলেন। এখানেও কোন বেতন পেতেন না ক্লার্ক গেবল। শুধু খাওয়া-থাকার খরচ জুটত। পাওনা মিটিয়ে যদি কখনও কদাচিৎ হাতে দু চার টাকা বাঁচত তাহলে সবাই ভাগ করে নিত। অনেক দিনের মধ্যে ক্লার্ক একবার সারা সপ্তাহের রোজগার হিসেবে ন শিলিং উপার্জন করেছিলেন সেখানে। অবশেষে ১৯২২ সালে, ঝড়ে তুষারে মণ্টানার একটা জায়গায় ওরা সবাই আটকে পড়ে যায়। টাকা নেই পয়সা নেই, খাবার নেই, কেবল পাওনাদার

আছে, আছে হতাশা। পরদিন সকালে গেবল কাছাকাছি রেলওয়ে স্টেশনে গেলেন হাঁটতে হাঁটতে। বড় ক্ষুধার্ত ছিলেন তিনি, ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছিলেন, ছেঁড়া প্যাণ্ট, ছেঁড়া জুতো, পকেটে মাত্র তিনটি পেনি পড়ে রয়েছে। সেখান থেকে তিনি বাবাকে একটা টেলিগ্রামে লিখলেন যে টাকা পাঠালেই তিনি ফিরে যেতে পারেন। তারপর অনেকক্ষণ একা একা ভাবতে থাকলেন, টেলিগ্রামটা পাঠাবেন না পাঠাবেন না। সারাজীবনের স্বপ্ন এবং উচ্ছ্বাস সব কি আজ বিসর্জন দিয়ে সেই অপছন্দের কাজ মাথায় চাপিয়ে নেবেন। জীবনের এই চরম সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে নিজেকে অসহায় বোধ করছিলেন তিনি। যাই হোক গেবল-বংশের স্বাভাবিক একরোখা স্বভাবটি তাঁর মধ্যেও যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান ছিল। লেখা টেলিগ্রামটি ছিঁড়ে তিনি ভবঘুরের মতন ট্রেনে চেপে শহর পরিত্যাগ করলেন। অনেকটা আসার পরে একজন রেলের লোক তাকে ধরে লাথি মেরে নামিয়ে দেয়। পাক্কা তিনটি মাস অতঃপর তাঁকে ক্যাম্পে কাজ করতে হয়েছিল শুধুমাত্র অরিসন-এ যাওয়ার গাড়িভাড়া যোগাড় করতে। পছন্দমতন কোনও কাজ না পেয়ে টেলিফোন কোম্পানীর লাইনসম্যানের কাজে সপ্তাহে ৩ পাউণ্ড মাহিনাতে অগত্যা তিনি লেগে পড়েন। সেই কাজটিও কিন্তু আবার তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল। একদিন লিটল থিয়েটার-এর টেলিফোন সারানোর জন্য তাঁকে পাঠান হল। লাইন সারানোর ফাঁকে তাঁর সঙ্গে পরিচয় করেন ডিরেকটর জোসেফিন ডিলন। মহিলাটির কাছ থেকে অভিনয়ে শিখতে শুরু করলেন তিনি। প্রেমে পড়ে গেলেন। বিয়েও করলেন তাঁকে। কিন্তু অসম্ভব পরিশ্রম, প্রাণপণ কষ্ট করা সত্ত্বেও আরও দীর্ঘকাল তাঁকে তাঁর অভীপ্সীত স্থান থেকে সরে থাকতে হয়েছিল যতদিন না তিনি প্রথম কাজটি পেলেন, একটি গুণ্ডার ভূমিকায় অভিনয় করার জন্য। ছবিটির নাম “A free soul”। সেই সময়ে তিনি ব্রডওয়ের ছোট

ছোট অভিনয়ে অংশ নিতেন আর হলিউডের আশেপাশে ঘুরঘুর করতেন। প্রায় দুবছর ঘোরাফেরার পরে তিনি আর একটা ছবিতে কাজ পেলেন, সেই সময়ে তাঁর রোজগার ছিল এক পাউণ্ড দশ শিলিং দৈনিক। পরবর্তী কালে যখন তিনি কোটি কোটি অর্থ উপার্জন করছিলেন তখন এই সময়কার একটা ছবি তিনি নিজের বসবার ঘরে টাঙিয়ে রেখেছিলেন—সেই ছবিতে লেখা ছিল—"তোমাকে মনে করিয়ে দেবার জন্য গেবল—সেই সব কথা"—

যদিও ক্লার্ক গেবল অবিশ্বাস্য রকমের চিত্রতারকার খ্যাতি পেয়েছিলেন, পেয়েছিলেন মহিলাদের ভালবাসা; তবুও শৈশবে, কৈশোরে-এমনকি যৌবনের প্রথম দিকেও তিনি মেয়েদের নিয়ে খুব একটা সুবিধা করতে পারতেন না। যে সমস্ত ছেলেদের তিনি দেখতেন অনায়াসে মেয়েদের নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, গল্প বলছে, তাদের বস্তুত তনি হিংসাই করতেন। মেয়েদের সম্পর্কে হয়তো বা তাঁর প্রীতি ছিল কিন্তু জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে তিনি যে সাহস যে অদম্য সংগ্রামের চেহারাটা দেখিয়েছিলেন, এমনকি আমেরিকান বিমান-বাহিনীতেকাজ করার সময়ে অনায়াসে সর্বোচ্চ সম্মান পেতে তাঁর কোন অসুবিধা হয় নি। এয়ার মেডেল দেবার সময়ে লেখা হয়েছিল যে —"সাহস, ধৈর্য এবং কুশলতার জন্য ক্যাপ্টেন গেবলের স্থান সকলের কাছে আদর্শ হয়ে থাকবে"। তথাপি মেয়েদের বেলায় তাঁর এগিয়ে যাওয়ার সাহস ছিল না।

লর্ড লুই মাউণ্টব্যাটেন
রানী ভিক্টোরিয়ার প্রপৌত্র যুদ্ধক্ষেত্রে অকুতোভয় সৈনিক

ব্রিটিশ রাজের আত্মীয় এবং রানী ভিক্টোরিয়ার প্রপৌত্রের আদেশে লক্ষ লক্ষ লোক দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় যুদ্ধ করে চলেছে। বিশ্বযুদ্ধের সবচাইতে সুদর্শন উজ্জ্বল চেহারার নেতা সম্ভবতঃ তিনিই ছিলেন যার নাম মাউণ্টব্যাটেন। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার মিত্র-শক্তির পক্ষে সর্বোচ্চ সৈনাধ্যক্ষ ছিলেন তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলার সময়ে।

উইনস্টান চার্চিল তাকে সৈনাধ্যক্ষের পদে নিয়োগ করেছিলেন। বলা বাহুল্য কুইবেকএ মিত্রপক্ষের আলোচনা-সভায় চার্চিল এত গুরুত্বপূর্ণ একটি পদের জন্য সুপারিশ করার সময় নিশ্চয় মনে রাখবেন না যে তিনি কোন প্রাসাদে শৈশব কাটিয়েছেন (সত্যিই যেমন মাউণ্টব্যাটেন কাটিয়েছিলেন) কিংবা খরগোশ ধরতে পছন্দ করেন কিনা—যেমন আইসেনহাওয়ার করতেন।

এটা ঠিকই যে জীবনে এমন কিছু বড় বড় যুদ্ধে জয়লাভ করেছিলেন যে তা ঠিক নয়। অবশ্য তার কারণ যে সব যুদ্ধে তিনি জড়িয়ে পড়েছিলেন তার রসদের অবস্থাতে সেইসব যুদ্ধের অর্দ্ধেকটাও করা যায় না, জেতা ত অনেক দূরের কথা। কিন্তু লড়াইটা তিনি চালিয়েছিলেন চমৎকার ভাবে। এক সময়ে এমন বলা হত যে ডিকি (তাঁর ডাকনাম) মাউণ্টব্যাটেন হলেন সেই সৈনাধ্যক্ষ-সবচেয়ে বেশী বোমার আঘাত পেতে হয়েছিল যাঁকে। লর্ড মাউণ্টব্যাটেনই ব্রিটিশ নৌবহরকে আবার সেই ঐতিহাসিক "নেলসন"-এর ট্রাফালগার যুদ্ধের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। এবং তাঁর সেই অসামান্য নৌযুদ্ধের ওপর ভিত্তি করে নোয়েল কাওয়ার্ড চমৎকার চিত্রটি নির্মাণ করেছিলেন—"In which we serve"।

প্রথম দিকে মাউন্টব্যাটেনের নাম শোনা গিয়েছিল যখন তাঁকে "কমাণ্ডো"র নেতা করা হয়েছিল, সেই গেরিলাদলের যারা ফ্রান্স, বেলজিয়াম এবং হল্যাণ্ডের সমুদ্রতীর ধরে ক্রমাগত গোপন লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল। তাদের প্রত্যেকটি আক্রমণে জার্মানরা পর্যুদস্ত হয়ে যাচ্ছিল। গেরিলাদলের নেতৃত্ব নেবার সঙ্গে সঙ্গে লর্ড লুইস তাঁর লোকজনদের বলেছিলেন যে তিনি নিজে যা করতে পারেন না সেই কাজ কোনদিন কাউকে করতে দেবেন না। তিনি নিজে কমাণ্ডোর কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন সে সময়। ছুরি লোহার কড়া ও হাতুড়ি ইত্যাদি সব কিছু লুকোন অস্ত্র দিয়ে জার্মানদের হঠাৎ হঠাৎ হানা দিয়ে থাকতেন। তিনি যে শুধুমাত্র নিজে গেরিলাযুদ্ধে অংশ নিতেন তা নয় গেরিলা ট্রেনিং এ যথারীতি সবসময়ই উপস্থিত থাকতেন। প্রত্যেক সৈন্যকে যে ধরনের ট্রেনিং নিতে হত তিনি নিজে আগে সেটি নিতেন। তিনি "blood and sweet" বলে প্রত্যেকটি কম্যাণ্ডোর পক্ষে বাধ্যতামূলক যে ট্রেনিং সেটি নেবার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এই ট্রেনিং-এ প্রথমে কাঁধে বেশ এক গোছা বেওনেট লাগানো রাইফেল নিয়ে দশ ফুট কাঁটাতারের মধ্য দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে হত। সেখান থেকে বেরোনর সঙ্গে সঙ্গে বোমা আর মাইন ফাটবে ক্রমাগত আশেপাশে। তারপর সবাইকে গলা পর্যন্ত জলের মধ্য দিয়ে এগিয়ে আগুন জ্বলতে থাকা একটা দেয়াল ডিঙোতে হবে। ডিঙিয়ে, দশ ফুটের একটা ব্যারিকেড পেরিয়ে পাহাড়ের ওপরে উঠতে হবে। সেটাই শেষ লক্ষ্য। আর এই ট্রেনিং চলাকালীন সারা সময় জার্মান ভাষায় ভয়ের ছবি দেখানো হবে। বোমার শব্দ, আক্রমণের শব্দ বাজতেই থাকবে যাতে ট্রেনিং নিতে থাকা দলটি ভয় কোরে যায়। কিন্তু নিজে সেনাধ্যক্ষ হয়েও লর্ড মাউন্টব্যাটেন এইসব ট্রেনিং নিজে দিয়েছিলেন যাতে তার সৈন্যদের তিনি বলতে পারেন যে তারও ট্রেনিং নেয়া রয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সেনাধ্যক্ষদের মধ্যে লর্ড মাউন্ট্যাবেটন

ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ, আইসেনহাওয়ারের চাইতে দশ বছর আর জেনারেল ম্যাক আর্থারের চাইতে একুশ বছরের ছোট ছিলেন তিনি। তবু তিনিই যুদ্ধের ইতিহাসে অভূতপূর্ব সেই তিনটি ঘটনাতেই নেতৃত্ব দিয়েছিলেন—একটা হচ্ছে উত্তর আফ্রিকায় সৈন্য অবতরণ, সিসিলি এবং ইটালীর সৈন্য অবতরন পরিকল্পনা এবং নেতৃত্ব।

জীবনের দুই-তৃতীয়াংশ সময় ব্রিটিশ নেভীতে কাজ করে গেছেন তিনি। ১৩ বছর বয়সে তিনি নেভীতে যোগদান করেছিলেন।

সময় সম্পর্কে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সচেতন। প্রত্যেকটি আক্রমণ রচনা করার পরে, তিনি সকলের সঙ্গে বসে আলোচনা করতেন ঘটনাটি নিয়ে, বিশ্লেষণ করতেন ত্রুটি ইত্যাদি নিয়ে। যদি ৬'৩০ মিনিটে কারও আসার কথা থাকে এবং তিনি ৬'৩১এ আসেন তাহলে কোথায়.অসুবিধা হল সেটা খুঁটিয়ে দেখে নিতে চাইতেন তিনি সবসময়।

মাদাম চিয়াং কাইশেক

তিনি নির্ভয়ে একলক্ষ উত্তেজিত সৈন্যের মোকাবিলা করেছিলেন নিজের স্বামীকে রক্ষা করতে।

১৮৭৬ সালে বোস্টনের একটি চীনা ছেলে একটি রেশনের দোকান থেকে পালিয়ে যায়। দোকানটি তার কাকার। ছেলেটির দোকান ভাল লাগে না, পড়াশুনা করতে ভাল লাগে তার। কিন্তু কাকার পড়াশুনা খুবই অপছন্দ বলে ১২ বছরের ছেলেটি বোস্টন বন্দরে কোন জাহাজে চড়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে! এই ছেলেটিই আসলে মাদাম চিয়াং কাইশেকের বাবা। বলা বাহুল্য এই ছেলেটি একটি ঐতিহাসিক পরিবারকে পাদপ্রদীপের আলোয় নিয়ে আসেন। কারণ তাঁর তিন মেয়ে, তিনজনেই চীনের তিন রাজনৈতিক নেতাকে বিয়ে করেন। বড়জন চুং লিং বিয়ে করেন ডাঃ সান ইয়াৎ সেনকে, যাকে চীনের ওয়াশিংটন বলা হয়ে থাকে, অর্থাৎ নতুন চীনের জনক এবং চীনবিপ্লবের হোতা হিসেবে এবং যিনি মাংচু রাজত্বকে উৎখাৎ করেছিলেন। যারা দীর্ঘ ২৬৮ বছর চীন দখল করে রেখেছিল, এবং যিনি চীন রিপাবলিকের জন্ম দিয়েছিলেন। দ্বিতীয়জন ইংলিং বিয়ে করেন ডাঃ কাংকে, যিনি চীনের অর্থমন্ত্রী ছিলেন। যিনি চীনের আবহমানকালের ধর্মগুরু কনফুসিয়াসের বংশধর ছিলেন। এবং তৃতীয় জন মে লিং, যে নামের অর্থ হল "সুন্দর জীবন"—ইনি বিয়ে করেছিলে জেনারেল চিয়াং কাই শেককে।

এই তিন বিখ্যাত মহিলার পিতা, বারো বছরের পালিয়ে-যাওয়া ছেলেটি, যার নাম চার্লস সুং, দীর্ঘদিনের একটা সংস্কার ভেঙে

তার তিন মেয়েকেই আন্তরিকভাবে পড়াশুনা করতে পাঠিয়েছিলেন। হাজার বছরের পুরোন গোঁড়ামি ভাঙতে দ্বিধা করেন নি তিনি।

মাদাম চিয়াং কাইশেক জর্জিয়ার মেকনে ওয়েসলিয়েন কলেজ অফ্ উইমেন-এ পড়াশুনা করতে থাকেন এবং পরে মাসাচুসেটস-এর ওয়েলেসলী কলেজ থেকে স্নাতক হন। উনিশ বছর বয়সে আমেরিকা ত্যাগ করার সময়ে তিনি বলেছিলেন—"প্রাচ্যের একটি জিনিসই আমি বহন করছি। সেটা হচ্ছে আমার "মুখশ্রী"—সংহাই তে পৌছে চীনা ভাষায় কথা বলা ও পড়া লেখার জন্য তাকে রীতিমত মাস্টার রেখে শিখতে হয়েছিল।

কিন্তু প্রথম থেকেই মাদাম চিয়াং কাইশেকের একটি বিশেষ আদর্শ ছিল জীবনে, একটি গভীর বিশ্বাস। সেটি হল যে অসম্ভব দারিদ্র্য, আলস্য আর অত্যাচার-নিপীড়নের হাত থেকে চীনের সাধারণ লোকদের তিনি রক্ষা করার চেষ্টা করবেন। নাবালকদের দিয়ে কাজ করানোর বিরুদ্ধে তিনি নতুন করে আন্দোলন শুরু করলেন। লড়াই শুরু করলেন ফ্যাক্টরিতে বছরে দু পাউণ্ড রোজে কর্মরত নাবালক শিশুদের হয়ে।

স্বাস্থ্যবিধি, শিক্ষা, সাহচর্য, সুন্দর জীবন এবং পরিবেশের কথা তিনি প্রচার করতে শুরু করলেন। এই কাজে চীনের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত অক্লান্তভাবে ঘুরে বেড়াতেন তিনি। বিমানে চড়ার ব্যাপারে তার স্বাভাবিক এ্যালার্জি ছিল তবু তিনি বিমানের মেঝেতে শুয়ে পড়ে নাকে স্মেলিং সল্ট দিয়ে যাতায়াত করতেন। চীয়াং কাইশেককে দীর্ঘ পাঁচ বছর মে-লিংকে বিয়ের জন্য রাজী করাতে সময় লেগেছিল। দীর্ঘ পাঁচ বছরের টালবাহানার পরে ১২৯৬ সালে মে লিং চিয়াং কাইশেককে বিয়ে করতে রাজী হন।

মাদাম চিয়াং কাইশেকের সাহস এবং ধৈর্য ছিল অসাধারণ। একটা ঘটনা উল্লেখ করা যায়। তীব্র গৃহযুদ্ধের মধ্যে একবার চিয়াং কাইশেককে কিছু উচ্চাশাপূর্ণ জেনারেলরা মিলে অপহরণ

করে নিয়ে যায়। তাদের উদ্দেশ্য ছিল চিয়াংকে হত্যা করে নিজেরাই দেশটা চালাবেন। প্রায় দুসপ্তাহ বন্দী ছিলেন চিয়াং। কিন্তু তবু জেনারেলদের দাবীর কাছে নতি স্বীকার করলেন না তিনি। এমন কি ওই জেনারেলদের দেওয়া খাবারও খেতে রাজী হলেন না তিনি। বারবার তিনি তাদের তিরস্কার করেছিলেন এবং স্পষ্টভাষায় জানিয়ে দিচ্ছিলেন যে কোন দাবী মেনে নেওয়ার আগে মারা যাবেন সেও ভালো। চিয়াং কাইশেকের অপহরণের খবরে সারা চীন উত্তেজিত হয়ে ওঠে। চিয়াংএর অনুগত সৈন্যদল যে শহরে চিয়াংকে আটকে রাখা হয়েছে সেই দিকে রওনা হতে প্রস্তুত। চীন আবার একটা বিরাট গৃহযুদ্ধের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে বুঝে মাদাম চিয়াং কাইশেক সৈন্যদলের আশ্রয় নিতে অস্বীকার করে একাই চিয়াংএর সঙ্গে দেখা করতে রওনা হন। সঙ্গে নিয়েছিলেন একজনকে যার হাতে একটি রিভলভার দিয়ে আদেশ করেছিলেন যে, বিদ্রোহী সৈন্যরা যদি তাকে অসম্মান করতে চেষ্টা করে তাহলে যেন তাকে হত্যা করা হয়। চিয়াংএর বারবার নিষেধ সত্ত্বেও অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু জেনেও মাদাম চিয়াং কাইশেক নির্দ্বিধায় বিপদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে দ্বিধা করলেন না। যেখানে চিয়াংকে বন্দী করে রাখা আছে সেখানে উপস্থিত হয়ে চিয়াংকে এবং বিদ্রোহী সেনানায়কদের সঙ্গে দুদিন ধরে অনুনয়-বিনয় করে চীনের পরিস্থিতি বোঝান এবং গৃহযুদ্ধ বাধাতে বারণ করেন। মাদামের আন্তরিক প্রচেষ্টা দেখে বিদ্রোহী সৈন্যাধ্যক্ষরা চিয়াংকে দিয়ে দেন। এবং চীন টুকরো টুকরো হওয়ার হাত থেকে, রক্তাক্ত হওয়ার হাত থেকে মাদাম চিয়াং কাইশেক সেদিন সত্যিই চীনকে রক্ষা করেছিলেন সন্দেহ নেই।

রাইট ভাইরা

ওরা ১২ সেকেণ্ডে ইতিহাস তৈরী করেছিল।

১৮৭৮ সালে সেডার র‍্যাপিড্স, আইওয়া, নামে আমেরিকার একজন বিশপ একদিন তার দুই নাবালক ছেলের জন্য একটি নতুন খেলনা উপহার এনেছিলেন। খেলনাটি ছিল একটি উড়ন্ত মেশিন, শোলা, বাঁশ আর কাগজ দিয়ে তৈরী; দুটো বিপরীতমুখী, প্রোপেলার দেওয়া, যার ফলে মেশিনটা অনেকটাই বাতাসে ভেসে থাকতে পারে। এই খেলনাটি দেখার পরই বাচ্চাদুটির ওড়ার ব্যাপারে অদ্ভুত আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছিল! তাদের দুজনের সেই অদম্য কৌতূহল এবং আগ্রহ থেকেই সৃষ্টি হয়েছিল উড়োজাহাজ। বহু শতাব্দী আগে আবিষ্কৃত বারুদ ছাড়া মানবসভ্যতাকে এত বেশী প্রভাবিত করতে আর কোন আবিষ্কারই পেরে উঠে নি। এই ছেলেদুটির নাম উইলবার এবং অরভিল রাইট।

দুই ভাই বাবার দেওয়া মেশিন নিয়ে খেলা করতে করতে ভেঙে ফেলল খেলনাটা। যেহেতু পয়সা ছিল না নতুন আরেকটা কেনার সেইহেতু তারা নিজেরাই একটা খেল্‌না বানাতে শুরু করে দিল। ক্রমশঃ তাদের তৈরী খেলনা শহরে অন্যান্য ছেলেমেয়েরা রীতিমত পয়সা দিয়া কিনে নিয়ে যেত। বলা বাহুল্য খুব শীগগিরই আকাশে 'ওড়ার স্বপ্নে অস্থির হয়ে উঠতে লাগল তারা।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা মাটিতে চিৎ হয়ে শুয়ে থেকে তারা একমনে তাদের তৈরী খেলনার ওড়ার প্রকৃতি লক্ষ্য করে যেতেন, লক্ষ্য করে যেতেন ফড়িং কি করে ওড়ে। ঘুড়ি, শালিখ, চড়ুই কিভাবে উড়ে বেড়ায়। বাজপাখী বা চিল ডানা একদম না - নেড়ে আধঘণ্টার ওপরে কেমন করে বাতাসে ভেসে থাকতে পারে ইত্যাদি।

একদিন ওরা ওহিওর স্থানীয় একটি কাগজে দেখল যে বার্লিনের একজন ইনজিনিয়ার নাকি অটো লিলেনথাল নামে যে উড়তে গিয়ে মারা গিয়েছিলেন। লিলেনথাল দুটো বিশাল ডানা কাঠির সঙ্গে লাগিয়ে ওড়ার চেষ্টা করে মারা গেছিল।

বলা বাহুল্য খবরটি রাইট ভাইদের কাছে নতুন আলোর সন্ধান এনেছিল। যদিও লিলেনথাল খুব একটা বেশী দূরে উড়ে যেতে পারেন নি, কিন্তু তিনি মরে অন্তত প্রমাণ করে দিয়েছিলেন যে মানুষের পক্ষে পাখিদের মতনই ওড়া সম্ভব। এর পর থেকে দুই ভাইয়ের খাওয়া-দাওয়া মাথায় উঠল। সারাক্ষণ একটিই চিন্তা কিভাবে ওড়ার মতন উপযুক্ত মেশিন তৈরী করবে তারা। ওয়াশিংটনের স্মিথ্‌সোনিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়কে চিঠি লিখে যাবতীয় প্রকাশিত খবরাখবর এবং প্রবন্ধ আনিয়ে খুঁটিয়ে পড়াশুনা করতে লাগল তারা। চার বছর পড়াশুনার পরে ওরা ঠিক করল নিজেরাই একটা উড়োজাহাজ তৈরী করবে, খেলনার মতই হোক না কেন, শুধু মজা করার জন্যই নাহয় তৈরী হল। ওরা কিন্তু তখনও ভাবতে পারে নি যে পৃথিবীর মানবসভ্যতার জন্য একটি অভিনব বস্তু আবিষ্কার করতে যাচ্ছে তারা।

রাইট ভাইরা কিন্তু কোনদিন নিজেদের বৈজ্ঞানিক কিংবা আবিষ্কারক হিসেবে ভাবে নি। সাধারণ ছেলেমেয়েদের মতনই ওড়ার ব্যাপারটা নিয়ে একটু বা মজা করা অবসর সময়ে যেমন অন্যলোকজনেরা পাহাড়ে চড়া কিংবা খেলাধূলা নিয়ে মজা করে। জীবিকার জন্য রাইট ভাইদের ওহিওতে একটা সাইকেল মেরামতের দোকান খুলতে হল। সারাদিন বেচাকেনার পরে রাত্রিবেলা দুজনে মিলে তাদের সেই উড়োজাহাজ তৈরীর জন্য যাবতীয় মালমসলা তৈরী করে নিত। তিন পাউণ্ড মাত্র খরচ করে ওরা প্রথম উড়োজাহাজটি তৈরী করেছিল।

রাইট ভাইরা ঠিক করল যে ছুটির সময়ে ওরা ওই গ্লাইডারটি

চালানোর চেষ্টা করবে। আবহাওয়া ঘোষণায় ওরা খবর পেল যে kill deril, kitty hawk, উত্তর ক্যারোলিনার আবহাওয়া এই কাজের জন্য একান্তই উপযুক্ত। ওরা কি টি—হক্-এ প্রথম চেষ্টা করবে ভাবল, একটি ক্যাসন শো এর ঠিক পরপরই। ওদের তৈরী মেশিনটা হালকা একটু মাত্র উড়িয়েছিল তাদের।

পরের বছর ওরা আবার একটি বড় ধরনের গ্লাইডার তৈরী করল। এবারের চেষ্টাও ব্যর্থ হল মর্মান্তিক ভাবে। সব দেখে শুনে উইলবার মন্তব্য করেছিল সেই সময়ে যে "মানুষের আকাশে উড়তে আরও একবছর লাগবে।"

ওরা এত বেশী হতাশ হয়ে ফিরছিল যে এই বিষয়ে সকল চেষ্টা বন্ধ করার কথা সত্যিই সত্যিই ভাবতে শুরু করেছিল। কোনদিনই তাহলে হয়তো উড়োজাহাজ আবিষ্কার হতোই না যদি না একজন ইনজিনিয়ার তাদের নতুন করে উৎসাহিত করতেন। এই ইনজিনিয়ারকে ওড়ার ব্যাপারে একজন বিশারদই বলা যেতে পারে। তিনি কিটি হক-এ রাইট ভাইদের ব্যর্থতার পরিপ্রেক্ষিতে বললেন যে যদিও প্রয়াসটি ব্যর্থ হয়েছে তবুও বলা যেতে পারে যে ওরা পূর্ববর্তী সবরকমেরই রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে এবং পৃথিবীতে যদি সফল বৈমানিক কেউ থাকেন তো ওর দুজনেই।

অক্টোভের এই প্রশংসায় ওরা অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে পড়ে এবং আরও গভীর মনোসংযোগ করতে থাকে তাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায়। এই সময়ে অক্টোভ উইলবারকে শিকাগোতে ইনজিনিয়ারদের সামনে ওদের এই ওড়ার বিষয় নিয়ে বক্তৃতা করতে অনুরোধ জানায়। এই বক্তৃতার বিষয়টি আসলে অনেক কিছুই বদলে দিল উইলবার। ঠিক করেছিল যে সে খোলাখুলিভাবেই বলবে যে বৈজ্ঞানিকরা যেসব তথ্য এযাবৎ উপস্থিত করেছিল সেগুলো সব ভুল। কিন্তু এইরকম একটি দুঃসাহসিক মন্তব্য করার

আগে অরভিল একবার সব পরীক্ষা করে নিতে চাইল। এবং সেই পরীক্ষার সময়েই তারা পৃথিবীর প্রথম wind tunnel তৈরী করে ফেলল, এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রমাণও করে দিল যে বৈজ্ঞানিকদের এযাবৎ প্রকাশিত তথ্যগুলো সবই ভুল। দুজন অশিক্ষিত সাধারণ মানুষ সাইকেল সারাই-এর কাজ করতে করতে বিখ্যাত সব ইনজিনিয়ার এবং বৈজ্ঞানিকদের ভুল ধরে ফেলছে এটা ভাবতেই কেমন লাগে।

অতঃপর তারা যে মেশিনটা তৈরী করল সেই মেশিনে অন্তত এক হাজার বার উড়েছিল তারা। কিন্তু কোন বারই বাতাসের আনুকূল্য না পাওয়ার জন্য ওরা ঠিক করল যে বাতাস ওরা নিজেরাই নিয়ন্ত্রিত করবে। এবং সেটা করতে গিয়ে সারাদিন কাজের পরে সারারাত জেগে ওরা নিজেদের সাইকেল সারাই-এর দোকানে নতুন পেট্রোল ইনজিন তৈরী করার কাজে লেগে গেল। ভাবলে ওর সাহায্যে প্রোপেলারের সঙ্গে সংগ্রাম করা যাবে। পুরো মেশিনটা তৈরী করতে ওদের খরচ পড়েছিল ১৬০ পাউণ্ড মাত্র। এই মেশিনটি নিয়েই ওরা ১৯০৩ সালের ১৭ই ডিসেম্বর সেই ঐতিহাসিক ওড়ার ব্যবস্থা করেছিল কিল ডেভিল হল-এ। এবং সেইদিনই বিমান ইতিহাসের সবচেয়ে স্মরণীয় দিন—যেদিন সফল ভাবে তারা বাতাসের চাইতে ভারী মেশিনটি মাটি থেকে ১২০ ফিট ওপরে তুলে নিয়ে উড়তে পারল।

তারপরেও দীর্ঘকাল কোন বিজ্ঞানের কাগজ রাইট ভাইয়ের এই অসাধারণ কৃতিত্বের খবর ছাপেনি। সবচেয়ে মজার খবর হচ্ছে যে অনেক চেষ্টা করেও রাইট ভাইরা আমেরিকার যুদ্ধ-দপ্তরকে কৌতুহলী করে তুলতে পারে নি ওদের ওই ফ্লাইং মেশিন সম্পর্কে। অবশ্য প্রায় বছর চারেক পরে যুদ্ধ-দপ্তর একটি মেশিন কেনার সিদ্ধান্ত নেয় এবং সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হল যে সেই ক্রয়ের জন্য আবার কোটেশন ডাকা হয় নানা জায়গা থেকে যদিও তখন সম্ভবতঃ

পৃথিবীতে দুজনের একটি টিমই কেবল ফ্লাইং মেশিন বানাতে পারে সারা পৃথিবীতে।

সেই প্রথম ওড়ার ঘটনাটি মাত্র ১২ সেকেণ্ড। কিন্তু সেই ১২ সেকেণ্ডই সারা পৃথিবীর ইতিহাসকে বদলে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট ছিল সন্দেহ নেই।

হেনরী জে কাইজার

তিনি স্টুডিওতে কাজ করতে ঢুকেছিলেন কিন্তু অতঃপর পৃথিবীর সবচাইতে বড় এবং বিখ্যাত জাহাজ প্রস্তুতকারক হয়ে উঠেছিলেন।

যুদ্ধ যে মানুষটিকে পাদপ্রদীপের নীচে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল তাঁর নাম হেনরী জে কাইজার। যুদ্ধ জয় করার জন্য অন্যান্য অনেকের মতন বিশিষ্ট অবদান ছিল তাঁর। যুদ্ধের আগে যদিও কেউই তাকে প্রায় চিনতই না কিন্তু যুদ্ধের সময়ে তাঁকে প্রায় কিংবদন্তীর পুরুষ হিসেবে চিহ্নিত করতে সুরু করেছিল সবাই। তার কারণ সেই সময়ে তাঁর সাতটি জাহাজ তৈরীর কারখানায় রাতদিন কাজ চলছে, কাজ চলছে ফাইটার প্লেন ফ্যাক্টরীতে, ম্যাগনেশিয়াম প্লাণ্ট-ইত্যাদিতে।

নিজের ফ্যাক্টরীতে যখন স্টীল পাওয়া যাচ্ছে না তখন বিনা দ্বিধায় স্টীল মিল তৈরী করছেন, ব্লাস্ট ফারনেস থেকে রোলিং মিল পর্যন্ত। কিনে ফেলছেন লোহার খনি, কয়লা খনি, যা দরকার তাই।

সাধারণ জীবনে সকলেই কাইজারকে, এই টাকমাথা, মোটাসোটা বড়সড় চেহারার মানুষটিকে নিজের লোক বলেই ভাবত অত্যন্ত খুশী মনে। তার কারণ কাইজারের ছিল সহজ সরল ব্যবহার, অত্যন্ত উৎসাহ এবং উদ্দীপনায় ভরপুর।

শৈশব থেকেই হেনরী জে কাইজার একটি অস্থির, কর্মমুখর উৎসাহের জীবন কল্পনা করতে ভালবাসতেন, যে জীবন তাঁকে বিখ্যাত করে তুলবে, সম্পদশালী করে তুলবে। তাঁর বাবা ছিলেন জার্মান। জুতো তৈরী করে যা রোজগার করতেন তাতে চারটি

ছেলেমেয়ে নিয়ে সংসার চালানোই খুব কঠিন কাজ ছিল তাঁর। যেহেতু একমাত্র ছেলে ছিলেন হেনরী সেইহেতু এগারো বছর বয়স হতে না হতেই তাঁকে কাজে লেগে পড়তে হয়। নিউ ইয়র্কের একটি ডিপার্টমেণ্টাল স্টোরে সারাদিন ধরে মালপত্র খদ্দেরদের বাড়িতে বাড়িতে দিয়ে আসার কাজ পেলেন প্রথমে। রাত্রিবেলায় তিনি তার সখের কাজ ছবি তোলায় সময় নষ্ট করতেন। ফটোগ্রাফী সংক্রান্ত বিষয়ে পড়াশুনা করতে করতে তিনি ফটোগ্রাফীর দোকানে চাকরী পেলেন। এই কাজটিতে তার খুবই উৎসাহ লাগছিল, কাজ বলেই মনে হয় না—প্রায় খেলার মতন।

জেনারেল চার্লস দ্য গ্যল

জীবিত অথবা মৃত যে ভাবেই হোক তাঁকে ধরার জন্য ৪০,০০০ পাউণ্ড পুরস্কার ঘোষিত হয়েছিল।

১৯১৮ সালের ১১ই নভেম্বর পশ্চিম ফ্রণ্টে বন্দুকের আওয়াজ বন্ধ হয়েছিল। বেশীর ভাগ সময়েই ফ্রান্সের মাটিতে যে রক্ত ঝরছিল এদিন সেই চারবছরের রক্তাক্ত যুদ্ধের অবসান হয়েছিল। বেলজিয়ামের আল্পস্ পর্বতরেখা থেকে ভার্দুনের উত্তাল তরঙ্গক্ষুব্ধ সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চল পর্যন্ত মিত্রশক্তির উজ্জ্বল জয়ের চিহ্ন ছড়িয়ে গেছে। সেইসব এলাকায় ফ্রান্সের রণহুংকার আকাশ বাতাসে ধ্বনিত হয়ে চলেছে তখন পর্যন্ত।

কুড়ি বছর পরে আরও বড় আরও সর্বাত্মক যুদ্ধ সারা পৃথিবীতে যখন ছড়িয়ে পড়ল তখন ফ্রান্স মৃতপ্রায় এবং বিবর্ণ। সেই মুমূর্ষু জাতির অন্তর্জলীতে একটি মানুষের কথাই আশার স্পন্দন নিয়ে এসেছিল সারা দেশজুড়ে। ১৯৪০ সালে কিন্তু সেই মানুষটিকে মিলিটারী কোর্টে বিচার করা হল। সেই বিচারে তিনি দোষী সাব্যস্ত হলেন, এবং বিশ্বাসঘাতক বলে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হল। সারা পৃথিবীতে যিনি একদিকে প্রচণ্ড ঘৃণা আবার অন্যদিকে প্রচণ্ড ভালবাসা কুড়িয়ে এনেছিলেন। সেই মানুষটির নাম চার্লস দ্য গ্যল।

জার্মান পক্ষের সৈন্যবাহিনীর বিদ্যুৎ আক্রমণে ফ্রান্স যখন হতপ্রায় তখনই দ্য গ্যল আত্মসমর্পণ করতে রাজী হন। তিনি ফ্রান্সের নেতৃবৃন্দের যুদ্ধশান্তিচুক্তির অপমানকর শর্তগুলি মেনে নিতে রাজী নন। কারণ তিনি পালিয়ে গেলেন ইংলণ্ডে এবং সেখান থেকেই ফ্রান্সের মুক্তিআন্দোলন সুরু করেছিলেন।

জার্মান-প্রভাবিত ভিকি সরকার দ্য গ্যলকে বিশ্বাসঘাতক নামে অভিহিত করে জীবিত অথবা মৃত অবস্থায় ধরার জন্য তাঁর মাথার দাম ধার্য করল ৪০,০০০ পাউণ্ড। কিন্তু লক্ষ লক্ষ সাধারণ ফ্রান্সবাসী যারা জার্মানীর চরম অত্যাচারে মুখ বুজে থাকতে বাধ্য হয়েছিল তাদের কাছে দ্য গ্যল ছিলেণ মুক্তির প্রতীক।

১৯১৮ সালের শান্তিপর্বের দিনটির কথা আপনাদের স্মরেণ আছে। দীর্ঘকালের মধ্যে এই দিনটি ছিল অত্যন্ত আনন্দসূচক। সৃষ্টির জন্মলগ্নের পরে এই দিনটির মতন মানুষের আনন্দ করার আর কোন মহত্তর ব্যাপার সম্ভবতঃ ঘটেনি। চার চারটি বছর রক্তাক্ত যুদ্ধে প্রায় পঁচাশি লক্ষ লোক নিহত হওয়ার পরে জার্মানী আত্মসমর্পণ করল। ১৯১৮ সালের সেই দিনটিতে সকলে ভেবেছিল আর কোনদিন যুদ্ধ হবে না। এবং সত্যিই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সম্ভবতঃ ঘটতই না যদি ফ্রান্স দ্য গ্যলের মতামতকে একটু গ্রাহ্য করত।

যদি দ্য গ্যলের পরামর্শমত ফ্রান্স দশটি যুদ্ধ ডিভিশন তৈরী করত তাহলে হিটলার কোন অবস্থাতেই ফ্রান্স আক্রমণ করার কথা কল্পনাও করতেন না। কল্পনা করতেন না অস্ট্রিয়া এবং পোলাণ্ড আক্রমণ করার কথা। সম্ভবতঃ জেনারেল দ্য গ্যলই প্রথম-যিনি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে আধুনিক যুদ্ধের ব্যাপারটা কি রকম হতে পারে।

ফ্রান্সের যুদ্ধবিশারদরা কিন্তু জার্মানীর সীমান্তরেখায় স্টিল এবং কংক্রিটের একটি বেড়াজাল তৈরী করতেই বেশী ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল সে সময়ে যার নাম দিয়েছিল তারা ম্যাজিনট লাইন। তাঁরা ১৯১৪ এবং ১৯১৮ সালের যুদ্ধ দেখে ভেবেছিলেন সম্ভবতঃ এবারও যুদ্ধ সেই রকমেরই হবে বা যুদ্ধে অনেক পদাতিক-বাহিনী পায়ে হেঁটে দেশ:জয় করতে বের হবে।

জেনারেল দ্য গ্যল কিন্তু সাবধান করে দিয়েছিলেন যে পরবর্তী যুদ্ধে ম্যাজিনট লাইন কোন কাজের হবে না। তিনি সাবধান করে

দিয়েছিলেন এই বলে যে যদি যুদ্ধ লাগে তাহলে জার্মানী ফ্রান্সকে আক্রমণ করবে বেলজিয়াম সীমান্ত দিয়ে, যেখানে ম্যাজিনট লাইন নেই। তিনি আরও সাবধান করে দিয়েছিলেন এই বলে যে এবারকার যুদ্ধ হবে গতি-যুদ্ধ, বিদ্যুৎ চালিত কামানের গোলা ছুটবে, বিমান আক্রমণ হবে সেইরকম গতিতেই।

ফ্রান্সের সমর নেতারা দ্য গ্যলের এই কথা হেসেই উড়িয়ে দেন। জেনারেল পেট্রাইল জেনারেল দ্য গ্যলের "The army of the future বইটিকে পরিহাস বলে ঠাট্টা করলেন এবং জেনারেল ওয়েগাণ্ড বললেন বইটি সেনাবাহিনীর কাছে ক্ষতিকারক। একটি স্বয়ংক্রিয় বাহিনী তৈরী করা অসম্ভব ব্যাপার। কোথায় অতবড় কারখানা যেখানে অত বড় ট্যাংক কামান তৈরী হবে। তাদের ধারণাই বা কি করে দেয়া যাবে। সেই সব স্বয়ংক্রিয় মেশিন ডিভিশনকে যুদ্ধক্ষেত্রে নতুন অস্ত্রসম্ভারে সাজানো যাবে কি ভাবে। পাহাড়ে বর্ষায় তারা যুদ্ধই বা করবে কি ভাবে। না পুরো ধারণাটাই বাজে। অসম্ভব। কিন্তু জার্মানী সেটা অবহেলা করেনি। ওরা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বইটা পড়েছিল। কাজে লাগিয়েছিল। এমন কি নাৎসি মেকানাইজড্ আর্মি ডিভিশনের কর্তা স্বয়ং হিটলারকে জানিয়েছিলেন যে তাদের মেকানাইজড ডিভিশন সম্পর্কিত সব শিক্ষাই দিয়েছেন জেনারেল দ্য গ্যল।

নাৎসী সৈন্যগণ ছিল তরুণ, তারা সবসময়ে চাইত নতুন নতুন ধ্যানধারণা। সেই কারণে দ্য গ্যল যেমনটি বলেছিলেন ঠিক তেমনটি ভাবেই তারা তাদের প্যান্থার ডিভিশন তৈরী করেছিল। যুদ্ধের ইতিহাসে এই প্যান্থার ডিভিশন যুদ্ধজয়ের পূর্ববর্তী সব কীর্তি ধূলিসাৎ করে দিয়েছিল। মাত্র ৪১ দিনে পাঁচ হাজার ট্যাংক-এরতিনহাজার প্লেন পাঁচ লক্ষ পদাতিক ফ্রেঞ্চ বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে দিয়েছিল।

মাত্র ছসপ্তাহের মধ্যে ফ্রেঞ্চ রিপাবলিককে হাঁটু গেড়ে বসতে

বাধ্য করে নাৎসীরা। ২০ লক্ষ ফ্রেঞ্চ বন্দী হয়। ২০ লক্ষ সৈন্য গ্রেপ্তারের ঘটনাটি অকল্পনীয় এবং অভাবিত। এই বিষয়ে উইনস্টান চার্চিলের সেই বিশ্ববিখ্যাত উক্তিটি স্মরণ করতেই হয়—'আগে কোনদিন এত লোককে এত কম সময়ে এত কম লোক গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয় নি।"

কিন্তু এই ছয়সপ্তাহের অবিস্মরণীয় যুদ্ধের সময় দ্য গ্যল প্রমাণ করেছিলেন যে তিনি যেমন যুদ্ধ করতে পারেন তেমনি পারেন লিখতেও। জার্মানরা সারা ফ্রান্স কাঁপিয়ে সমুদ্রের দিকে এগিয়েছিল প্রায় বিনা বাধায়। সেখানে তারা বাধা পেল দ্য গ্যলের মেকানাইজড সৈন্যবাহিনীর কাছে। এবং প্রথম সুযোগেই দ্য গ্যল জার্মানদের অপ্রতিরোধ্য অগ্রগতি ভেঙ্গে টুকরো করে দিলেন।

একসময় আমার সঙ্গে কম্যাণ্ডার পিয়ের বেনেডিকটাস, যিনি নিউ ইয়র্কের ফাইটিং ফ্রেঞ্চ মিলিটারী মিশনের একজন অফিসার ছিলেন এবং তিনি লণ্ডনে জেনারেল দ্য গ্যলের সঙ্গে কাজ করেছিলেন বছরখানেক। তিনি স্পষ্টই জানিয়েছিলেন যে পৃথিবীতে অন্যান্যদের তুলনায় জেনারেল দ্য গ্যলকে তিনি শ্রদ্ধা করেন সবচেয়ে বেশী। বেনেডিকটাসের মতে আপাত দৃষ্টিতে জেনারেল দ্য গ্যলকে শীতল এবং রক্ষণশীল মনে হলেও ভেতরে তাঁর ছিল ছাইচাপা আগুন। তাঁর কর্মচারীরা তাঁকে ভয় করত আবার শ্রদ্ধাও করত খুব বেশী। তাঁর অত্যন্ত কাছের বন্ধুবান্ধবরাও কোনদিন তাঁকে 'চার্লস' বলে ডাকতে সাহস পেত না। বরং বলত "মাই জেনারেল"। তিনি বই পড়াও ভালবাসতেন। ইতিহাস, দর্শন এবং অর্থনীতির বইপত্র পড়ার দিকে তাঁর ঝোঁক ছিল অপরিসীম। অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ মানুষ ছিলেন তিনি। নিয়মিত চার্চে যেতেন এবং প্রতি রাতে প্রার্থনা করতেন নিয়ম করে।

অত্যন্ত লাজুক প্রকৃতির লোক ছিলেন তিনি। তাঁর সেই লাজুক প্রকৃতির জন্য আপাতদৃষ্টিতে তাকে কঠিন, এবং গম্ভীর মনে হত।

তাঁর মা একবার বলেছিলেন যে—"চার্লস এত ঠাণ্ডা যেন মনে হয় এক্ষুনি বরফের ট্যাঙ্ক থেকে উঠে এল"—

দীর্ঘকাল আগে সৈন্যবাহিনীতে যখন তিনি একজন তরুণ ক্যাপ্টেন মাত্র তখন প্যারিসের আর্ট গ্যালারীতে একজন সুন্দরী মাহিলাকে দেখতে পান। সেই অপরাহ্নে মহিলাটিকে চায়ের নিমন্ত্রণ করতে তাঁকে অনেক সাহস সঞ্চয় করতে হয়েছিল। এত বেশী নার্ভাস হয়ে পড়েছিলেন তিনি যে কাপ উলটে মহিলাটির জামায় চা ফেলে দিয়েছিলেন। মাস পাঁচেক পরে তাঁরা বিয়ে করেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে জেনারেল দ্য গ্যল তিনবার আহত হয়েছিলেন। শেষবার তিনি একটি শার্পনেলে আহত হয়েছিলেন ভার্দুনে এবং অজ্ঞান অবস্থায় জার্মান সৈন্যদের হাতে বন্দী হন। পাঁচবার তিনি জার্মানদের হাত থেকে পালিয়েছিলেন, কিন্তু পাঁচবারই ধরা পড়ে যান এবং যুদ্ধচলাকালীন বাকী সময়টিতে নির্জন কারাকক্ষে বন্দী থাকেন। ১৯৪০ সালের ১০ই জুন জেনারেল দ্য গ্যল ইংলণ্ডে নামেন একা। সঙ্গে তার ছিল না কোন সৈন্য, কোন টাকা, কোন সহচর। উইনস্টান চার্চিল তাকে সাদরে অভ্যর্থনা জানান এবং পরাজিত ফ্রান্সবাসীর প্রতি বেতার-ভাষণে আবেদন প্রচার করতে সাহায্য করেন। সেই দিন দ্য গ্যল বেতারে বললেন যে, যদিও ফ্রান্স একটি সংঘর্ষে পরাজিত, তাবলে তারা কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত নয়। এবং তিনি ফ্রান্সের সৈন্যদের এবং সাধারণ মানুষদের অকুণ্ঠ সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসতে আহ্বান করেন।

তার এই অবেদনের উত্তরে সারা পৃথিবী থেকে লোকজন ইংলণ্ডে জড়ো হতে লাগল। ফ্রেঞ্চ সৈন্যরা গাড়ী চুরি করে ইংলিশ চ্যানেল সামান্য ভেলায় চড়ে পার হয়ে ইংলণ্ডে চলে আসতে থাকল। কেউ কেউ অবশ্য গোটা এরোপ্লেন চুরি করেই চলে এল। একজন শিক্ষানবিশ পাইলট তিনটি পরিত্যক্ত বিমান থেকে একটি প্লেন তৈরি করে জিব্রালটারে অবতরণ করল।

এটা ছিল শুরু মাত্র। খুব শিগগিরই দ্য গ্যল আফ্রিকার তিনটি ফ্রেঞ্চ কলোনী, ভারতবর্ষের ফ্রেঞ্চ অধিকৃত জায়গা, প্যাসিফিক-এর ফ্রেঞ্চ দ্বীপগুলি জয় করে নিলেন এবং সবশেষে তাঁর সৈন্যদল ভিকি সরকারকে বাধ্য করেছিল সিরিয়াকে আত্মসমর্পণ করতে।

দ্য গ্যল ঘোষণা করেছিলেন যতদিন ফ্রান্স অধিকৃত থাকবে ততদিন তিনি "লোরেইন-এর ক্রস" মাথায় নিয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যাবেন এবং ফরাসী বিপ্লবের সেই বিখ্যাত ধ্বনি অনুসরণ করে যাবেন—"জয় নয়ত মৃত্যু—স্বাধীনতা নয়ত কবর।"

লর্ড বেভারব্রুক

একজন কার্টুনিস্টকে তিনি বছরে দশ হাজার পাউণ্ড পারিশ্রমিক দিয়েছিলেন নিজেকে হাস্যাস্পদ করে তুলতে।

১৯৪০ সালে ইংলণ্ডকে রক্ষা করার বিষয়ে যে মানুষটির সবচেয়ে বেশী অবদান ছিল, এবং যিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে যথেষ্ট সময় এবং সুযোগের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন আত্মরক্ষার প্রস্তুতি নিতে তাঁর জন্ম হয়েছিল কানাডার অরণ্য-অধ্যুষিত অঞ্চলে। তিনি তাঁর জীবনের প্রথম ৩৮ বছর ম্যাক্স আইটকেন বলে পরিচিত ছিলেন। আজ তিনি লর্ড বেভারব্রুক নামে বিশ্ববিখ্যাত।

ডানকার্ক-এর যুদ্ধে জার্মানীর বিমান আক্রমণে ইংলণ্ড যখন প্রায় ধ্বংসের মুখোমুখি তখন চার্চিল ভাবছিলেন যে বিমান উৎপাদনের সংখ্যা দ্বিগুন না করতে পারলে রক্ষা নেই। বিমান উৎপাদন তুএকমাসের মধ্যে দ্বিগুণ করার কথাটি হাস্যকর প্রায়। চার্চিল সেই সময়ে যে মানুষটিকে এই কাজের ভার দিয়েছিলেন তিনি অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলেছিলেন। ইংলণ্ডের বিমান উৎপাদন মে মাসে নশো থেকে অগাস্ট মাসে আঠারোশোতে তুলে। এবং এই ভাবেই লর্ড বেভারব্রুক ইংলণ্ডকে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন।

খুব অল্পই লেখাপড়া জানতেন লর্ড বেভারব্রুক। স্কুল জীবন তার বেশী দিনের নয়। যতদিন স্কুলে ছিলেন পড়াশুনার চাইতে মারামারি করতেই বেশী ভালবাসতেন। এত গণ্ডগোল করতেন তিনি যে শিক্ষকদের দৈনন্দিন কাজ ছিল তাঁকে প্রহার করা। প্রথম জীবনে যে কাজেই তিনি হাত দিয়েছিলেন সব কাজে আশ্চর্য রকম

ভাবে ব্যর্থ হন—জীবনবীমা, সেলাই মেশিন বিক্রি। খবরের কাগজ চালানো এমন কি স্কুলের পরীক্ষায় পাস করতে পর্যন্ত অদ্ভুতভাবে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছিলেন। যখন তাঁর বয়স কুড়ি, তখন তাঁর হাতে একটি কপর্দকও নেই। কিন্তু যখন তাঁর বয়স ত্রিশ তখন তিনি এক মিলিয়ন পাউণ্ডের মালিক।

কি করে তিনি করলেন এত অর্থ, এত বৈভব।

প্রথমে তিনি হ্যালিফাক্স-এর একটি ব্যাংকে সেক্রেটারীর চাকরী নিলেন। নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে তিনি নানান ব্যবসায় টাকা খাটাতে থাকেন। দশ বছরে এত টাকা তিনি রোজগার করেছিলেন যার সম-পরিমাণ রোজগারসমগ্র কানাডার ইতিহাসে কেউ কোনদিন করেন নি। কিন্তু তাতেও তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না।

কানাডা ছেড়ে তিনি ইংলণ্ডে আসেন। প্রথমে লণ্ডনের ডেইলীএক্সপ্রেস কাগজটি কিনে নিলেন। প্রথম বছরই তার লোকসান হল ২০,০০০ পাউণ্ড। পরবর্তীকালে বছরে ২০০,০০০ পাউণ্ড লাভ করতে সুরু করলেন। নানানরকম চমকপ্রদ পরিকল্পনায় ডেইলী এক্সপ্রেস কাগজটির কিছু দিনের মধ্যে ৮০০ শতাংশ বিক্রী বেড়ে গেল। তিন লক্ষ থেকে দুকোটি পঞ্চাশ লক্ষ দৈনিক বিক্রী হতে লাগল এবং এই সময়ে পৃথিবীর সবচাইতে বেশী বিক্রীত কাগজ হয়ে উঠল।

তাঁর স্বপ্ন ছিল ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার। অবহেলা পাওয়ার চাইতে সমালোচিত হতে চাইতেন তিনি। ফলে তাঁর স্বভাব অনুযায়ী সাহস এবং ধৈর্যের পরীক্ষায় তিনি তাঁর এক কর্মচারীকে নিযুক্ত করলেন যার কাজ হবে তাঁর সম্পর্কে কঠোর সমালোচনা লেখা। একাজে প্রথমেই বড় রকমের পুরস্কার ঘোষিত হয়ে গেল।

ডেভিড লো যখন ইংলণ্ডের অন্য একটি কাগজে তাঁর সম্পর্কে হাস্যকর কার্টুন আঁকলেন তখন লর্ড বেভারব্রুক তাঁর কাছে প্রস্তাব

পাঠালেন বছরে দশহাজার পাউণ্ড বেতনে ডেইলী এক্সপ্রেস-এ তাঁর সম্পর্কে হাস্যকর কার্টুন আঁকতে। লো এই প্রস্তাব গ্রহণ করে অনেক দিন লর্ড বেভারব্রুককে একটি দানব কিংবা কীট হিসেবে কার্টুনচিত্রে এঁকেছিলেন। ১৯৪৩ সালে চার্চিল-মন্ত্রিসভায় যোগ দিয়েছিলেন পঞ্চম স্থানে। সাড়ে তিনবছর তিনি মন্ত্রিসভায় ছিলেন। অদ্ভুত স্বভাব ছিল তাঁর, একসঙ্গে দুজন নাপিত তাঁর চুল দাড়ি কাটত। পরবর্তীকালে সময় বাঁচাতে তিনি হিলেকাফ্রি যন্ত্র দিয়ে নিজেই নিজের চুল কাটতেন। তাঁর নিজের তৈরী একটি বিরাট ক্রস তাঁর বাগানবাড়ির পাশে ছিল যেখানে রাতে অঢেল আলোর ব্যবস্থা ছিল যাতে এই ক্রস চিহ্নটি দেখে সবসময় মনে পড়ে যে আয়ু সীমিত এবং মানুষ মৃত্যুর দিকেই ছুটছে। প্রত্যেকটি মুহূর্ত কাজে লাগানোই উচিত কারণ মৃত্যু কাছেই কোথাও আত্মগোপন করে রয়েছে।

জেনারেল বার্ণার্ড মণ্টগোমারী

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তাঁকে কবরখানার কবরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল অথচ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তিনিই ছিলেন সব চাইতে বিখ্যাত সেনাধ্যক্ষ।

গত ২৫০০ বছরে নয়শো দুটি যুদ্ধ পৃথিবীতে সংঘটিত হয়েছে, কিন্তু লর্ড মণ্টগোমারী নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করেছিলেন যুদ্ধকৌশলের। পনেরো সপ্তাহে তার সৈন্যদল জেনারেল রোমেল-এর অপ্রতিহত সৈন্যদলকে আফ্রিকার মরুভূমিতে পনের শত মাইল তাড়া করে নিয়ে গিয়েছিল। এই যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে জেনারেল মণ্টগোমারী তাঁর সৈন্যদের বলেছিলেন যে এই যুদ্ধই বিশ্বমহাযুদ্ধের ভাগ্য প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত করবে। করেও ছিল তাই। যদি তিনি সেই যুদ্ধে হেরে যেতেন তাহলে জার্মানী ইজিপ্ট এবং সুয়েজ ক্যানেল অধিকার করে বসে থাকত। অধিকার করে নিত ইরান আর ইরানের তৈলখনিগুলো, হয়তো ভারতবর্ষ জয় করে জাপানের সঙ্গে হাত মিলিয়ে রাশিয়া এবং চীনের রসদপথ আটকে দাঁড়াত।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তাঁর বুকে গুলী লেগে মৃতপ্রায় হয়েছিলেন তিনি, প্রায় জীবন্ত অবস্থাতেই তাঁকে কবর দেবার প্রস্তুতি চলছিল। তাঁকে কফিনে শোওয়ানোর মুহূর্তে ভাগ্যের জোরে একজন আরদালি তাঁকে জীবন্ত বলে সন্দেহ করে এবং তিনি বেঁচে উঠে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সবচেয়ে বিখ্যাত সৈনাধ্যক্ষ হিসেবে নিজেকে দাঁড় করান।

জাতে আইরিশ ছিলেন তিনি। জীবনের যা কিছু প্রেরণা সবটাই তিনি পেয়েছিলেন তাঁর মার কাছ থেকে। মা তাঁকে বিখ্যাত সব জীবনী পড়ে শোনাতেন—ক্রমওয়েল, ক্লাইভ, ড্রেক এবং নেলসনের জীবনী। পরে তিনি রয়াল মিলিটারী কলেজে

(স্যাণ্ডহার্স্ট) যোগ দেন। পরবর্তী চল্লিশ বছর তিনি আর্মি অফিসার হিসাবেই কাটান।

সেনাধ্যক্ষ হিসেবে তাঁর সাফল্যের মূল কারণ হল তাঁর মধ্যে একটি বিশেষ গুণ ছিল নেতৃত্ব দেওয়ারও এবং মানুষকে প্রেরণা জোগানোর। তাঁর মত ছিল যে যুদ্ধে জয়লাভ করার প্রথম এবং প্রধান রসদ হচ্ছে মানুষ। ট্যাংক নয়, সাঁজোয়া গাড়ি নয়, যুদ্ধজাহাজ নয়, বোমারু বিমান নয়—মানুষই যুদ্ধের সর্বশ্রেষ্ঠ উপকরণ"—

তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে—যুদ্ধের আগুন প্রত্যেকটি সৈন্যের চোখে জ্বলে উঠলেই তার উদ্দেশ্য সার্থক হবে। তিনি তাঁর সৈন্যদের আশ্বাস দিতেন এই বলে যে কোনদিন তিনি তাদের যথেষ্ট রসদ না দিয়ে যুদ্ধে যেতে বলবেন না। দুটো কঠিন নিয়ম তিনি সকলকে অনুসরণ করতে বলতেন—

১। কথনও তাড়াহুড়ো করে কোন কিছুতে লিপ্ত হবে না।

২। সাফল্য সম্পর্কে নিজে সম্পূর্ণ নিশ্চিত না হয়ে কোন আক্রমণ সংগঠিত করবে না।

এবিষয়ে তাঁর বক্তব্য ছিল—"আমি কোন যুদ্ধই শুরু করি না যে যুদ্ধে জেতার সম্ভাবনা নেই। যুদ্ধ সম্পর্কে চিন্তিত থাকলে জিতব কখন। আমি যতক্ষণ না তৈরী থাকি বরং ততক্ষণ অপেক্ষা করি।"

যুদ্ধ তাঁর পেশা ছিল না, ছিল কর্তব্য। যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর হেড কোয়ার্টার্সে বানিয়ানের পিলগ্রিমস প্রোগ্রেস এক কপি সব সময় রাখা থাকত। তিনি তাঁর সব অফিসারদের বলতেন বাইবেল পড়তে। তাঁর আদর্শ ছিল অলিভার ক্রমওয়েল। জেনারেল ম্যাকআর্থার, জেনারেল আইসেন হাওয়ার প্রভৃতি উচুদরের সেনাপতিদের মতন জেনারেল মণ্টগোমারীরও গভীর ধর্মবিশ্বাস ছিলেন। তিনি কোনদিন মদ খেতেন না, শপথ উচ্চারণ করতেন না, ধূমপান করতেন না, প্রতি রাতে প্রার্থনা করতেন এবং নিজ আয়ের এক-দশমাংশ চার্চকে দান করতেন।

শত্রুকে ঘৃণার কোন ব্যাপার ছিল না তাঁর। রোমেলের প্রধান সহকর্মী জেনারেল ফন থোমাকে গ্রেপ্তারের পরে তিনি নৈশ আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করেছিলেন তাঁকে।

যুদ্ধ পরিচালনার ব্যাপারে তিনি তাঁর সহকারীদের এমনভাবে তৈরী করতেন যে কোন ব্যাপারেই তাড়াহুড়ো করতে হ'তই না। যুদ্ধ শুরু হওয়ার একদিন আগেও তেমন তাড়াহুড়ো দেখা যেত না তাঁর ক্যাম্পে। খুব সহজেই ব্যাপারটার মোকাবিলা করতেন তিনি। তার কারণ ইতিমধ্যেই যুদ্ধজয় সম্পর্কে পরিকল্পনা রচিত হয়ে গেছে। তাঁর ধারণা ছিল বন্ধুদের গুলী ছোটার আগেই যুদ্ধ জেতা যায় এবং জেতা উচিতও, খুব সাবধানে পরিকল্পনা রচনা করে।

যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরেই আসলে তিনি নিশ্চিত হতেন বেশী। রোমেলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু হওয়ার একঘণ্টা আগে তিনি ঘুমোতে গিয়েছিলেন। সাড়ে চার ঘণ্টা পরে তাঁকে ঘুম থেকে তুলে অবস্থার বিশেষ বিবরণ জানানো হয়। তিনি চুপচাপ শোনেন, কিছু পরামর্শ—আদেশ দেন তারপর আবার বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়েন। অত্যন্ত সাবধানে পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন বলে তাঁর মধ্যে আশ্চর্য রকমের আত্মবিশ্বাস জন্মেছিল।

চল্লিশ বছর বয়সে জেনারেল মণ্টগোমারী বিয়ে করেন। একটি ছেলে আছে, তার নাম ডেভিড। স্ত্রী মারা যান ১৯৩৭ সালে। স্ত্রীর মৃত্যুতে খুবই ভেঙে পড়েছিলেন তিনি।

করডেল হাল

সতেরো বছর বয়স পর্যন্ত তিনি রেলগাড়িতেই উঠেন নি, অথচ পৃথিবীর প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন তিনি।

আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময়ে টেনাসির পাহাড় অঞ্চলে বিলিহাল নামে একটি ছেলে তার প্রতিবেশীর কাছ থেকে একটি গরুর বদলে একটি বন্দুক নিয়েছিল। প্রতিবেশীটি রাতে বিলির বাড়ি থেকে বন্দুকটি চুরি করে আনে। বিলি জানতে পেরে চোরটিকে যা তা গালাগালি দিয়ে বন্দুকটি ফেরত নিয়ে নেয়। চোর প্রতিবেশী বিলিকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য গেরিলা সৈন্যদের খবর দেয় যে বিলি আসলে চোরাই বন্দুক-এর ব্যবসা করে, সে বন্দুক সরবরাহ করে থাকে বিপ্লবীদের। সৈন্যরা বিলিকে খুঁজেপেতে গুলী করে মৃত মনে করে ফেলে রেখে যায়। বিলির মাথায় গুলী লেগেছিল। একটা চোখের মধ্য দিয়ে। ভাগ্যের জোরে বিলি বেঁচে যায় একজন কৃষকরমণীর সেবা শুশ্রূষায়। পড়াশুনার বালাই ছিল না বিলির। আদৌ লিখতে পড়তে জানত কিনা সন্দেহ। তার ছেলের নামই করডেল হাল।

করডেল হাল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সেক্রেটারী অফ স্টেট ছিলেন দীর্ঘ এগারো বছর। বাইশ বছর তিনি মার্কিন কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন। জীবনের দুই-তৃতীয়াংশ তিনি জনসংযোগের মধ্যেই কাটিয়েছিলেন। একজন আইনজীবী হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন তিনি আজীবন।

প্রায় অর্ধশতাব্দীর জনজীবনে করডেল হাল অসংখ্য বক্তৃতা দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর নিজের কাছে চৌদ্দ বছর বয়সে যে বক্তৃতাটি তিনি দিয়েছিলেন সেটাই ছিল শ্রেষ্ঠ বক্তৃতা। ব্যাপারটি

ছিল এই রকম—করডেল জানতেন যে তাদের পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে একজনকে তাঁর বাবা কলেজে পড়তে পাঠাবেন, কিন্তু কাকে সেটা কেউ জানে না। করডেলের ইচ্ছে ছিল কলেজে পড়ার। সেইজন্য বাবাকে খুশী করার জন্য তিনি স্থানীয় ডিবেটিং ক্লাবে ডিবেটে অংশ গ্রহন করলেন তিনি। বেশ কয়েকদিন সাংঘাতিক পড়াশুনা করলেন তিনি। তারপর ডিবেটের জায়গায় সমস্ত অধ্যাপকদের উপস্থিত থাকার অনুরোধ জানিয়ে এলেন। অসম্ভব পরিশ্রম করে পড়াশুনা করে এবং সর্বোপরি আত্মবিশ্বাস রেখে তিনি ডিবেটে জিতলেন। বলা বাহুল্য তাঁর বাবা তাকেই কলেজে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। কলেজে পড়ার সময়ে শহরে তিনি একটি ছোট ঘরে রান্না করে খেতেন, ছুটির দিনে বারো মাইল হেঁটে বাড়ি এসে আবার ফিরে যেতেন। সারা জীবন ধরে করডেল হাল-এর স্বপ্ন এবং সাধনা ছিল রাজনীতি করার। বক্তৃতা দেওয়ার এবং শোনার এত আগ্রহ ছিল তাঁর যে বাবার কাছ থেকে পারিশ্রমিক দিয়ে তিনি একজন কংগ্রেস ম্যানকে নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াতেন গাড়ি করে। যাতে ওই কংগ্রেস ম্যানটির বক্তৃতা শুনতে পান সব সময়ে। ইতিমধ্যে আইন পরীক্ষায় পাস করেন তিনি এবং ভোট দেওয়ার বয়স হওয়ার আগেই কোর্টে প্র্যাকটেস শুরু করেন। যথারীতি ব্রীফের দেখা নেই। একুশ বছর বয়স হওয়ার আগেই তিনি রাজনীতিতে যোগ দেন, স্টেট লেজিসলেটিভ বডিতে নির্বাচিত হন। করডেলের একুশ বছর এই বডির অধিবেশন বসতে বসতে হয়ে যাওয়াতে কোন অসুবিধার সৃষ্টি হয়নি। ৩২ বছর বয়সে তিনি বিচারপতি হন। বিচারপতি থাকাকালীন তিনি অত্যন্ত কঠোর নিয়ম পালন করতেন। এমন কি নিজের বাবাকেও একবার ফাইন করে দিয়েছিলেন। ৩৫ বছর বয়সে জজ হলে কংগ্রেসে নির্বাচিত হন এবং ১৯০৬ সালে ওয়াশিংটনে আসেন। তিনিই আমেরিকায় প্রথম ইনকাম ট্যাক্স আইনের খসড়া করেন—ইনহেরিটেন্স আইন।

সাধারণতঃ বিশদ খাবারের আয়োজন তার পছন্দ ছিল না। নিমন্ত্রণ তিনি পারতপক্ষে একেবারে অপারক না হলে নিতেনই না। নিজেও খুব একটা খাওয়া-দাওয়া করতেন না। ছেচল্লিশ বছর বয়সে তিনি বিয়ে করেন। কোন সন্তান হয়নি তাঁদের। ওয়াশিংটনে হোটেল কার্লটনে সাত কামরায় সুটে থাকাকালীন কেউ এলে নিজেই সাধারণতঃ দরজা খুলে দিতেন।

করডেল হালকে খেপানো খুব কঠিন কাজ ছিল। পার্ল হারবারের পতনের মাস খানেক আগে করডেল হাল সকলকে সাবধান করে বলছিলেন—'সাবধান—জাপান আক্রমণ করবে খুব শিগগিরই।

এমনএকদিন ছিল যে খালি পায়ে গ্রামে বাস করত সতেরো বছর বয়স পর্যন্ত। সতেরো বছর বয়স পর্যন্ত সে কোনদিন রেলগাড়িতে চড়ে নি। অথচ পরবর্তী জীবনে মার্কিন যুদ্ধবিষয়ক কংগ্রেসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সভ্য ছিলেন তিনি। সারা জীবনে করডেল হালের দেওয়া অসংখ্য বক্তৃতা এখনও মানুষজন মনোযোগ দিয়ে পড়ে থাকে।

একটা সময় ছিল যখন তিনি গুদামঘরের চাকরীর অনুপযুক্ত ছিলেন। পরবর্তীকালে আমেরিকার প্রিয় কমেডিয়ানের কাজটি কিন্তু সার্থকভাবেই করেছিলেন।

বিন ক্রসবীর প্রতিবেশী বব হোপই একমাত্র আমার জানা শোনার মধ্যে যিনি ৮০,০০০ মাইল ভ্রমণ করেছিলেন একটু হাসির জন্য। হ্যাঁ আমেরিকার সৈন্যবাহিনীর মুখে হাসি ফোটাতে বব হোপ আশীহাজার মাইল ভ্রমণ করেছিলেন। এবং এই কাজে তাঁকে লক্ষ্য করে বোমা ছোঁড়া হয়েছিল আলজিয়ার্সে। ইটালীতে তিনি আটকে গিয়েছিলেন।

স্টেজে অভিনেতাদের মধ্যে বব হোপের রেকর্ড আজও অম্লান রয়ে গেছে। যুদ্ধের সময়ে তিনিই প্রথম যিনি হাস্যকৌতুকের মাধ্যমে সৈন্যবাহিনীর মানসিকতা অক্ষুন্ন রাখার কথা ভেবেছিলেন। শুধু ইয়োরোপ নয় এই কাজে তিনি প্রত্যেকটি ট্রেনিং সেণ্টারে এমন কি আলাস্কাতেও নিজে উপস্থিত থেকেছিলেন।

যদিও সর্ববিষয়ে তাঁর ব্যবহার ছিল মার্কিনী তবু আসলে তিনি ইংলিস ছিলেন নিঃসন্দেহে। তাঁর পিতামাতা ক্লিভ্‌ল্যাণ্ড এ আসেন এবং সাত বছর বয়স হতে না হতেই বব হোপ অভিনয় তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য বলে স্থির করে ফেলেছিলেন।

প্রথম জীবনে স্থানীয় চার্চের একটি উৎসবের দিনে ছোট ববের একটি কবিতা আবৃত্তি করার কথা ছিল। স্টেজে উঠে কিছুটা বলার পরে কবিতাটি বেমালুম ভুলে যায় সে। অন্য বাচ্চাদের মতন পালিয়ে না গিয়ে বব দর্শকদের সামনে মজা করার জন্য একটু অঙ্গভঙ্গী-সহকারে স্টেজে রো করতে থাকে। দর্শকরা বিরক্ত হওয়ার বদলে আনন্দে খুশী হয়।

বারো বছর পরে অভিনয়ের প্রতি তার এতটা দুর্বলতা ছিল যে একটি মোটর কারখানায় চাকরী করতে করতে উপর ওয়ালার ডিক্টোফোনে কয়েকজন লোককে নিয়ে একটি গানের আয়োজন করেন সারারাত। বেশ কিছুদিন চলে কিন্তু মালিক একদিন জানতে পারলে বব হোপের চাকরিটা যায়।

অনেক ভেবেচিন্তে বব অভিনয়ের দিকে আরও বেশী ঝুঁকে পড়েন। সম্পূর্ণ কপর্দকশূন্য অবস্থা তাঁর সেই সময়ে। একদিন থিয়েটারের দৈনিক দর্শকদের কাছে কিছু একটা ঘোষণা করার জন্য অনুরোধ আসে। এই সূত্রে দশমিনিট দর্শকরা উল্লাসে ফেটে পড়ে। স্টেজের ম্যানেজার তাঁকে উপদেশ দেন মনোলসের অভিনয় করার জন্য। সেই উপদেশ মেনে নিয়েছিলেন বব হোপ।

পরবর্তী কালে তাঁর রোজগার ছিল বছরে ৮০,০০০ পাউণ্ড। হলিউডের সবাই বলাবলি করত যে বব জানে কি করে টাকা জমাতে হয়। একবার ব্যাংকের ম্যানেজারের কাছে একজন দালাল বসে অনুরোধ করেছিল বব হোপের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে যাতে সে ববের ম্যানেজারের কাজটি পেতে পারে। ব্যাঙ্কের ম্যানেজার উত্তরে দালালটিকে বলেছিল যে ববকে সে দীর্ঘকালই চেনে এবং দালালের টাকার যদি কিছু লগ্নীর পরিকল্পনা করতে হয় তাহলে বব করলেই বরং সেটা ভালো হবে।

একদম চুপচাপ বসে থাকার লোক ছিলেন না তিনি। এত বেশী ধরনের কাজ তিনি একসাথে করতেন যে লোক তাকে 'তাড়াহুড়ো মশায়' নাম দিয়েছিল।

যে সমস্ত হাসির গল্প বলে বব বিশ্ববিখ্যাত হয়েছিলেন সেগুলো তৈরী করতে তাঁকে পরিশ্রম করতে হত কম নয়। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে অনেক ভেবে তৈরী করতে হত তাঁকে সেই সব বিখ্যাত গল্পগুলি। জীবনে তাঁর সব চাইতে প্রিয় সম্পদ ছিল ভিতরের ঘরে রাখা একটা ফাইল। ফাইল ভর্তি হাসির গল্প, এই বেডরুমটির চাবি

একমাত্র তাঁর কাছেই রাখতেন। এছাড়া তার কাজের জন্য ছটি Gag writer-দের কাজ ছিল সারাবছর হাসির গল্পের খোরাক যোগাড় করে রাখা।

১৩০ মিলিয়ন লোকজন বছরে তার হাস্যকৌতুকের অংশীদার থাকতেন একমাত্র নিজের স্ত্রী ডলোর্স ছাড়া। ডলোর্সের মতে বব বাড়িতে হাসিঠাট্টা করলে সেটা হাসিঠাট্টাই মনে হত না।

অন্য অনেক অভিনেতার মতন ববেরও কুসংস্কার ছিল। প্যারামাউন্ট স্টুডিও থেকে প্রস্তাব দিয়েছিল যে ববের জন্য একটা নূতন ড্রেসিং রুম করতে চায়। কিন্তু প্রথম ছবিটিতে বব অভিনয়ের সাজ যে ড্রেসিং রুমে সেজে ছিলেন সেই ড্রেসিংরুমটি তিনি কিছুতেই ছাড়তে রাজী হননি। একটা কার্বার্ডের মতনই জায়গাটি। এখন ওই কার্বার্ডকে ঘিরে অনেক ঘর করা হয়েছে। বব হোপ তাঁর সেই পুরোন আয়নাটা তাঁর নিজের ব্যবহারের জন্য রেখেছেন।

বব হোপের আশা ছিল একবার তিনি অস্কার পুরস্কার পাবেন। কিন্তু অস্কার পান বা নাই পান জনচিত্ত জয় তিনি করেছিলেন দীর্ঘ কাল আগেই। বলা বাহুল্য একটি যুবকের মুখের কথাটি চমৎকার মনে হল—"আমি আজীবন একটি বিষয়েই গুরুগম্ভীরভাবে গ্রহণ করেছি—এবং সেটা হচ্ছে একটি হাসি"—প্রাণ খোলা হাসি।"

মুসোলিনি

তিনি আদেশ করেছিলেন সশস্ত্র ইতালিয়ানদের এই বলে যে—"বিপজ্জনকভাবে বাঁচো"—অথচ তিনি নিজেই অন্ধকার রাতে বাড়ি ফিরতে ভয় পেতেন।

গত শতাব্দী শেষ হতে না হতে একজনের হঠাৎ চাকরী চলে যায়। মানুষটি শুনেছিল যে আমেরিকাতে টাকা বাতাসে ছড়িয়ে আছে, শুধু কুড়িয়ে নেওয়ার অপেক্ষা। ফলে একদিন তিনি একটা পয়সা নিয়ে টুং করে বাতাসে ছুঁড়লেন। যদি হেড হয় তবে আমেরিকা চলে যাবেন—টেল হলে সুইজারল্যাণ্ডেই থেকে যাবেন। টেল পড়ল—সেই ঘটনাতে ইতিহাসের গতিই গেল বদলে। যদি ভদ্রলোকটি আমেরিকাতে যেতেন তাহলে ইতালী নিশ্চয়ই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ত না। তার কারণ যে মানুষটি বাতাসে পয়সাটি ছুঁড়েছিল তার নাম বেনিটো মুসোলিনি। বলা কি যায় মুসোলিনি ইতালীর ডিক্টেটর না হলে হয়তো হিটলার অতটা ক্ষমতাশালী হতেনই না! মুসোলিনি যখন ক্ষমতা গ্রাস করছেন হিটলার তখন কোথায়! মুসোলিনির কাছ থেকেই হিটলার শিখেছিলেন ক্ষমতা কি করে কেড়ে নিতে হয় এবং কি করে ডিক্টেটর হওয়া যায়।

১৯০৪ সালে মুসোলিনি পাসপোর্ট জাল করে ইতালী থেকে সুইজারল্যাণ্ডে পালিয়ে গিয়েছিলেন, পাছে সৈন্যদলে যোগ দিতে হয় সেই ভয়ে। একটি রেল স্টেশনে কুলির কাজ করতে থাকেন তিনি। মাল বয়ে নিয়ে যেতেন প্যাসেঞ্জারদের এবং বখশিস নিতেন। একটি মাংসের দোকানেও তিনি ডেলিভারি বয়এর কাজ করতেন। কিন্তু সব সময়েই দেখা যেত তিনি মালিকদের

সঙ্গে ঝগড়া করছেন আর বার বার চাকরী চলে যাচ্ছে তাঁর। এমন অনেক সময় হয়েছে যখন তিনি কপর্দকশূন্য হয়েছেন, ব্রীজের নীচে মাটিতে শুয়ে রাত কাটিয়েছিলেন। জামাকাপড প্রায়ই তাঁর নোংরা, শতচ্ছিন্ন থাকত। ক্ষিদের জ্বালায় পাগল হয়ে রাস্তায় ভিক্ষেও করেছেন অনেক দিন। একবার তিনি পার্কে পিকনিক করতে ব্যস্ত দুজন মহিলার কাছ থেকে রুটি চুরি করেছিলেন। একবার একটি সোনার ঘড়িও চুরি করেছিলেন। পুলিস তাঁকে গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠিয়েছিল এগারো বার।

শৈশবে মুসোলিনির শোবার কোন বিছানা ছিল না। কুকুরের মতন একগোছা খড়ের ওপরে তাঁর শোবার বন্দোবস্ত ছিল। দারিদ্র্য এবং ঘৃণার পরিবেশে মানুষ হয়েছিলেন তিনি। তার বাবা প্রথম ছিলেন একজন কামার। সারাজীবন ধনীদের, এবং সরকারকে ঘৃণা করতেন, আর ঘৃণা করতেন চার্চকে। বৈপ্লবিক কাজকর্মের দায়ে মুসোলিনীর বাবা তিনবছরের জন্য জেলে গিয়েছিলেন। মেক্সিকোর ইতিহাসে দুর্ধর্ষ বিপ্লবী বেনিটো জুয়ারেজ-এর নামের অনুকরণে তিনি ছেলের নাম রেখেছিলেন বেনিটো।

এইরকম ঘৃণা, বিপ্লব এবং দারিদ্র্যের মধ্যে বড় হয়েছিলেন মুসোলিনি। একবার তিনি বলেছিলেন—"গাঁয়ের চোর ছিলাম আমি, সব সময়েই হাতাহাতি করতে প্রস্তুত ছিলাম। প্রায়ই বাড়িতে ফিরতাম ভাঙা হাত পা মাথা নিয়ে। তার প্রতিশোধ কি করে নিতে হয় তাও জানতাম আমি।"

মুসোলিনি হিটলারের মতনই ক্ষমতা হাতে নিয়ে ছেলেবেলায় হতমান পরিস্থিতির প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলেন। হাতাহাতি করতে তিনি সব সময়ই তৈরী থাকতেন, তবে নিজের চাইতে বয়স কম এমন ছেলে যারা তার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবে না তাদের কাছেই ছিল তার কাণ্ডপ্রদর্শন। চল্লিশ বছর পরে অসহায় ছোট ছোট দেশগুলি, যেগুলো আত্মরক্ষা করতে অক্ষম তাদেরকে আক্রমণ

এবং অত্যাচার করতে দ্বিধা করেন নি—যেমন ইথিওপিয়া, আলবানিয়া এবং গ্রীস।

সারা জীবনই মুসোলিনি আক্রমণ করেছেন লুকিয়ে চুরিয়ে রাতের অন্ধকারে। চোরা গোপ্তা আক্রমণই ছিল তাঁর লক্ষ্য। যখন ছোট ছিলেন তখন একটি ছেলে তাঁকে চড় মারলে একটা ছোট পাথরের টুকরো লুকিয়ে হঠাৎ পিছন থেকে তিনি ওই ছেলেটিকে আক্রমণ করে 'ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছিলেন তার সারা মুখ। ইতালীয় ডিক্টেটর হওয়ার পরেও তিনি এই গল্পটি সকলকে বলতে ভালবাসতেন।

চার্চের স্কুল থেকে তাঁকে বিতাড়িত করা হয়েছিল এই বলে যে —"তোমার হৃদয় নরকের মতন সমাকীর্ণ"—

মুসোলিনি তাঁর ছেলেবেলার এই সব কুকীর্তির জন্য কোনদিন অনুতপ্ত ছিলেন না। নিজেকে ছাড়া আর সবাইকেই অভিযুক্ত করতেন তিনি। অনেক বছর পরে তিনি বলেছিলেন—"আমার প্রতি কেউ স্নেহপূর্ণ ব্যবহার করে নি। যখন ছোট ছিলাম দরিদ্র পরিবেশে জীবন কেটেছে আমার। তাহলে স্নেহমমতা কোথায় শিখব আমি। না কোথাও নয়। তাহলে লোকজনেরা কেন আমাকে অযথা গালাগালি দেয় কঠিন বলে, নিষ্ঠুর বলে, কে জানে"—

যখন যেখানে গেছেন তিনি ঘৃণা এবং সংশয়ের বীজ বপন করেছেন। মুসোলিনি তাঁর দেশবাসীকে উপদেশ দিয়েছিলেন যে "—বিপজ্জনক ভাবে বাঁচো"—অথচ নিজে এমন ভীতু ছিলেন যে "আভন্টি" নামে সোস্যালিস্ট কাগজের সম্পাদক যখন ছিলেন তখন সবসময়ে একটা ছুরি আর গুলীভরা রিভলভার সঙ্গে রাখতেন। সেই সময়ে তাঁর যে সহকারী সম্পাদক ছিল তিনি একজন মহিলা। সম্ভবতঃ তিনি মুসোলিনিকে সেই সময়ে যতটা ভাল করে চিনতেন অন্য কেউ সেরকম চিনত না। এই মহিলাটি একবার স্বীকার

করেছিলেন যে মুসোলিনির শারীরিক ভয় এমন ছিল যে সবাই আশ্চর্য হয়ে যেত। মুসোলিনি স্বীকার করেছিলেন মেয়েটির কাছে যে এমন কি ছায়াকেও ভয় পেতেন তিনি। এত ভীতু ছিলেন যে রাতে একা বাড়ি যেতে ভয় লাগত। অফিসের লোকজনদের কাছে ব্যাপারটা জানাতে লজ্জা করত তাঁর। ফলে তাঁর মেয়ে সহকর্মীটিকে রোজ তাঁর সঙ্গে বাড়ী পর্যন্ত যেতে অনুরোধ করতেন। মেয়েটি তাঁকে তাঁর দরজা পর্যন্ত পেঁীছে দিয়ে তারপর একা একা নিজের বাড়িতে যেত। এইসব কথা মহিলা নিজেই একটি স্মৃতিকথায় লিখেছেন বলেই জানা গেছে। ডিক্টেটর হওয়ার পরে সাতবার মুসোলিনিকে হত্যা করার চেষ্টা হয়। মুসোলিনি এত বেশী ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন তারপর থেকে যে, পনেরো হাজার সৈন্যের একটি দল দিয়ে সারাক্ষণ নিজের বাড়ি এবং অফিস ঘিরে রাখতেন।

পনেরো বছর পর্যন্ত অক্ষর পরিচয় হয়নি মুসোলিনির। পরবর্তী কালে অনেক পড়াশুনা তিনি করতেন সন্দেহ নেই কিন্তু তা সত্ত্বেও যথেষ্ট কুসংস্কার ছিল তাঁর। যেমন তাঁর ধারণা ছিল যে মানুষের নিয়তির ওপর চাঁদের প্রভাব খুব বেশী। তিনি চন্দ্রালোকে খোলা জায়গায় ঘুমোতে পারতেন না। তিনি বিশ্বাস করতেন যে এক প্যাকেট তাসের দিকে তাকিয়ে তিনি অন্যদের ভালবাসা দিতে পারেন। রোম অধিকার করতে যাত্রা শুরু করার আগে তিনি টেবিলের ওপরে এক প্যাকেট তাস ছড়িয়ে একবার নয় বারবার লক্ষ্য করেছিলেন, কি চিহ্ন পান সেটা দেখতে। মুসোলিনি নিজে তাঁর জীবনীর ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন এবং সেই জীবনীতে এই সব খবর তিনি অস্বীকার কারনে নি।

মুসোলিনি নিউরোটিক ছিলেন সন্দেহ নেই। নিজেকে দ্বিতীয় জুলিয়াস সীজার ভাবতেন সব সময়েই। সীজারের মতন ভঙ্গীতে তিনি স্থাপত্যশিল্পীদের আদেশ করেছিলেন তাঁর মূর্তি তৈরী করতে। ১৯২৬ সালে যখন তিনি ত্রিপোলিতে গিয়েছিলেন তিনি নিজের

হাতে হাজার হাজার রঙিন পোস্টার অনুমোদন করেছিলেন যে পোস্টারে লেখা ছিল—"Hail caeser"—

মুসোলিনি একবার ঘোষণা করেছিলেন—"আমার উইল দিয়ে আমি ইতিহাসে নজীর স্থাপন করতে চাই। যেমন একটি সিংহ তার নখ দিয়ে গভীর দাগ কাটে, আমিও সেই রকম দাগ কাটতে চাই ইতিহাসের শরীরে। এই বন্য কামনায় আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি। আমার সমস্ত সত্তা এবং অস্তিত্বই এই চিন্তায় বিভোর"—

এই চারটি ব্যাপারের দ্বারা মুসোলিনির জীবন খুব সহজে বোঝা যাবে। এমন চমৎকার একটি স্বীকারোক্তি একজনের যে পাঁচলক্ষ লোককে রক্তাক্ত যুদ্ধের দিকে ঠেলে দিচ্ছে-যাতে তার নিজের সম্মান ইতিহাসের পাতায় উজ্জ্বলতর হয়ে উঠে ছিল বিংশ শতাব্দীর জুলিয়াস সীজারের মতন।

বিং ক্রসবি

সারা পৃথিবীতে সবচাইতে মূল্যবান সংগীতশিল্পী কে জানেন—এমন একজন যিনি সারা জীবনে কোনদিন সংগীতের শিক্ষা গ্রহণ করেন নি। গানের ব্যাপারে একটি প্রাকৃতিক দুর্ঘটনাই সবচেয়ে বেশী কাজ করেছিল বলা যেতে পারে, কারণ তাঁর ভোকাল কর্ডটি অত্যন্ত দুর্বলভাবে তৈরী ছিল।

তাঁর নাম হ্যারী লিনি ক্রসবি—"আপনারা সবাই যাকে "বিং" বলেই জানেন। বিং এক বছরে ১৫০,০০০ পাউণ্ড পর্যন্ত রোজগার করেছেন। ১৯৪৩ সালে ফ্রাংকলিন ডি রুজভেল্ট এবং উইনস্টান চার্চিলের সম্মিলিত রোজগারের সাতগুণ বেশী রোজগার করেছিলেন।

তাঁর এই সাফল্যের ইতিহাসটি চমকপ্রদ। ১৯০৪ সালে জন্মেছিলেন তিনি। মাথায় চুল এত কম ছিল যে সব সময় টুপি পরে চলতে হত তাকে। কান দুটো এত বৃহৎ ছিল যে ছবি তোলার সময় কান দুটোকে মাথার পিছন দিকে ঠেলে রাখতে হত। প্রেমের দৃশ্যের অভিনয়ে স্যুটিং চলাকালীনও তিনি এক খণ্ড চুইংগাম মুখে পুরে রাখতেন অথচ লক্ষ লক্ষ মহিলার স্বপ্নের পুরুষ ছিলেন তিনি। লক্ষ লক্ষ পুরুষের ইচ্ছার বিষয়। জেনারেল ম্যাক আর্থার যখন যুদ্ধের একটি কঠিন পরিস্থিতিতে পড়ে আছেন তখন রুজভেল্ট তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে কি করলেসৈন্যদের মানসিক স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকবে। ম্যাক আর্থার উত্তর দিয়েছিলেন যে—"বিং ক্রসবি"

কয়েক বছর আগে যখন ডাঃ থর্নওয়েল জেকবকে (ওগ্লথর্প বিশ্ববিদ্যালয়) টাইম ভল্টে রাখার মতন জিনিসপত্রের তালিকা

প্রস্তুত করতে বলা হয়েছিল, যে টাইম ভল্টটি ছ-হাজার বছরের আগে খোলার কথা নেই, ডাঃ জেকব নির্দ্বিধায় বিং ক্রসবির রেকর্ড রাখার প্রস্তাব করেছিলেন। অর্থাৎ এখন থেকে ছহাজার বছর পরে যে কেউ গ্রামোফোনগুলিতে বিং ক্রসবির রেকর্ড নিশ্চয়ই শুনতে পাবে টাইম ভল্টের কল্যানে।

তাঁর এই সাফল্যের কারণটি কি? কি এই মনকাড়া গলার স্বরটির ইতিহাস। ডাক্তারদের মতে ছোট ছোট ফুস্কুরি গলায় থাকার কারণেই এই ব্যাপার। কিছুদিন আগে একজন বিখ্যাত সার্জেন ওগুলর অপারেশনের প্রস্তাব দিতে বিং বলেছিলেন—না মশাই আমার আগের স্বর শুনলে মনে হবে যেন বৃষ্টির মধ্যে থেকে গাইছি" —এই ফুস্কুরিগুলো ইনসিওর করা হয়েছিল ২০,০০০ পাউণ্ডে।

অনেকেই অভিযোগ করেছেন যে বিং আসলে খুবই অলস প্রকৃতির লোক। ভাগ্য সুপ্রসন্ন বলে তিনি সব পেয়ে গেছেন। একটুও কসরৎ করতে হয়নি সেজন্য। তাহলে বিশদভাবে বলা যাক। স্পেনেএ তখন তিনি থাকতেন। শৈশবে যখন অন্য ছেলে-মেয়েরা ছুটি কাটাচ্ছে মজা করে তখন বিং ক্রসবিকে একটি আচারের কারখানায় কাজ করতে হচ্ছে। আচার শিশিতে ভর্তি না করলে, খবরের কাগজ বিলি না করলে, খড় না কাটলে তাঁর খাবার জুটত না। প্রথম নাম কেনার সময় থেকেই তিনি দিনে পাঁচবার প্যারামাউন্ট থিয়েটারে উপস্থিত থাকতেন। রেডিওতে গান গাওয়ার জন্য ছোটা। রেকর্ড করতে ছোটার দিনই। লোকে যাই বলুক, বিং বলত—"আমার ভাগ্যটি নেহাতই ভালো"। শারীরিক ভাবে তাকে অমানুষিক পরিশ্রম করতেই হত।

যদি কেউ তাঁকে জিজ্ঞেস করত যে কোন একটি সবচেয়ে গুরুত্ব-পূর্ণ বিষয়ের কারণে তাঁর এই সাফল্য—তাহলে উত্তরে শুনতে পেত সে যে কথা বলার একটি কোর্সে সে ভরতি হয়েছিল সেটাই। সেই কথা বলার কোর্সেই তিনি কিভাবে থামতে হয়, কথা সুন্দর

ভাবে বলার কৌশল শিখেছিলেন তিনি। তিনি বলতেন—"আমার যা কিছু সাফল্য সব কিছুর মূলে কিন্তু ওই ছোট্ট কথা বলার কোর্সে শিক্ষা নেওয়া"—

যদিও বিং ক্রসবি লক্ষ লক্ষ মহিলার স্বপ্নের পুরুষ, অথচ বিয়ের জন্য যাঁকে তিনি প্রস্তাব করেছিলেন তিনি "ডিক্সি লী", তিনি তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তখন তাঁর মতে বিং একজন অভিনেতা ছাড়া কিছুই নয়।

এই ঘটনায় বিং-এর চোখ খুলে গেল। রাতারাতি তিনি তাঁর অর্থনৈতিক ব্যাপারটা বাবার হাতে দিয়েদিলেন এবং নিয়ন্ত্রিত জীবন যাপন করতে লাগলেন। প্রত্যেক রবিবার চার্চে যাওয়া শুরু করলেন। অবশ্য ডিক্সি লীর সঙ্গেই তাঁর বিয়ে হয়েছিল কিছুদিন পরে। চারটি চমৎকার ছেলে আছে তাঁদের।

সাঁতার কাটতে খুব ভালবাসতেন তিনি, গলফ্ খেলতেও। ছোট গল্প লিখেছেন কিছু—সিনেমার জন্য চিত্রনাট্য লিখেছেন কয়েকটি। শান্ত স্নিগ্ধ চমৎকার স্বাস্থ্যকর সংসার ও সুখী পরিবারের মধ্যে বাস করেছেন তিনি।

জেনারেল জর্জ-সি-মার্শাল

তিনি খবর সৃষ্টি করতেন বটে কিন্তু কোনদিন শোনার জন্য অপেক্ষা করেন নি।

জেনারেল জর্জ সি মার্শাল ছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্য-বিভাগের এক নম্বর ব্যক্তি "চীফ অফ স্টাফ"।

প্রাক্তন চীফ অফ স্টাফ জেনারেল জে ফ্রাংকলিন জর্জ মার্শালের সংগে ফিলিপাইনস্-এ একসাথে কাজ করেছিলেন। তার মতে জেনারেল মার্শাল অসাধারণ মিলিটারী প্রতিভার অধিকারী যার মতন তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন জেনারেল স্টোনওয়েল জ্যাকসনের পরে আর কেউ আসেন নি।

জেনারেল পারশিং যিনি প্রথম মহাযুদ্ধে ইয়োরোপে মার্কিন সৈন্য পরিচালনা করেছিলেন এবং যিনি নিজে জেনারেল মার্শালকে চীফ অফ অপারেশন-এর পদে উন্নিত করেছিলেন, জেনারেল মার্শাল সম্পর্কে তার ধারণাও ছিল জেনারেল বেলের অনুরূপ চীফ অফ আপারেশন ফার্স্ট আর্মি, ইয়োরোপে থাকাকালীন জেনারেল মার্শাল চমৎকার ভাবে একটি দুরূহ সমস্যার সমাধান করেছিলেন। নিরাপদে এবং জার্মান সৈন্যের চোখ এড়িয়ে একবার পাঁচ লক্ষ সৈন্য, ৩ হাজার বন্দুক, ৪০ হাজার গোলাবারুদ, ৩৪টি হাসপাতাল সেণ্ট মিহাইল থেকে আরগন এ পাঠানোর দরকার ছিল। জেনারেল মার্শাল রাতের অন্ধকার এমন সুন্দর ভাবে সে কাজটি করেছিলেন যে জার্মানরা জানতে পারল তখনই যখন আরগন থেকে তাদের ওপরে ওই পাঁচ লক্ষ সৈন্য ঝাঁপিয়ে পড়ল। লিংকন তাই জেনারেল মার্শাল সম্পর্কে একবার বলেছিলেন—"একজন নেতার মানসিক ব্যাপারের ওপরে কত কিছু যে নির্ভর করে।"—

চীফ অফ স্টাফ থাকাকালীন তিনি প্রথমেই তিন হাজার বাছাই করা সৈন্যদের কাছে একটি প্রশ্নপত্র পাঠিয়েছিলেন যে গুলি তারা উত্তর দিয়ে বিনাদ্বিধায় নীচে নাম সইকরবে। প্রশ্নগুলো ছিল এইরকম—

১। আপনি কি আপনার উপরওয়ালা অফিসারকে পছন্দ করেন,

২। যদি করেন তাহলে বলুন কেন করেন,

৩। যদি না করেন তাহলে বলুন কেন করেন না।

৪। আপনার মতে সৈন্যবিভাগের আরও বেশী উন্নতি কিভাব করা যায়।

হয়ত অনেকেই ছিলেন যারা এই সরাসরি কথোপকথন সৈন্য-বিভাগে অন্তত একদম পছন্দ করেন নি। কিন্তু ব্যাপারটিতে নীট লাভ যেটা হয়েছিল সেটা হচ্ছে—সৈন্যবিভাগের ট্রেনিং কোর্সটি আরও মানবিক হয়ে উঠেছিল।

প্রথম জীবনে স্পোর্টসম্যানসিপ তাঁর এত ছিল যে একজন ছাত্র তাকে বেওনটের আঘাতে প্রায় মৃতপ্রায় করে ফেললেও শত অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি ছেলেটির নাম বলে দেন নি কাউকে। ভার্জিনিয়ায় মিলিটারী ইনস্টিট্যুটে থাকার সময়েও তার কাজকর্ম খুবই ভাল হয়ে ছিল।

যদিও চীফ অফ স্টাফ হিসাবে কাজ করার সময়ই তাকে অমানুষিক পরিশ্রম করতে হত, দায়িত্ব বহন করতে হত অপরিসীম তবুও তাকে দেখলে কোনদিন মনে হত না যে তার কোন তাড়াহুড়া আছে। তার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন যে—যত কঠিন কাজই হোক না কেন জর্জ মার্শাল কোনদিন এক মুহূর্তের জন্যও নার্ভাস হতেন না। তার কাজ করার ধরণ-ধারণটাই ছিল আলাদা।

প্রথম—তিনি লম্বা বিশদ কোন রিপোর্ট পড়তেন না। সংক্ষিপ্ত ছোট রিপোর্টই কেবল তিনি পড়তেন,

দ্বিতীয়—খুব দ্রুত পড়ার অভ্যাস ছিল তার। সংগে সংগে মনোসংযোগ করতে পারতেন।

তৃতীয়—কোন মিলিটারী সিদ্ধান্ত নেয়ার পরে তিনি সেই ব্যাপারে সময় কিংবা শক্তি আর অপচয় করতেন না। সির্দ্ধান্ত একবার নিয়ে ফেললে প্রানপনে চেষ্টা করতেন কাজটি সিদ্ধ করতে।

চতুর্থ—মিলিটারী সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়টি সম্পর্কে তার বিস্তারিত জ্ঞান ছিল। সব কিছুই যেমনটি তেমনটি ভাবেই থাকত তার মনে, মুখস্থ বলে দিতে পারতেন তিনি।

পঞ্চম—তিনি খুব সকালে উঠে দিন শুরু করার কথা ভাবতেন। সাড়ে সাতটার মধ্যে তার রাতের খাওয়া শেষ এবং সকাল সাড়ে সাতটার মধ্যে নিজের অফিসে উপস্থিত হতেন। দিনের বেলায় ঘুমোন অপছন্দ করতেন তিনি। হেঁটে বাড়ি ফিরতেন মিসেস মার্শাল তাদের দীর্ঘ তের বছরের বিবাহিত জীবনে কোন সমস্যা নিয়ে বড় বেশী একটা চিন্তা ভাবনা করতে দেখেন নি। ঘরে থাকলে এক্‌মিনিট ঘুম কামাই হত না তাঁর।

মিসেস মার্শালের কথায়—দীর্ঘকাল সৈন্যবিভাগে চরম ডিসিপ্লিন-এর মধ্যে থাকার ফলে মার্শাল নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করার আর্ট'টি এমনই শিখে নিয়েছিলেন যে আত্মনিয়ন্ত্রনের অদ্ভুত উদাহরণ হিসাবে পরিচিত হয়ে থাকবেন।

যখন কাজের চাপ থাকত না তখন অন্যান্য খেলাধূলো করতেন। বিছানায় শুয়ে শুয়ে পড়াশুনা করতেন। যদিও দিনে তিন প্যাকেট সিগারেট খেতেন তবু একদিন হঠাৎ সেটাও ছেড়ে দিয়েছিলেন অতঃপর কোনদিনই আর সিগারেট খান নি। পাব্লিক লাইব্রেরী থেকে বইপত্র এনে পড়াশুনা করতেন তিনি নিয়মিত ভাবে।

মাত্র হুজনকেই জেনারেল মার্শাল শ্রদ্ধা করতেন—একজন

হলেন বেঞ্জামীন ফ্রাংকলিন এবং অন্যজন রবার্ট-ই লিয়ের। একটি বই তিনি দিনের দিন পড়েও কখনো ক্লান্ত হতেন না, বইটি বেঞ্জামীন ফ্র্যাংকলিনের আত্মজীবনী।

একদিন মিসেস মার্শাল তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে সমস্ত আর্মির চীফ হওয়ার বদলে আর কি হলে তিনি খুশী হতেন। মার্শাল কিছু না ভেবেই উত্তর দিয়েছিলেন—"কেন বড় কোন সিমফোনীর একজন কনডাকটার হতে পারলেই খুশী হতেন সবচেয়ে বেশী।"

জেনারেল চার্লস উইনগেট

লোকে বলত সুইসাইড ব্রিগেড পরিচালনা করতেন তিনি কিন্তু সবাইকে ঘরে ফিরিয়ে এনেছিলেন।

জেনারেল উইনগেট এশিয়ার জঙ্গলে মিত্রপক্ষের হয়ে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন। চারটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ তারা করেছিলেন।

১। উইনগেটে সৈন্যরা এমনভাবে হানা দিচ্ছিলেন যাতে জাপানীরা বার্মাতে তাদের রসদ সরবরাহের নিরাপত্তা দেখতেই ব্যস্ত হয়ে ভারতবর্ষ কিংবা চীন আক্রমন করতে না পারে। বার্মাতে এমন কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ খবর জোগার করেছিলেন যাতে R. P. F. বিনা দ্বিধায় জাপানী অধিকৃত এলাকা গুলিতে বোমা বর্ষন করতে পারে।

৩। তারা প্রমান করে দিয়েছিলেন যে নামমাত্র ট্রেনিং দিয়েই দ্বিতীয় সারির সৈন্যদের (যাদের মধ্যে ছিল ২৮ থেকে ৩৫ বয়সের বিবাহিত সব সাধারণ কেরানী বা চাকুরীজীবি লোকজন) নিয়ে জাপানীদের জয় করা যায়। জয় করা যায় জঙ্গলের ভয়ংকর প্রতিরোধ।

৪। ওরা সকলে মিলে প্রমাণ করে দিচ্ছিল যে বার্মার জঙ্গল থেকে জাপানীদের তাড়িয়ে দেয়ার জন্য তারা যে পরিকল্পনা রচনা করেছে তা যথাযথ হয়েছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভারত-বার্মা সীমান্তে উইনগেট চমৎকার সাফল্য লাভ করছিলেন। যখন ১৯৪৩ সালে তিনি ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন তখন সকলেই তাকে অভ্যর্থনা জানায়। প্রথম

মহাযুদ্ধের বীরসেনানী—"লরেন্স অব অ্যারাবিয়া" র অনুসরণে জেনারেল উইনগেটকে "লরেন্স অব বার্মা" আখ্যা দেয়া হয়।

উইনগেটের জন্ম ভারতে। হিমালয়ের ছ হাজার ফিট ওপরে পাহাড়ী এলাকায়। তার বাবা ৩২ বছর ব্রিটিশ সৈন্যদলে কাজ করার পর অবসর নিয়ে একটি মিশনারী সেবাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ;এবং উইনগেট প্রায় ধর্মীয় একটি পরিবেশেই মানুষ হয়েছিলেন।

শরীরের প্রতি যত্ন নিতে ভালবাসতেন তিনি সব সময়ই। পড়াশুনার দিকে ঝোঁক ছিল প্রচণ্ড। সাধন অনুরাগী ছিলেন এবং সেক্সপিয়র থেকে দর্শনের এবং ধর্মের বইপত্র এমনকি কমিক স্ট্রিপসও পড়তে ভালবাসতেন। তার কথাবার্তা শুনলে মনে হত যেনবা একজন জীবন্ত এনসাইক্লোপেডিয়া কথা বলছে এত বিচিত্র বিষয়ে পড়াশুনা ছিল তার। বিভিন্ন ভাষা জানতেন তিনি এমনকি আরবী পর্যন্ত।

জ্যাক ডেমপ্‌সে

একটা সময় ছিল যখন তাকে গাঁয়ের স্কুল থেকে গাধা চরানোর উপদেশ দেয়া হয়েছিল অথচ পরবর্তী কালে তিনি চার মিনিটে ১০০,০০০ পাউণ্ড রোজগার করেছিলেন।

আমার সৌভাগ্য হয়েছিল এমন একজনের সঙ্গে নৈশাহারে নিমন্ত্রিত হওয়ায় যার কাজের জন্য প্রতি সেকেণ্ডে ২০০ পাউণ্ড মূল্য দেওয়া হত—২৩৭ সেকেণ্ড ধরে সেকেণ্ড প্রতি ৪০০ পাউণ্ডেরও বেশী অর্থাৎ ১০০,০০০ পাউণ্ড চার মিনিটের কাজের জন্য—তার নাম জ্যাক ডেমপ্‌সে। সাধারণ মানুষ অবশ্যই তিনি নন। বলা যেতে পারে তিনি নিজেই ছিলেন একটি ঐতিহ্য।

আমার সঙ্গে যখন তার দেখা হয় তখন তিনি মার্কিন কোস্টগার্ডসদের জুজুৎসু আর বক্সিং শেখাচ্ছেন।

যুদ্ধের প্রথম দিনটাতে জ্যাক ডেমপসের জনপ্রিয়তা হঠাৎ হয় একটি ছোট খবরের কাগজের খবরে। যে খবরটিতে আমেরিকান কোস্ট গার্ডসেদের শিক্ষা সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ ছিল। শনিবার সকালে খবরটি প্রকাশিত হয়েছিল এবং সেদিনকার মতন স্থানীয় রিক্রুটিং বন্ধ ছিল। খবরটি এত বেশী জনপ্রিয়তা লাভ করে যে রবিবার সকাল থেকে রিক্রুটিং সেণ্টারে রিক্রুটমেণ্টের জন্য লাইন পড়ে যায়। সকলেই জ্যাক ডেমপসের কাছে শিখতে চান।

জ্যাক আমাকে বলেছিলেন যে তার জীবনের সবচাইতে বিপদময় সময় ছিল জেস উইলার্ডকে হারিয়ে হেভীওয়েট চাম্পিয়ন হওয়ার ঠিক পরপরই। চাম্পিয়ন হওয়ার পরপরই অদ্ভুত সব ঘটনা তার জীবনে ঘটতে থাকে। একসঙ্গে রিপোর্টাররা, দোকানদার, সেলসম্যান, পুরনো বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন সবাই এক সঙ্গে তার

সাথে দেখা করার আগ্রহ প্রকাশ করতে থাকে, বড় বড় জায়গা থেকে, বিদগ্ধ সমাজ থেকে তাকে ক্রমাগত দিনের পর দিন নিমন্ত্রণ করা হতে থাকে। মোট কথা নিমন্ত্রণ এবং সাক্ষাৎ করার ঠেলায় তিনি পাগল হয়ে ওঠেন।

ডেমপ্‌সে যখন ইংলণ্ডে আসেন তখন কুইন মেরী বাকিংহাম প্রসাদ থেকে তাকে দেখা করার আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু ডেসপসে এত লাজুক ছিলেন যে অসুস্থতার ভান করে তিনি সেই নিমন্ত্রণ রাখতে পারেন নি। ইতিহাসে সম্ভবতঃ তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি নিমন্ত্রিত হয়েও বাকিংহাম প্রাসাদে প্রবেশ করেন নি।

ডেমপ্‌সে আমাকে বলেছিলেন যে "যদি না দারিদ্র আমাকে এত বেশী ছোট করে দিত, এত বেশী কষ্টের মধ্যে ফেলে না দিত তাহলে আমি আদৌ বক্সিং লড়তে আসতাম কি না সন্দেহ।"

তার বাবা ছিলেন উদাসীন গোছের একজন লোক। সবসময় এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঘুরে বেড়াতেন তিনি। একদিন তিনি স্ত্রী এবং এগারোটি ছেলেমেয়েকে নিয়ে কালরাডোর পাহাড়ি অঞ্চলে বেরিয়ে পড়লেন। প্রায় দশ হাজার ফুট ওপরে পাহাড়ী অঞ্চলে ওঠার পরে হালকা বাতাসে একটি ঘোড়া সঙ্গে সঙ্গে মরে যায়। জ্যাকের মাও অসুস্থ হয়ে পড়েন। মাকে বাঁচানোর জন্য বাবা রেলের একটি টিকিট কিনে ডেনভারে তার বোনের বাড়ীতে পাঠিয়ে দেয়। মা জ্যাককে সঙ্গে নিয়েছিলেন। আশা ছিল হয়ত কনডাকটাররা জ্যাকের টিকিট চাইবে না। কিন্তু জ্যাকের বয়স তখন আট। কনডাকটররা হাফটিকিটের জন্য জোর জবরদস্তি করতে সুরু করল। এমনকি ট্রেন থেকে নেমে পড়তেও বলল। ভয় পেয়ে মা কাঁদতে থাকে। সেই সময় একজন নীচু শ্রেণীর লোক জ্যাকের কানে কানে উৎসাহিত ভাবে তার মাকে চিন্তিত হতে বারণ করতে বলে। যদি সত্যিই তেমন দরকার পড়ে তাহলে সে টিকিটের দাম দিতে প্রস্তুত। এই গল্পটি বলতে বলতে জ্যাক আমাকে বলেছিলেন

যে—"গরীব হওয়ার বিষয়ে আমি এত লজ্জা পেতাম"। মনে মনে স্থির সংকল্প করেছিলেন যে বড় হলে ট্রেনের ওই নীচ লোকটার মতন আর কাউকে অপমান করতে দেব না, সকলের সামনে আমার মাকে কাঁদতে দেখে খুবই বিচলিত হয়ে পড়েছিলাম আমি। সেই মুহূর্তে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে বড় ধরনের প্রাইজ আমাকে নিতেই হবে। টাকা করতে হবে এবং এই কাউবয়টার মতন বড়লোক হতে হবে।"

ডেমপ্‌সের সঙ্গে লুইস কিরকোর লড়াইটি, যাকে আখ্যা দেয়া হয়েছিল "The wild bull of the Pampus," সেই লড়াইতে যেমন চাঞ্চল্য উৎসাহ এনেছিল বক্সিং ইতিহাসে সেরকম কোনদিন হয়নি। দর্শকরা লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে চীৎকার করে একাকার কাণ্ড করেছিল। সেদিন সত্তর হাজার দর্শক ২০০,০০০ পাউণ্ডের টিকিট কেটেছিল।

সব বড় বড় খেলোয়াড়দের দুটো গুণ থাকা চাই-ই এক মনোসংযোগ করার ক্ষমতা দুই স্বয়ংক্রিয় ভাবে কাজ করার ক্ষমতা। ডেমপ্‌সে বলত যে এত বেশী মনসংযোগ তার হত যে দর্শকদের চীৎকার সে শুনতেই পেত না। এবং কোন কিছু চিন্তা না করেই আক্রমণ রচনা করত সে। জ্যাক বলত "আক্রমণ করবে কি করবে না এটা ভাবতে গেলেই খুব দেরী হয়ে যাবে আর কাজ করা যাবে না"।

বারো বছর বয়সে জ্যাক তার বক্সিং কেরিয়ার সুরু করে। সে নিজে একটি পুরনো তোষোক মেঝেতে পেতে বালু আর কাঠের গুড়ো দিয়ে পানচিং ব্যাগ তৈরী করে নিয়েছিলেন। বোসিনগাম মুখে পুরে সারাক্ষণ চিবিয়ে মাড়ি এবং দাঁতের মাস্‌ল শক্ত করত সে।

ট্রেনিং এর সময় জ্যাক সব সময় প্রার্থনা করত। লড়াই সুরু হওয়ার আগেও প্রার্থনা করে নিতে ভুলত না সে। জ্যাক আমাকে বলেছিল "আমার জীবনে একদিনের জন্যও কোথাও শুইনি আমি।

একবারও খাবার খাইনি প্রার্থনা না করে। আমি জানি আমার প্রার্থনা পূর্ণ করেছেন ঈশ্বর অন্তত হাজারবার। আর আমি জানি যে আমার জীবনে একটি প্রার্থনাও আমি করিনি যে প্রার্থনা থেকে কোন না কোন ভাল হয়নি আমার।

জেনারেল ক্লেয়ার শেনল্ট

ওরা তাকে ভাড়া করে নিয়ে যেত স্কুলের শিক্ষক হিসেবে, কারণ সে লড়াই করতে পারত।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে একজন স্কুলশিক্ষক ছিলেন লুসিয়ানায় যার ইচ্ছে ছিল বিমান বাহিনীতে যোগ দেবার। কিন্তু তার আবেদন পত্র প্রত্যাখ্যাত হচ্ছিল এই বলে যে—"সফল বৈমানিক হওয়ার উপযুক্ত শিক্ষা নেই"—পরবর্তী কালে এই লোকটিই কমব্যাট এ্যাভিয়শনে পৃথিবী বিখ্যাত হয়েছিল। তার নাম মেজর জেনারেল ক্লেয়ার লি শেনাণ্ট। তিনি তার বৈমানিকদের সহায়তায় বার্মার জঙ্গলে জাপানীদের সঙ্গে একটার পর একটা লড়াই জিতে যাচ্ছিলেন যখন জাপানীরা "প্রিন্স অব ওয়ালস"—"রিপালস" ডোবাচ্ছে। লড়াই জিতলে ওরা আবার অষ্ট্রেলিয়া আক্রমণ করব—করব করছে। কিরকম লোক ছিলেন মেজর জেনারেল শেনল্ট। চার বছর বয়সে মা মারা গিয়েছিল তার। তার বাবার ধারণা ছিল ছেলে মানুষ হওয়ার একমাত্র রাস্তা নিজের মতন করে বড় হতে দেয়া। ফলে লাগাম ছাড়া গরুর মত নিজের খুশী মত বড় হতে থাকে সে।

তার জীবনে একটিই ব্যাপার তার কল্পনাকে আন্দোলিত করেছিল, সেটা হচ্ছে টম স্যইয়ারের হাক্‌লবেরি ফিন। ড্যানিয়েল বুন। তার মনে হত ওদের মতনই জীবন যাপন করবে সে। বাবার তুলোর চাষে হঠাৎ ক্ষতি হওয়ায় নিজের জীবিকা নিজেকেই রোজগার করার মতন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েগিয়েছিল তার। চাকরীর চেষ্টায় ব্যর্থ হওয়ায় পর স্কুলের শিক্ষক নিযুক্ত হয় সে। পড়াশুনার জন্য নয়, কঠিন লড়াই করতে পারত বলেই তার স্কুলশিক্ষকতার চাকরীটি হয়।

এমন এমন স্কুলে তাকে যেতে হত যেখানে ছাত্ররা মাস্টারদের মেরে লাট করে দেয়। সেইসব স্কুলে ক্লেয়ার রীতিমত লড়াই করে ছাত্রদের শুইয়ে দিয়ে স্কুলে পড়াশুনার পাট ফিরিয়ে আনত। অদ্ভুত কাজটি ছিল তার।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সুরুর সঙ্গে সঙ্গে স্কুলের কাজ ছেড়ে সে সেনা বাহিনীতে যোগ দেয়। তার ওপরওয়ালারা তার প্রতিবাদ এবং সমালোচনা করার অভ্যাসে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে মাত্র ৪৬ বছর বয়সে আর্মি থেকে অবসর নিতে বাধ্য করে। কয়েক মাস পরে অবশ্য তাকে জেনারেল চিয়াং কাইশেকের বিমান বিষয়ে পরামর্শদাতা করে পাঠানো হয়।

এলি কালবার্টসন

তিনি পাত্রীর জন্য বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন এবং তিনশোর বেশী দরখাস্ত পেয়েছিলেন।

১৯৪৩ সালে একটি বই প্রকাশিত হয়ে সারা পৃথিবীকে চমকিয়ে দিয়েছিল। বইটির নাম—"সম্পূর্ণ শান্তি"—কি কারণে যুদ্ধ হয় এবং শান্তি কিভাবে সংগঠিত করা যায়।" বইটির লেখক এলি কালবার্টসন চার বছর ধরে অমানুষিক পরিশ্রম করে বইটি লিখে প্রকাশিত করেন। এই কালবার্টসনই হচ্ছে সেই লোক যাকে লক্ষ লক্ষ লোক ব্রিজ খেলায় পদ্ধতি প্রকরণের ব্যাপারেই চেনে। তার আত্মজীবনীর নাম "একজন মানুষের অসংখ্য অদ্ভুত জীবন"। একথা সত্যি যে এলি কালবার্টসন বস্তুত একজন লোক হলেও এক জীবনেই বহু আশ্চর্যরকমের জীবন যাপন করেছিলেন।

আমেরিকার কোটিপতি একজনের সন্তান এলি একদিন রাতারাতি বিলাসব্যসনপূর্ণ জীবন ত্যাগ করে রাস্তায় রুটির জন্য একাকী নেমে পড়েছিলেন। এলির বাবা বলতেন তাস শয়তানের দূত অথচ এলি জীবনে তাস সম্পর্কে পার্শীতে সবচেয়ে বেশী দক্ষ হয়ে উঠেছিলেন এবং ব্রীজ খেলা শিখিয়ে ২০০,০০০ পাউণ্ড পর্যন্ত রোজগার করেছেন।

আমার কাছে কালবার্টসনের বিস্ময়কর জীবনের সবচাইতে চমৎকার ঘটনা মনে হয় তার স্বপ্নের সঙ্গিনীটিকে বাস্তবে খুঁজে বের করাটা। এলির বক্তব্য ছিল যে সকলেই কেমন যেন খাপছাড়া ভাবে জীবনসঙ্গিনী বেছে নেয়। তাই তার ইচ্ছে ছিল একজন স্টেনোগ্রাফারকে যেভাবে দেখে শুনে নেয়া যায় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে সেরকমই হবে না কেন স্ত্রী নির্বাচনের পর্যায়। ফলে এলি ইটালীতে একজন মডেল চেয়ে, তার কাংখিত সমস্ত সুসম্পনা শরীরের বিবরণ দিয়ে বিজ্ঞাপন

দিয়েছিল। টুরিন শহরে বক্স নাম্বারের আড়ালে বিজ্ঞাপন দেয়া হল। এত বেশী স্পষ্ট ধারণা নিয়ে বিজ্ঞাপনটা ছিল যে আধ ডজনের বেশী উত্তর কেউই আশা করেনি। কিন্তু উত্তর এল তিনশোর বেশী। প্রায় সবটাকেই না বলতে বলতে অবশেষে একজনকে তার সেই স্বপ্নের নারী হিসেবে মনে হয়েছিল বটে কিন্তু ততদিনে খুব দেরী হয়ে গেছে। পুলিস এইরকম একটি অদ্ভুত কাণ্ড ঘটানোর জন্য এলিকে গ্রেপ্তার করল। দীর্ঘকাল পরে অবশ্য মেয়েটির সংগে এলির আবার দেখা হয়েছিল নিউইয়র্কে।

ধনাঢ্য পরিবারের সবরকম সুযোগ সুবিধা ত্যাগ করে এলি নানানধরণের ছোটখাটো কাজ করেছে জীবনে, টাইমকিপার, হেল্পার, ইত্যাদি নানানধরণের কাজ।

কালবার্টসনের কোটিপতি বাবা সোভিয়েৎ রাশিয়ায় সোনার বণ্ডে সমস্ত টাকা লগ্নী করেছিল এবং লেলিন সোভিয়েত রাশিয়ায় সরকার প্রতিষ্ঠা করার সঙ্গে সঙ্গে সব টাকা বরবাদ হয়ে যায়।

ফলে সর্বশান্ত হয়ে তারা চাকরী খুঁজতে থাকে। এলির বাবা নিউ ইয়র্কে নাইট ওয়াচম্যানের, এলি সহযোগী। দুজনেই চাকরী পেতে ব্যর্থ হয়। তিনি কয়লা বিক্রি কফি বিক্রি করতে সুরু করে ব্যর্থ হন। অবশেষে ফরাসী সাহিত্য পড়ানোর খুব ছোটখাটো একটা কাজ সে পেয়ে যায়।

এবং সেই সময়ে ব্রিজ শেখানোর জন্য চারটি বই সে লিখে ফেলে। বইগুলো অসম্ভব দ্রুত নিঃশেষিত হয়ে যায়। বিদেশী ভাষায় অনুবাদ হয়ে লক্ষ লক্ষ কপি বিক্রি হতে থাকে।

এলি কালবার্টসান যেভাবে তার কনট্রাক্ট ব্রিজের সিস্টেম সম্পর্কে লেখার সঙ্গে সঙ্গে শান্তির জন্য অতটা সময়ে ব্যয় করেছিলেন সেটা বলতেই বিস্মিত হতে হয়।

গ্লেন-এল-মার্টিন

একসময় তিনি রান্না ঘরে বসে ঘুড়ি বানাতেন—পরে নিজের কারখানায় বোমারু বিমান বানাতেন

জানুয়ারী ১৫, ১৮৮৬ সালে রাইট ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রথম আকাশে ওড়ার সতেরো বছর আগে মিসেস কিস্টা মার্টিন স্বপ্ন দেখেন যে তিনি একটি উড়ন্ত যন্ত্রে চেপে আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছেন। হয়ত আজগুবি ভেবে অন্যসময় হলে উপেক্ষাই করতেন বিষয়টি নিয়ে কিন্তু যেহেতু তিনি সেই সময় ছিলেন সন্তান সম্ভবা সেইহেতু স্বপ্নের কি অর্থ হতে পারে এই বিষয়ে কৌতুহল হয় এবং সবাইকে এইরকম তাৎপর্য জিজ্ঞাসা করতে থাকেন। মজার কথাটি হল যে তার সন্তান তুদিন পরেই জন্মান এবং সবাই আশা করতে থাকে যে ঘটনাটার হয়ত এইরকমই অর্থ হতে পারে যে কিষ্টার বদলে তার ছেলে গ্লেনই আকাশে চড়বেন। বস্তুত পরবর্তীকালে করেছিলও ঠিক তাই। রাইট ভাতৃদ্বয়ের পর গ্লেনই তৃতীয় যিনি আকাশে উড়েছিলেন।

যদি তার মা সেই স্বপ্নের কথা মনে করিয়ে না দিত যে তাকে অবশ্যম্ভাবী একজন বৈমানিক হতেই হবে তা না হলে কিন্তু গ্লেনের কোন কথা ছিল না অন্তত বৈমানিক হওয়ার।

মিসেস কিস্টা মার্টিন ছেলেবেলা থেকেই গ্লেনকে আত্মবিশ্বাস, মনস্তত্ত্ব এবং সংযমের শিক্ষা দিতেন। যখন গ্লেন ঘুড়ি কেনার আবদার করত তখন তার মা ঘুড়ি নিজে বানিয়ে নিতে বলত।

কুড়ি বছর বয়সেই গ্লেন নিজের হতে ওড়ার যন্ত্রটি তৈরী করেছিল। ১৯০৮ সালে পরিত্যক্ত একটি বাড়ির ফাঁকা জমিতে সে প্রথম এরোপ্লেনটি তৈরী করে।

সারা জীবনে অনেকের কাছ থেকে অনেক রকমের বাধা বিপত্তি

পেলেও মার কাছ থেকে অসম্ভব রকমের সাহস এবং উৎসাহ পেয়েছিলেন। তিনি ১৯০৯ সালে গ্রেন-এরোপ্লেন তৈরী করে নিজে চড়ে একেবারে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিলেন।

গ্রেনের জীবনে অধ্যাবসায় এবং চাওয়ার একটাই বিষয় সম্পর্কে একাত্মতার শিক্ষা বিশদ আলোচনা। তার জীবনের উপদেশই ছিল যদি কেউ শিক্ষা নিতে সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে প্রথম কথাটি হল নিজের আদর্শ যেন স্থির তাহলে সে যেকোন দিকেই সফল হবে যে কোনদিকেই সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

কাপটেন এডি রিকেনরেকার

দু-দুটো মহাযুদ্ধের হিরো অথচ "শুভদিন" বলতেও লজ্জা পেতেন

ইস্টার্ন এয়ার লাইনস এর-প্রেসিডেন্ট এবং জেনারেল ম্যানেজার কাপটেন রিকরেকার জীবন যাপন করেছেন।

আমিরিকার প্রসিদ্ধ রেসিং ড্রাইভার, এডি প্রতিযোগিতার সময়ে গাড়ি উল্টে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছেন বেশ কয়েকবার। ১৯৪১ সালের যুদ্ধের সময় যুদ্ধেও আহত হয়েছিল বারাংবার।

এডির ভাষায়

—"কারও ঠিক ভয় পাওয়া উচিত নয়। আমি বলতে পারি কখন আমি নিজে অনেকবার মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছেন। বেশ আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতাতেই বলব। সুন্দর সংগীতের সুর। শান্ত বেশ আনন্দের পরিবেশেই যে—কোন মারামারি হানাহানি নেই, ভয় নেই, শুধু শান্ত নীরবতা আর অসীম সৌন্দর্য্য। মৃত্যু যখন আসবে, তখন দেখবে খুব সহজ খুবই আশীর্বাদপূত অভিজ্ঞতা তোমার হবে ইতিপূর্বে যা কোনদিন তোমার হয়নি"—

এডি রিকেনরেকারকে ভয়ংকর সাহসী লোক হিসেবে সারা পৃথিবীর লোক জানলেও ছেলেবেলায় এই এডিই খুব লাজুক ছিল। চেনা কাউকে "গুড মর্নিং" বলতে হবে ভয়ে সে রাস্তা পার হয়ে অন্যদিকে চলে যেত।

স্বচ্ছল পরিবারে হঠাৎই একটা দুর্ঘটনা নেমে এল। এডির বাবা হঠাৎ একটি দুর্ঘটনায় মারা গেলেন। সাত বছর বয়সে সমস্ত পরিবারের মুখে রুটি জোগাড় করতে তাকে বেরিয়ে পড়তে হল।

তার প্রথম চাকরী ছিল গ্লাস ফ্যাকটরীতে রাতের সিফটে কাজ ঘণ্টায় আধ পেনী রোজে বারো ঘণ্টার ডিউটিতে।

প্রথমে এই গ্লাস ফ্যাকটরী তারপর ছাতার কারখানা, মেসিন শপ, এইরকম অনেক কোম্পানীর অনেক কারখানায় কাজ করতে হত তাকে। অথচ এইসব কাজকে আন্তরিক ঘৃণা করতেন তিনি! সেই কারণে সারা জীবন ধরে তার একটি স্বপ্ন ছিল "শিল্পী" হওয়ার।

এইরকম সময় যখন সে একজন স্থপতির সহকারী হিসেবে পাথর কাটার কাজ পায় যক্ষায় মরতে চলেছে তখন'১৪ বছর বয়সের একটি ঘটনায় এডির জীবনের মোড় ঘুরে যায়। সে নেহাৎই কপালজোরে একটি গাড়ি চালাতে শিখে কোন একজন ড্রাইভারের সঙ্গে ভাব জমায়।

দীর্ঘদিন প্রাণপণ চেষ্টা করে তিলতিল করে একটা মোটর গাড়ি সে নিজেই তৈরী করে ফেলে। এবং শহরে একটি মোটর তৈরীর কারখানা হলে সেখানে কাজ পাওয়ার ব্যাপারে দীর্ঘ আটমাস ধরে প্রত্যেক রোববারে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত, এবং প্রত্যেকবারেই তাকে ফিরিয়ে দিত কোম্পানীর লোকজনেরা।

অন্য কেউ হলে হতাশ হয়ে চেষ্টা ছেড়েই দিত নিশ্চয়। কিন্তু এডির উদ্দেশ্য ছিল মোটর গাড়ির কারখানায় কাজ করার। সেজন্য

সে নিজেই কারখানার ঘর ঝাট দিতে শুরু করে কোম্পানির লোকজনেরা জিজ্ঞেস করলে বলে যে মাহিনা দেয়া হোক বা না হোক সে কাজ করতে বদ্ধ পরিকর। কারখানার ম্যানেজার অগত্যা ওকে চার পেনী রোজে একটা চাকরী দিয়ে দেয়। একদিন দুপুরে কারখানার ম্যানেজার কারখানায় টহল দিতে গেলে এডিকে দেখে আশ্চর্য হয়ে যায়। সবাই যখন দুপুরের খাওয়া শেষ করে গুলতানী করছে তখন এডি মেকানিক্যাল ইনজিনিয়ারিং-এর ওপর একটি কারখানায় কোর্স পড়াতে ব্যস্ত। ম্যানেজারটি খুবই খুশী হয়ে যায় এবং তাকে বেশী মায়নায় ইনজিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টে বদলী করে নেয়।

সেই সময়ে এডির ওপর—"আমি সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনাও কিন্তু করি নি জীবনে"—সেইদিন থেকে অবশ্য উন্নতি হতে থাকে ধাপে ধাপে এবং সেই সাক্ষ তার জীবনের সেই এ্যাডভেঞ্চারের স্বপ্ন গতির স্বপ্ন সব ফিরে আসে এবং প্রত্যেকটিকে তিনি কাজে লাগাতে শুরু করেন। ২৫ বছর হতে না হতে রিকেনরেকার পৃথিবীতে বিখ্যাত রেসিং ড্রাইভারদের মধ্যে একজন হয়ে ওঠেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে এডি মোটর গাড়ির জগতের হিরো হয়ে উঠেছিলেন। ফ্রান্সে তিনি যান জেনারেল পারসিং এর ড্রাইভার হিসেবে। কিন্তু ফ্রন্ট লাইনে জেনারেলের গাড়ি ড্রাইভ করার মতন শক্ত কাজ কি তার পোষায়! মাত্র পাঁচ সপ্তাহের ট্রেনিং নিয়ে তিনি জরুরী অবস্থার মধ্যে ২৬টি যুদ্ধ জয় করেন। এবং ওয়ার হিরোদের তালিকার শীর্ষে নিজেকে স্থাপিত করেন। নিউইয়র্কে ফিরে এলে তাকে সকলেই রাজকীয় সম্বর্ধনা জানায়।

ব্যক্তিগত জীবনে এডির সবচাইতে মজার অভিজ্ঞতা হল তিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে বার্লিনে জারমান গোয়েরিং এর সঙ্গে ব্যাক্তিগত পরিচয় এবং কথোপকথন। যে কথোপকথন থেকে স্পষ্ট জানা গিয়েছিল যে জার্মানী তার হৃত সম্মান পুনরুদ্ধার করতে বদ্ধপরিকর।

জন ব্যারিমুর

দিনে এক হাজারেরও বেশী পাউণ্ড রোজগার তিনি করেছিলেন বটে অথচ তার পোষা শকুনটার জন্য ডাস্টবিন থেকে খাবার কুড়িয়ে বেড়াতেন।

ইংলণ্ডের এ্যামেচার লাইটওয়েট চাম্পিয়ন যে ছেলেটি অক্সফোর্ড আণ্ডার গ্রাজুয়েটের ছাত্র সেই পরবর্তী কালে আমেরিকার থিয়েটার ইতিহাসের প্রবাদপুরুষ জন বারিমুরের পিতা মরিস বারিমুর। বারিমুর পরিবারের সকলেই বিংশ শতাব্দীর থিয়েটার জীবনের সঙ্গে প্রবলভাবে যুক্ত ছিলেন। অথচ আশ্চর্য এই যে বারিমুর পরিবারের কেউই জীবনে অভিনেতা হওয়ার স্বপ্ন দেখেন নি। দুভাই লায়োনেল প্যারিসে চিত্রকলা শিখতে গিয়েছিল এবং জন কার্টুন আঁকার কাজ নিয়েছিল আর্থার ব্রিস্টল নামে নিউইয়র্ক জার্ণালের সম্পাদকের দপ্তরে। কার্টুন আঁকার চাকরীতে প্রসিদ্ধ লেখিকা এলা কুটলার উইলকক্সের কবিতার কার্টুন এঁকে জন লেখিকার বিরাগভাজন হন এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। অবশ্য সে কারণেই কিনা জানা নেই তিন সপ্তাহের মধ্যে জন চাকরীটা খোয়ান অনুপযুক্ত বলে।

লায়োনেলের ভাষায় আঁকা ছবি কিংবা কার্টুন বিক্রী না করতে পেরে না খেয়ে থাকতে হয়েছে বহুবার। সেই সময়ে ওদের দুজনের সঙ্গে বাটলার নামে একজন লোকও বাস করত।

বারিমুর পরিবারে জন্তু জানোয়ারের প্রতি প্রীতি ছিল অসাধারণ। জনের ও ব্যতিক্রম ছিল না। একটা পোষা বাঁদর ছিল তার যেটাকে সে ছেলের মতনই আদর করত। দুটো পাখির জন্য ৪৯ পাউণ্ড খরচ করেছিল বা ৪০০০ পাউণ্ড খরচে তাদের থাকবার বিশেষ বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। একবার জন একটা বিশাল শকুন কিনে আনে এবং

বাড়িতে পুষতে থাকে। এই শকুনটার জন্য বিশেষ ধরণের মাংসের টুকরো জনকে খুঁজে বার করতে হত ডাস্টবিন থেকে। পথিকেরা অনেকেই ভিখিরী ভেবে দুটো একটা পয়সা হামেশাই সাহায্য করত। অবশ্য সেই সময়ে জন দিনে একহাজার রোজগার করতেন।

হলিউড থেকে জন বারিমুর ৬০০,০০০ পাউণ্ড রোজগার করেছিলেন। ১৯৩০ সালে তিনি বছরে ১০০,০০০ পাউণ্ড রোজগার করেছেন। ১৯৩৪ সালে জন ভারতবর্ষে শরীর সারাতে এসেছিলেন।

জীবনে টাকাপয়সা, জামাকাপড় নিয়ে কোনদিন মাথা ঘামান নি তিনি। যখন দিনে ১০০০ পাউণ্ড রোজগার করতেন তখন দিনে খরচ করতেন চারগুণ। যখন এ পর্যন্ত রোজগার করছেন তখনও—

নানান ধরনের বন্ধুবান্ধব ছিল তার। সমাজের উচ্চতম পর্যায়ের লোক থেকে নীম্নতম পর্যায়ের লোকজন পর্যন্ত।

জন বারিমুরের শেক্সপিয়রের নাটকের অভিনয় মানুষজন আজও ভুলতে পারে না। আজও থিয়েটারের প্রবাদ পুরুষ হয়ে বেঁচে রয়েছেন জন বারিমুর।

অনুসরণ ও সাফল্যের নূতন দিগন্ত

ডেল কার্নেগী রচিত

How To Devlop Self Confidence And Influence People By Public Speaking

অবলম্বনে ভাষান্তরিত সম্পাদনা
অচিন চৌধুরী

মনোযোহন প্রকাশনী * কলকাতা তিয়াত্তর

থিওডোর: রুজভেল্ট এর স্মৃতির উদ্দেশ্যে—

অনুবাদকের ভূমিকা

জীবিত অবস্থাতেই কোন কোন মানুষ কিংবদন্তী-পুরুষ হয়ে ওঠেন। যাবতীয় প্রতিকূলতার অনুপুঙ্খময় সূক্ষ্মতা সত্ত্বেও মানুষের দরবারে গাঢ়, গভীর আঁচড়ে, নিপুণ মমতায় জীবন্তভাবে চিত্রিত হন।

ডেল কার্নেগী তেমন একজন প্রতিভাময় ব্যক্তিত্ব। বারো বছর বয়সে ফলের ঝুড়ি বহন করে যার উপার্জনের শুরু। বত্রিশ বছর বয়সেও যিনি জীবনে অসফল—সেই তিনি-ই বেয়াল্লিশ-এ পা রেখেই পৃথিবী বিখ্যাত। তাঁর জীবনের এই মন্ত্রসিদ্ধির কথাই তিনি আলোচনা করেছেন, তাঁর লেখা বইয়ে।

জীবনে যাঁরা নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে সফলতা অর্জন করতে চান এ বইটি তাদের অবশ্যপাঠ্য।

বইটি অনুবাদে—দেবযানী মজুমদারের সহায়তার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

॥ অচিন চৌধুরী ॥

কীভাবে সাহস ও আত্মবিশ্বাস বাড়ানো যেতে পারে

প্রিয় মিঃ কার্নেগী,

আমি একজন লোহার ব্যবসায়ী। বিগত কয়েক বছর ধরে আমি শুধু লোকসান দিয়ে এসেছি। অথচ আমার দিক থেকে চেষ্টা, অধ্যাবসায় আর ধৈর্য্যের কোন ত্রুটি ছিল না। আমি আপনার কথা শুনেছি। তাই মনে সাহস এনে চিঠি লিখছি— আমি কি আমার কর্মদক্ষতা বাড়িয়ে প্রতিষ্ঠানের লোকসানের ধাক্কা সামলে লাভের মুখ দেখতে পারবো? উপার্জনের নতুন পথ খুঁজে পাবো? যখনই আমি কোন কিছু বলার চেষ্টা করি, আমার সবকিছু কেমন গুলিয়ে যায়। আমাদের ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সমিতিতে এবারে আমাকে সহ-সভাপতি পদে মনোনীত করা হয়েছে। খুব শিগ্রই সমিতির বার্ষিক অধিবেশন শুরু হবে। সহ-সভাপতি হিসাবে বক্তব্য রাখতে হবে আমাকে। অথচ মঞ্চে উঠলেই আমার হাত-পা ঠকঠক করে কাঁপতে থাকে। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আসে। সমস্ত ভাবনাচিন্তা আমি গুলিয়ে ফেলি। ভয়ে ভাবনায় অতি মাত্রায় আত্মসচেতন হয়ে উঠি। কী বলবো তা কিছুতেই মনে করে উঠতে পারি না। পূর্বেও বহুবার এমন হয়েছে। মিঃ কার্নেগী, আমি সফল বক্তা হিসাবে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চাই। আমি এটা বুঝতে পেরেছি যে, কেবল একজন সফল বক্তাই কথার বিনিময়ে লোকের মন জয় করতে পারে। আয় উন্নতি বাড়িয়ে তুলতে পারে সঠিক কথা বলার ক্ষমতার সাহায্যে। আপনি আমাকে সাহায্য করুন। নির্দেশ দিন। কীভাবে কেমন করে আমি জীবনের প্রতিটি কর্মক্ষেত্রে সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হবো।...

এ চিঠিটি আমাকে বোস্টনের এক ভদ্রলোক লিখেছেন। ১৯১২ সাল থেকে আমার কথা বলা শেখার পাঠ্যক্রমে কম করেও পাঁচ লাখ পুরুষ-মহিলা শিক্ষাক্রম শেষ করেছেন। ডেলকার্নেগী ইনস্টিটিউটে ভর্তি হওয়ার আগে, এদের মধ্যে অনেকেই আমাকে ওপরের ভদ্রলোকের মতই চিঠি লিখেছেন। যদিও প্রতিটি চিঠির ভাষার ব্যবহার মোটেই একরকম ছিলো না—বর্ণনাও আলাদা বিষয়ের ওপর থাকতো; তবুও চিঠির মূল সুর ছিলো এক। প্রত্যেকেই জীবনের সফলতা অর্জন করতে চাইতেন, নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হতে চাইতেন।

ফিলাডেলফিয়াতে আমাদের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে এক ভদ্রলোক ভর্তি হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন একটি কারখানার মালিক। বেশ বয়স হয়েছে তার। কথা বলা শেখার ক্লাশে ভর্তি হওয়ার মূল উদ্দেশ্য ছিল ভালো করে বক্তব্য রাখতে পারা, তা জনসমক্ষে বিশাল শ্রোতার সামনেই হোক বা নিজের কারখানার লোকদের সামনেই হোক। আমাকে একদিন তিনি মধ্যাহ্নভোজে নেমন্তন্ন করলেন। খাবার টেবিলে আমার কাছে তিনি গভীর আগ্রহে জানতে চাইলেন এমন কোন উপায় বা পন্থা আছে কিনা যার দ্বারা তিনি সফল বক্তৃতা করতে সক্ষম হবেন। আমি তাকে নির্দ্বিধায় জানিয়েছিলাম একজন ভালো বক্তা হওয়া তার পক্ষে মোটেই অসম্ভব ব্যাপার নয়। ঠিকমত অনুশীলন করে গেলেই তিনি সফল হবেন। বেশ কয়েক বছর কেটে গেছে। আমি প্রায় ভুলেই গেছি সেই ভদ্রলোককে। ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রীর ফিলাডেলফিয়া আগমন উপলক্ষ্যে—ফিলাডেল-ফিয়াবাসীরা এক বিরাট সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করেছিলেন। সেই সভায় ফিলাডেলফিয়াবাসীর তরফ থেকে মুখ্য বক্তার ভূমিকা নিয়েছিলেন সেই ভদ্রলোকটিই। এতে অবাক হবার কিছু নেই কিন্তু। এটা কোন অঘটন নয়, সত্যি ঘটনা।

আরেক ভদ্রলোক, তিনি ছিলেন একটি কার্পেট কারখানার

মালিক। তিনি ডেল কার্নেগী ইনস্টিটিয়্যুশনের চৌদ্দ সপ্তাহের শিক্ষাক্রম সমাপ্ত করার শেষে আমাকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন যে —আমাদের প্রতিষ্ঠানে চৌদ্দসপ্তাহে তিনি যা শিখতে পেরেছেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪ বছরের পাঠ্যক্রমেও তিনি তা শিখতে পারেননি।

কথাটি বর্ণে বর্ণে সত্যি। ১৯৩৩ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী নিউইয়র্কের ইয়েল ক্লাবের বিশেষ সমাবর্তন উৎসবে প্রায় ছ'শ লোকের সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে এ কথাটি তিনি ঘোষণা করেছিলেন।

একজন ডাক্তারকে চিনতাম। তিনি চেয়ারে বসে থাকা অবস্থায় সম্পূর্ণ অপ্রস্তুতভাবে বক্তৃতা করতে পারতেন—খাবার টেবিলে বা বন্ধুবান্ধবের ঘরোয়া বৈঠকে। একবার একটি হোটেলে বেস-বল খেলোয়াড়দের নামী দলের সবার সংগে তার খুব আলাপ হয়ে গেল। খাবার টেবিলে দলের ম্যানেজার ঘোষণা করলেন—আমরা আমাদের মাঝে একজন বিখ্যাত চিকিৎসককে পেয়েছি। তার মুখ থেকে আজ আমরা বেস-বল খেলোয়াড়ের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত আলোচনা শুনবো।—ডাক্তার ভদ্রলোকটি বলবার জন্য তৈরী ছিলেন ?? হ্যাঁ। তিনি পৃথিবীর সেরা বক্তার মতই তৈরী করেছিলেন নিজেকে। কারণ তিনি পঁচিশ বছরেরও বেশী সময় ধরে স্বাস্থ্য এবং ঔষধ সম্পর্কিত পড়াশোনা করে আসছিলেন। তিনি চেয়ারে বসে বসেই সারা রাত ধরে ডাইনে—বাঁয়ে উপবিষ্ট শ্রোতাদের সামনে মনোজ্ঞ বক্তব্য রাখতে পেরেছিলেন। কিন্তু সেই ডাক্তারই উঠে দাঁড়িয়ে কিছু বলতে গিয়েই ঘেমে নেয়ে তোৎলাতে তোৎলাতে কথা খুঁজে না পেয়ে অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিলেন বহুবার।

মাত্র কয়েক ডজন চেনা লোকের সামনে বক্তৃতা করতে উঠে, কোন কথা বলতে না পেরে লজ্জায় অপমানে আর নিজের প্রতি

ঘৃণায় তিনি—মানে সেই প্রখ্যাত ডাক্তারটি সভাগৃহ ত্যাগ করেছিলেন অধোবদনে।

তাহলে কীভাবে সাহস আর আত্মবিশ্বাস বাড়ানো যেতে পারে? ধরুন, আপনার কথাই। আপনি একজন দোকানদার। প্রসাধন সামগ্রী কিংবা মনোহারী দ্রব্য আপনি বিক্রি করেন। আপনার ক্রেতারা অধিকাংশই মহিলা। অনেকেই সুরুচি আর কৃষ্টিসম্পন্না সুন্দরী ভদ্রমহিলা। আপনি গুছিয়ে সুন্দর মার্জিত ভঙ্গীতে কোন কথাই বলতে পারেন না তাদের সামনে। লাজুক গোবেচারার ভঙ্গীতে অস্পষ্ট আড়ষ্ট গলায় আপনি কোন কথাই ঠিকমত বোঝাতে পারেন-না তাদের। ফলে বিরক্ত হয়েই অনেক ক্রেতা আপনার দোকান থেকে কেনাকাটা বন্ধ করে দেন। এতে আপনার সমূহ ক্ষতি। আমি যদি এখন আপনার সামনে উপস্থিত থাকতাম তাহলে আপনি নিশ্চয়ই আমাকে প্রশ্ন করতেন—মিঃ ডেল কার্নেগী, কি পথ অনুসরণ করলে আমি ব্যবসায়ে লাভ করতে পারবো?

আমি কথা দিচ্ছি—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন এই বইয়ের মত ও পথ অনুসরণ আর অনুশীলনের মাধ্যমেই আপনার সামনে সাফল্যের নতুন দিগন্ত খুলে যাবেই—যাবে।

আত্ম-বিশ্বাস আর সাহস পেতে হবে আপনাকে। আর সেটা পেতে হলে আপনাকে ঠাণ্ডা মাথায় পরিষ্কার করে ভাবতে—শিখতে হবে। আপনি প্রথমে ঠিক করুন—কি বলতে চান আপনি—কেমন করে বলবেন সেটা পরে বলছি। তবে এটা ঠিক যে ঠাণ্ডা মাথায় ঠিক মতো ভাবতে পারলে একজন দুজন নয়—এক ঘর লোকের সামনে কথা বলতেও বিন্দুমাত্র অসুবিধা হবে না আপনার। এ বইয়ের শিক্ষা আর অনুশীলন আপনার মন থেকে লোক-সম্পর্কে ভয়ভীত দূর করে আত্মবিশ্বাস আর সত্যিকারের সাহস ফিরিয়ে আনবে।

আপনি ভাববেন না যেন কাজটি খুবই কঠিন। চেষ্টা ইচ্ছা

আর নিষ্ঠা নিয়ে অনুশীলন করলেই আপনি সহজেই গুছিয়ে সুন্দর ভাবে কথা বলে আপনার ক্রেতাকে প্রভাবিত করতে পারবেন। আপনার লজ্জিত বা অপ্রস্তুত হবার কিছু নেই। বিখ্যাত ঔপন্যাসিক মার্ক টোয়েনও প্রথম জীবনে লোকজনের সামনে আড়ষ্ট আর সংকুচিত হয়ে পড়তেন। মুখ দিয়ে ঠিকমত কথা বেরুত না। একজন বিখ্যাত আইরিশ নেতা যিনি প্রতিপক্ষকে চোখা চোখা বক্তব্যের বানে ক্ষতবিক্ষত করতেন অতি সহজেই, তার জীবনের প্রথমদিকে তিনি একলাইন কথাও ঠিকমত গুছিয়ে বলতে পারতেন না।

বিখ্যাত ঐতিহাসিক বক্তা সিসারো দু'হাজার বছর আগে বলেছিলেন—কে কত ভাল বক্তা—সেটা বিচার করা যায়, কে কতটা ভয়-ভীতি আর সংকোচ কাটাতে পেরেছে শ্রোতা সম্পর্কে—কেবলমাত্র তার ভিত্তিতেই। পৃথিবী বিখ্যাত চলচ্চিত্রস্রষ্টা চার্লি চ্যাপলিন তার রোজনামচায় একবার লিখেছিলেন—রেডিওতে বলার সময় মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়ে আমি এতো বেশী ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম যেন আমি ফেব্রুয়ারীর ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দিচ্ছি। অথচ নির্জন ফাঁকা, পায়ের নীচে কার্পেট বিছানো স্টুডিওতে আমি একাই ছিলাম, শ্রোতারা আমার সামনেও ছিলো না। এ ধরণের অনুভূতির কথা আমার সারা জীবন মনে থাকবে।

এমনকি প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন পর্য্যন্ত বক্তৃতা শুরুর পূর্ব মুহূর্তে লাজুক আর আড়ষ্ট হয়ে পড়তেন—কিন্তু তা শুধু কয়েক মুহূর্তের জন্যই। তার পরেই তিনি হয়ে উঠতেন সাহস আর প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসে ভরপুর এক যুগান্তকারী বক্তা।

সুতরাং আপনার ভেংগে পড়ার কিছু নেই। এ ধরণের

অভিজ্ঞতার মুখোমুখি যদি আপনি দাঁড়ান—তাহলে বইটির যথার্থ অনুসরণ আর অনুশীলনের মাধ্যমেই আপনি তা কাটিয়ে উঠতে পারবেন।

আপনি মোটেই ভাববেন না যেন আপনার ঠিকমত কথা বলতে না পাবার ক্ষমতাটা অস্বাভাবিক কিছু। পৃথিবীর অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিই প্রথম জীবনে আপনার মতই ছিলেন। পরে তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে তারা আত্মবিশ্বাস আর সাহসের আগুনে পুড়ে খাঁটি সোনায় রূপান্তরিত হতে পেরেছিলেন।

এ ধরণের অভিজ্ঞতার মুখোমুখী হয়েছেন—জে. এফ. ব্রায়ান, এম. এল. জোন্স, ববি জর্জ, চার্লস স্টুয়ার্ট ব্রাউন, রবার্ট ব্রাস্ট, ডিজরেলী, স্বেরিডান প্রমুখ ব্যক্তিরা।

সুতরাং আপনার হতাশ হওয়ার কোন কারণ নেই। মহাজনদের পথ অনুসরণ করুন সাফল্যের নতুন দিগন্তের সন্ধান পাবেন।

বলতে গিয়ে যদি কোন রকমে মনে দৃঢ়তার ভাব এনে আত্মবিশ্বাস আর সাহস ফিরে পেতে পারেন—তাহলে দেখবেন সব ভয়-ভীতি, সংকোচ আর আড়ষ্টতা কর্পূরের মত উবে গেছে।

মনস্তাত্ত্বিক ডেভিড জেমস বলে গেছেন—নিজেকে সাহসী ভাবুন, তাহলেই সাহস ফিরে পাবেন। আরও সোজা করে বলতে গেলে আপনি সাহসী—এ অভিনয় চালিয়ে যান—তাহলেই ভীতি দূরে হবে, আর আপনিও সত্যিকার সাহসী হয়ে উঠবেন।

প্রেসিডেন্ট থিওডোর রুজভেল্ট তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন—গ্রীজলী ভল্লুক, বুনো ঘোড়া, আর বন্দুক বাজদের কাছ থেকে—ভয়-ভীতি আমি তাড়াতে পেরেছিলাম, নিজেকে একজন অত্যধিক সাহসী লোকের ভূমিকায় কল্পনা করে আর অভিনয় করে করে।

আপনিও এমন করেই লোকের ভয়, আর পাছে কিছু মনে করবে—এই দ্বিধা আর সংকোচ কাটিয়ে ফেলতে পারবেন।

অনুশীলন! অনুশীলন! অনুশীলন!

উপরের এই শব্দটির বারবার উল্লেখই এর দায়িত্ব-গুরুত্ব আর যোগ্যতা প্রমাণ করে। ভয় হচ্ছে গিয়ে আত্মবিশ্বাসের অভাব। আর আত্মবিশ্বাসের অভাব। তাই আপনার সামনে ও পেছনে সার্থকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তুলে ধরুন—তাহলে ভয় পালাতে পথ পাবেনা।

প্রত্যেক মানুষের মনের গভীরে একটি গোপন আকাঙ্খার ঝর্ণা প্রবাহিত হয়ে চলে। প্রত্যেকটি মানুষের জীবনের গভীর গোপন ইচ্ছে হল যে কোন উপায়ে, শ্রেষ্ঠ হতে পারার ক্ষমতা লাভ করা। তাহলে ভেবে দেখা যাক এমন কোন উপায় আছে কি যা আলাদীনের আশ্চর্য্য প্রদীপের জীন—দৈত্যের মত সবকিছু নিমেষে হাজির করে দেবে আপনার সামনে। পৃথিবীর অনেক দার্শনিক চিন্তাবাদ আর ধর্মীয় গুরুরা বিভিন্নভাবে মানুষেরই জয়গান করেছেন। মানুষের কল্যানের জন্যই ভেবেছেন। সাড়ে চার হাজার বছর আগেও হিন্দু ঋষিরা মানুষের সম্পর্ক নিয়ে ভেবেছেন। পারস্যের অগ্নি উপাসকদের কাছে জরাথুস্ত তিনহাজার বছর আগে মানুষের জীবনে প্রশংসা লাভের চেষ্টা আর আগ্রহ সম্পর্কে বলেছেন। আড়াই হাজার বছর পূর্বে চীনা ধর্মশিক্ষক কনফুশিয়াসও মানবিক সম্পর্ক নিয়ে বাণী দিয়ে গেছেন। হুদ, নদীর উপত্যকায় তাও ধর্মীয় গুরু লাওৎসে ও একথা ভেবেছিলেন। এখানে উল্লেখ্য লাওৎসে তাও ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা। জেরুজালেমের বাজারে বেনিয়া মহাজনদের সুবুদ্ধি ফিরিয়ে আনার চেষ্টায় যীশুখৃষ্ট নিজেও মানুষের সম্পর্কের ওপর জোর দিয়েছিলেন। বোধিসত্ত্ব গৌতমবুদ্ধ ও খৃষ্টের জন্মের পাঁচশো বছর আগে অন্য লোককে শ্রেষ্ঠ ভাবতে দেওয়ার মূলমন্ত্র ঘোষণা করেছিলেন।

ওপরে বর্ণিত সমস্ত মহাপুরুষদের বাণীর সংক্ষিপ্ত সারকে এক কথায় বলা যেতে পারে। "তুমি অন্যদের কাছ থেকে যে ব্যবহার আশা কর নিজে অন্যদের সংগে সেরকম ব্যবহার কর"।

উপরের কথাগুলো থেকে আপনার জীবনের অমূল্য শিক্ষা নেবার আছে, আপনার জীবনের উন্নতির মোড় ঘুরিয়ে দেবে তা। উপরে বর্ণিত অংশগুলি পড়ুন। বারবার পড়ুন। তারপর তা নিজের কর্মক্ষেত্রে বাস্তবে প্রয়োগ করুণ। আপনি নিজেই দেখবেন কি আশ্চর্য ফল পাবেন তাতে।

একজন লোক যখন সত্যিকার কিছু বলার মত আগ্রহ আর উদ্দীপণা নিয়ে মনেপ্রাণে তার মনের ভাব প্রকাশ করার চেষ্টা করেন—তখন তার হৃদয়ের অন্তর্নিহিত ভাবের প্রতিফলন শ্রোতারা যাবে বলা হচ্ছে তার মধ্যে অনুরণিত হবেই হবে। ভালোভাবে ভেবে নেওয়া বা চিন্তা প্রসূত বক্তব্যের দশভাগের ন ভাগ অন্ততঃ কার্য্যকরী করা সম্ভব।

প্রস্তুতি কি? কি ভাবে কিছু বলার প্রস্তুতি নেওয়া যায়? কিছু একঘেয়ে যান্ত্রিক বক্তব্যের ফুলঝুড়ি কাগজে কলমে লিখে তোতাপাখির মত মুখস্থ করা? না বাছা বাছা প্রবাদ মনে করে বলে সবাইকে চমকে দেওয়া?

প্রস্তুতি হল আপনার নিজের ধ্যানধারণা আর ভাবনাপ্রসূত বক্তব্য আর যুক্তিকে বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ভাবা, বিচার বিশ্লেষনের আগুনে পুড়িয়ে নেওয়া—মনে মনে মন্থণ করা—অর্থাৎ কোন অবস্থাতে ঐ অন্যের লেখা কোন কিছু জাবর কাটা নয়।

কখনও ভাববেন না যে, আধঘণ্টা সময় পেলেই আপনি আপনার বক্তৃতার বিষয়বস্তু অসাধারণ মালমশলা দিয়ে রান্না করে নিতে পারবেন। এটা কোন অর্ডার মাফিক মাটন-ওমলেট তৈরী করার মত ব্যাপার নয়। আপনাকে ভাবতে হবে, বুঝতে হবে, বারবার চিন্তার যুক্তিতে শান দিতে হবে। সুযোগ পেলে মতের বিনিময়

করে আলোচনার মাধ্যমে আপনার বক্তব্যের মূল সারবস্তাকে ঝালিয়ে নিতে হবে।

আপনি যখন বাজার করেন, খেলা দেখেন, রাস্তায় হাঁটেন, খাবার টেবিলে বসেন, স্নান করতে যান, ফুলের বাগানে সার-মাটি ঠিক করেন নিড়ানি দিয়ে—সর্বদাই মনে মনে ঝালিয়ে নেবেন আপনার ধারণার গ্রন্থিগুলোকে। নিজেকেই নানারকম প্রশ্ন করুণ। যুক্তি-তর্কে ছিন্নভিন্ন করুন ভাবনার জালকে। জীবনের নানা ঘটনা, উদাহরণ, অভিজ্ঞতায় পোড় খাওয়া দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার ঝুলি থেকে শিক্ষনীয় আর স্মরনীয় কথার মালা সাজিয়ে নিন মনে মনে। আপনিই হচ্ছেন আপনার সবচেয়ে বড় বিচারক আর একাধারে বড় সমালোচক।

প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকনও এই একই পদ্ধতিতে নিজের বক্তৃতা তৈরী করার প্রস্তুতি নিতেন। যখন তিনি খেতেন, গাড়ি চালিয়ে কোথাও যেতেন, ঘোড়ায় চড়তেন, নাটক দেখতেন, এমনকি বিছানায় শুয়ে ঘুম আসার পূর্ব মুহূর্তগুলোও তিনি কাজে লাগাতেন। শুধু লিংকন নন, পৃথিবীর বাঘা বাঘা বক্তার নিজেকে তৈরী করার পেছনে রয়েছে এরকম দীর্ঘ মহড়া আর অনুশীলনের ক্লান্তিহীন অভ্যাস।

একটি অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দেবার পূর্বে চুপচাপ বসেছিলাম আমি। যখনই আমাকে কোথাও বলার জন্য ডাকা হত, মঞ্চে ওঠার পূর্বে নিজের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলে নিতাম আমার পাশেই আর একজন বক্তা বসেছিলেন। তিনি আমার কাছে জানতে চাইলেন আমায় ভয় করছে কিনা। আমি উত্তরে জানালাম—হ্যাঁ, আপনি ঠিকই ধরেছেন। আমার যে একটুও ভয় লাগছে না—তা নয়। প্রত্যেক বারই শ্রোতার সামনে কিছু বলার আগে আমি একটু দুর্বল হয়ে পড়ি। কারণ, শ্রোতার প্রতি আমার গভীর ভালবাসা, আন্তরিকতা আর সম্মানবোধ আমাকে একটু পীড়িত করে তোলে। আমাকে

পছন্দ আর ভালবাসার মানুষদের—আমার শ্রদ্ধেয় শ্রোতাদের হৃদয় জয় করতে আমি যদি অসমর্থ হই শ্রোতাদের মন জয় করার যে দায়িত্ব আমি কাঁধে নিয়েছি সেটা কখনই আমি ভুলতে পারি না যে! আপনার ভয় লাগছে না? উত্তরে সেই বক্তা অবজ্ঞার হাসি হেসে বললেন—আরে দূর দূর! শ্রোতাদের আবার ভয়ের কি আছে? ওরা ত মাছের টোপ গেলার মত আমি যা বলব তার প্রতিটি কথাই গিলে নিতে বাধ্য হবে।

কি করে কথার টোপ ফেলতে হয় আমার খুব ভালই জানা আছে।—আপনার সঙ্গে আমি একমত হতে পারলাম না। শ্রোতারা আমার কাছে ঈশ্বরের মত পূজনীয়। কারণ ওরাই হল বক্তার সত্যিকার যথার্থ ও নিরপেক্ষ বিচারক।

আমাদের সেই ভয়ঙ্কর আত্মবিশ্বাসী বক্তাকে সেবার তোত্‌লাতে হয়েছিল বহুবার এবং পরিশেষে লেজে—গোবরে হয়ে চোরের মত বক্তৃতা মঞ্চ ত্যাগ করতে হয়েছিল।

একজন বিখ্যাত পরিব্রাজক, জাতে তিনি অ্যামেরিকান, আমাকে তিনি একবার বলেছিলেন যে দেখুন মিঃ কার্নেগী, সারা পৃথিবী আমাকে ঘুরতে হয়েছিল বহুবার। বিভিন্ন রকম লোকের সামনে ব্যক্তব্য রাখতে হয়েছিল অসংখ্যবার। একটা জিনিস পরিষ্কার উপলব্ধি করতে পেরেছি, শ্রোতারা কেউই মূর্খ বা গবেট নয়। তাদের প্রত্যেকেরই নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে উপলব্ধি ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার সহজাত বিশেষ এক ক্ষমতা রয়েছে। কোনও বক্তারই উচিত হবে না, শ্রোতাদের তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা। এছাড়া প্রত্যেক বক্তাকেই মনে রাখতে হবে যে প্রত্যেক মানুষই তার ব্যক্তিত্বের সঠিক মূল্যায়ণে ভালবাসা এবং শ্রদ্ধা পেতে চায়। তাহলে দুষ্ট কথায় শ্রোতার হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত করলে বক্তার পক্ষে বোকামো

হবে। আর বক্তাকে সম্মান জানিয়ে, ভালবেসে, তুষ্ট করতে পারলে খুব সহজেই চিরদিনের মত শ্রোতার মন জয় করে নিতে পারে বক্তা।

(সুতরাং মোদ্দা কথা হল ভুল করেও মনে মনে শ্রোতৃমণ্ডলীকে গরু গাধা ভেবে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করতে যাবেন না যেন। তাহলে সেটা আপনার কাছেই বুমেরাং হয়ে ফিরে আসবে)।

তাহলে আর একটা কথা খেয়াল রাখবেন, সেটা হল আপনি যে মুহূর্তে মঞ্চে উঠবেন কিছু বলার জন্য, সেই মুহূর্ত থেকেই আপনি শ্রোতাদের বন্ধু ভাবতে চেষ্টা করবেন খুব সহজ বন্ধুত্বপূর্ণ আবহাওয়া সৃষ্টি করতে। তাতে ফল হবে এই নিজের অজান্তেই আপনি সুন্দর এবং হৃদয়গ্রাহী ব্যক্তব্য রাখতে পারবেন। কারণ আপনার তখন মনে হতে থাকবে শ্রোতারা আপনার অপরিচিত নন। আপনি যেন খুবই পরিচিত বন্ধুদের সামনে কিছু বলছেন।

একবার উইলিয়াম ম্যাক্ফারসনকে একজন নাস্তিক খুব জোর আক্রমণ করেছিল। তিনি কিভাবে সেই নাস্তিককে নাস্তানাবুদ করেছিলেন সেটাই এখন বলব। তার পূর্বে উইলিয়ম ম্যাকফারসন সাহেবের একটি পরিচয় দেওয়া দরকার! তিনি হলেন একজন বিদগ্ধ পণ্ডিত। ধর্মসম্পর্কে তাঁর মৌলিক কাজকর্ম শ্রদ্ধা এবং বিস্ময়ের উদ্রেক করে। তদুপরি তিনি হলেন একজন প্রভাবশালী আলোড়ন সৃষ্টিকারী বক্তা।

এবারে সেই নাস্তিকের কথায় আসি। নাস্তিক হঠাৎ-ই প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল—আপনার ওসব ঈশ্বর টিশ্বর, ওসব একেবারে কালতু, বাজে কথা। তিনি অসীম, অনন্ত, সর্বশক্তিমান-এগুলি গালভরা বুকনি ছাড়া কিছুই নয়। আমি ওসব বিশ্বাস করি না।

একটুও অপ্রস্তুত না হয়ে ধীর শান্তভাবে মিঃ ম্যাক্‌ফারসন তাঁর হাতের ঘড়িটি খুলে নিলেন। এবং ঘড়িটা নাস্তিকের সামনে টেবিলের উপর রাখলেন। এবং বললেন—এই যে ঘড়িটা, এর ভেতরের লিভার এবং হুইলগুলো সব আপনা আপনি-ই তৈরী হয়েছে এবং আপনাআপনিই একত্রিত হয়েছে আর নিজে নিজেই চলতে সুরু করেছে টিক্‌টিক্ করে, কোন কিছুরই সাহায্যের দরকার হয় নি—এই কথাগুলো যদি আমি বলি তাহলে আপনি আমার মাথার ঘিলু আর স্বাভাবিক সুস্থতা নিয়ে প্রশ্ন তুলবেন, তাই না? আমি জানি আপনি আমাকে পাগল ভাবতে একটুও ইতস্ততঃ করবেন না। মাথা তুলে আকাশের দিকে একটু তাকাবেন কি? তাকালেই দেখবেন সেইসব তারাদের, প্রত্যেকটি তারাই নিজ নিজ গতিতে, নিজ নিজ অক্ষপথে পরিভ্রমণ করছে। একটুও ভুলচুক না করে যেমনি করে পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহরা সূর্য্যকে পরিভ্রমণ করছে, যেহেতু সৌরজগতে সূর্য্যই হচ্ছে প্রধান প্রাণপুরুষ। অনেককে একদিনে কয়েক কোটি মাইলও পরিভ্রমণ করতে হচ্ছে। প্রত্যেকটি নক্ষত্রই তার নিজের জগতে আমাদের সূর্য্যের মতই। এবং তাকে ঘিরেও তার গ্রহমণ্ডলীর অবিরত পরিক্রমা চলছে নিজ নিজ অক্ষপথে। তবুও তাদের মধ্যে পারস্পরিক সংঘর্ষ, কোনরকম বাধাবিঘ্ন ভুল পরিলক্ষিত হয় না। শান্ত সুশৃঙ্খল এবং বাধ্যভাবে তারা নিজ নিজ পরিমণ্ডলে আবর্তিত হয়। তাহলে কি এটা বিশ্বাস করা খুবই সহজ নয় যে এরা নিজে নিজেই সব কিছু ঠিকঠাক করে নেয় নি, নির্দিষ্ট গতিপথে সুশৃঙ্খলভাবে পরিভ্রমণ করতে শুরু করে নি? সে তাদের নির্দিষ্টপথে নিয়ন্ত্রিত গতিতে নিয়ম মেনে বাধ্য করেছে ঠিকভাবে চলার জন্য। কে সেই সর্বশক্তিমান? সমস্ত শক্তির উৎস যিনি, ক্ষমতার উৎস যিনি, সমস্ত কার্য্যনিয়ন্ত্রন করেন যিনি, নিয়ামক যিনি, নিয়ন্তা যিনি—তিনিই সেই মহান অসীম, অনন্ত, সকলশক্তির আধার ঈশ্বর।

নাস্তিক কুপকাৎ। কারণ তার বিশ্বাস ও যুক্তির ভিত-ছিল পাল্‌কা।

এ পর্য্যন্ত আমি যা বলে চলেছি তা কিন্তু মোটেই নতুন নয়। বহুপূর্বে সেন্ট পল এমনি ভাবেই তার প্রচার কার্য্য চালিয়েছিলেন। সেন্ট পল এইভাবেই অতি সূক্ষ্ম দক্ষতার সঙ্গে মারস্ হিলোর উপর এথেন্সবাসীদের কাছে এমনভাবে বক্তব্য রেখেছিলেন যার প্রভাব পরবর্তীকালে ঊনবিংশ শতাব্দীতেও প্রশংসিত এবং কার্যকরী হয়েছিল। মানুষ হিসাবে পল ছিলেন অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী। ধর্মান্তরিত হওয়ার পর থেকেই তার উদার বক্তব্য তাকে চূড়ান্ত জনপ্রিয়তার অধিকারী করে। একবার তিনি এলেন এথেন্সে—এথেন্সের জাজ্বল্যমান্ গৌরবান্বিত স্বর্ণযুগ তখন অস্তমিত—পেরিক্লিসের আমলের এথেন্সের স্বর্ণময় অধ্যায়ের গৌরব তখন নির্বাপিত দীপের মত ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে কোথায় শূন্যে বিলীন হয়ে গেছে কে জানে। এথেন্সের এই অবক্ষয়ের যুগ সম্পর্কে বাইবেলে বলা হয়েছে: এথেন্সের অধিবাসীদের তখন অন্য কোনও কাজ ছিল না, একমাত্র কাজ ছিল নতুন নতুন গল্প শোনা।

আমরা যেমন রেডিও শুনে, অথবা আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে টেলিফোনে গল্প করে অথবা নানারকম নতুন নতুন তথ্য সম্বলিত পুস্তিকা পড়ে আমাদের অলস বিকেলগুলো কাটিয়ে দিই, সেযুগে এথেন্সবাসীরা আর এমন সময় কাটানোর আধুনিক উপায় পাবে কোথায়? পল এলেন নতুন যুগের বার্তা নিয়ে—তাঁর বক্তব্যে ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের নতুনত্বের ছোঁয়া! এথেন্সবাসীরা তাঁর চারিপাশে মৌমাছির মত গুঞ্জন শুরু করে দিল সর্বক্ষণ। তারা তাঁকে এরোপেগাসের কাছে নিয়ে গেল, বলল: আমরা জানতে চাই আপনি কোথাকার কথা বলেন, আপনার এই নতুন বক্তব্যের

মানেই বা কি? কারণ অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলেন, আমরা এমন কথা মোটেই কখনও শুনি নি। এ সকল বক্তব্যের অর্থ আমরা অবশ্যই জানতে চাই।

পল একটুও ইতস্ততঃ না করে তাঁর বক্তব্য রাখলেন। বলতে লাগলেন তাঁর এখানে আসার উদ্দেশ্য। হয়ত তিনি কোনও উঁচু পাথরের উপর দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিতে শুরু করেছিলেন, প্রত্যেক ভাল বক্তার মত প্রথমে হয়ত একটু ভয়ও পেয়েছিলেন, কি বলবেন কি বলবেন না একথা মনে করতে করতে দু চারবার কেশে গলা পরিষ্কার করে নিয়েছিলেন!

তিনি বক্তব্যের শুরুতেই বললেন নতুন কিছুই তিনি বলছেন না। তিনি জানতেন এথেন্স তার ধর্মপ্রচারের উপযুক্ত জায়গা। কিন্তু তিনি যদি বলতে চান যে তাঁর বক্তব্য সম্পূর্ণ নতুন, তবে তা উল্টো ফল দেবে। হয়ত পরিবেশকেই বিষাক্ত করে দেবে। তিনি তাঁর ধর্মবিশ্বাসকে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন যা কিনা এথেন্সবাসীদের কাছে নতুন ত নয়ই বরং তাদের প্রচলিত ধর্ম-বিশ্বাসেরই অঙ্গ। এতে যুক্তিতর্ক বা ব্যক্তিগত মতবিরোধকে এড়াতে পেরেছিলেন তিনি। কিন্তু কেমন করে? তিনি প্রথমে এক মুহূর্ত ভেবে নিয়েছিলেন; অপূর্ব কোনও পরিকল্পনা তৈরী করে নিয়েছিলেন; তারপর হয়ত তাঁর সেই অবিস্মরণীয় বক্তব্য রেখেছিলেন: আমার এথেন্সবাসী বন্ধুরা, আমি মনে করি আপনারা এখনও অনেক বিষয়ে কুসংস্কারের প্রশ্রয় দিয়ে থাকেন।

অথবা কোথাও অনুবাদ করলে দাঁড়ায়: "হে এথেন্সবাসীগণ, আপনারা প্রবল ধর্মপরায়ণ।" আমি মনে করি তাঁর এইভাবে বক্তব্য শুরু করার মধ্যে তাঁর ধীশক্তি অদ্ভুতভাবে কাজ করেছিল। কারণ এথেন্সবাসীরা তখন ছিল বহু দেবদেবীর পূজারী। এবং এজন্য তাদের গর্বের সীমা ছিল না, তারা নিজেদেরকে মনে করত এক অতি সুসভ্য জাতি। সুতরাং তিনি পরোক্ষভাবে তাদের

সন্তুষ্টই রাখতে চাইলেন। ব্যক্তব্যের প্রথমেই তিনি তাদের সহৃদয় বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার পেয়ে গেলেন। যদি কখনও সহজেই মনজয়কারী কোনও ব্যক্তব্য রাখতে চান তবে সেন্টপলের মত সব সময়েই কোনও না কোনও উদাহরণ দিয়ে আপনার বিবৃতি শুরু করুন।

সকালবেলা শয্যা ত্যাগ করার পর থেকে নিশীথে শয্যাগ্রহণের প্রাক্‌মুহূর্ত পর্য্যন্ত কত লোকের সঙ্গে কত বিষয়ে কত কথাই না আমরা বলে থাকি। একবার কি ভেবে দেখেছেন কেমন করে কিভাবে আপনার নির্দিষ্ট ব্যক্তব্য বিষয়ে আপনি প্রভাবিত করতে পারেন অন্যদের ?

অফিসে, ট্রেনে, কোনও অনুষ্ঠানে, কলে কারখানায়, হাটে বাজারে, দোকানে, হোটেল রেস্টুরেন্টে বিভিন্ন লোকের সঙ্গে কথা বলার সময় আপনি কি সুযোগ করে নিতে পারেন না কথা বলার মহড়া দেওয়ার অনুশীলন করার ?

এ পর্য্যন্ত যা শিখলেন তা কি প্রয়োগ করা যায় না অন্যের উপরে ? যদি তা প্রয়োগ করা যায় তাহলে কি করে শুরু করবেন ? লিংকনের কৌশলে না কি নিজের মত করে ? যদি লিংকন বা অন্য কোনও প্রখ্যাত বক্তার মত করে শুরু করতে পারেন, তাহলে বুদ্ধি, মেধা, কলা কৌশলের, চাতুর্য্য আপনাকে অপ্রত্যাশিত সফলতায় অসাধারণ শ্রদ্ধাবান্ বক্তা করে তুলবে আপনার প্রিয় শ্রোতাদের কাছে।

এবারে এ পরিচ্ছেদের সমাপ্তিতে এমন একজন বিখ্যাত ব্যক্তির নজির টানব যা থেকে আপনারা এক চূড়ান্ত শিক্ষা নিতে পারবেন। তিনি হলেন অ্যামেরিকার জনপ্রিয় এবং মহত্তম প্রেসিডেন্ট—উড্রো

উইলসন। একবার বুদ্ধিজীবিদের এক সম্মেলনে তিনি হাসতে হাসতে বলেছিলেন—আপনারা যদি আমার কাছে আসেন এবং বলেন, আসুন আমরা কোনও বিষয়ে সম্পর্কে এক জায়গায় বসে আলোচনা করতে শুরু করি এবং আমরা যদি একে অপরের সঙ্গে মতের মিল করতে না পারি, আমরা যদি বুঝতে পারি কেন আমরা মতৈক্যে পৌঁছতে পারছি না, কি বিষয়েই বা আমাদের মতদ্বৈততা, আমরা ঠিক বুঝতে পারব যে আমাদের পরস্পরের সঙ্গে মতভেদ বিশেষ প্রকট নয়, যে বিষয়ে আমাদের মতদ্বৈততা তা এমন কিছুই মনে করে রাখার মত ত নয়ই বরং বেশীর ভাগ বিষয়েই আমরা একমত হয়ে গেছি। আর আমাদের যদি ধৈর্য্য, একাগ্রতা বা একতার আগ্রহ থাকে তবে অবশ্যই আমরা একমত হব।

উপস্থিতমত বক্তৃতা রচনা করা

কিছুদিন পূর্বে একদল ব্যবসায়ী এবং সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মচারী জমায়েত হয়েছিলেন একটি ঔষধ প্রস্তুতকারী সংস্থার নতুন গবেষণাগারের উদ্বোধনীসভাতে। তারা এসেছিলেন মানুষের কল্যানে নিয়োজিত এ সংস্থাকে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানাতে।

পাঁচ-সাতজন বক্তা, যারা গবেষনার কাজে নিযুক্ত—তারা বক্তব্য রাখলেন; কেমন করে তারা নতুন নতুন জীবাণু প্রতিষেধক ভ্যাকসিন। ভাইরাসধ্বংসকারী এ্যাণ্টি-বায়োটিক আর মানুষকে দুশ্চিন্তার স্নায়ুছেঁড়া টানাপোড়ন থেকে মুক্তি দিতে নতুন ট্র্যাঙ্কুইলাইজার আবিষ্কার করার কাজ করে চলেছেন। প্রথমে কীভাবে কেমন করে জীবজন্তুর ওপর পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে ঔষধের নানারকম ফলাফল লক্ষ্য করা হয়---তারপর মানুষের ওপর ব্যবহার করা হয়—এ সম্পর্কে নাটকীয় ঘটনার সংমিশ্রিত বক্তৃতা শ্রোতাদের মনোযোগ আকর্ষণে সমর্থ হলো।

একজন উচ্চপদস্থ অফিসার রিসার্চ ডিরেক্টরের পাশেই বসেছিলেন। এ পর্য্যন্ত রিসার্চ ডিরেক্টরের অধীনস্থ লোকেরাই বক্তব্য রেখেছে---স্বয়ং রিসার্চ ডাইরেক্টর চুপচাপ শুনেছিলেন—তিনি কিছুই বলছিলেন না। ব্যাপারটা খুবই চোখে লাগলো সেই সরকারী অফিসারের। তিনি জানতে চাইলেন---অসাধারণ বিষয়ে বক্তৃতা শোনার সৌভাগ্য হল এখানে এসে। মিঃডিরেকটর আপনার লোকেরা সবাই যাদুকর। কিন্তু আপনি কেন এখন পর্য্যন্ত কিছু বলছেন না?—আমি শুধু নিজের মত করেই কিছু বলতে পারি—

শ্রোতার সামনে কোন কিছু বলার ক্ষমতা আমার নেই!—দুঃখিত বিষণ্ণ গলায় জানালেন রিসার্চ ডিরেক্টর।

কিছুক্ষণ পর চেয়ারম্যানের কণ্ঠস্বর শোনা গেল—আমরা এখন আমাদের রিসার্চ ডিরেক্টরের নিজের মুখ থেকে কিছু শুনতে চাই। তিনি বাঁধাধরা ছকে কিছু বলতে চাননা অবশ্য। তবুও আমি তাঁকে অনুরোধ করছি তিনি যেন আমাদের জন্য দু'চারটি কথা অন্তত বলেন।

ঘটনাটি ছিলো বেদনাদায়ক। রিসার্চ ডিরেক্টর উঠে দাঁড়িয়ে মাত্র দু'লাইন কোনরকমে বলতে পেরেছিলেন। তিনি বেশী কিছু বলতে পারবেন না বলে ক্ষমা চাইলেন এবং দুঃখিত হয়ে বসে পড়লেন। শ্রোতাদের কাছে বলা তাঁর বক্তব্যের এই ছিলো মূলকথা।

অথচ তাঁর নিজের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সফল—অসাধারণ মেধাসম্পন্ন বিজ্ঞানী আর কৃতীপুরুষ। কিন্তু মঞ্চে উঠে তিনি শুধু লোককে নিরাশ করলেন। অথচ তাঁর মত মানুষের পক্ষে বক্তৃতা শেখা বা উপস্থিত মত বক্তৃতা রচনা করাটা এমন কিছু কঠিন হতো না।

এ পর্য্যন্ত ডেলকার্নেগী ইনস্টিটিউশনে ভর্তি হওয়া ছাত্রদের ভেতর এমন একজনও দেখিনি—যার লেখার ইচ্ছা ও একাগ্রতার অভাব নেই এবং যে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ সে ব্যর্থ হয়েছে বক্তা হিসাবে।

আগে থেকে জানা থাকলে আর অনুশীলন করা হলে বক্তব্য রাখা সহজ হয়, যেমন আবার হঠাৎই অপ্রস্তুতভাবে বলতে হলে হতবুদ্ধি হয়ে একটা শব্দও মনে না আসতে পারে।

তাই একজন লোকের পক্ষে দ্রুত চিন্তা করার ক্ষমতা আর অবস্থার সংগে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়াটা খুবই জরুরী। হয়তো পূর্ব-প্রস্তুতি থাকলে পরে দীর্ঘ-পরিশ্রম সাপেক্ষ বক্তব্য রাখা সহজ হয়ে ওঠে।

কিন্তু আজকের দিনে ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্রুত ক্রমোন্নতির ক্ষেত্রে, নিজের ভাবনা চিন্তাকে জড়ো করে চিন্তাকে যুক্তি-তর্কের সীমানায় এনে অন্যকে প্রভাবিত করতে হয় অহরহ—সেখানে হাতে খুব একটা সময় থাকে না। দ্রুত ভাবতে হয়—দ্রুত বলতে হয়—আরও দ্রুত প্রস্তুতি নিতে হয় পরবর্তী কাজের, তাই যে কোন অবস্থায় যে কোন বিষয়ে কিছু বলতে পারার তাৎক্ষণিক ক্ষমতা থাকা খুবই জরুরী হয়ে ওঠে।

সরকারী কাজকর্মে এবং শিল্পের ক্ষেত্রে গোল টেবিল বৈঠকে, পারস্পরিক মতের বিনিময়েই প্রতিটি সিদ্ধান্ত গড়ে ওঠে। পরে তা কার্যকরী হয়। তাই বলার ব্যাপারটা পরিষ্কার না হলে চিন্তার আদান-প্রদানও ঘোলাটে হয়ে উঠবে। শুধুমাত্র একজন লোকের কথায় আজ আর কিছু হয় না। অনেকের সম্মিলিত চিন্তা থেকে প্রণয়ণ হয় নতুন নতুন সিদ্ধান্ত, যা পরে বাস্তবে প্রয়োগ করা হয়।

তাই তাৎক্ষণিক বক্তৃতা বা বক্তব্য রাখার ক্ষমতা অর্জন করাটা খুবই প্রয়োজনীয় একজন ভাবী শিল্পপতি বা গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়োজিত থাকা ব্যক্তির যা কিনা অভাবনীয় সফলতা বয়ে আনবে তার জীবনে।

হঠাৎ করে কোন কিছু বলা অভ্যাস করুন

যে কোন মানুষই যার ইচ্ছা আছে শেখার এবং নিজের প্রতি আত্মবিশ্বাস—তার পক্ষে উপস্থিতমত কিছু বলাটা এমন কিছু কঠিন বা শক্ত বিষয় নয়।

আমি এখন অনেকগুলো উপায় আপনাদের শিখিয়ে দেবো যার যথার্থ প্রয়োগে এবং অনুশীলনে আপনারা তুবড়ির মত উপস্থিত বক্তব্য রাখতে সক্ষম হবেন—যদি হঠাৎ করে কোন কিছু বলার জন্য আমন্ত্রিত হন কখনও। ডগলাস ফেয়ার ব্যাঙ্কস যে পদ্ধতি থেকে শিখেছিলেন সেটা এখন তার মুখ থেকেই শোনা যাক—

আমি, চার্লি চ্যাপলিন আর ম্যারী পিকফোর্ড প্রায় প্রতি রাত্রিতেই সুটিং এর ফাঁকে এ খেলাটা খেলতাম। ছ'বছর ধরে আমরা এ খেলাটা খেলেছিলাম। এটা নিছকই খেলার জন্য খেলা ছিলো না। আমার মনে হয় কথা বলা শেখা এবং অভ্যাস করার সবচেয়ে কঠিন অতিঅবশ্য ফলপ্রসু আর কার্য্যকরী পদ্ধতি এটা।

আমরা প্রত্যেকেই কাগজের টুকরোতে কোন একটি বিষয়ের শিরোণাম লিখতাম। পরে সবার লেখা হয়ে গেলে কাগজগুলো ভালো করে পুরিয়ার মত করে নিতাম আর ঝাঁকুনি দিয়ে মিশিয়ে ফেলতাম। তারপর কাগজগুলো একসংগে টেবিলে ফেলার পর একজন একটি পুরিয়া টেনে নিয়ে খুলে দেখতাম। আমাদের মধ্যে কেউই একই বিষয়ে ছ'বার লিখতাম না। যে প্রথম পুরিয়া টেনে নিতো তাকে কাগজে লেখা নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর দেরী না করে ষাট সেকেণ্ড বলতে হতো।

একদিন রাতে পুরিয়া টেনে নিয়ে, দেখলাম, লেখা আছে: বিষয়—'ল্যাম্পের-ঢাকনা'। আপনাদের ভেতর যদি কারুর বিষয়টিকে সহজ বলে মনে হয় একবার চেষ্টা করে দেখবেন। আমি কোন-রকমে উৎরে গেলাম।

তবে এ বিষয়ে লক্ষ্যণীয় এটা যে—আমরা তিনজনই খেলা সুরু করার পর থেকে দ্রুত উন্নততর হতে থাকলাম, উপস্থিত মত কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে বলতে পরার ক্ষমতা পেলাম। আমরা বিভিন্ন বিষয়ে অনেক কিছু জানতাম: কিন্তু তার চাইতেও বড় কথা হল, নিমেষের মধ্যে চিন্তা যুক্তি আর বুদ্ধিকে একত্রিত করে যে কোন বিষয়ে গুছিয়ে প্রভাবশালী বক্তব্য রাখার ক্ষমতা অর্জন করে ফেললাম। আমরা শিখতে থাকলাম নিজের মত চিন্তা করতে, যে কোন মুহুর্তে ভাবনাকে কাজে, লাগিয়ে বলাতে আত্মনিয়োগ করতে সমর্থ হতে।'

ডেলকার্নেগী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বক্তৃতা শিক্ষাদান কালে বহু ছাত্রছাত্রীকে আমি অপ্রস্তুত অবস্থায় উপস্থিত-মত বক্তব্য রাখতে বলতাম।

কারণ আমার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি যে এ ধরণের অভ্যাস দুধরণের কাজ করে।

(১) এটা আমার ক্লাশের ছাত্র-ছাত্রীদের ভাবতে শিখিয়েছিলো যে তারা যে কোন মুহূর্তে অপ্রস্তুত অবস্থায়ও সুন্দর করে গুছিয়ে বক্তৃতা দানে সে সক্ষম। নিজের মত করে ভাবনা-চিন্তা করতেও পিছ-পা নন।

(২) এ ধরণের অভিজ্ঞতা তাদের আত্মবিশ্বাস আর দ্রুত সঠিক চিন্তা করার ক্ষমতাকে বাড়াবে এবং নিজের চারপাশে নিরাপত্তা আর সফলতার এক দুর্ভেদ্য দুর্গ গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।

সুতরাং কোনও না কোনও সময়ে ক্লাসের সদস্যদের বলা হবে: আজকে রাতে আপনাদের প্রত্যেককে এক একটি সম্পূর্ণ নতুন

বিষয় দেওয়া হবে যা সম্পর্কে আপনাদের কিছু বলতে হবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত বলবার জন্য আপনি উঠে না দাঁড়াবেন ততক্ষণ পর্য্যন্ত আপনার আলোচ্য বিষয়টি সম্পর্কে আপনাকে কিছুই জানানো হবে না।

কি ঘটবে ? হয়ত একজন হিসাবরক্ষককে ডাকা হবে বিজ্ঞাপন সম্পর্কে কিছু বলতে। কোনও বিজ্ঞাপন কোম্পানীর লোককে হয়ত ডাকা হবে শিশুশিক্ষা বা কিণ্ডারগার্টেন সম্পর্কে কিছু বলতে। কোনও স্কুলমাস্টারের ভাগ্যে হয়ত পড়বে ব্যাংকসম্পর্কিত কোনও বিষয় কিংবা কোনও ব্যাংকের কর্মচারীর ভাগ্যে পড়বে স্কুলশিক্ষা সম্পর্কিত কোনও বিষয়।

যাদের বলতে বলা হল তারা "কি পারব" না ভেবে লেজ গুটিয়ে পালিয়ে যাবে ? কখনও না ! তাদের নিজ নিজ বিষয় সম্পর্কে পাণ্ডিত্যপূর্ণ সারগর্ভ বক্তৃতা দিতে পারবে না কিন্তু। প্রত্যেকে তাদের সাধারণ জ্ঞানের সাহায্যে বক্তৃতাকে মনোজ্ঞ করে তুলতে পারে। আসল কথা হল ভয় পেলে চলবে না। তাদের উঠে দাঁড়িয়ে কিছু বলতে হবে। অনেকের ভাগ্যে তাদের বিষয়টি হয়ত একটু কঠিন হয়ে যায়। কিন্তু তারা পারব না বলে পালিয়ে গেলে চলবে না। অনেক সময় দেখা যায় যা বলবে ভেবে তারা বলতে শুরু করেছিল তার থেকে অনেক ভাল বলে চলেছে। এতে তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়ে কারণ তারা বুঝতে পারে তারা তাদের এই গুণটি সম্পর্কে এতদিন পর্য্যন্ত অবহিত ছিল না।

আমার বিশ্বাস, সকলেই এইভাবে বলতে পারে আর ইচ্ছে শক্তি আত্মবিশ্বাস থাকলে প্রত্যেকেরই চেষ্টা সফল হবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

আর একটা পদ্ধতিতেও আমরা আমাদের ক্লাসের সদস্যদের শিক্ষা দিয়ে থাকি। এই পদ্ধতিতে কোনও একজন লোককে হয়ত বলা হল কোনও একটি বিষয়ে অতি সুন্দর ভাবে যতটা সম্ভব অপূর্ব

ভঙ্গীতে গুছিয়ে কিছু বলতে, অনেকটা গল্প বলার ভঙ্গীতে। তিনি হয়ত বলতে শুরু করেছেন হঠাৎ সময় শেষ সূচক ঘণ্টা বেজে উঠল। তখন পরবর্তী বক্তাকে পূর্ববর্তী বক্তার গল্পের জের টেনে চলতে হবে।

এইভাবে পূর্বপ্রস্তুতিহীন বক্তৃতার ক্ষমতা বাড়িয়ে চললে নানাভাবে প্রশংসা অর্জন করা যায়। যে যত অভ্যাসের দ্বারা এই ক্ষমতা বাড়িয়ে চলে সে তত এই অ-পূর্বপরিকল্পিত বক্তৃতায় অদ্ভুত ব্যুৎপত্তি লাভ করতে পারে।

তাই মোদ্দা কথা হল—অযথা না ফেনিয়ে কম কথায় গুছিয়ে বলতে হবে। অন্যথায় শ্রোতার বিরক্তি উৎপাদনই করা হবে শুধু। কাজের বারোটা বাজবে। একটা কথা প্রসঙ্গে মনে পড়ে গেল। একজন বিশিষ্ট অধ্যাপক একবার বলেছিলেন—যদি আপনি সফল হতে চান কোন বিষয়ে, তাহলে যাদের নিয়ে আপনার কাজকর্ম, তাদের মনে আগ্রহ জাগিয়ে তুলুন আপনার কাজ সম্পর্কে। যদি অন্যের মনে আগ্রহ জাগাতে সক্ষম হন, তাহলেই আপনি সঙ্গী পাবেন। একলা পথ চলতে হবে না। ব্যর্থতার বদলে সফলতা আপনার করায়ত্ত হবে।

আর একটা কথা মনে রাখবেন—ভয়ভীতি আপনাকে অজ্ঞতা আর অনিশ্চয়তার সেকল পরিয়ে রাখে। ধরুন, একজন সেলসম্যান আপনি। আপনার বিক্রয় পণ্য হল সাবান। এখন আরও তিরিশটি কোম্পানী সাবান বিক্রি করে। এরা আপনার জোর প্রতিদ্বন্দ্বী। এদের সবার কাছ থেকে আলাদা যুক্তিপূর্ণ হৃদয়গ্রাহ্য ও আবেদনপূর্ণ কথার মাধ্যমেই কেবল আপনি ক্রেতার মনে প্রভাব বিস্তার করতে পারবেন। নম্র-ভদ্র-বিনীত কথার যুক্তিতেই ক্রেতাকে না চটিয়ে তার মনে আগ্রহের সঞ্চার করে তুলতে পারবেন আপনি। যদি তা পারেন তাহলেই আপনার বিক্রি বাড়বে!

হুকুম করে কথা বলা কেউ পছন্দ করে না। আমি একজন সাইকেল ব্যবসায়ীকে চিনি। তার দোকানের কর্মচারীর সংখ্যা চল্লিশ। এরা কেউই ভদ্রলোককে পছন্দ করে না। কারণ তিনি অতিমাত্রায় সন্দেহ-প্রবণ, খিটখিটে আর খুঁতখুঁতে লোক। সব সময় মুখে কোষ্ঠকাঠিন্যের মতই অখুশী আর অসন্তুষ্টির ছাপ। সর্বদা কর্মচারীদের ধমকে—বকে বা হুকুম করতে অভ্যস্ত ছিলেন তিনি। মুখে সবসময় লেগেই থাকতো—এটা—করো, ওটা করো। এটা করো, ওটা করো। এটা করো না—সেটা করো না।

এর ফলে ব্যাপারটা এই দাঁড়ালো যে, কর্মচারীরা মালিকের হুকুম মাফিক কাজ না করতেই অভ্যস্ত হয়ে পড়লো। সম্পর্কটা দাঁড়িয়ে গেল শত্রুর মত। ব্যবসা যখন ফেল পড়ার উপক্রম তখন তিনি এলেন আমার কাছে। পরামর্শ নিতে।

প্রথমেই আমি তাকে বললাম—সব সময় হাসি মুখে খুশী মনে থাকার যথাসাধ্য চেষ্টা করুন। হাসি না এলেও হাসি আরোপিত করার চেষ্টা করতেই হবে। নরম গলায় অন্তরঙ্গ ভংগীতে অনুরোধ করুন কর্মচারীদের।—কখনও সোজাসুজি হুকুম না করে, কোন কাজ করবে তাই বলুন। কেউই আদেশ পালন করতে পছন্দ করে না।

অনেক বড় বড় কোম্পানী তাদের উৎপাদিত পণ্য-সামগ্রীকে ক্রেতার কাছে আকর্ষণীয় করে তুলতে টেলিভিসন/রেডিও/খবরের কাগজে/আর বড় বড় রাস্তার সংযোগে হোর্ডিং টাঙিয়ে জোর বিজ্ঞাপণ প্রচারের সাহায্য নেন। প্রতিটি বিজ্ঞাপনই এত সুকৌশলে পরিবেশিত হয় যে—ক্রেতাসাধারণ নিজের অজান্তেই পণ্য সামগ্রী, কেনার জন্য প্রভাবিত হন, যুক্তি দাঁড় করিয়ে ফেলেন মনে মনে।

সকালে চা সহযোগে প্রাতঃরাশ সারতে সারতে আপনি যখন দৈনিক সংবাদ পত্রে চোখ বুলিয়েনেন, তখন নিশ্চয়ই অনেকগুলো মোটর গাড়ি—দুর্ঘটনা আর চালক ও আরোহীর অকালমৃত্যু সংবাদ আপনাকে বিষণ্ন আর চিন্তিত করে তোলে। কারণ আপনিও

গাড়ি চালিয়ে সারাদিন কাজের ধান্দায় এধার—ওধার চষে বেড়ান। রাস্তাতে পথ-দুর্ঘটনার শিকার আপনিও যে কোন মুহূর্তে হতে পারেন, তাই মনে মনে আপনি সাবধানতা অবলম্বন করার শপথ নেন।

একটি ব্যাটারী-প্রস্তুতকারক কোম্পানী, তাদের বিজ্ঞাপন-প্রচার করার সময়—টেলিভিসনে একটি পথ দুর্ঘটনার ঘটনা দেখাতো। স্বামী, স্ত্রী আর চার বছরের শিশুকন্যা দুর্ঘটনায় একই সংগে প্রাণ হারিয়েছিলো। দুর্ঘটনাটি ঘটেছিলো গাড়ির হেডলাইটের ব্যাটারী অকেজো হয়েছিলো বলে। ঠিক সময়ে কাজ করেনি বলে। কিন্তু নির্ভরযোগ্য ব্যাটারী ব্যবহার করলে সেই মর্মান্তিক মৃত্যু ও দুর্ঘটনার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যেতো। শ্রোতার মনে দুর্ঘটনার সংগে ব্যাটারীর সম্পর্ককে (সেই বিশেষ কোম্পানীর ব্যাটারী অবশ্য) এত সুন্দর করে গেঁথে দেওয়া হল যে—এরপর তিনি নিজের প্রাণের নিরাপত্তার জন্য অবচেতন মনে অজান্তেই সেই কোম্পানীর ব্যাটারীর জন্যই ব্যস্ত হবেন। বিজ্ঞাপন কোম্পানীর ঘোষণাটি ছিল এরকম—অযথা প্রণের ঝুঁকি নেবেন না। 'এ' ব্যাটারী কিনুন, সময় থাকতে বিপদের মোকাবিলা করুন।

এভাবে প্রতিবারই সেই ব্যাটারী কোম্পানী একটি বা দুটি করুণ মর্মস্পর্শী দুর্ঘটনার কথা বলতো। শিশু, নারী, বৃদ্ধরাও দুর্ঘটনার শিকার হতো শ্রোতারা এতো বেশী নিজেদের অজান্তেই এ দুর্ঘটনা মধ্যে নিজেদের ঢুকিয়ে ফেলতো যে—ব্যাটারী কোম্পানীর বিজ্ঞাপনের মধ্যে নিজেদের নিরাপত্তা খুঁজে নিতো। অবশ্য কোম্পানী যে দুর্ঘটনার কথা বিবৃত করতো—সেগুলো ছিলো সবই সত্যি ঘটনা। বানানো বা বিকৃত ঘটনা নয়। তার ফলেই সত্যিকার সৎ-হৃদয়গ্রাহ্য আবেদন রাখা সম্ভব হয়েছিলো শ্রোতাদের মনের আসরে।

যারা কোন কিছু বিক্রি করেন, তারা এ ঘটনা থেকে অনেক

কিছু শিখতে পারবেন। (সত্যি ঘটনাকে সঠিক দৃষ্টিকোণ দিয়ে কাজে লাগাতে পারলে ম্যাজিকের মতই ফল হবে)

নিজের জীবন থেকে দৃষ্টান্ত দিন

প্রথমে কথা দিয়ে জনসাধারণকে বশীভূত করার চেষ্টা করুন। আপনি আপনার বক্তৃতায় এমন একটি অভিজ্ঞতার কথা বলবেন যা থেকে আপনি নিজেও বেশ কিছু শিক্ষা পেয়েছেন। মনোবিজ্ঞানীদের মতে আমরা দুভাবে জ্ঞান লাভ করতে পারি।

বারবার অনুশীলন দ্বারা। অর্থাৎ ক্রমান্বয়ে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি আমাদের ব্যবহারিক স্বভাবের পরিবর্তন ঘটাবে।

কাজের ফল সম্পর্কে অবহিত হওয়ার দ্বারা। অর্থাৎ কোনও একটি ঘটনার ফল চমকপ্রদ হয় যার দ্বারা আমাদের স্বভাবের পরিবর্তন সাধিত হয়। এরকম ঘটনার কথা আমরা কখনও ভুলি না, স্মৃতিপটে ছবির মত জ্বল জ্বল করে। এরকম কোনও ঘটনার উল্লেখ করে আমরা অন্যের স্বভাবেরও পরিবর্তন করতে পারি। কারণ লোকে কথার মারপ্যাঁচে যতটা না আকৃষ্ট হয় তার থেকে অনেক বেশী আকৃষ্ট হয় বাস্তব ঘটনার চমকপ্রদ উদাহরণে। এমন ঘটনা সাধারণভাবে আপনার মনের উপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল তা গুছিয়ে বলতে পারলে জনসাধারণের কাছে আপনার বক্তৃতা প্রভাব বিস্তারকারী যাদুদণ্ডের মত কাজ করবে। বিশদভাবে গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে নাটকীয়ভাবে এমন ঘটনার উপস্থাপনা শ্রোতাকে উৎসাহী করে তুলবে তাদের দৈনন্দিন কোন স্বভাবের বিশেষ পরিবর্তন ঘটাতে। নীচে কতকগুলি সূত্র দেওয়া হল সেগুলি পালন করলে আপনার বাচনভঙ্গী হয়ে উঠবে পরিষ্কার, সংযত এবং অর্থবহ।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে উদাহরণ টানুন

প্রথমে এমন একটি বিশেষ দৃষ্টান্তের অবতারণা করুন যা আপনার ব্যক্তিগত জীবনের উপর নাটকীয় প্রভাব বিস্তার করেছিল। ঘটনাটি হয়ত দীর্ঘস্থায়ী নয়, হয়ত কয়েক মিনিটের ব্যাপার কিন্তু সেই সময়ের সেই স্বল্প পরিধি থেকে আপনি অবিস্মরণীয় একটি শিক্ষা লাভের সুযোগ পেয়েছিলেন। একবার একজন ভদ্রলোক আমাদের ক্লাসে বলেছিলেন তাঁর এক ভয়ংকর সন্তরণ অভিজ্ঞতার কথা। নৌকা উল্টে জলে পড়ে গিয়ে নাকানি চুবানি খেয়ে তিনি যখন তীরের দিকে অতি কষ্টে সাঁতরে আসছিলেন সেই অভিজ্ঞতার কথা যা কিনা প্রায়শঃই সকলের জীবনে ঘটে যাবে। আমি বাজি রেখে বলতে পারি শ্রোতাদের মন তখন এই বক্তার দুর্ভাগ্যজনিত ভয়ংকর অভিজ্ঞতার সাথে একাত্ম হয়ে গিয়েছিল। আর একবার একটি বালকের বৈদ্যুতিক ছেদকযন্ত্রের শিকার হয়ে পড়ার ঘটনা একজন ভদ্রলোকের বক্তৃতায় এত চিত্রানুগ ভাবে বর্ণিত হয়েছিল যে আমি পর্যন্ত দারুণভাবে প্রভাবিত হয়েছিলাম এই ঘটনার দ্বারা এবং ভবিষ্যতে বাচ্চারা আমার ছেদকযন্ত্রের নাগাল যাতে কখনও না পায় তারই চেষ্টা করতাম। এই চরম যন্ত্রণাদায়ক অভিজ্ঞতা থেকে শ্রোতারা ভবিষ্যতে অবশ্যই সাবধান হওয়ার সংকল্প আঁটবেন সন্দেহ নেই।

সুতরাং বুঝতেই পারছেন এমন একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা শ্রোতার মন জয় ত করবেই উপরন্তু তাদের আপনার কাছে থেকে উপদেশ নিতেও বাধ্য করবে বলেই আমার ধ্রুব বিশ্বাস।

বক্তৃতা আরম্ভেই এমন কিছু বলুন যা হবে আলোড়ন সৃষ্টিকারী

ভাল বক্তার প্রথম কাজই হল প্রথমেই এমন কিছু বলা যা শ্রোতার মনে তৎক্ষণাৎ আলোড়ন সৃষ্টিকারী হয়। অধিকাংশ বক্তাই অসফল হন কারণ তাঁরা বেশীর ভাগ গতানুগতিক পদ্ধতিতে মান্ধাতার আমলের বাচনভঙ্গীতে বলে চলেন যা কিনা শ্রোতাদের জয় করতে একেবারেই অচল। আমি বক্তৃতা দিতে তেমন অনভ্যস্ত নই'—একথা শ্রোতাদের মনে বিরক্তি উৎপাদনকারী হবে জেনেও বহু বক্তা প্রথমেই এ কথা বলে বসেন এবং শ্রোতৃমণ্ডলীর মনযোগ হারান। আপনি কেন এই বিষয় সম্বন্ধে বলতে এসেছেন, আপনি যে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য বিশেষ প্রস্তুতির সময় পান নি অথবা ধর্ম-প্রচারকদের মত গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে প্রথমেই আপনার বক্তৃতার বিষয় কি তা ঘোষণা করতে বসেন তবে শ্রোতার মন জয় করতে আপনি যে ব্যর্থ হবেন। তাহলে শ্রোতার মন জয়ের সহজ উপায় কি ?

মঞ্চে উঠেই প্রথমে কোনও বিখ্যাত ম্যাগাজিন বা খবরের কাগজের লেখকদের মত নাটকীয়ভাবে বিশেষ কোনও খবর দেওয়ার ভঙ্গীতে আপনার নিজের জীবন থেকে উদাহরণ টানুন, দেখবেন শ্রোতার মন স্বতঃস্ফূর্তভাবেই আপনি জয় করে ফেলেছেন।

নীচে কতগুলি উদাহরণ দৃষ্টান্ত স্বরূপ দিলাম ঃ—

যেমন ধরুন ····

"১৯৪১ সালে, আমি নিজেকে হঠাৎ-ই আবিষ্কার করলাম হাসপাতালের খাটে।"

"গতকাল প্রাতরাশের সময় আমার স্ত্রী কফি ঢালছিলেন এবং······"

"আমার অফিসের দরজা খুলে গেল এবং জন স্টেপলটন, আমাদের ফোরম্যান, ঝড়ের বেগে ঢুকে পড়লেন।"······ইত্যাদি।

মনে রাখবেন আপনি যখনই আপনার বক্তৃতায় কে, কখন, কোথায়, কি, কেমন অথবা কেন ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করে প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবেন তখনই আপনি হবেন শ্রোতার মন জয়ে ব্যর্থ। বাচ্চাদের রূপকথা অথবা কথার যাদুতে ভুলিয়ে রাখার মত ভঙ্গীতে যদি কিছু বলতে পারেন তবে আপনি যে শ্রোতার মন জয় করবেনই এতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

৪। প্রাসঙ্গিক ঘটনা থেকে দৃষ্টান্ত দিন

কোনও কিছুরই বিশদ বিবৃতি বিরক্তিকর। কোনও ছবির সামঞ্জস্যবিহীন বেশী আঁকিবুঁকি দর্শকের চোখে বিশেষ কোনও সাড়া জাগায় না। ঠিক সেই ভাবেই অপ্রয়োজনীয় বিশদ বিবৃতিপূর্ণ বক্তৃতা শ্রোতাকে অধৈর্য করে তোলে। ভাল বক্তৃতার গোপন চাবিকাঠি হল বেছে প্রাসঙ্গিক ঘটনার উপর জোর দেওয়া।

ঘটনার প্রাসঙ্গিক বিবরণগুলি রংফলানো ভাষায় বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে উপস্থাপন করতে পারলেই তা শ্রোতার মনে ছবির মত আঁকা হয়ে থাকবে। আপনার কোন ভয়ংকর অভিজ্ঞতার কথা যদি বহুবিধ সংজ্ঞাবহ শব্দশৈলীর দ্বারা উপস্থাপিত করা যায় তবে তা শ্রোতাদের মনে সচেতনভাবে পাথরের উপর খোদাই করা কাজের মত খোদিত হয়ে থাকবে।

সুতরাং শব্দের ছবি এঁকে শ্রোতার মনে তার দৃষ্টিলব্ধ কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করতে পারলেই ত আপনি শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃদয় জয় করতে পারবেন অতি অবশ্যই।

৫। ঘটনা বিবৃতির সময় বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতার কথা বলুন

চিত্রানুগ বিবৃত দেওয়ার সময় আপনার উচিত বৈচিত্র্যময় বিবরণের অবতারণা করা। সমস্ত বিখ্যাত বক্তাদেরই নাটকীয়ভাবে বিষয় উপস্থাপনের ক্ষমতা থাকে। কিন্তু এই ক্ষমতা কেবলমাত্র বাক্‌পটু ব্যক্তিদের মধ্যেই যে দেখা যায় তা নয় অনেক বাচ্চাদেরও এই ক্ষমতা থাকে। আমার পরিচিত বহু ব্যক্তির মধ্যেই আমি নাটকীয় ভাবে বিষয় উপস্থাপনার মত সময়জ্ঞান, উপস্থিত বিদ্যা, নিখুঁতভাবে অনুকরণের ক্ষমতা বা নাটকীয় বাচনভঙ্গী প্রভৃতি গুণগুলি দেখেছি। ইচ্ছে করলেই এই গুণগুলির আরও ঔৎকর্ষ্য বিধান করা যায়।

আপনার বক্তৃতা যতই গতিময় ও উত্তেজনাবর্ধক হবে ততই আপনি শ্রোতৃমণ্ডলীর মনের কাছাকাছি চলে আসবেন। আপনি কি কোনও অগ্নিকাণ্ডের বর্ণনা দিতে চলেছেন? তাহলে, যখন ফায়ারম্যানরা অতিকষ্টে আগুন নেভাচ্ছিল, দর্শকের মনের তখনকার সেই উত্তেজনাপূর্ণ ভয়ংকর অনুভূতির কথা বলুন। আপনি কি আপনার প্রতিবেশীর সঙ্গে ঝগড়া করার অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন? তবে তা রংফলিয়ে নাটকীয়ভাবে বলুন। প্রাণপণ চেষ্টায় আপনি কিভাবে জলের মধ্যে সাঁতার কেটে তীরে ওঠার চেষ্টা করছেন, সেই ভয়ংকর অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করছেন কি? তবে আপনার শ্রোতৃমণ্ডলীকেও আপনার সেই মরিয়া হয়ে প্রাণ বাঁচানোর ভয়ংকর অভিজ্ঞতার মুহূর্তগুলি অনুভব করতে দিন। আপনার দৃষ্টান্তকে শ্রোতৃমণ্ডলীর মনে স্মরণীয় করে রাখতে হবে বৈচিত্র্য-ময়তার দ্বারা।

সুতরাং মোদ্দা কথা হল আপনার বক্তৃতা শ্রোতার হৃদয়গ্রাহী করে তুলতে হলে ঘটনার মধ্যে বৈচিত্র্য সাধন করতে হবে আর

এভাবে শ্রোতাদের উৎসাহ উদ্দীপনাও জোগানো যাবে। আপনার জীবনের অভিজ্ঞতা যা আপনাকে কিছু শিখিয়েছে তা পরিষ্কারভাবে শ্রোতারা বুঝতে পারলে তারাও আপনার অনুগামী হবে। এইভাবে আমরাও সরাসরিভাবে ম্যাজিক ফর্মুলার দ্বিতীয় পর্যায়ের সাফল্যের দ্বারদেশে পৌঁছে যাব।

৬। শ্রোতার কাছে থেকে আপনি যা আশা করেন তা পরিষ্কারভাবে বলুন।

ধরুন আপনি দু'মিনিটের মধ্যে কিছু বলবেন। আপনাকে কুড়ি সেকেণ্ডের মধ্যে বলে ফেলতে হবে আপনি শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে থেকে কি ধরণের কাজ পেতে চান এবং সেই কাজের ফলস্বরূপ তারা কি আশা করতে পারে। বিশদ বিবরণের প্রয়োজন নেই। এটা হল খবরের কাগজে খবর পরিবেশনের বিপরীত কৌশল অর্থাৎ প্রথমেই শিরোনামার পরিবর্তে আগেই বিবরণের স্থান এবং পরে কাজের আবেদন নিয়ে শিরোনামা প্রদান। এই কার্য্যসাধনের এই বিশেষ ব্যবস্থাটি নিয়ন্ত্রিত হয় তিনটি সূত্র দ্বারা :—

(১) আপনার আলোচ্য বিষয়কে সংক্ষিপ্ত ও স্বাতন্ত্র্যময় করে তুলুন। বক্তৃতা দেওয়ার সময় আপনি জনসাধারণকে দিয়ে কি করাতে চান তা সংক্ষেপে বলুন। স্পষ্টভাবে দৃষ্টান্ত দিন, নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করুন আপনার দৃষ্টান্তে প্রভাবিত করে জনসাধারণের কাছে থেকে ঠিক কি আপনি আশা করেন। টেলিগ্রাম করার সময় যেমন শব্দ সংক্ষেপ করেও পরিষ্কার ও স্পষ্টভাবে আপনি আপনার বার্তা প্রেরণ করেন ঠিক তেমনভাবে প্রথমে আলোচ্য বিষয়গুলি বেছে নিন। তারপর সংক্ষেপে প্রত্যেকটি বিষয় স্বাতন্ত্রভাবে স্পষ্টভাবে আলোচনা করুন।

(২) শ্রোতার কাছে আপনি যা প্রত্যাশা করেন তা খুব সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা করুন। শ্রোতৃমণ্ডলীকে আপনি আপনার অনুগামী করতে চাইলে সরলভাবে আপনার আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে স্পষ্টভাবে তা অবহিত করান। যদি আপনি আপনার শ্রোতৃমণ্ডলীকে নাম মনে রাখার ক্ষমতাকে বাড়াতে চান তবে এমনভাবে বলবেন না যে "এখন থেকে নাম মনে রাখার জন্য আপনারা আপনাদের স্মৃতিচারণ ক্ষমতার ঔৎকর্য্য সাধনের চেষ্টা করুন" পরিবর্তে বলুন "কোনও ব্যক্তির নাম মনে রাখতে হ'লে তার সঙ্গে দেখা হওয়ার পরবর্তী পাঁচ মিনিটের মধ্যে পাঁচবার তার নাম পুনরাবৃত্তি করুন।"

আপনার আলোচ্য বিষয় নাস্তিকবাচক অথবা আস্তিকবাচক হবে এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় এটা সম্পূর্ণভাবে শ্রোতাদের দৃষ্টিভঙ্গীর উপর নির্ভরশীল হবে। সকল নঞর্থক বাচক আলোচ্য বিষয় যে অকার্য্যকারী হবে তা নয়। কোনও বিষয় কিভাবে এড়িয়ে যাওয়া যায় তা নেতিবাচক আলোচনায় বেশী কার্যকরী হয়, শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে সঠিক আবেদন রাখতে সক্ষম হয় অনেক বেশী।

(৩) আপনার বক্তব্য রাখুন জোর এবং আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে। শিরোনামগুলি যেমন বড় বড় অক্ষরে লেখা হয় আপনার বক্তব্যকেও তেমনি উদাত্ত গলায় প্রাণবন্ত করে তুলুন, সোজাসুজিভাবে দৃঢ়তার সঙ্গে বলুন। আপনার বক্তব্যের জোরালো বেড়াজালে শ্রোতার মন এমনভাবে আকৃষ্ট করুন যাতে তারা বুঝতে পারে আপনি আপনার বক্তব্যে কতখানি আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছেন। কোনও অনিশ্চয়তার সুর যেন আপনার বক্তব্যকে শিথিল করে না দিতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখুন। আপনার প্রত্যয় উৎপাদনকারী এই বিশেষ ক্ষমতা আপনার বক্তব্যের শেষ শব্দটি পর্যন্ত শ্রোতার মনে আলোড়ন তুলতে সাহায্য করবে এবং আপনি ম্যাজিক ফর্মুলার তৃতীয় ধাপে পৌঁছে যাবেন সহজেই!

৭। **শ্রোতাকে এমন কিছু বলুন যাতে সে লাভবান হতে পারে।** আপনার কথা তখনই শ্রোতার ভালো লাগবে, যখন সে কথার ভেতর তার নিজেরই ছায়া খুঁজে পাবে বা যা বলা হচ্ছে তাতে তার বিশেষ কোন উদ্দেশ্য সাধনে সহায়তা করবে। প্রত্যেক মানুষই নিজের মঙ্গল চায়, ভালো চায়। তাই আপনার বক্তব্য যদি শ্রোতার ভালো মন্দ নিয়ে আন্তরিকভাবে কিছু ভাবনার স্বাক্ষর রাখতে পারে, তাহলে শ্রোতাকে বশীভূত করা খুবই সহজ হবে।

৮। **এমন উদাহরণ দেবেন, যা যুক্তিপ্রদ হবে**

ধরুন, আপনি শ্রোতাকে একটি গল্প বলবেন। গল্পটি আপনার নিজের অভিজ্ঞতা লব্ধ।

আপনি একটি বাইসাইকেল কিনতে চেষ্টা করছিলেন অনেক দিন ধরে। কিন্তু নতুন সাইকেল নগদ দাম দিয়ে কেনার মত সঞ্চয়ও আপনার নেই। বাকীতে কেনার মত কোন সুযোগও আপনার সামনে ছিলো না। অথচ বাইসাইকেল কেনাটা আপনার পক্ষে খুবই প্রয়োজনীয়। এতে আপনার অনেক সময় বাঁচবে—উপরন্তু গাড়িভাড়া বাবদ বেশ কিছু টাকাও বাঁচাতে পারবেন। তাই আপনি ভেবেচিন্তে ঠিক করলেন সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড বাইসাইকেল কিনবেন। ভালো মডেলের প্রায় নতুন ঝকঝকে কলকব্জাযুক্ত একটি গাড়ি আপনি সস্তায় পেয়ে গেলেন। আপনার কাছে যা টাকা ছিলো তাতেই হয়ে গেলো। ধার-দেনাও করতে হলো না। আপনি শ্রোতার কাছে এবারে আবেদন রাখলেন, তারা যেন সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড গাড়ি কিনে দেখে তাতে তারা ঠকবেন না, বরং জিতবেন। পুরোনো গাড়ির মডেল এখনকার অনেক নতুন গাড়ির চেয়েও দেখতে সুন্দর, চালিয়ে আরাম, আর অনেক ধকল সইতে পারে, মজবুত আর টেকসই।

এভাবে বক্তব্য রাখলে শ্রোতারা আগ্রহী হবে। আপনার কথায়—ভেবে দেখতে আগ্রহী হবে পুরোনো গাড়ি কেনার ব্যাপারে আপনার কথাকে উপদেশ না ভেবে বন্ধুর অনুরোধের মত মনে রাখার চেষ্টা করবে।

৯। একটি বিষয়ে, হ্যাঁ—কেবলমাত্র একটি বিষয়ের ওপর জোর দিন।

বেশীর ভাগ বিক্রেতাই আপনি কেন তার জিনিষ কিনবেনএ সম্পর্কে বলতে গিয়ে আধডজন কারণ তুবড়ির মত বলতে যান আপনার কাছে। এত করে এতগুলো কারণকে গুছিয়ে পরিষ্কার করে উপসংহারে নিয়ে যেয়ে, আপনাকে প্রভাবিত করতে তারা অনেকাংশেই অসফল হয়। কোন বিষয়টাই যেন আপনার চোখে উজ্জ্বল হয়না আর মনেও প্রাধান্য পায় না।

অথচ একটি মাত্র বিষয়কে যুক্তি আর ঘটনার জোরালো আলোকে আপনার সামনে উপস্থিত করা যেতো অতি সহজেই। একটু কম কথা বলে।

আমেরিকার প্রথম সারির সংবাদ-পত্র আর ম্যাগাজিনগুলোতে একটু চোখ বুলিয়ে নিলেই আপনার নজরে পড়বে—

কোন বিজ্ঞাপন প্রতিষ্ঠানই এক সংগে অধিক জিনিষের বিজ্ঞাপন করেনা বা ভিন্ন ভিন্ন বক্তব্য বা আদেশের কথা প্রচার করেনি। কখনও তা করে না। এতে শ্রোতার বা পাঠকের প্রচার ভিন্ন প্রসংগে ধাবিত হয় মূল লক্ষ্য ছেড়ে। প্রচারকার্য ব্যর্থ হয়।

বড় বড় বিজ্ঞাপন কোম্পানিগুলি তাদের মক্কেলের হয়ে যে সব ব্যবহার্য জিনিষপত্রের প্রচার কার্য্য চালায় রেডিও, টি. ভি. এবং কাগজপত্রে, তাতে তারা একটি জিনিষ-আপনি কেন কিনবেন, এ সম্পর্কে বলতে গিয়ে বা প্রচার চালাতে গিয়ে, খুব কমই একসঙ্গে অনেকগুলো সুবিধাজনক কারণ দেখায়। মূলতঃ বেশীর ভাগ

সময়ই তারা একটি মূল বিষয়কে নিয়েই আপনাকে প্রভাবিত বা আকৃষ্ট করার চেষ্টা করে থাকে। তাতে উদ্দেশ্য থাকে একটাই——এক সংগে বেশী কারণ নিয়ে মাথা ঘামালে শ্রোতা বা পাঠক সব কিছুই গুলিয়ে ফেলবে—নির্দিষ্ট একটা কারণও মাথায় থাকবে না। প্রচারের মূল লক্ষ্য যেটা—বিক্রি বাড়ানো—সেটাই ব্যর্থ হবে। ভেস্তে যাবে।

মোদ্দা কথা :

(অল্প কথায়, ছোট্ট উদাহরণে নির্দিষ্ট বিষয়মূলক গোছালো বক্তব্য রাখতে পারাটাই হল ; দ্রুতভাবে অপরের মন জয় করার সহজ উপায় বা ম্যাজিক ফর্মুলা।)

এই বই লেখার সময় আমি পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি বিখ্যাত লোকের সংগে সাক্ষাৎ করেছি। নিজের অভিজ্ঞতা, প্রজ্ঞা আর অনুভব মিশিয়ে চেনার চেষ্টা করেছি তাঁদের। জানার চেষ্টা করেছি। আর বুঝবার চেষ্টা করেছি, কেমন করে তাঁরা অপরের উপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হতেন। তাঁরা হলেন—ক্লার্ক গেবল/মার্টিন জনসন/মেরী পিকফোর্ড/ওয়েন ডি ইয়ং/এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট থিয়োডোর রুজভেল্ট।

এছাড়াও শিক্ষা নিয়েছি বাইবেল থেকে। জর্জ ওয়াশিংটন, আব্রাহাম লিংকন, টমাস আলভা এডিসন থেকে ঐতিহাসিক বিতর্কিত চরিত্র জুলিয়াস সীজার পর্যন্ত পড়ে ফেলেছি গোগ্রাসে। মোটামুটিভাবে আমরা যাঁদের মহাপুরুষ বলে চিহ্নিত করি—তাঁদের প্রত্যেকের জীবনীই পড়েছিলাম গভীর আগ্রহের সংগে। কী করে তাঁরা কৃতী হলেন এটা জানতে তাই এই সব পড়াশুনা, মেলামেশা আর দেখা শোনার অভিজ্ঞতা লব্ধ মালমশলা দিয়েই আমার পুস্তিকা লেখার কষ্টকর সেই রন্ধনকার্য্য সম্পাদন করেছি। তাই আপনারা যারা অনেকক্ষণ ধরে এই বইটি পড়ে চলেছেন, তাদের কাছে আমার সবিনয় নিবেদন :

যদি কিছু শিখতে চান, বইটি বারবার পড়ুন। ভাবুন। নিজের মনের গভীরে শিখবার প্রবল ইচ্ছা আর কার্য্যদক্ষতা বাড়াবার জন্য একটা দৃঢ় নিশ্চয় ভাব জাগিয়ে তুলুন। তাহলেই দেখবেন, অচিরেই সফলতা আপনার দুয়ারে এসে কড়া নাড়ছে।

শ্রোতার কথা সর্বদা মনে রেখে সঠিক বক্তব্য রাখুন

এমন অনেক লোকের কথা আমি জানি, যারা পোশাকে-আশাকে পরিচ্ছন্ন; কিন্তু কথাবার্তায় একেবারেই নোংরা, অপরিচ্ছন্ন। মাথা-মুণ্ডু কিছুই থাকে না তাদের কথাবার্তায়, তারা নিজেরাই ভালো করে জানেনা, নিজে কী বলতে চায় তারা। শ্রোতারা এ ধরণের লোকের কথা শুনতে চাওয়া তো দূরের কথা; দেখলেই বিরক্ত হয়। এড়িয়ে চলে ছলছুঁতোয়। এ ধরণের লোকের পক্ষে মানুষের মন জয় করাতো দূরের কথা, সমস্ত কাজে ব্যর্থ হওয়াটাই সত্য ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়।

আমার এক ঘনিষ্ঠ আইনজীবী বন্ধুর চেম্বারে একবার একবার একজন মক্কেল এলো। মক্কেল সমাজের একজন কেউ-কটা লোক। তার একান্ত ইচ্ছা সে তার স্ত্রীকে ডাইভোর্স করবে। বিচ্ছেদের মামলা আনবে। যদিও সে তার স্ত্রীর প্রশংসাই করলো। মক্কেলের স্ত্রী সুন্দরী, সুগৃহিণী, আদর্শ মা এবং রান্নাবান্নার হাতও অতি চমৎকার। সেলাইফোঁড়াইও ভালো করেন। আমার আইনজীবি বন্ধু তার মক্কেলের কাছে জানতে চাইলো, তা হলে আপনি স্ত্রীর বিরুদ্ধে বিচ্ছেদের মামলা আনছেন কেন?'

'কারণ আর কিছুই না, আমার স্ত্রী বড়ো বেশী কথা বলে। বকে বকে আমার কান ঝালাপালা করে দিলো একেবারে!⋯ ⋯'

'কি বিষয়ে এতো কথা বলেন আপনার স্ত্রী ?'

'সেটাইতো মুস্কিল হয়েছে। ও যে কি বলতে চায়, সেটাই আমি বুঝতে পারিনা! আপনাকে আর কী করে বোঝাই!'

এটা সত্যিই একটা বিরাট সমস্যা, অনেক বক্তার কাছেই। স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই কাছে।' তাদের শ্রোতারা আদৌ বুঝতে বা আন্দাজ করতে পারে না কোন কথা বা কি বিষয়ে তারা কথা বলছে। তারা নিজেরাও ভুলেই মেরে দেয়। একবারও প্রয়োজন বোধ করে না কথাটা পরিষ্কার করে বলার।

আমার আগের বইতে আমি ম্যাজিক-ফর্মূলার সাহায্যে দ্রুত শ্রোতার মন জয় করার উপায় সম্পর্কে বলেছি বিশদভাবে।

এবারে আমি বলবো কিছু উপায় সম্পর্কে, যার সাহায্যে শ্রোতাকে পরিষ্কার করে গুছিয়ে সব বলতে পারবেন। অথচ আপনার বক্তব্য হতে হবে সহজ সরল—একেবারেই তা উদ্দেশ্য প্রনোদিত হবে না কখনও। এটা কখনো ভুলে যাবেন না।

আমরা ব্যক্তিগত জীবনে প্রতিদিনই তথ্যবহুল কিছু না কিছু কথাবার্তা, নির্দেশ বা নানা কারণ দেখানো রিপোর্ট লিখে থাকি। প্রতি সপ্তাহেই বিভিন্ন বিষয়ক বক্তব্য পেশ করে থাকি নানা রকম লোকের সামনে। তখনই আমরা আমাদের কাজে সফল হবো, যখন সুনির্দিষ্ট বিষয়ে সুন্দর করে গুছিয়ে অল্প কথায় শ্রোতার কাছে আবেদন পূর্ণবক্তব্য রাখতে সক্ষম হবো। আপনার কথাতে মুগ্ধ হলেই কেবলমাত্র শ্রোতারা আপনার মত সমর্থন করবে বা আপনি তাদের দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে পারবেন। মোদ্দা কথাটি হল: আপনার কথাতে অনুপ্রাণিত হলেই শ্রোতারা কাজে নেমে পড়বে অন্যথা নয়।

ডব্লিউ ডি. ইয়ং কে নিশ্চয়ই চেনেন আপনারা। আজকের অ্যামেরিকাতে তাঁর চেয়ে বড় শিল্পপতি খুব কমই আছে। তাঁর

নিজের জীবনের সফলতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে একবার তিনি আমাকে বলেছিলেন—

আজকের পৃথিবীতে নিজের সম্পর্কে অপরকে আগ্রহী করে তোলার সহজ উপায় হল : নিজের সম্পর্কে, বক্তব্য বিষয় সম্পর্কে, শ্রোতাদের মতামতের উপর আপনি কি মূল্যায়ন করছেন সে সম্পর্কে তাদের অব্যহিত করানো। তাদের মতামত আপনার কতটা হিতার্থে আসবে সে সম্পর্কেও শ্রোতার মনে পরিষ্কার বা স্বচ্ছ ধারণা তৈরী করতে হবে যখনই কোন ব্যক্তিকে আপনি যথেষ্ট গুরুত্ব দেবেন, পরোক্ষভাবে সেও আপনার কথা এবং কাজে গুরুত্ব দেখাবে।

আমাদের সমাজের সর্বস্তরেই একথা খাটে। প্রত্যেক মানুষের সংগে সহযোগিতার মনোভাব রেখে চলুন তা হলেই সে আপনার সমব্যথী হয়ে উঠবে। অন্যকে বুঝতে হবে, জানতে হবে। ভাষা হচ্ছে মানব সভ্যতার ধারক ও বাহক। ভাষাই মানুষকে কাছে টানে পৃথিবীর বৃত্ত আর পরিধিকে ঘরের কোণে ছোট করে আনে। তাই ভাষা অর্থাৎ শব্দের সঠিক ও যথার্থ প্রয়োগ জানতে হবে। আমাদের শিখতে হবে কেমন করে মার্জিতভাবে সুকৌশলে পার্থক্য বিচার করে শব্দের প্রয়োগ করা যেতে পারে। শব্দের সঠিক ব্যবহারে আপনি যেমন লাভ করবেন বন্ধু ; আবার শব্দের অযথা অযোগ্য ব্যবহারে আপনি তেমনই বাড়িয়ে তুলবেন শত্রু।

একজন পৃথিবী বিখ্যাত বক্তার কথাতেই বলা যাক :

(যা কিছু ভাববেন পরিষ্কার করে ভাববেন ; যা কিছু বলবেন গুছিয়ে বলবেন।)

১। বক্তব্যকে সামিতসময়ে গুছিয়ে বলার চেষ্টা করুন। সংক্ষিপ্ত পরিধীতে বক্তব্য ধরে রাখুন।

আমি বলতে চাইছি, একগাদা বিষয় নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে অনেক অনেক উপমা আর যৌক্তিকতার বেড়া জালে না জড়িয়ে, একটি মাত্র নির্দিষ্ট বিষয়ে মাথা ঘামালে বাঁধা-ধরা সময়ের মধ্যেও আপনি অনেক অনেক ভালো, হৃদয়গ্রাহী আবেদনমূলক বক্তৃতা দিতে সক্ষম হবেন। সফল বক্তা হিসাবে শ্রোতারা আপনাকে স্থান দেবে। মনে রাখবে।

অনেক বক্তাই বলার সময় সম্ভব হলে সারা পৃথিবী আর মানব জাতিকেই টেনে আনে। পরে তাল রাখতে না পেরে সবই গুবলেট করে দিয়ে ল্যাজে-গোবরে হয়ে 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' গোছের মুখ করে পালিয়ে যায়। ভাবখানা এই যেন শ্রোতারা তাকে মাথার দিব্যি দিয়েছিল বক্তৃতা করার জন্যে। শ্রোতাদের মঙ্গল করার জন্যই যেন তার এত ভাবনা-চিন্তা, বক্তৃতা করার চেষ্টা। এ ধরণের মিথ্যা অহমিকা অনেক বক্তার চোখে অন্ধত্বের ঠুলি পরিয়ে রাখে। এটা বিপদজনক।

আরও সহজ করে বলতে গেলে বক্তা যেন প্রচলিত—ট্যুরিস্ট গাইড সেজে যায়—যে কিনা একদিনে, ভ্রমণকারীদের পুরো প্যারী শহরটা ঘুরিয়ে দেখিয়ে দেওয়ার ভার নেয়।

এ যেন আধ ঘণ্টায় 'আমেরিকান মিউজিয়াম অফ ন্যাচারাল হিস্টরী' দেখা শেষ করে ফেলার মত। এতে না হয় ব্যাপারটা উপভোগ্য, না হয় পরিষ্কার কোন ধারণা। সবকিছুই আলো আঁধারিতে ঢাকা পড়ে যায়। বক্তা যেন পাহাড়ী ছাগলের মত দ্রুততা আর ক্ষিপ্রতায় এক পাহাড় থেকে বক্তব্যের অন্য পাহাড়ে বিচরণে করে চলে।

২। **আপনার চিন্তাকে বক্তব্যের গুরুত্ব অনুযায়ী,—এক একটি দৃশ্যের মত সাজিয়ে নিন।**

একটি উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে বলছি :

ধরুন আপনি ওয়াশিংটন ডি. সি শহরটি সম্পর্কে শ্রোতাদের কিছুটা ধারণা তৈরী করে দিতে চান। তাহলে শ্রোতাদের আপনি ক্যাপিটল বিল্ডিং এর সর্বোচ্চতলে নিয়ে চলুন। এরপর পূর্ব/পশ্চিম/উত্তর/দক্ষিণে যত আকর্ষণীয় এবং প্রধান প্রধান দ্রষ্টব্য বিষয় আছে তার সংগে পরিচয় করিয়ে দেবেন। তাহলেই ব্যাপারটা দৃশ্যগ্রাহ্য ও হৃদয়গ্রাহ্য হয়ে উঠবে।

ধরুন, আপনি জেট বিমান নিয়ে কথা বলতে চান। তাহলে· মূল প্রয়োজনীয় অংশগুলিকে খণ্ড খণ্ড করে বিচ্ছিন্ন করুন—আর এক একটি যন্ত্রাংশ ধরে বর্ণনা করতে থাকুন। শ্রোতারা শুনতে আগ্রহী হবে।

৩। **প্রত্যেকটি আলোচ্য বিষয়কে পৃথক পৃথকভাবে উল্লেখ করুন ভাল ফল পাবেন।**

বোঝার সুবিধের জন্য উদাহরণ দিয়েই বলছি : একবার একজন বিশ্বখ্যাত অর্থনীতিবিদের বক্তৃতা শোনার সুযোগ হয়েছিলো। তিনি আয়করদাতাদের এক—'আমার মূল কথা হল কীভাবে সহজ কৌশলে নিম্নবিত্ত আর মধ্যবিত্ত মানুষ তার স্বল্প আয় থেকে কর দেবার হাত থেকে অব্যহতি পাবেন। কারণ তাদের আয়ের বেশীটাই কর দিতে চলে যায়।' তিনি বলে চললেন—এরকম ভাগ ভাগ করে, যেমন—

"বিশেষ করনীয় ......"

"তারপরে যেটা করতে হবে......"

"এরপরে এটা অবশ্যই করে ফেলতে হবে......"

"তার সংগে যুক্ত হবে ...," তিনি বলে চললেন।

"এর পেছনে তিনটি মূল কারণ বিগ্যমান......প্রথমত...দ্বিতীয়ত......তৃতীয়ত......

"সবার শেষে সার শেষ কথা হল, আমাদের অতি অবশ্যই কর দেওয়ার হাত থেকে রেহাই পেতে হবে। নিম্নবিত্ত মানুষ আর মধ্যবিত্ত রুজিরোজগারে মানুষের পক্ষে, জিনিষপত্রে অগ্নিমূল্য এড়িয়ে বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয় সামগ্রী জোগাড় করা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

উপরের বক্তৃতার কলাকৌশলটা একটু মন দিয়ে দেখলেই বুঝবেন, আলোচ্য বিষয়কে পৃথক পৃথকভাবে উল্লেখ করলে কত ভাল ফল হয়।

৪। **এমনভাবে কথা বলুন যাতে শ্রোতার সামনে ছবি ফুটে ওঠে।**

আমেরিকার প্রায় প্রতিটি হাই-ওয়েতেই দুর্ঘটনা-এড়ানোর জন্য অনেক রকম বিপদসূচব সতর্কবানী লেখা থাকে। যেমন—

'আপনি হয়তো গাড়িতে করে নিউইয়র্ক থেকে লস-এঞ্জেলস এ যাচ্ছেন প্রমোদ-ভ্রমণে। রাস্তার ট্রাফিক নির্দেশ মেনে চলুন। সতর্কভাবে গাড়ি চালান। মানুন নির্দ্ধারিত গতিবেগ। না হলে ভেবে নিন সেই সব কফিনের কথা—যাদের মধ্যে স্থান হয়েছিলো আপনারই মত দ্রুতি-গতি গাড়ির চালকের।

হতভাগ্য সেইসব আরোহীরা। যারা বেড়াতে বেরিয়েছিল। কিন্তু কফিনের অন্ধকারেই মুখ গুঁজে খুশী থাকতে হলো তাদের। হাই-ওয়ের প্রতি বারো মাইল দূরত্বে পাঁচ সেকেণ্ড পরপরই পথ-

নির্দেশ চোখে পড়বে—আপনি তা মেনে চলুন। না হলে দুর্ঘটনার কবলে পড়বেন। মৃত্যু অপেক্ষা করছে পথে।

ব্যক্তিগতভাবে আমি কখনও গাড়ি চালিয়ে দূর পাল্লার রাস্তায় একদম চলি না। ওই পথ নির্দেশ চোখে পড়লেই আমার বুকের ভেতরটা কেঁপে ওঠে ভয়ে আর অজানিত আশংকায়।

৫। কখনও কারিগরি বিজ্ঞান বা শিল্পসংক্রান্ত পরিভাষা বেশী ব্যবহার করবেন না। সম্ভব হলে এড়িয়ে চলুন।

গ্রীক দার্শনিক এ্যারিস্টোটল এইবিষয়ে খুব সুন্দর উপদেশ দিয়ে গেছেন। তাঁর কথায়—

"জ্ঞানী মানুষের মত চিন্তা করুন; কথা বলুন অতি সাধারণ লোক যে ভাবে বলে।"

কথাটি বর্ণে বর্ণে সত্যি। যদি আপনি বিজ্ঞান বা শিল্পসংক্রান্ত পরিভাষা ব্যবহার করতে চান তবে পূর্বে শ্রোতাকে সে সম্পর্কে অবহিত করুন।

৬। প্রতিটি কথাকে দৃশ্যগ্রাহ্য করুন

একজন প্রাচীন দার্শনিক বলেছেন—

একবার চোখে দেখাতে যে ফল হয় একশোবার শোনাতে বা বলাতেও তা হয় না।

তাই এমন শব্দ ব্যবহার করুন, যাতে প্রতিটি কথা বা উদাহরণ দৃশ্যগ্রাহ্য হয়।

আমেরিকার একজন প্রখ্যাত প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন একবার একজায়গায় নিজের বাল্যকাল সম্পর্কে বলতে গিয়ে লিখেছিলেন—

আমার বাবা ছিলেন একজন প্রগাঢ় বোধশক্তিসম্পন্ন পুরুষ। তাঁর অগাধ পড়াশুনা ছিলো। আমার জীবনের যা কিছু স্মরণীয় শিক্ষা সবই তাঁর কাছ থেকে শিখেছি।

বড় হয়েও তাঁর শিক্ষা থেকে রেহাই মেলেনি কখনও। ১৯০৩

সালে তিনি মারা যান একাশি বছর বয়সে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত আমি যে সমস্ত চিঠিপত্র তাঁকে লিখেছিলাম, সে সম্পর্কে তিনি নানা রকম প্রশ্ন করতেন। পড়া ধরার মত ধরতেন। তিনি আমাকে চেঁচিয়ে পড়তে বলতেন—যা সারা জীবন ধরে আমার কাছে খুবই বেদনাদায়ক ছিলো। চিঠি পড়ার সময়, যখন তখন তিনি আমাকে থামিয়ে দিয়ে অজস্র ভুল বের করতেন। তুমি এর দ্বারা কি বোঝাতে চাইছো ?'—তিনি জিজ্ঞেস করতেন।

আমি মুখে বলতে পারতাম ভালো করে বুঝিয়ে, অথচ চিঠিতে আমার লেখা অত ভালো হতো না।

—'চিঠিতে ওভাবে লেখোনি কেন ? পাখিকে গুলিবিদ্ধ করার বদলে চিন্তাকেই গুলিবিদ্ধ কর তুমি। এমন ভাবে বক্তব্য পেশ করার চেষ্টা কর, যাতে মনে হয়। তোমার বলাটা হবে রাইফেল দিয়ে গুলি করার মত স্পষ্ট। আর দাগ কাটার বক্তব্যের গভীরে।'

উপরের উদাহরণ ব্যাপারটা আপনাদের কাছে অনেকটা বোধগম্য হয়েছে বলে আশা রাখছি। এবারে চলে যাবো অন্য প্রসঙ্গে।

এমন কথা বলার চেষ্টা করুণ, যাতে জনসাধারণ প্রভাবিত হয়।

একবার আমরা একদল লোক হ্যারিকেন ঝড়ের মুখোমুখি হলাম। না সমুদ্রে নয়—খোদ চিকাগো শহরের কেন্দ্রে। একটি আন্তর্জাতিক হোটেলের খাবার ঘরে ঘটনাটি ঘটলো। আমরা সেখানে উপস্থিত একজন বক্তার দিকে পূর্ব থেকেই লক্ষ্য রেখেছিলাম, কখন তিনি বলতে উঠবেন। জানা ছিলো—তিনি খুবইশক্তিশালী বক্তা। প্রথমে তিনি এখানে আমন্ত্রিত হবার জন্যে ধন্যবাদ জানালেন সবাইকে। তিনি ক্ষমা চেয়ে নিলেন এই বলে, যে তিনি হয়তো

সবাইকে বিরক্ত করবেন, একটি গুরু গম্ভীর বিষয় নিয়ে বক্তব্য রেখে। তারপরই তিনি ঈষৎ ঝুঁকে, শ্রোতাদের সবার চোখে চোখ বুলিয়ে, আচমকা হ্যারিকেন ঝড়ের মতই ক্ষিপ্র বেগে আক্রমণ করলেন যেন সবাইকে।

'এখানে উপস্থিত সবাই পরস্পরকে দেখুন ভালো করে। আপনারা কি জানেন আপনাদের মধ্যে কতজন ক্যান্সারে মরতে চলেছেন ? প্রতি চারজনের মধ্যে একজন মরতে চলেছেন, যারা পঁয়তাল্লিশ পেরিয়েছেন। হ্যাঁ, প্রতি চারজনে একজন।'

তিনি থামলেন। তার মুখ উজ্জ্বল হল। 'এটা হয়তো সহজ সরল নির্মম সত্য—তবে বেশীদিনের জন্য নয়। কিছু একটা করতেই হবে এর জন্য। ক্যান্সার প্রতিরোধ কল্পে গবেষণা আর চিকিৎসার উন্নততর সমাধান খুঁজে বের করতে হবে আমাদেরই।

নিজের টেবিলের চতুর্দিক ঘুরে সবার দিকে তাকিয়ে তিনি প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন, 'আপনারা কি ক্যানসার প্রতিরোধে সাহায্য করবেন না ?'

আমাদের মধ্যে এমন একজনও ছিলোনা যে মনে মনে 'হ্যাঁ' বলে সম্মতি জানায়নি। একমিনিটের ও কম সময়ের মধ্যে বক্তা সম্মোহিত করে ফেলেছিলো সমস্ত শ্রোতাকে।

এখানে বক্তার আন্তরিকতা, নিষ্ঠা, বিষয়বস্তুর প্রতিএকাগ্রতা আর ব্যক্তিত্ব আমাদের জয় করে নিয়েছিলো অতি সহজেই। আমরা সবাই বক্তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলাম, বন্ধুভাবাপন্ন হয়ে উঠেছিলাম।

এ ঘটনা থেকে শিক্ষা নিন। অনুশীলন করুণ। প্রয়োগ করে দেখুন। তাহলে আপনিও সফল হবেন কর্মক্ষেত্রে। সহজে লোকের মন জয় করতে পারবেন।

১। আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলুন
২। সরাসরি 'না' বলবেন না
৩। আপনার উৎসাহ-উদ্দীপনা জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দিন।
৪। অন্য লোকের প্রতি শ্রদ্ধা আর আন্তরিক আগ্রহ দেখান, তাহলেই ভালবাসা পাবেন
৫। কথা বলে বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ তৈরী করুণ

কোন বক্তা নিজের বক্তব্যে যদি পুরোপুরি বিশ্বাস আর আস্থা না রাখে; তাহলে শ্রোতারাই বা কেমন করে তার উপর আস্থা রাখবে। বক্তাকে সবচেয়ে আগে অর্জন করতে হবে দৃঢ় আত্মবিশ্বাস। তারপর অন্য কিছু। বক্তা নিজের কথাতে নিজেই যদি প্রভাবিত না হয়, জনসাধারণ কেমন করে প্রভাবিত হবে? পৃথিবীর একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাদুকরকে একবার আমি প্রশ্ন করেছিলাম, তার জীবনে সাফল্যের চাবিকাঠি কি? উত্তরে, প্রথমে তিনি হেসেছিলেন। পরে বলেছিলেন খুবই সোজা উপায়। জনসাধারণকে আমি পছন্দ করি। আমি তাদের শ্রদ্ধা করি। ভালবাসি। আমার ঐকান্তিক উৎসাহ-উদ্দীপনার জোয়ারে নিজের অজান্তেই তারা প্লাবিত হয়ে ওঠেন। প্রথমতঃ আমি দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের সংগে তাদের খুশী করার চেষ্টা করি। দ্বিতীয়তঃ সহজ অন্তরঙ্গ ভঙ্গীতে কথা বলে জনসাধারণের মধ্যে এক বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ তৈরী করে নিই। তাদের সমস্ত প্রশ্নের জবাবে ভুল শুধরে দেবার মত কিছু থাকলেও, সরাসরি না বলিনা। কারণ আমি জানতাম সোজাসুজিভাবে লোকের ভুল দেখাতে নেই তাহলেই তারা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, তাদের আত্মবিশ্বাসে ঘা লাগে। আর এতে ফল হবে এই আমার সমস্ত যাদুবিদ্যা আর -ভেল্কিবাজি একত্রিত করেও শ্রোতার মন জয় করা হয়ে উঠবে না। তাই মিঃ

কার্নেগী, আমি "সবার উপরে ঈশ্বর আছেন" একথার পাশাপাশি আর একটি কথকখনও কখনও ভুলি না "সবার উপরে মানুষ সত্য"।

তাহলে মোদ্দা কথা হল, যদি লোকের মন জয় করতে চান তাহলে লোকের সম্পর্কে আপনার আগ্রহ বাড়ান। আপতি যদি মানুষকে ভাল না বাসেন তাহলে মানুষও আপনাকে ভালবাসবে না।

যদি আরও সহজে লোকের মন জয় করতে চান তাহলে অন্য লোকের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনুন। তাকে নিজের সম্পর্কে বলতে উৎসাহিত করুন।

বর্তমান আমেরিকার সবচেয়ে বড় মনস্তাত্বিক জেম্‌স্‌ নিকলসনের লেখা থেকে কিছুটা উদ্ধৃতি দিচ্ছি—

আমরা যেহেতু মানুষ সেহেতু আমাদের মন স্বভতঃই পরিবর্তনশীল, আমরা যে সবদা নিজের ইচ্ছায় বা বাধ্য হয়ে মনের পরিবর্তন সাধন করি তা নয়, তবুও যখন কেউ আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় আর চেঁচিয়ে বলে, আমরা ভুল করেছি—আমরা তখন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠি, আমাদের হৃদয় ঠাণ্ডা ধাতুর মতই শক্ত হয়ে আসে। অজ্ঞতা, কুসংস্কার এবং যে সমস্ত অবৈধ বিশ্বাস আমাদের মনের মধ্যে প্রবল বিশ্বাসের দুর্ভেদ্য দুর্গ গড়ে তোলে, সেগুলো ভুল হলেও সম্পূর্ণ অযৌক্তিক হলেও কিছুতেই আমরা সেগুলোকে দূরীভূত করতে পারি না। আর সত্যি কথা বলতে কি দূর করার কোনও রকম ইচ্ছে বা আগ্রহও আমরা দেখাতে পছন্দ করি না। তাই মনের গভীরে আমাদের ভ্রান্ত বিশ্বাসগুলি প্রাধান্য পায়। আমাদের ভেতরকার 'আমিত্ব' বা অহং ভাব ক্রমশঃই অভ্রংলিহ হয়ে ওঠে। তার ফলশ্রুতি হয়ে দাঁড়ায় মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবহারে, সৌজন্যে, আচার-আচরণে কেবলমাত্র আমি" বা "আমার" সবচেয়ে বড় হয়ে দাঁড়ায়। এ ধরণের শক্তিকে হেলাফেলা করা যায় না। এর শক্তি ভয়ংকর প্রবল হয়ে ওঠে। আর ঠিক সেই কারণেই আমার

দেশ, আমার বাড়ী, অমার খাদ্য প্রভৃতি সমস্ত কিছুই একই অর্থবহ বলে মনে হয়।

তার মানে হল আমরা যখন ভুল করি, আর আমাদের মতামতে কেউ ভুল ধরে, তখন আমরা ভয়ঙ্কর চটে যাই। কেবল তাই নয়, পৃথিবীর যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে আমি-ই সঠিক জানি এ ধরণের মতবাদ পোষণ করে বসে। আর সেই সঙ্গে জেদ ধরে দাবী করি, যা জানি তা সমস্তই ঠিক এবং নির্ভুল। সমস্ত বিশ্বাস আর ধারণাকে শক্ত আর দূর করার জন্য অনবরত প্রমাণ খুঁজে বেড়াতে থাকে।

তাই আমরা যখন কোন কিছু সঠিক না বলতে পারি বা না জানি বা ভুল করি, তখন আমরা অন্ততঃ নিজেদের কাছে তা মনে মনে হলেও স্বীকার করতে পারি।

একবার কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিতর্ক অনুযায়ী আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিলো একজন বিচারক হিসেবে। বক্তারা প্রায় সকলেই উঠে পড়ে লেগেছিলো কীভাবে পুরস্কার স্বরূপ 'কার্টিজ-পর্দক' টি লাভ করা যায়। আধডজন অস্নাতকদের মধ্যে বেশীরভাগ ছাত্রই বিস্তৃতভাবে নিজেকে তৈরী করেছিলো। বাক-চাতুর্য, কণ্ঠস্বরের ব্যায়াম নিয়েই তারা মত্ত হয়েছিলো, যে বিষয়ে তারা বক্তব্য রাখছিলো সে সম্পর্কে তারা নিজেরাই জানতে আগ্রহী ছিলোনা। যুক্তি-তর্কের জাল বিছিয়ে ভঙ্গী-সর্বস্ব আবেদনহীন নিষ্প্রাণ ছিলো সেইসব ছাত্রদের বক্তৃতা।

একজন আফ্রিকান ছাত্র ছিলো এদের মধ্যে ব্যতিক্রম। সে ছিলো একজন জুলু-যুবরাজ। তার বক্তব্য রাখতে গিয়ে আধুনিক সভ্যতাতে আফ্রিকার দান নিয়ে বিশ্বাস একাগ্রতা আর আগ্রহ দিয়ে প্রতিটি শব্দ উচ্চারণ করে চলেছিলো সে। শ্রোতার সংগে একাত্ম হতে পেরেছিলো সে। ছলাকলা ছাড়া তার প্রতিটি কথা শ্রোতার কাছে উষ্ণতার ছোঁয়ায় প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিলো।

শ্রোতা ও বিচারকমণ্ডলীর বিচারে জুলু-যুবরাজই পুরস্কৃত হয়েছিলো, অন্য কোন ছাত্র নয়।

এখানে আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারলাম জুলু ছাত্রটির জেতার কারণ কী?

কারণ হল: ছাত্রটি শ্রোতাকে যে সব কথা বলেছিলো তার প্রতিটি শব্দ সে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করতো।

যখনই আপনি কোন বিষয়ে স্বাধীনভাবে চিন্তা করার ক্ষমতা অর্জন করবেন, তখন আপনার চিন্তা আর ভাবনাকে ঝালিয়ে নেবার উপযুক্ত স্থান হবে কোন লাইব্রেরীতে যাওয়া। সময় পেলেই সুযোগ মত বই-পত্র ঘেঁটে বক্তব্য বিষয়ে নিজেকে তৈরী করার জন্য প্রস্তুতি নেবেন। সব সময় সঠিক বিষয়ের বই পেতে লাইব্রেরীয়ান কে বলুন। তিনি আপনার বিষয়ে আলোকপাত করার ব্যাপারে, ঠিক বই খুঁজে দিতে পারেন অতি সহজে। তার মতামত জেনে নিয়ে গ্রন্থতালিকা নির্বাচন করুন। কোন দ্বিধা দ্বিরুক্তি না রেখেই লাইব্রেরীয়ানের মতামত নিন। বিশেষ উপকৃত হবেন।

কোন বিষয়ের ওপরে যতখানি সম্ভব মাল-মশলা সংগ্রহ করুন। কাজে যদি কমও লাগে তাহলে বেশী উপাদান সংগ্রহের দিকে লক্ষ্য রাখুন। বিখ্যাত বক্তা টমাস বারব্যাঙ্ক যা করতেন, আপনিও তাই করুন না কেন। তিনি কয়েকশো উদাহরণ আর উপমা থেকে একটি বা দুটি সঠিক ঘটনা বেছে নিতেন। তাতেই বাজীমাৎ করতেন তিনি। তাহলে এতক্ষণ যা বললাম, তার মূল সূত্র হল: একশো চিন্তাকে একত্রিত করুন, তার থেকে নব্বইটা বাদ দিন—দশটাকে বেছে নিন। তাহলেই দেখবেন আপনি প্রভাবশালী বক্তব্য রাখতে পারছেন আপনার মক্কেলের কাছে বা ক্রেতার কাছে।

আপনার ভেতরের অন্তর্নিহিত শক্তি বাড়িয়ে তোলার মূল উপায় হল—যা প্রয়োজন তার থেকে অনেক বেশী উপাদান সংগ্রহ করুন, তথ্য সমৃদ্ধ করে প্রস্তুত করুন নিজেকে।

এ্যামেরিকার একটি প্রথম সারীর ফুড-প্রোডাক্ট বিক্রয়কারী সংস্থার প্রধান আমাকে একবার বলেছিলেন—আমার কোম্পানীতে যোগ দেবার সময় বেশীরভাগ সেলসম্যানেরই আসল উদ্দেশ্য থাকে যেনতেন প্রকারে মাল বেচা। তারা নিজেরাই নিজের প্রোডাক্ট সম্পর্কে সব চেয়ে কম জানার চেষ্টা করে—ধৈর্য্য বা চেষ্টার এতটুকু অংশও তারা এদিকে দেবার প্রয়োজন বোধ করে না।

এতে করে তারা খুব কমদিনই টিকে থাকতে পারতো কোম্পানীতে। আটচল্লিশ ঘণ্টার বেশী কেউই টিঁকতে পারতো না। কারণ ওই তড়িঘড়ি ব্যবসা বাড়ানোটাই মাথায় পুরে রাখতো প্রতিটি সেলসম্যান—প্রয়োজন মনে করতো না নিজের প্রোডাক্ট সম্পর্কে কিছু জানার আছে বলে। দেখা যেতো ব্যবসা করতে বা বাড়াতে অসফলতাই বরণ করে নিতো প্রতিটি সেলসম্যান।

আমি তখন ঠিক করলাম কী কয়েকজন খাদ্য-গুণাগুণ বিশেষজ্ঞকে নিয়োগ করলাম সেলসম্যানদের প্রশিক্ষণের জন্য। আর অ্যামেরিকান সরকার থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন খাদ্য দ্রব্যের গুণাগুন ও মান-সম্পর্কিত তালিকা পড়াটা বাধ্যতামূলক শিক্ষার পর্য্যায়ে ফেলে দিলাম। যা হল প্রতিটি সেলসম্যানের অবশ্যপাঠ্য।

যে যে দ্রব্য আমার সেলসম্যনেরা বিক্রি করতে যেতো—তাদের-সে বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে না জেনে কাজ করতে পাঠানো হতো না কিছুতেই। এতে করে ম্যাজিকের মতই বিক্রী বাড়াতে সক্ষম হয়েছিল আমার সেলসম্যানরা। আমার কথা হল আমি যদি দোকানদারদের বা আমার ক্রেতার কাছে গিয়ে প্রোটিন, কার্বো হাইড্রেট, মিনারেলস সম্পর্কে জ্ঞান দিতে আরম্ভ করি তাহলে দোকানদাররা বা ক্রেতারা শুধু বিরক্তই হবে। তাদের রয়েই গেছে, প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট বা ভিটামিন সম্পর্কে জানাতে !! কী লাভ ওসব ছাতামাথা জেনে !!

আপনি যে জিনিষই বিক্রি করতে চান না কেন, আপনি যদি নিজেকে একজন দক্ষ সেলসম্যান হিসাবে প্রমাণ করতে চান, তাহলে অতি অবশ্যই আপনার বিক্রী করার সামগ্রীর নামধাম জন্ম বৃত্তান্ত থেকে শুরু করে সব কিছু A থেকে Z পর্য্যন্ত আপনার কণ্ঠস্থ থাকা চাই। তাহলেই সমস্তটুকু উৎসাহ-উদ্দীপনা আর আবেগময় প্রাণবন্ততায় আপনার ক্রেতাকে। সক্ষম হবেন আত্মসম্মান বজায় রেখে আপনার বিক্রি বাড়িয়ে তুলতে। যে বিক্রিটা হবে একদিন বা দু'দিনের নয়—হয়ে উঠবে দীর্ঘস্থায়ী।

মিস্ ইভা এম. টারবেল, একটি তেল কোম্পানীর বিখ্যাত ঐতিহাসিক, একবার মিঃ কার্নেগীকে লিখেছিলেন যেন অনেক বছর আগে, যখন তিনি প্যারিসে ছিলেন তখন মিঃ এস. এস. ম্যাকক্লুর, "ম্যাক্‌ক্লুর" পত্রিকার মালিক তাঁকে আটলান্টিক কেবল্ সম্পর্কে একটি ছোট প্রবন্ধ লিখে দিতে বলেছিলেন। মিস্ টারবেল লণ্ডনে গিয়ে প্রধান, মূল টেলিফোনের তারের ইউরোপীয়ান ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করে এই বিষয়টি সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য যোগাড় করলেন। এখানেই তিনি থামলেন না কারণ তাঁর উদ্দেশ্য ছিল বিষয়টি সম্পর্কে সম্যক্ জ্ঞান লাভ করব। তাই তিনি ব্রিটিশ মিউজিয়ামে গিয়ে টেলিফোন তার সম্পর্কিত এই বিষয়টি সম্পর্কে সমস্ত রকমে পড়াশোনা করলেন, জন্মবৃত্তান্ত থেকে শুরু করে কেমন করে এই তার তৈরী হয় তা পর্যন্ত নিজে চোখে দেখে বিষয়টি সম্পর্কে খুঁটিনাটি সব জেনে নিলেন।

প্রয়োজনের অতিরিক্ত অন্ততঃ দশগুণ বেশী তথ্য তিনি কেন সংগ্রহ করলেন? তিনি এটা করেছিলেন কারণ তিনি জানতেন যে যতটা তিনি জানেন তার সবটাই ভাষায় প্রকাশ করতে পারবেন না। কিন্তু যেটুকু প্রকাশ করবেন তা হয়ে উঠবে এক কথায় অতুলনীয়

সুতরাং, কোনও বিষয় সম্পর্কে আপনার বক্তৃতা তখনই মনোজ্ঞ

হয়ে উঠবে যখন সেই বিষয় সম্পর্কে আপনি যাবতীয় তথ্য জোগাড় করে বলে উঠতে পারবেন বা সেই বিষয় সম্পর্কে খুঁটিনাটি সব-রকম খবরাখবর দিতে পারবেন।

যদি আপনি একজন দোকানদার হন বা সেলসম্যান হন তাহলে আপনার ক্রেতার সামনে আপনি যা বলতে চান তা কেমন করে গুছিয়ে পেশ করা যায়—এ সম্পর্কে নীচের নিয়মগুলো অনুসরণ করুন।

1) আপনার মূল বক্তব্য সূত্র ঠিক করুন।
2) সূত্রগুলোর পক্ষে যুক্তি রাখুন।
3) ক্রেতার মনে আবেদন তৈরীর পরিবেশ তৈরী করুন।
4) এমন কিছু নিজেই বলুন যা ভুল, বা করা ঠিক নয় কোন ব্যবসায়ীর পক্ষে।
5) কীভাবে কেমন করে তার সংশোধনী সম্ভব।
6) ক্রেতাকে সহযোগীতার হাত বাড়াতে উদ্বুদ্ধ করুন।

নেপোলীয়ন একবার তার সহযোগী যোদ্ধাদের বলেছিলেন—যুদ্ধের মূল কৌশল হল : এক ধরণের বিজ্ঞান, আর সেই বিজ্ঞানে কৃতী ছাত্র হতে গেলে সুনির্দিষ্ট ও সুচিন্তিত পরিকল্পনা অবশ্যই করতে হবে।

কথা বলা থেকে বন্দুক চালানো সবক্ষেত্রেই এটা প্রযোজ্য। কথা বলা হচ্ছে একধরণের ভ্রমণ। আপনি যখন কথা বলেন তখন নিজের অজান্তেই শ্রোতার মনের ওপর দিয়ে ভ্রমণ করতে থাকেন। তাই সব ভ্রমণের পূর্বে যেমন ভ্রমণসূচী আর পথ-ঘাটের সঠিক বিবরণ ঠিক করে জেনে নিতে হয়, ঠিক তেমনই বক্তাকেও শুরু এবং শেষ কি রকম হবে তা পূর্বেই ভেবে নিতে হবে।

এমন কোন অকাট্য বা অভ্রান্ত নিয়মই তৈরী করা যায়নি যা কোনও কিছু বলার ব্যাপারে সর্বক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কারণ যখনই আপনি বা অন্য কেউ কোনও বিষয়ের উপর কথা বলেন অতি

অবশ্যই তা হয়ে ওঠে বিভিন্ন সমস্যা আর বিষয়ের গুরুত্বের তারতম্যের উপর। তাই প্রত্যেকটি বক্তৃতাই প্রায়শঃই ব্যক্তব্য এবং বিষয়ের উপস্থিতিতে তারতম্য ঘটিয়ে একজন বক্তা একটি বক্তব্যসূত্রকে আগাগোড়া সঠিক পথে চালিত করতে পারেন তখনই যখন তিনি তাঁর বক্তব্য বিষয় নিজে খুব ভাল করে ওয়াকিবহাল থাকেন। তবে কখনই একই কথার পুনরাবৃত্তি করবেন না বা একই উদাহরণ বারবার টানবেন না।

অ্যামেরিকার একজন বিখ্যাত সিনেটার-বক্তা এবং বক্তব্য বিষয় সম্পর্কে বলেছেন—আপনার বক্তব্য বিষয়ের পক্ষে বিপক্ষে যতদূর সম্ভব মালমসলা সংগ্রহ করুন একত্রিত করুন, সুচিন্তিতভাবে গ্রন্থিবদ্ধ করুন, বারবার নিজের মনেই ভালো চিন্তার অবকাশ রাখুন যাতে করে পুরো বিষয়টাই আপনার মস্তিষ্কে পরিপাকের রসে সম্পূর্ণভাবে জারিত করে ফেলতে পারে।

এবারে বক্তব্যকে প্রমাণ করার চেষ্টা করুন যে আপনি যা বলছেন তা সঠিক এবং নির্ভুল। শ্রোতাকে সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রভাবিত করুন যাতে করে আপনার বক্তব্যকে ধ্রুব সত্য বলে মানতে বাধ্য হয়।

প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন যখনই কিছু বলতে যেতেন তিনি পূর্বেই সে সম্পর্কে ভাবতেন, তথ্য সংগ্রহ করতেন এবং নিজের সুচিন্তিত মতামতের সাহায্যে সম্পূর্ণ অংক কষার নিয়ম মেনে মতামতের ফলাফল কষে রাখতেন।

যখন লিংকন চল্লিশ বছর বয়সে পদার্পণ করলেন তখন তিনি কংগ্রেসের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। এবং সে সময় তিনি গভীর আগ্রহে অসীম ধৈর্য্যে একান্তভাবে মনোনিবেশ করেছিলেন ইউক্লিড রচিত জিওমেট্রি পুরোপুরিভাবে পরিপাক করে ফেলতে। যাতে করে সম্পূর্ণ জ্যামিতি অংকের নিয়মে তিনি তাঁর বক্তব্যের সফলতার লাগাম টানতে পারবেন।

যখন প্রেসিডেন্ট থিওডোর রুজভেল্ট তাঁর বক্তৃতা তৈরী করতেন তখন বক্তব্য বিষয় সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করতেন, তাদের ফলাফল, সুফল কুফল নিংড়ে বার করে নিতেন এবং পরে নিজের মনে বারবার সাজিয়ে গুছিয়ে যুক্তিতর্কের জালে অনুশীলন করতেন নিজে নিজেই। তারপর ঝড়ের গতিতে দুর্দম শক্তিতে তিনি টাইপরাইটারে তা লিপিবদ্ধ করতেন এবং পরে সেই বক্তৃতা-মালা জনসমক্ষে বলতেন।

যদি সম্ভব হয় নিজের কথা ডিক্টাফোনে লিপিবদ্ধ করুন এবং পরে তা বারবার নিজের কানে শুনে ভুল ত্রুটি শুধরে নিন।

আগে থেকে লেখা বক্তব্য মুখস্থ করে বলার চেষ্টা করা মানে আপনার বক্তব্যের পঞ্চাশ ভাগ আকর্ষণ নষ্ট করে ফেলা, কারণ শ্রোতারা গড়গড় করে নামতা পড়ার মত মুখস্থ করা কথা শুনতে একেবারেই উৎসাহিত হয় না, বরঞ্চ বিরক্ত হয়।

তাই কথনই মুখস্থ করার চেষ্টা করবেন না তাতে স্বতঃস্ফূর্ততা প্রাণবন্ততা একেবারেই হারিয়ে যায়। আসল গোলাপ ছেড়ে কেউ কী আর কাগজের গোলাপ তুলে নেয় হাতে ?

মনে মনে বক্তব্য সাজিয়ে ফেলার পর—আপনি যখন একা একা রাস্তায় হাঁটবেন, তখন নিজের সংগে নিজেই কথা বলুন—নিজের বক্তৃতা নিজেকেই শোনান। এভাবে বারবার করুন—তাতে করে অনেক ভুল-ত্রুটি শুধরে নিতে পারবেন। একটা কথা খেয়াল রাখবেন—আরম্ভ আর শেষ যেন একটা যোগসূত্র মেনে চলে। হঠাৎ আরম্ভ, হঠাৎ শেষ সব কিছু গুবলেট করে দিতে পারে। আপনি সব সময় ভাববেন, যেন অগুন্তি শ্রোতার সামনে আপনি বক্তৃতা দিচ্ছেন আর শ্রোতারা মুগ্ধ বিস্ময়ে আপনার কথা শুনছে। এতে করে সত্যি সত্যি যখন আপনি মঞ্চে উঠবেন কিছু বলার জন্য, তখন আপনি খুব সহজভাবেই শ্রোতার মুখোমুখি হতে

পারবেন। জড়তা আর ইতস্ততঃভাব কাটিয়ে অনেক অনেক বেশি অন্তরঙ্গ হয়ে উঠতেও পারবেন শ্রোতার কাছে।

ধরুন আপনার মাত্র উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাগত যোগ্যতা রয়েছে। আপনি ব্যবসা করতে চান অথচ সেরকম ব্যবসা-বুদ্ধি আর অভিজ্ঞতা আপনার নেই, তাহলে আপনি কী করবেন? কেমন করে এগুবেন?

প্রথমতঃ ধৈর্য্য রাখতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ সুচিন্তিত ভাবে সুনির্দিষ্ট বিষয়ে ভাবতে হবে।

তৃতীয়তঃ ভুল-ত্রুটি গুলো নির্দয় আর নির্মমভাবে শুধরে নিতে হবে। কোন রকম আপোষ করাই চলবে না। নিজের ভুলের কথা বার বার আলোচনা করুন—দেখবেন নিজেই বুঝতে পারবেন কোনটা ঠিক আর কোনটা বেঠিক। অভিজ্ঞতাই আপনার বিচার বুদ্ধি আর সঠিক দৃষ্টিভংগী এবং সফল সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে। কোন মানুষই বিচার-বুদ্ধি আর অভিজ্ঞতা নিয়ে জন্মায় না। তাই এক মাত্র অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই বিচার বুদ্ধি আসে। তাই অন্যকে সমালোচনা না করে আগে নিজেকে সমালোচনা করুন। কোন বক্তা যদি নিজের ভুল—ত্রুটির কথা প্রথমেই বলে নেয়, তাহলে কোনরকম সমালোচনা শোনা শ্রোতার পক্ষে খুবই সহজ হয়।

তাই আপনি যদি ব্যবসায়ী বা ভালো সেলসম্যান হতে চান, তবে প্রথমে ক্রেতার সামনে নিজের সমালোচনা দিয়ে শুরু করুন আর ক্রেতার প্রশংসা দিয়ে শেষ করুন। আর কৌশলে তারই ফাঁকে নিজের বিক্রয়-দ্রব্যের গুনাগুণ ঢুকিয়ে দিন—দেখবেন হাতে হাতে ফল পাবেন।

জানেন, বারো বছর বয়সে আমি যখন মিসৌরী গ্রামে স্ট্রবেরী ফল ঝুড়ি ভর্তি করে আর তা মাথায় করে মহাজনের গুদামে পৌঁছে দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতাম, সে সময়কার কথা আমি ভুলিনি। যেমনভাবে আমি মাঝেমাঝেই নিজেকে নিজে প্রশ্ন করি—ডেল

কার্নেগী, উনিশ বছর বয়সে তুমি কি করতে? মনে পড়ে—গরু গাধার মত কত অসংখ্য ভুল তুমি করেছিলে? কত হাস্যকর আর নির্বোধ ভুলের উপকরণ সংগ্রহ করেছিলে তার ঠিক নেই। একটা কথা শোন ডেল কার্নেগী—সে সব কথা মনে রেখো। ভুলে যেওনা। তাই যখনই কমবয়সী অভিজ্ঞতাহীন কোন যুবক আমার কাছে আসে আমি তার দোষত্রুটি আর সমালোচনা করার পূর্বে নিজেকেই নিজে ফিসফিস করে বলে উঠি—

'এক মিনিট ডেল কার্নেগী। একটু দাঁড়াও। একটু ভাবো। একটু অপেক্ষা করে শোনোতো। যে যুবকটি তোমার সামনে দাঁড়িযে তার চাইতে দ্বিগুণ বয়স তোমার। আর অভিজ্ঞতা, তার চাইতে দশ হাজার গুণ বেশী ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতা আর জ্ঞান রয়েছে তোমার। তাই তুমি কীভাবে কেমন করে আশা কর যে—ছেলেটি তোমার মত ভাবতে পারবে। তোমার মত বিচারবুদ্ধি আগ্রহ আর কাজ করার সিদ্ধান্ত নেবার অনায়াস সহজ দৃষ্টিভংগী গড়ে উঠবে তার? আর নিজেকে অসাধারণ কিছু ভাবছই-বা কেন? আজ তোমার যে গুণগুলো নিয়ে তুমি গর্ববোধ কর—সেগুলি বা ও গুণগুলি খুবই সাধারণ। অসাধারণত্ব হল, তোমার সুচিন্তিত সঠিক পথে দীর্ঘ অভিজ্ঞতার খোরাককে বাস্তব প্রয়োগ করে সফলতা অর্জণ করতে পারাটা।

কিভাবে স্মৃতিশক্তি বাড়ানো যায়

পৃথিবীর একজন সেরা মনোচিকিৎসক বলেছেন—বেশীরভাগ মানুষই তার স্মৃতিশক্তির মাত্র শতকরা দশভাগ কাজে লাগাতে সক্ষম হন। বাকী শতকরা নব্বই ভাগই অপচয় হয়—নষ্ট হয় অকারণে। মানুষ প্রকৃতির সহজ নিয়মকে লঙ্ঘন করে, তার সঠিক ব্যবহার না করে।

এসব সাধারণ লোকের মধ্যে যদি আপনিও পড়েন তবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে আপনার যে অনগ্রসরতা তার জন্য অন্য কারুর কিছু করার নেই। আপনি নিজেই তার জন্য দায়ী। তাই যদি আপনি নিজেকে সুসজ্জিত আর শক্তিশালী করতে আগ্রহী হন, তবে কোন বিষয়ের ওপর লেখা বই-পত্র শুধু পড়ার জন্য পড়বেন না। বারবার পড়ুন। এ অধ্যায়ে আমি আপনাদের স্মৃতিশক্তি বাড়ানো এবং তার সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে আপনাদের কিছু বলবো।

মনে রাখার নিয়মকানুনগুলি খুবই সহজ আর স্বাভাবিক। একটুও কঠিন নয়। নিয়মিত অনুশীলনে আপনার পক্ষে তা আয়ত্ব করা খুবই সহজ হবে।

তিনটি সাধারণ নিয়মের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে স্মৃতিশক্তি বাড়ানো বা মনে রাখার পদ্ধতিগুলি।

(১) মনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করা

(২) পুনরাবৃত্তি ও পুণঃসজ্ঘটন

(৩) বিভিন্ন অবস্থার সাদৃস্য বা প্রাসঙ্গিকতা বিচার

কোন জিনিষ সম্পর্কে গভীরভাবে ভাবা আর তার গভীরে ঢুকতে হবে—যাতে সে বিষয়ে মনের ওপর ছাপ পড়ে এবং দৃঢ় প্রভাব পড়ে। প্রেসিডেন্ট থিওডোর রুজভেল্টের অনন্যসাধারণ স্মৃতিশক্তির কথা আজ কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছে। যত তুচ্ছ ঘটনাই হোক, কোন লোকের সংগে মাত্র একবার মিলিত হলেই তিনি তার নামধাম পেশা, আর বিস্তৃত বিবরণ মনে রাখতে পারতেন। এতে করে কত সহজেই না তিনি লোকের মন জয় করে উঠতে সক্ষম হতেন।

থিওডোর রুজভেল্টের অদ্ভুত জনপ্রিয়তার মূলেও অত্যাশ্চার্য্য স্মৃতিশক্তির ভূমিকা কম নয়। তাঁর নিগ্রো চাকরেরা তাঁকে খুবই ভালোবাসতো! একজন নিগ্রো চাকর তাঁর সম্পর্কে একটা বই লিখেছিল। সে লিখেছিলো—প্রেসিডেন্ট আমাদের ছেলেমেয়ের নাম পর্য্যন্ত নির্ভুল মনে রেখেছিলেন। আমাদের বাড়ির পাশ দিয়ে

যাওয়ার সময় ছেলেমেয়েদের নামধরে তিনি ডাকতেন—খোঁজখবর নিতেন—কথা বলতেন। আমার ছেলেমেয়েরা এত সহজ আব্দারের সংগে তাঁর সংগে কথা বলতো, যেন ওরা সবাই সমবয়সী বন্ধু। এছাড়াও আমার স্ত্রীর সংগেও তিনি বন্ধুভাবে কথা বলতেন। কথা শুনতেন। একদিন ডিনার-টেবিলে আমার স্ত্রী তাকে বব হোয়াইট সম্পর্কে নানারকম প্রশ্ন করেছিলেন। প্রেসিডেন্ট একটুও বিরক্ত না হয়ে ধৈর্য্য সহকারে সবিস্তারে আমার স্ত্রীকে বব হোয়াইট সম্পর্কে সমস্ত কিছু বলেছিলেন। সকল কৌতূহল মিটিয়েছিলেন।

এমনকি পরদিন সকালবেলা আমাদের কুটিরে আমার স্ত্রীকে টেলিফোন করে জানালেন যে—আমাদের জানলার বাইরে বব-হোয়াইট এসেছে এবং আমার স্ত্রী এই সুযোগে চেষ্টা করলেই বব হোয়াইটকে দেখে নিতে পারে!

নাম মনে রাখার ক্ষমতার আর একটি উদাহরণ দিচ্ছি! এ্যামেরিকার একজন প্রথম সারির রাজনৈতিক নেতা যিনি কখনও স্কুলে যাওয়ার সুযোগ পাননি। মাত্র পঁয়তাল্লিশ-ছেচল্লিশ বছর বয়সেই তিনি ডেমোক্রেটিক ন্যাশন্যাল কমিটির চেয়ারম্যান হন এবং পরে অ্যামেরিকার পোস্টমাস্টার জেনারেল হন। তিনি চারটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মাণসূচক ডক্টরেট উপাধি লাভ করেছিলেন।

আমি তাঁকে তাঁর সাফল্যের গোপন রহস্য জানতে চাইলে তিনি দ্বিধা না করে উত্তর দিলেন—অন্যকিছুই নয়। কেবল কঠোর পরিশ্রমই আমাকে সফলতা এনে দিয়েছে।

আমি বললাম, ঠাট্টা না করে, দয়া করে সত্যি কথাটা বলুন, আমি জানি আপনি আসল কথাটা বলতে চাইছেন না।

উত্তরে তিনি সুস্মিত হাসিতে জানতে চাইলেন আমার কি মনে হচ্ছে এ বিষয়ে। আমি তাঁকে জানালাম—শুনেছি আপনি নাকি দশহাজার লোকের নামধাম পেশা নির্ভুল বলতে পারেন। সেই বিখ্যাত রাজনীতিবিদ্ এবারে কোন রকম হেঁয়ালী না করে জানালেন

—ভুল শুনেছেন। আমি পঞ্চাশ হাজার লোকের নাম আর পেশার বিবরণ বলে দিতে পারি।

অনেক লোকই নাম মনে করে রাখতে পারেনা তার মূল কারণ হল, লোকেরা নাম মনে রাখার জন্য শক্তি ও মনোযোগ দেয়না। মোট কথা খুব একটা আগ্রহী হয়না—তারা এর জন্য ভাব দেখায় বা কারণ দেখায় যে তাদের খুব তাড়া আছে তারা খুব ব্যস্ত—প্রতিটি মুহুর্ত ভীষণ দামী।

কিন্তু তারা নিশ্চয় প্রেসিডেন্ট থিওডোর রুজভেল্ট বা এণ্ড কার্নেগীর চাইতেও বেশী ব্যস্ত আর দামী লোক নন।

প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট তার চাকর, খানসামা, বাগানের মালী, ধোপা, নাপিত আর গাড়ির ড্রাইভারের নামও নির্ভুল মনে রাখতে পারতেন।

ইস্পাতের রাজা এণ্ড্রু কার্নেগীরও সাফল্যের মূল কারণ ও একটিই। তিনি তার বিশাল কারখানার হাজার হাজার শ্রমিকের নাম জানতেন। তাই কারখানার কর্তৃত্ব করতে কোন অসুবিধাই হয়নি তাঁর। তাহলেই নাম মনে রাখার ব্যাপারে গুরুত্ব আর মর্য্যাদা দিতে তিনি কখনও ভুল করতেন না।

তাই স্মৃতিশক্তি বাড়ানোর ব্যাপারটা এতো গুরুত্বপূর্ণ। মানুষ নিজের নামকে তার প্রাণের চেয়েও বেশী ভালোবাসে। শ্রেষ্ঠ ভাবে। তাই আপনার ক্রেতা বা মক্কেলের নাম ধরে ডাকুন তাহলেই দেখবেন বরফ গলে জল হওয়ার মতই খুশী হয়ে উঠবে আপনার মক্কেল বা খদ্দের।

লোকের মনে আপনার সম্পর্কে ভাল ধারণা সৃষ্টি করার খুব সহজ আর সরল উপায় হল—নাম মনে রাখা। আমরা ক'জনই বা একথা মনে রেখে কাজ করি।

নাম মনে রাখার সহজ কতকগুলো উপায় বলছি। ধরুন, কোন একজন লোকের সংগে আপনার আলাপ হল। ধরুন, লোকটির

গলার স্বর জড়ানো আর অস্পষ্ট বা আপনি নিজেই সে সময় অন্যমনস্ক ছিলেন, তাহলে কী করবেন? তখন বলবেন, ক্ষমা করবেন—আমি আপনার নামটি ঠিকমত শুনতে পাই নি। আর যদি দেখেন নামটি নতুন ধরণের, তাহলে জেনে নেবেন নামটির অর্থ কী আর বানানটাই বা কেমন করে হবে। এরপরে মনে মনে নামটা বেশ কয়েকবার বলুন। সেই সংগে লোকটির পোশাক-আশাক চোখমুখ, চেহারার বৈশিষ্ট্য ও মনে রাখুন।

ফ্রান্সের সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন কখনও লোকের নাম ভুলে যেতেন না! এজন্য তিনি খুব গর্ব অনুভব করতেন।

তৃতীয় নেপোলিয়ন একবার এ প্রসঙ্গে বলেছিলেন—আমি চোখ দিয়ে নামটিকে লিখে রাখি আর কান দিয়ে মনে রাখি।

যখনই কোন কিছু পড়বেন বা মনে রাখার চেষ্টা করবেন তখন মনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করার চেষ্টা করবেন তখন মনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করার চেষ্টা করুণ। আর সেটা করতে গেলে আপনাকে ভাবনার গভীরে ডুবে যেতে হবে। হৃদয়ে ও মস্তিষ্কে গেঁথে ফেলতে হবে সবকিছু। প্রেসিডেন্ট থিওডোর রুজভেল্টের সাফল্যের চাবিকাঠি ছিল তা।

সবকিছু বিস্তৃতভাবে পর্যবেক্ষণ করুণ। খুঁটিনাটি বিষয়কেও অবহেলা করবেননা। যেমন ছবি তোলার সময় সূর্যালোক দরকার, ঘন কুয়াশাতে দামী ক্যামেরাও সুস্পষ্ট ছবি তুলতে সক্ষম হয়না। ঠিক তেমনি আপনার মন থেকে অস্পষ্টতার কুয়াশা আর অমনোযোগ দূর করে ফেলতেহবে অবহেলা,বিষয়বস্তুর পরিষ্কার প্রতিচ্ছবি আরপ্রতিলিপি মুদ্রিত হবে, রেখাঙ্কিত হবে আপনার মস্তিষ্কে। আপনার হৃদয় আর মস্তিষ্কের সমস্ত অনুভূতি দিয়ে বিষয়বস্তটিকে বোঝার চেষ্টা করুন। প্রেসিডেন্ট লিঙ্কন কখনও আস্তে আস্তে মনে মনে পড়তেন না। তিনি যদি কিছু মনে রাখার কথা ভাবতেন, তাহলে বিষয়বস্তুটি জোরে জোরে পরিষ্কার উচ্চারণ ও অর্থবহ ভঙ্গীতে বারবার পড়তেন।

'বিখ্যাত লেখক মার্ক টোয়েন তার বক্তৃতার কোন মাথামুণ্ডুই খুঁজে পেতেন না যখন তিনি কাগজে খসড়া বক্তব্য লিখে রাখতেন। কিন্তু যেদিন থেকে তিনি ওসব কাগজ-পত্রে লেখা বিষয়বস্তুকে হটিয়ে দিলেন এবং মনে মনে বক্তৃতার মূল সূত্রগুলোর ছবি এঁকে ফেলতে সক্ষম হলেন, তাঁর সব রকম অসুবিধা আর জড়তার বাধার পাহাড় তখন সরে গেলো। এর ফলে তিনি সহজ সাবলীল ভংগীতে অনায়াস বক্তব্য রাখতে সক্ষম হন।

স্মৃতিশক্তি বাড়ানো বা মনে রাখার দ্বিতীয় উপায় হল পুনরাবৃত্তি পুনঃসঙ্ঘটন।

তাহলে কথাটা আবার বলছি পুনরাবৃত্তি ও পুনঃসঙ্ঘটন। হাজার হাজার মুসলমান বালক ছাত্ররা প্রতিদিন নিয়ম করে কোরাণ পাঠ করে। আর এই বারবার পাঠাভ্যাসের মাধ্যমে একদিন সম্পূর্ণ কোরাণ তাদের কণ্ঠস্থ হয়ে পড়ে। ঠিক তেমনিভাবে আমরাও যদি স্মৃতি নামক পাথরে বারবার অনুশীলনের মাজাঘষা চালিয়ে যেতে থাকি তাহলেই আমাদের স্মৃতিশক্তি অদ্ভুতভাবে বেড়ে যাবে। আর একটা কথা মনে রাখতে হবে যতক্ষণ পর্যান্ত মনে না থাকবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত না থেমে বিষয়টির পুনরাবৃত্তি করে যেতে হবে। তাহলেই তা অতি অবশ্যই মনে থাকবে। যখন কোনও জিনিষ আমরা প্রথমে মনে রাখি তা আটঘণ্টা পর্য্যন্ত ঠিক মনে থাকে এবং যদি তিরিশ দিনের মধ্যে তা প্রয়োগ করতে যাই তাহলে অবশ্যই কয়েক মিনিট পূর্বে সে বিষয়ে স্মৃতিকে পুনর্বার ঝালিয়ে নিতে হবে।

স্মৃতিশক্তি বাড়ানোর তৃতীয় শক্তি হচ্ছে বিভিন্ন অবস্থার সাদৃশ্য বা প্রাসঙ্গিকতা বিচার। প্রফেসর হাভার্ড জেম্‌স্ বলেছেন যখনই নতুন কোনও জিনিষ আপনি আপনার স্মৃতিকে উপহার দেবেন তখনই পূর্ব থেকে জানা এবং মনে থাকা কোনও বিষয়ের সঙ্গে তার সংযুক্তি বা পরিচয় ঘটিয়ে নিন। একজন মানুষ যখন তার অনেক অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করে তখন নতুন কোনও কিছু শিখতে গিয়ে বা মনে রাখতে গিয়ে পূর্ববর্তী কোনও না কোনও ঘটনার সঙ্গে মিল বা সাযুজ্য খুঁজে পায়। এবং যখনই এ ধরণের সংযুক্তি ঘটাতে সক্ষম হয় তখনই তার স্মৃতিশক্তি উজ্জ্বল ও বর্ণাঢ্য হয়ে ওঠে।

কি করে আপনি অতীতের বা পূর্বতন কোনও ঘটনার সঙ্গে

বর্তমানের কোনও ঘটনা বা বিষয়বস্তুর সংযুক্তিকরণ বা সাযুজ্যকরণ ঘটাবেন ? এদের মাঝখানের সেতুটি হালকা কাঠের না হয়ে যদি ইস্পাত নির্মিত করতে পারেন তবেই আপনি সক্ষম হবেন সারা জীবনের মত আপনার স্মৃতিশক্তিকে ইচ্ছেমত নামধাম ঘটনার বিবরণ আর বিশদ বর্ণনাকে স্মৃতির বর্শায় গেঁথে রাখতে। তাহলে ঘটনাটা কি দাঁড়াল ? আমিই-বা এতক্ষণ ধরে কি বলতে চাচ্ছি ? একটি উদাহরণ দিচ্ছি। আপনি যদি নীচে বর্ণিত প্রশ্নগুলি নিজেকেই জিজ্ঞেস করেন এবং নিজেই তার উত্তর খুঁজতে চান তাহলেই দেখবেন একটিমাত্র সত্যতা বা যোগসূত্র দিয়ে আপনি কতকগুলো ঘটনা এবং সম্পর্ককে আঁকশি দিয়ে পেড়ে ফেলতে পারছেন। নীচের প্রশ্নগুলো এবং পদ্ধতিটি ভাল করে পড়ুন এবং মনে মনে বার বার ঝালিয়ে নিন, পুনরাবৃত্তি করুন।

(১) এটা কেন হল ?
(২) কেমন করে হল ?
(৩) কখন হল ?
(৪) কোথায় হল ?
(৫) কেই বা এটা করল ?

উপরের এই সূত্রগুলি দিয়ে আমরা খুব সহজেই একটি ঘটনা গল্পাকারে সুন্দর বর্ণনার মাধ্যমে মনে মনে সাজিয়ে ফেলতে পারি। তারপর খুব সহজেই সূত্রগুলোকে স্মৃতির দড়িতে টেনে টেনে বেঁধে গল্পের বাঁধুনিকে ক্রমশঃ লম্বা করে ফেলতে পারি।

যখনই আপনার সামনে কোনও ক্রেতা বা প্রার্থী বা কোনও মক্কেল বা কোনও অপরিচিত ব্যক্তি এসে দাঁড়াবে আপনি তখনই অলস চোখে না তাকিয়ে গভীর পর্য্যবেক্ষকের চোখে আগন্তুককে দেখুন, লক্ষ্য করুণ, মন্তব্য করুণ এবং মনে মনে বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত করুণ যেমন :—মুখের চোয়ালের গঠন, নাক, চুল এবং চোখের রং,

কি পোষাক পড়ে আছে তা, কথা বলার ভঙ্গী, কণ্ঠস্বরের হেরফের, এককথায় একটি পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন প্রায় নির্ভুল ছাপ মনের মধ্যে গেঁথে নেওয়ার চেষ্টা করুণ। এতে করে পরবর্তী সময়ে লোকটিকে দেখামাত্রই তার নাম খুব সহজেই আপনার মনে পড়ে যাবে।

কিভাবে কেমন করে সন তারিখ সম্বলিত ঘটনা মনে রাখবেন? আপনার জীবনে অনেক স্মরণীয় ঘটনাই ঘটে যা আপনার মনেও থাকে কিন্তু সঠিক সময় দিন, বার বার সালের হিসেবের গণ্ডগোলে আপনি কখনই ঘটনাটির যথার্থ বিবরণ দিতে সক্ষম হন না। তাই সাল আর তারিখ মনে রাখার সহজ উপায় হল কোনও বিখ্যাত ঘটনা ঘটার দিন তারিখের সঙ্গে নিজের জীবনের ঘটনাটির সংযোগ স্থাপন করা। এটা খুব একটা কঠিন নয়। যেমন ধরুন ঃ—যদি কোনও অ্যামেরিকান মনে রাখতে চান কোন্ সালে সুয়েজ খাল উন্মুক্ত হয়েছিল তাহলে তার পক্ষে অনেক বেশী সোজা হবে আঠার শো উনসত্তর সালে এই সুয়েজ খাল খোলা হয়েছে, এটা মনে না রেখে মনে রাখা সহজ হবে যে অ্যামেরিকার গৃহযুদ্ধ শেষ হওয়ার চার বছর পরেই এই খাল দিয়ে প্রথম জাহাজটি যাতায়াত করেছিল। আর একটি উদাহরণ দিচ্ছি ঃ—যদি কোনও আমেরিকানের সখ হয় যে প্রথম অস্ট্রেলিয়াতে পুনর্বাসন শুরু হওয়ার সালটা মনে রাখবে তাহলে সতের শো অষ্টাশির ৪ঠা জুলাই মনে না রেখে এভাবে মনে রাখলে সহজ হবে যেমনঃ—সে মনে রাখবে অ্যামেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণার তারিখটি। সতের শো ছিয়াত্তরের ৪ঠা জুলাই। ঠিক তার বার বছর পরেই প্রথম অস্ট্রেলিয়ার মনুষ্যবসতি শুরু হয়েছিল। ধরুন ঃ—১৮৯২ খ্রীঃ অব্দের কোনও স্মরণীয় ঘটনা যা আপনার পরিবারে ঘটেছিল আপনি মনে রাখতে চান, অথচ পারেন না ভুলে যান। তাহলে আপনার পক্ষে মনে রাখা সহজ হয়ে যদি আপনি মনে রাখেন ১৪৯২। কলম্বাস অ্যামেরিকা আবিষ্কার করেছিলেন। তাহলে কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের

চারশ বছর পরের ঘটনা এই যোগসূত্রই আপনাকে সাহায্য করবে নিজের স্মরণীয় পারিবারিক বছরটি মনে রাখতে।

নীচে লেখা সন্‌গুলো যথাসাধ্য মনে রাখার চেষ্টা করুণ ঃ—

(১) ১৫৬৪—সেক্সপীয়রের জন্ম।

(২) ১৬০৭—অ্যামেরিকার জেম্‌স্ টাউনে প্রথম ইংরেজ উপনিবেশ স্থাপন।

(৩) ১৮১৯—রানী ভিক্টোরিয়ার জন্ম।

(৪) ১৮০৭—রবার্ট ই. লি.-র জন্ম।

(৫) ১৭৮৯—বাস্তিল দুর্গের পতন।

এবারে দেখুন সেক্সপীয়রের জন্মসাল আপনার কি কাজে লাগছে। সেক্সপীয়রের তিনশতম জন্মবার্ষিকীতে অ্যামেরিকার গৃহযুদ্ধ ঘটেছিল।

যদি কেউ ঠিকমত স্মৃতির মাঝে নাম ঠিকানা ঘটনাকে আর ঘটনার বিবরণকে ক্রমানুযায়ী না সাজাতে পারেন তাহলে কিন্তু এক কেলেঙ্কারী কাণ্ড হবে। যেমন ঃ—শুধুমাত্র সাজানোর অভাবেই অনেক মূল সূত্র নীচের বাক্যটির মত জগাখিচুড়ি পাকিয়ে যেতে পারে। যেমন ঃ—

গরুটি চুরুট খাচ্ছিল আর চুরুট মুখেই নেপোলিয়ান মুখে কষে ঘুঁষি মারল। এবং ঘরটা পুড়ে ভস্মীভূত হল ধর্মের সাহায্যে।

ভালো কথা বলতে শেখার জন্য কিছু প্রয়োজনীয় মূল সূত্র :

আমরা কিছুই শিখতে পারবোনা, যদি না আমরা ধীরে ধীরে ধৈর্য্য সহকারে অধ্যবসায় নিয়ে কাজকর্ম না করি। তা, গলফ খেলাই হোক, ফরসী ভাষা শেখাই হোক আর লোকের সামনে বক্তৃতা করার ব্যাপারই হোক। একাই পাঁচতালা বাড়ির সিঁড়ি বেয়ে বেয়েই সর্বোচ্চতলে উঠতে হয়—একেবারেই সিঁড়ি অতিক্রম না করে ওপরে ওঠার চেষ্টা করা বাতুলতা মাত্র।

আমরা যখনই কোন কিছু শিখতে শুরু করি নতুন করে, তখনই আকস্মিক এক নাড়াচাড়া চলে মনের মধ্যে। তার ফলে আমাদের অগ্রগতি হয় অপ্রত্যাশিত আরম্ভের পথে। তাতে করে হয় আমরা কয়েক সপ্তাহ একই জায়গায় ঝিম মেরে দাঁড়িয়ে থাকি বা যা কিছু শিখেছিলাম তাও সব ভুলে মেরে দিতে পারি। মনোবিজ্ঞানীরা এ ধরণের অবস্থাকে বদ্ধ জলাশয়ের সংগে তুলনা করেছেন। এক ধরণের সময়সীমার দ্বারা গণ্ডীবদ্ধ হয়ে থাকি আমরা।

এ যেন কোন কিছু শেখার রাস্তার বাঁকে বাঁকে বাধার কাঁটা ঝোপ রেখে দেওয়া হয়। আমরা প্রায়শঃই বাঁধার কাঁটাতে ক্ষতবিক্ষত হই। এবং এক সময় বিরক্ত হয়েই শেখার রাস্তা থেকে দূরে সরে যাই। এতে করে অস্বাভাবিকতাও কিছু নেই—বেশীরভাগ লোকই প্রথমদিকে বাধাবিঘ্নের প্রাচীর ডিঙোতে অক্ষম হয়েই ব্যর্থ হবেন ভেবে বিফল মনোরথ হয়ে ভেংগে পড়েন। কিন্তু সব কিছুকে অগ্রাহ্য করে অক্লান্ত অধ্যবসায়ের সংগে যারা আদা-নুন খেয়ে লেগে থাকতে পারেন তিনি—ই সফল হন। এক সুন্দর প্রাতে: তিনি হঠাৎ আবিষ্কার করেন যে, তার সামনের সমস্ত বাধা বিপত্তি হটে গেছে।

রাতারাতি এরোপ্লেনের গতিতে আপনি শেখার পথ-পরিক্রমা করে ফেলতে পারছেন।

যখনই কোন কারণে আপনি নিরুৎসাহ হয়ে উঠবেন তখনই প্রেসিডেণ্ট থিওডোর রুজভেল্টের কথা মনে রাখবেন। ঘটনাটা হল —প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের ঘরে প্রেসিডেণ্ট আব্রাহাম লিংকনের একটি ছবি টাঙানো থাকতো। ছবিটি এমনভাবে টাঙানো হয়েছিলো যাতে করে রুজভেল্টের কাজ করার টেবিলে বসলেই মুখোমুখি পড়ে ছবিটা। যখনই দারুণ কোন বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হতেন রুজভেল্ট, সিদ্ধান্ত নেবার ব্যাপারে মনস্থির করতে পারতেন না, তখনই তিনি লিংকনের ছবির দিকে তাকিয়ে থাকতেন, ভাবতেন যে তাঁর নিজের মত প্রতিকূল সংঘাতময় অবস্থায় যদি লিংকন নিজে থাকতেন তাহলে তিনি কেমন করে কিভাবে সিদ্ধান্ত নিতেন।

এতে করে চমৎকার ফল পেতেন থিওডোর রুজভেল্ট। আমেরিকার একজন বিখ্যাত নৌ-সেনাপতি যিনি প্রথম মহাযুদ্ধে অসীম সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন—তিনি তাঁর সাফল্যের চাবিকাঠি বলতে বর্ণনা করেছেন চারটি 'G' অক্ষর দিয়ে গড়া শব্দকে। তারা হল ঃ

(১) প্রশংসনীয় সদগুণ (GRACE)

(২) সাধারণ বুদ্ধি (GUMPTION)

(৩) দৃঢ় চরিত্র (GRIT)

(৪) প্রচণ্ড সহ্যশক্তি (GUTS)

উপরে বর্ণিত এই চারিটি গুণাবলী যদি আপনি অর্জন করতে পারেন, তবে আপনার সফলতার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে শয়তান পর্য্যন্ত ভয় পাবে।

সুন্দর করে কথা বলতে পারার গভীর গোপন রহস্য :

কেউ কেউ এত সুন্দর করে কথা বলতে পারেন যে, সেটা এক নিপুণ শিল্পকর্ম হয়ে দাঁড়ায়। ঠিক এই সূত্রের ওপর ভিত্তি করেই আবৃত্তিকাররা আবৃত্তিকে শিল্প-পর্য্যায়ে উন্নীত করার চেষ্টা করে চলেছেন। আমরা সবাই কথা বলি—কিন্তু সবার বলাটা কি অন্যের পক্ষে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে কিংবা শ্রোতাকে খুবই আগ্রহী করে তোলে কথা শুনতে। তাহলেই দেখুন কথাতো আমরা অনর্গল বলে চলেছি—কিন্তু সত্যিকার সুন্দর ভাবে হৃদয়গ্রাহী করে কজনই বা বলতে পারি। তাহলেই দেখুন কিছু একটা রহস্য থেকেই যাচ্ছে—কেমন করে কীভাবে কথা বলতে হবে এ বিষয়টা হেলাফেলা করার ব্যাপার—এটাও শিখতে হয়, জানতে হয়, অনুশীলন করতে হয় বাস্তব প্রয়োগের মাধ্যমে।

অনেক বক্তাই শ্রোতার দিকে মনোযোগ দেওয়াটা প্রয়োজনীয় মনে করেন না—তারা হয় কড়িকাঠের দিকে তাকান বা বাইরের জানালার দিকে তাকান বা মেঝেতে হঠাৎই যেন কিছু খুঁজে নিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। শ্রোতা-দর্শকের সংগে হৃদয়ের সংযোগ স্থাপনের কোন প্রয়োজন আছে বলেও তারা বোধ করেন না। দর্শক বা শ্রোতা যেন কলের পুতুল বা অন্য গ্রহের জীব। আর বক্তা নিজে যেন এক বিশেষ হোমরা চোমরা—শ্রোতাকে কৃতার্থ করে দিচ্ছেন। এরকম ভাবভঙ্গী শ্রোতাকে বক্তব্যের প্রতি আকৃষ্ট করাতো দূরের কথা—বরঞ্চ মারমুখী হয়ে ওঠে তারা। বিরক্তে ফেটে পড়ে। চীৎকার বা অযথা হাততালি দিয়ে বক্তাকে মঞ্চ পরিত্যাগে বাধ্য করে। এতে করে বক্তা ও তার বক্তব্যের দফারফা হয়ে যায়।

আর, কখনও কারুর অনুকরণে বা ভঙ্গীতে কথা বলার চেষ্টা

করবেন না। যাতে করে প্রায়শঃই এক ধরণের আরোপিত ব্যক্তিত্ব ভর করে, বক্তার ওপরে। এতে খুব জরুরী আর গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখার সময়ও বক্তা হয়ে ওঠেন শ্রোতার কাছে একজন সার্কাসের ক্লাউন।

প্রতিটি মানুষই আমরা একে অন্যের চেয়ে আলাদা। পৃথক। শারীরিক ও মানসিক কোন দিক থেকে একজন আর একজনের সমকক্ষ হয়ে উঠতে পারে না। প্রত্যেকটি মানুষের কথা বলার নিজ নিজ দোষ-ত্রুটি গুণাবলী সমন্বিত পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

যখনই কারুর সামনে কিছু বলতে উদ্যোগী হবেন, তখনই সমস্ত মনপ্রাণ ঢেলে কথা বলুন। এতে করে কথা বলাটা হয়ে উঠবে বাস্তব আর প্রাণবন্তময়।

যখনই আমরা দৈনন্দিন জীবনে কোন সত্যিকার ঘটনার মুখোমুখী হই এবং কথা বলি তখনই নিজেদের সম্পূর্ণ অজান্তে ৪টি নিয়ম অবশ্যই মেনে চলি। অথচ যখনই জানছি যে কিছু প্রভাবশালী বক্তব্য রাখতে হবে—ঠিক তখনই ভুলে মেরে দিই ওপরের সেই সূত্রগুলো।

উপায় চারটি হল ঃ—

(১) জরুরী কথায় বা বিশেষ শব্দের ওপরে জোর দিন। গুরুত্ব অনুসারে শব্দের ওপর জোর কমান বা বাড়ান।

(২) নির্দিষ্ট সুরে কথা না বলে—প্রয়োজনমত কথার সুরের ওঠানামার পরিবর্তন করুন।

(৩) একঘেয়ে কথা না বলে—কথার স্বাদের হেরফের করুন।

(৪) প্রত্যেকটি জরুরী কথা শুরু করার পূর্বে এবং কথা শেষ হলে কয়েক মুহূর্ত থেমে থাকুন।

উপরিল্লিখিত প্রত্যেকটি সূত্রের বাস্তব প্রয়োগ এবং অনুশীলনের মাধ্যমেই আপনি কেবল সফল হতে পারবেন—অন্যথা নয়।

বারবার পড়ুন। বিশেষ বিশেষ অংশে লাল পেন্সিল দিয়ে দাগ দিন, এতে করে গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো অবশ্যই মনে গেঁথে যাবে

আপনার। এতক্ষণ ধরে যা বলা হল এসবই আপনার সাফল্যের নতুন দিগন্ত খুলে দেবে—যদি আপনি নিজের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এগুলির অনুশীলন করেন বাস্তব প্রয়োগ ঘটাতে সমর্থ হন।

বইটি বারবার পড়ুন। একবার পড়ে রেখে দেবার বই এটা নয়।

ডেল কার্নেগী ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজীর তরফ থেকে ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব বিষয়ক একটি সমীক্ষা চালানো হয়েছিলো। তথ্যানুসন্ধান ও পরিসংখ্যানের মাধ্যমে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলাম যে—

জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রের চেয়েও, অনেক বড় ভূমিকা জুড়ে থাকে ব্যক্তিত্ব ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের ক্ষেত্রে। এটি একটি ধ্রুব সত্য। একজন সফল ব্যবসায়ীর ব্যবসায়ের বিকাশসাধন এবং ক্রমোন্নতি নির্ভর করে তার মানসিক ক্রমোন্নতি আর ব্যক্তিত্বের মূলধনের ওপরেই।

এখন কথা হচ্ছে—ব্যক্তিত্ব জিনিষটি বা ব্যাপারটা কী? এটা খুবই কঠিন প্রশ্ন। এক কথায় এর কোন সংজ্ঞা আজও কেউ দিতে পারেননি, দেওয়া সম্ভবও নয়। মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে—ব্যক্তিত্ব হচ্ছে—অননুভবনীয় ধরা ছোঁয়ার বাইরে ছলনাময় প্রকাশ ব্যাঞ্জনা—যা এক অর্থে রহস্যময় ধাঁধা উদ্রেক কারী। ব্যক্তিত্ব'র বিকাশ বা পরিবর্ধন সম্পর্কে সঠিক কোন সংজ্ঞা বা ফর্মূলা বলে দেওয়া অসম্ভব। তবে মোটামুটিভাবে ব্যক্তিত্ব বিকাশের পক্ষে অনেকটা সহায়ক হবে—এমন কিছু নির্দেশে আমি আপনাদের জ্ঞাতার্থে আনছি।

(১) যখন আপনি ক্লান্ত বোধ করবেন; দেরী না করে বিশ্রাম নিন। আপনার অন্তর্নিহিত সুপ্ত ক্ষমতাকে বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করুন। শক্তি সঞ্চয় করুন। শক্তি হল প্রাণপ্রাচুর্য্যময়তার জ্বালানী।

(২) যখনই কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে কথা বলতে যাবেন—মিতাহারী হোন। গুরু-ভোজন করবেন না।

(৩) অযথা কথা বলে—বকবক করে শক্তির অপচয় করবেন না।

শক্তি হচ্ছে আপনার জ্বালানী। আর শক্তি হল চুম্বকের মত। যা কিনা অতি সহজেই চুম্বকের সহজ ধর্ম মেনে লৌহস্বরূপ আপনার শ্রোতাকে আকর্ষণ করবে। অর্থাৎ আপনার প্রাণ প্রাচুর্যময় সহজ অন্তরঙ্গ ভঙ্গীর কথাই শ্রোতাকে প্রভাবিত করতে পারবে।

(৪) সুন্দর-মাজিত ছাঁটকাট আর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোশাক আপনার ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহায়ক হবে। আপনার আত্মসম্মান—বোধ বাড়িয়ে হীনমণ্যতা কাটিয়ে উঠতেও পোশাকের ভূমিকা অনেকখানি।

একজন সেলসম্যান—যার পরণে নোংরা অপরিচ্ছন্ন কোঁচকানো ইস্ত্রিবিহিন প্যাণ্ট। জামার বোতাম ছেঁড়া—ঠিকমত লাগানো নেই, জুতোয় পালিশ নেই, কাদা মাখানো। এলোমেলো চুল-আঁচড়ানো নেই। কলম বা পেন্সিল মুখে পুরে চিবুতে চিবুতে জড়ানো গলায় কথা বলা চলে—হাতে ঝোলে পুরোনো বিবর্ণ সেলাই করা রংচটা ব্যাগ; তাকে দেখে একজন দোকানদার বা ব্যবসায়ী কতটা উৎসাহ বোধ করবে বা সেলসম্যানটির বিক্রয়সামগ্রী কিনতে আগ্রহী হবে?

এছাড়া সেলসম্যানটি নিজেই কি পুরোপুরি আত্মবিশ্বাস, আত্ম-মর্য্যাদা বজার রেখে দৃঢ়তা আর বিশ্বাসের সংগে নিজের জিনিষ সম্পর্কে প্রভাবশালী ব্যবসায়ীর কথাবার্তা চালাতে পারবে? না। একদম নয়! সেলসম্যানটির কোন ব্যক্তিত্বই গড়ে উঠবে না ব্যবসায়ীর চোখে—সে হয়ে উঠবে দয়া বা করুণার পাত্র। এক কথায় যার নিজের প্রতি নিজেরই শ্রদ্ধা বা আত্মসম্মান বোধ নেই, বিশ্বাশের দৃঢ়তা নেই—সে কেমন করে অন্য কাউকে প্রভাবিত করবে???

আপনি যদি একজন সফল বিক্রয়-প্রতিনিধি বা ব্যবসায়ী হতে চান তবে উপরে বর্নিত কথাগুলো অক্ষরে অক্ষরে পালন করে চলবেন। এই প্রসঙ্গে সেই বিখ্যাত প্রবাদ-বাক্যটি স্মরণ করা যাক—যে নিজেকেই নিজে সাহায্য করবে না—ঈশ্বর তাকে কেমন করে সাহায্য করবেন!

(৫) হাসির ভূমিকা কী ?

কয়েক হাজার বছর পূর্বেও চীনারা, হাসির মর্ম বুঝেছিলেন। একজন বিখ্যাত চীনা ধর্মীয় প্রশিক্ষক জ্ঞানী বৃদ্ধ কনফুসিয়াস বলেছিলেন—যে লোক হাসতে পারে না তার দোকান খোলা উচিত নয়। হাসি হচ্ছে বন্ধুত্বের চিহ্ন।

তাই হাসিমুখের কদর সর্বত্র। এই সহজ উপায়টি ব্যবসায়ে সাফল্য আর বিক্রয় বাড়ানোর ক্ষেত্রে অসীম কার্যকরী হয়ে ওঠে।

সত্যিকার হৃদয় উদ্বেলিত হাসি আপনার ব্যক্তিত্বের দরজা খুলে দেবে। সাহস আর আনন্দে আপনি ভরপুর হয়ে উঠবেন। মনে দৃঢ়তার অন্তর্নিহিত নদী বয়ে যাবে। আত্মীয় বন্ধু বা আপনার মক্কেলকে হেসে সম্বর্ধনা করুন। এতে করে আপনার ব্যক্তিত্বের সূর্যালোকে তাঁরাও অলোকিত হয়ে উঠবে আত্মীয়ের মত। তাই মুখ হাড়ি করে রাখবেন না। হাসি মুখে মাথা উঁচু করে এগিয়ে চলুন কর্মক্ষেত্রে।

প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন তার স্মৃতি কথায় একবার বলেছিলেন—সুখী হওয়া—কর্মে সাফল্য অর্জন করাটা মানুষের নিজের উপরেই নির্ভর করে। একজন মানুষ যদি সত্যি সত্যি সুখী, হতে চান—বা সফলতা অর্জন করতে চান—তবে তিনি তা হতে পারেন।

সঠিক চিন্তা করার ক্ষমতাই হল প্রধান। আপনি নিজেকে নিজে প্রশ্ন করুন ? আপনি কি সত্যি-ই জীবনে সফলকাম পুরুষ হতে চান ? যদি চান—তাহলে আন্তরিকভাবে দৃঢ়তার সংগে তা কামনা করুন। আমাদের হৃদয় যা চায় আমরা ঠিক তা-ই হই। যদি আপনি সমর্থ, আন্তরিক এবং প্রয়োজনীয় ব্যক্তি হয়ে উঠতে চান—কোনদিকে দৃকপাত না করে মনশ্চক্ষে নিজের সফলতার আলোকে নিজেকে দেখুন। একথা ভুলে গেলে চলবে না মনই হচ্ছে প্রধান আর ইচ্ছার চেয়ে বড় অস্ত্র আর কিছু নেই। তাই মানুষ যদি হৃদয় দিয়ে কিছু কামনা করে—তাহলে তার প্রতিটি আন্তরিক প্রার্থনাই সফল হয়।

আপনি যদি ভেবে চলেন ও মনে করেন যে কর্মক্ষেত্রে আপনি সফলতা অর্জন করতে চলেছেন তাহলেও কাজ হবে। একজন বিশ্ব-বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ বলেছেন—কিছু একটা করবার পর সে বিষয়ের অনুভূতি মনের গহনে প্রবেশ করে। তাই আসলে কাজ এবং অনুভূতি হল টাকার এ পিঠ আর ও পিঠ। তাই কাজকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। তাই ইচ্ছেমত কাজের প্রকৃতি বেছে নেওয়া সম্ভব। তাই কাজের সাহায্যে দরকারমত অনুভূতি সৃষ্টি করা সম্ভব।

তাই অসফল হলে সফল হবার শ্রেষ্ঠ উপায় হল সফলতার ভান করা। পৃথিবীতে কোটি কোটি লোক সফলতার লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য ছুটছে। তাই আপনি যদি সফল হতে চান চিন্তাকে নিয়ন্ত্রণ করুন—সত্যিকার ইচ্ছা করুন। সফলতার ভান করুন।

কীভাবে কথা বলা শুরু করবেন ?

কথা শুরু করাটা সত্যিই খুব কঠিন সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। আর কথা আরম্ভ করাটা খুবই জরুরী ব্যাপার—হেলাফেলা করে কথা বলা শুরু করলে ফল কখনও ভালো হয় না। সুন্দর সতেজ আর প্রাণবন্ত কথা কত সহজেই না শ্রোতাকে প্রতারিত করে ফেলে। তাই আপনি যদি ব্যবসায়ী হন—তবে কথা বলার শুরুতেই যদি খারাপ ধারণা তৈরী হয়ে যায় আপনার মক্কেলের মনে তবে বিক্রির বারোটা বেজে যাবে।

তাই খুব ভেবে চিন্তে যা বলা খুবই প্রয়োজন—সে কথা দিয়েই শুরু করুন। অবান্তর কথা যথা সম্ভব এড়িয়ে গিয়ে ভালোভাবে কার্য্যকরী ভূমিকা আছে এমন প্রসঙ্গ টেনে কথা বলা শুরু করুন।

কখনও কিছু বলতে উঠে দীর্ঘ ভূমিকা টানবেন না যেন। এতো লম্বা চওড়া ভূমিকা কখনই শ্রোতা বা আপনার খদ্দেরকে আকৃষ্ট করবে না বরঞ্চ বিরক্তির শিকার হবে আপনার শ্রোতারা। তাই খুব খেয়াল করবেন যাতে ভূমিকা অযথা দীর্ঘ বা দুচার পাতার বেশী বড় না হয়। স্রেফ দু'চার লাইন, তার বেশী যেন কোনমতেই না হয়।

যত কম শব্দ বা কথা বলে শ্রোতার মনে বেশী প্রতিক্রিয়া বা আবেদন সৃষ্টি করা যায় সেদিকে খেয়াল রাখুন। কথা কম হবে—অথচ বেশী প্রভাবশালী শব্দ-সমৃদ্ধ হওয়া চাই। কম কথা বললেই খদ্দের বা শ্রোতা খুশী হয়—বেশী কথা বললে বিরক্ত হয় এটা মনে রাখবেন সর্বদা। আপনি কম কথা বলেন বলে কেউ কিছু মনে করে বসে থাকবে না।

একমাত্র অনভিজ্ঞ বক্তারাই বলবে শুরুতে দীর্ঘ গৌর চন্দ্রিকা শুরু

করে বা কষ্ট-কল্পিত গল্প ফেঁদে বসে যা কিনা রূপকথার মতই শোনায় আর পুরো বিষয়টাই হাল্কা আর গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে আর শ্রোতার কাছে আপনি হয়ে উঠেন ভাঁড় বা বিদূষকের মতই মজাদার বস্তু। আপনি যদি বিক্রেতা হন—কোন গুরুত্বপূর্ণ বিক্রয়সামগ্রীর—তাহলে ক্রেতারা কখনই আপনার ওপর আস্থা রাখতে পারবেন না। দুটোই খুব খারাপ। ক্ষমা চেয়ে শুরু করা আর রূপকথার মত অবাস্তব গল্প ফাঁদা। খুব কম—খুবই কম—মাত্র একশো জন শ্রোতার মধ্যে একজনই এধরণের কথাবার্তা আমল দেন। আবার অপরদিকে একশোজন বক্তার মধ্যে মাত্র একজনই সফল ও সার্থকভাবে হাস্যরস সৃষ্টির অনবদ্য আবেদনের ভেতরে শ্রোতাকে প্রভাবিত আর জারিত করে ফেলতে পারেন।

আর একটা কথা। গল্প বলার জন্যই যেন গল্প বলা শুরু করবেন না। আপনার মূল বক্তব্যের সংগে যেন তার সংযোগ আর সামঞ্জস্য থাকে তার প্রতি দৃষ্টি রাখবেন—নাহলে পুরো ব্যাপারটাই হয়ে উঠবে হাস্যকর আর অর্থহীন। আর একটা কথা বলছি। হাস্যরস হচ্ছে বক্তব্যের একঘেয়েমী কাটানোর ওষুধ। অর্থাৎ কেক জমাতে যেমন ঠাণ্ডা বা বরফের আচ্ছাদন দরকার হয়—কিন্তু কেক তৈরী করার পেছনে এর কোন ভূমিকা নেই জোরালো, ঠিক তেমনি। কখনও কোন অবস্থাতেই ক্ষমা চাইবেন না। ক্ষমা-প্রার্থনা বিষয়ক কথার নামগন্ধও যেন বক্তব্যে না থাকে। ওটা বিপদজনক অস্ত্র হয়ে ওঠে আর যা কিনা আপনার বিরুদ্ধেই প্রয়োগ করবে—শ্রোতারা। শ্রোতারা এ ধরণের কথাতে বিরক্ত হয়। যা বলা জরুরী শুধুমাত্র সেটাই বলুন—যথাসম্ভব সংক্ষেপ করুন—দেখবেন একশো গুণ বেশী ফল হচ্ছে।

একজন বক্তা তার শ্রোতাকে মনোযোগী আগ্রহী আর প্রভাবিত করে তুলতে পারে কয়েকটি সহজ নিয়মের অনুশীলনের মাধ্যমে।

(১) শ্রোতার মনে কৌতূহলের উদ্রেক করুন।

(২) মানবতার জয়গান হয় এমন কোন গল্প বা ঘটনা দিয়ে বলতে শুরু করুন।

(৩) কোন সুন্দর যুক্তিপূর্ণ উদাহরণ সহযোগে আরম্ভ করুন।

(৪) কোন কিছু প্রদর্শনীর ব্যবস্থা রাখলে খুবই ভালো ফল হবে।

(৫) শ্রোতাকে সরাসরি কোন প্রশ্ন বা অনুরোধ মূলক জিজ্ঞাসাবাদ করুন।

(৬) কোন বিখ্যাত ব্যক্তির উক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে নাটকীয় ভাবে শুরু করুন।

(৭) রোমহর্ষক বা জোরালো কোন ঘটনার বর্ণনা দিয়ে বলতে শুরু করুন।

(৮) দায়সারা ভাবে কোন বক্তব্য যেন কখনও রাখবেন না। এতে ভালোর চেয়ে মন্দ হয় বেশী। আপনার নিজেরই যে বিষয়ে আগ্রহ নেই—সেখানে আপনি কি করে আশা করতে পারেন যে অন্য কেউ আপনার কথায় প্রভাবিত হবে।

তাই সাবধান থাকবেন—সতর্ক থাকবেন, কখনও যেন ঢিলেঢালাভাবে দায়সারা ভাবে বক্তব্য রাখতে যাবেন না।

কীভাবে এবং কেমন করে কথা শেষ করবেন ?

কথা আরম্ভ করা যেমন কঠিন—শেষ করাটাও তেমন কঠিন। বরং বেশী কঠিন। কারণ এতক্ষণ পর্যন্ত আপনি যা বল্লেন তার সব সারকথা লাটিমের দড়ি গোটানোর মতই শেষ কথাতে গুটিয়ে নিতে হবে কৌশলের সংগে; অথচ যা কিনা শ্রোতাকে প্রভাবিত করে তুলবে আপনার বিষয়ে। না হলে পুরো বলাটাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। কথায় বলে ঃ সব ভালো, যার শেষ ভালো।

সমীক্ষা নিয়ে দেখা গেছে যে—বক্তা তার বক্তব্যের শেষে কোন কথাটা বলেছে সেটা শ্রোতার মনে থাকে অনেক বেশী।

অনেক বক্তা আবার এক ধরণের মূর্খতার পরিচয় দেন বেশী কায়দা দেখাতে গিয়ে। যেমন—"এতক্ষণ পর্যান্ত আমি আপনাদের সামনে আমার যা কিছু বলার ছিলো সবই বললাম—আর আমার কিছু বলার নেই। তাই আমি আমার বক্তব্য আমি এখানেই শেষ করছি।"

বক্তব্য শেষ করে থামতে যাচ্ছেন—খুব ভালো কথা। কিন্তু কখনই জানিয়ে থামবেন না বা 'আমি থামছি এখানে' এই বলে কথা শেষ করবেন না।

এতে করে বক্তব্যের গুরুত্ব হ্রাস পায়। থামুন। কিন্তু থামার বিষয়ে কোন ঘোষণা করে থামবেন না।

৭টি ম্যাজিক—ফর্মূলার কথা আপনাদের আমি বলবো—যার সাহায্যে আপনারা কথা শেষ করতে পারবেন।

(১) বক্তব্যের সংক্ষিপ্তকরণ, সরলীকরণ, মূল বিষয়ের ওপর আলোকপাত করার চেষ্টা করুন।

(২) নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাত সৃষ্টি করুন।

(৩) শ্রোতাকে প্রশংসা করুন।

(৪) শ্রোতার মনে হাস্যরস সৃষ্টি করুন।

(৫) কবিতার লাইন উদ্ধৃত করুন।

(৬) বাইবেল বা কোন মহাকবির রচনা থেকে জোরালো উদ্ধৃতি দিন।

(৭) নাটকীয়ভাবে ঘটনার পরিণতির দিকে বক্তব্যকে এগিয়ে নিয়ে যান।

কি করে বক্তব্যকে প্রাঞ্জল করে তুলে ধরবেন

আপনি কি বলতে চাইছেন সেটা যাতে ভালো ভাবে পরিষ্কারভাবে শ্রোতা বুঝতে পারেন—সে দায়িত্বভার আপনার। যদিও এটা খুবই কঠিন দায়িত্বের একটি—তবুও বক্তাকে সচেতন থাকতেই হবে যেন শ্রোতারা কথার সঠিক মানে বুঝে ফেলতে পারে।

যীশুখৃষ্ট কথাটার মর্যাদা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তিনি অদেখা-অদৃশ্য জিনিষের সম্পর্কে বলতে গিয়ে দেখা যায় শোনা যায় এমন জিনিষের তুলনা দিয়েছিলেন।

যদি আলাস্কা সম্পর্কে কাউকে আপনি কিছু বলতে চান—তবে আয়তন, জনসংখ্যা, দৈর্ঘ্য-প্রস্থ এসব কথা না বলে আলাস্কার সংগে মিল আছে এমন কোন কোন দেশের তুলনামূলক বক্তব্য দিয়ে শুরু করুন। এতে করে শ্রোতারা তাদের জানা-চেনা জিনিষের সংগে মিল খুঁজে পাবে আর খুব সহজেই বুঝে নিতে পারবে ব্যাপারটা।

অল্প লেখাপড়া জানা অত শ্রোতার কাছে তথ্যবহুল পাণ্ডিত্যপূর্ণ সারগর্ভ বক্তব্য যেন কখনই রাখবেন না।

এটা শুধু বিপদজনক নয়—অর্থহীন, পাগলের প্রলাপ বকার মতই হয়ে দাঁড়াবে।'

যে জিনিষ নিয়ে বা যে বিষয়ে আপনি বলবেন তা যেন আপনার কাছে রৌদ্রস্নাত দিনের মত সূর্যকরোজ্জ্বল হয়ে ফুটে ওঠে মনের মধ্যে—তা না হলে শ্রোতা বা আপনি কেউই পরস্পরের কাছে বোধগম্য হয়ে উঠবেন না।

এমন শব্দ নির্বাচন করুন যাতে করে শ্রোতার মনে-বক্তব্য বিষয়ের একটি পরিষ্কার হবে ফুটে ওঠে—শ্রোতা যেন চোখের সামনে তা

দেখতে পান। তবেই হয়ে উঠবে আপনার বলা সার্থক এবং অর্থবহ। না হলে শুধুই বলা হবে—কাজ হবে না কিছুই।

কখনও একই কথা বা বিষয় নিয়ে পুনরাবৃত্তি, করবেন না। একই কথা বা বিষয় নিয়ে পুনরাবৃত্তি করবেন না। একই ঘটনা নিয়ে বারবার উল্লেখ করে ঘটনার গতিকে বিষয়বস্তুর প্রবাহকে শ্লথ করবেন না।

বিষয়বস্তুর গুরুত্বের ক্রমানুযায়ী বক্তব্য সাজান। কোন কোন শব্দ বা ঘটনার বিবরণ দেওয়ার সময় একটু বেশী জোর দিন। একই সুরে কণ্ঠস্বরের ওঠানামা—বিহীন কথা বলা শ্রোতাকে বিরক্ত করে তোলে।

বিরাট বিস্তারে না গিয়ে ছোট পটভূমিকায় বক্তব্য রাখা অনেক সহজ হয়ে ওঠে; মূল বক্তব্যের গভীরে ঢোকা সহজ হয়।

আপনি যা বলতে চাইছেন তার একটি সারমর্ম বক্তব্য শেষ করার পূর্বে শ্রোতার মনে একটু ঝালিয়ে তোলার চেষ্টা করুন।

কি করে শ্রোতার মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হবেন?

পৃথিবীতে জনমত নির্বিশেষে ৩টি জিনিষ সবাইকে আকর্ষণ করে চলে প্রতিনিয়ত। তারা হল ঃ—

(১) যৌনসম্পর্ক। নবনারীর যৌনসম্পর্কিত বিষয়।

(২) বিষয়, সম্পদ, অর্থ।

(৩) ধর্ম বা ধর্মীয় বিষয়মূলক চেতনার বিশ্লেষণ।

আমরা সবাই অতি সাধারণ জিনিষ নিয়ে অসাধারণ কিছু শুনতে ভালোবাসি। পছন্দ করি। আমরা সবাই নিজের কথা শুনতে ভালোবাসি। মনের গভীরে নিজের প্রশংসা শোনবার বাসনা ক্রমশঃ উন্মুখ হয়ে ওঠে—প্রখর হয়ে ওঠে। তাই যিনি শ্রোতার মনের কথা বলতে পারবেন তিনি-ই জিতবেন। যে বক্তা শ্রোতার হৃদয়তন্ত্রীতে সঠিক ঘা দিয়ে বাজাতে জানেন তিনি-ই শ্রোতাকে প্রভাবিত করে করে কার্যোদ্ধার করতে পারবেন। জমানো গল্প, লোকজনের গল্প—

শ্রোতাকে আগ্রহী করে তোলে মনোযোগী করে বক্তব্য শুনতে। বক্তা প্রথমে মাত্র কয়েকটি মূল বিষয় নিয়ে কথা শুরু করবেন—পরে প্রয়োজনবোধে তার ওপর মালমসলা আর ঘটনা ও উদাহরণের রং চড়াবেন।

কখনও এমন কথা ভুলেও উচ্চারণ করবেন না বা ভাববেন যে আপনি জ্ঞানী আপনি একজন বিরাট বোদ্ধা—আপনার প্রচুর পড়া-শুনো—জ্ঞানের চলমান জাহাজ আপনি। শ্রোতাকে সরাসরি আঘাত দেওয়া আর আপনারা কিছু জানেন না বলে বক্তব্য রাখা একই কথা। কখনও একথা বলে বলতে শুরু করবেন না যে আপনি কিছু প্রমাণ করতে চলেছেন বা কিছু শেখাতে যাচ্ছেন। এতে উল্টো ফল হয়। পরিস্থিতি আপনার প্রতিকূলে চলে যায়। নিজেকে বেশী বুদ্ধিমান ভেবে কিছু জ্ঞান দেওয়ার চেষ্টা করতে যাবেন না কখনও। এমনিতে অন্যের মত বদলানো খুবই কঠিন। প্রভাব বিস্তার করা আরও কঠিন। সেক্ষেত্রে কঠিন-ধর্মী বিরোধী গড়ে তুলে কি লাভ? এতে করে নিজের ক্ষতি নিজেই করবেন।

অনেক বছর আগে সক্রেটিস এথেন্সে তাঁর শিষ্যদের একটি কথা প্রায়ই বলতেন—আমি জানি একটা জিনিস, তা হল আমি কিছুই জানিনা।

আপনি এ থেকে শিক্ষা নিন। কারণ আপনি নিজেকে নিশ্চয়ই সক্রেটিসের চেয়ে বেশী জ্ঞানী বা পণ্ডিত ভাবেন না।

আর একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ও রাজনীতিবিদ তাঁর ছেলেকে উপদেশ দিয়েছিলেন—যদি সম্ভব হয় অন্যের চাইতে জ্ঞানী হওয়া—সেটা খুবই ভালো কথা। সুখের বিষয় হবে। কিন্তু দুঃখের কথা হয়ে উঠবে তখনই, যখন অন্যকে বলতে শুরু করবে যে তুমি অন্যের চেয়ে বেশী জানো, আর জ্ঞানী।

তাই ইচ্ছের বিরুদ্ধে কখনও অন্য লোককে কিছু বলবেন না—তাতে করে তার মত পাল্টানো দূরের কথা—সে শত্রু হয়ে উঠবে।

আপনি যদি বিক্রয় প্রতিনিধি হন—তবে কখনও ক্রেতার মনের প্রতিকূলে কোন তর্ক করবেন না বা উপদেশ দেবেন না। কারণ ওইভাবে মন বদলানো যায়না। তাই যতদূর সম্ভব কথা কম বলে শ্রোতার মনে প্রভাব বিস্তার করুন।

তাই যদি সহজেই শ্রোতার মন জয় করে প্রভাবিত করতে চান তবে একটি সহজ উপায় হল শ্রোতা যে বিষয়ে কথা শুনতে চায় সে বিষয়ে কথা বলুন।

কেন আপনি এ বই পড়লেন ?

এ বই পড়ে আপনার কি লাভ হলো ?

এরপর আপনি কি করবেন ?

এ পর্যন্ত যা বলা হল তার বাস্তব অনুশীলনই কেবলমাত্র আপনাকে সাফল্যের নতুন দিগন্তে পৌঁছে দিতে পারে। আপনি যে পরিস্থিতিতে যত প্রতিকূল পরিবেশেই থাকুন না কেন কখনও যেন মনোবল হারাবেন না। একজন লোক যখন তার নিজের ওপরে আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেন তখন তিনি সবকিছুই প্রায় হারাতে বসেন।

এ প্রসঙ্গে একজনের জীবন সম্পর্কে কিছু বলবো—যা আপনাকে সাহস দেবে—অনুপ্রেরণা যোগাবে। তাঁর দৃষ্টান্তের অনুসরণে' আপনার জীবনে সাফল্যের নতুন দিগন্ত খুলে দেবে।···বালকটি ছিলো খুবই গরীব। দু'বেলা খাবার জুটতো না। শৈশবে বাবা মারা গেলে —খুবই কষ্টেস্বষ্টে দিন চলতো। মার সামান্য রোজগারে চলতো না চলতো না দেখে দৈনিক আড়াইটাকা মজুরীতে কেরানীগিরি করতেন। অভাব আর অভিযোগ তাকে দুশ্চিন্তা ও অনিদ্রার অসুখী রুগী করে তুলেছিলো। তাই তিনি সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে টাকা রোজগার করতে চেয়েছিলেন। যাতে করে কষ্টের দিন পেরিয়ে যেয়ে সুখী হওয়া যায় —মাকে কষ্টের হাত থেকে বাঁচানো যায়। অফিসে কাজ করে— অবসরে আরো নানারকম আয়ের পথ করে নিয়ে, রাত জেগে পড়াশুনো করতেন, পরীক্ষা চালাতেন বৈজ্ঞানিক বিষয়ের ওপর। টুলে বসে বসেই বা বেঞ্চিতেই ঘুমিয়ে নিতেন। এমনও হয়েছে তিনচারদিন একই পোশাক পরে থেকেছেন। নামমাত্র খেয়ে রয়েছেন।

এমনিভাবে তিনি তাঁর প্রথম ছবি তোলার শুকনো প্লেট তৈরী

করলেন। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। জীবিত অবস্থায় তিনি পঞ্চাশ কোটিরও বেশী টাকা জমিয়েছিলেন। এক অত্যাশ্চার্য বৈজ্ঞানীক আবিষ্কারে তিরি সারা পৃথিবীর শ্রদ্ধাভাজন হয়েছিলেন। তিনি স্বচ্ছ ফিল্মের আবিষ্কর্তা—যাঁর ফলে আজকের চলচ্চিত্রভাবনা সম্ভব হয়েছে। তিনি আর কেউ নন। আপনারা নিশ্চয়ই এতক্ষণে তাঁকে চিনে ফেলেছেন। তিনি হলেন—জর্জ ঈস্টম্যান।

কীভাবে কেমন করে শব্দ সম্ভার বাড়ানো যেতে পারে? এর কি কোন পথ আছে? সহজ কোন উপায়? না ঠিক তেমন কিছু আমার জানা নেই। তবে কিছু কিছু জনিষের অনুশীলনে শব্দ-মৌলীর স্বাস্থ্যবৃদ্ধি হয়।

পৃথিবীখ্যাত লেখক মার্কটোয়েন যে পদ্ধতি অনুসরণ করে শব্দ-সম্ভার বাড়াতে পেরেছিলেন সেটাই আপনাদের বলছি।

প্রথম যৌবনে মার্কটোয়েন ছিলেন একজন ভ্রমণকারী। আবিষ্কারকের চোখে নানা কষ্টসাধ্যভাবে তিনি পরিভ্রমণ করেছেন মিসৌরী থেকে নেভাডা পর্য্যন্ত। সংগে রাখতেন ওয়েবস্টাররে—অভিধান। প্রতিটি চেনা-পরিচিত বা অচেনা দৃশ্যাবলীর খুঁটিনাটি বিবরণের সংগে মিলিয়ে তিনি ঝালিয়ে নিতেন তাঁর শব্দ-শৈলী, কারণ তিনি মনেপ্রাণে চেয়েছিলেন প্রচুর শব্দ-সম্ভারের রহস্যময় জগতের দেবতা হতে। আর পরবর্তী জীবনে তিনি তা হয়েওছিলেন সাহিত্যিক হিসাবে. তিনি ছিলেন খুবই উঁচু পর্যায়ের এবং সার্থক লেখনীর অধিকারী।

আমাদের সামনে মোটামুটিভাবে চারটি উপায় বা পথ আছে যার

যথার্থ প্রয়োগ আর অনুশীলনে আমরা সফল হবো জনসাধারণের সংগে মেলামেশা করতে এবং সঠিক প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হতে। নীচে ৪টি উপায় বর্ণিত হলো ঃ

(১) আমরা কী করবো বা করতে চাইছি

(২) কীভাবে কোন দৃষ্টিভংগীতে আমরা কোন বিষয়কে দেখবো।

(৩) আমরা যা বলবো

(৪) কেমন করে বলবো

আপনার কথা বলার রুচি এবং শব্দচয়ন নির্ভর করে আপনি কেমন পরিবেশে থাকেন বা কাদের সংগে মেশেন তার ওপর। তাই ও বিষয়ে প্রেসিডেন্ট লিংকনের পথ অনুসণ করুন।

প্রেসিডেন্ট লিংকন সময় সুযোগ পেলেই সাহিত্যিক কবি ও নাট্যকারের সংগে মেলামেশা করতেন। এতে করে তাঁর মানসিক প্রস্তুতি আর শব্দ-শৈলীর উন্নয়ণ ঘটতো। তিনি নতুন নতুন শব্দের সঠিক ব্যবহার শিখতেন। তাই আপনিও আপনার অবসর সময়, বিকেল বা সন্ধ্যা, কোন কবি-সাহিত্যিক বা শিল্পীর সংগে কাটাতে চেষ্টা করুন। তাহলে আপনার শব্দজ্ঞান সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে।

আপনার কথাবার্তায়—শব্দ চয়নে। সময় পেলে শেক্সপীয়রের সংগে পরিচয় করুন, নিজের জ্ঞান বাড়াতে সাহায্য করুন।

মিলটন বা ইউক্লিড পর্যন্ত পড়া উচিত। জানা উচিত। বাস্তবে অনুসরণ করুন। অনুশীলণ করুন।

খবরের কাগজ পড়া বন্ধ করে—সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করে অনেকে নিজেকে বেশী সুখী ভাবেন। যখনই কোন কিছু পড়বেন। সংগে অভিধান রাখুন। কোন অপরিচিত অজানা শব্দ পেলেই বিশদ জানার চেষ্টা করুন। চেষ্টা করুন নতুন শেখা শব্দটির প্রয়োগ করতে। এতে করে স্মৃতিতে গেঁথে যাবে শব্দটি।

শব্দের ব্যুৎপত্তি জানা থাকলে, সে শব্দটির সঠিক ব্যবহারে আপনার বিশেষ অধিকার জন্মাবে।

এ বই শেষ হয়ে এলো। পরিশেষে গুটিকয়েক কথার পুনরাবৃত্তি না করলে বইয়ের শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

নিজেকে প্রকাশ করার ইচ্ছে মানুষের চরিত্রের এক বিরাট দিক। তাই যখনই কাউকে দিয়ে কোন বিশেষ কাজ করিয়ে নেবার দরকার হবে—তখন সেই কাজটি সম্পর্কে তার মনে আগ্রহ আর আন্তরিক শ্রদ্ধার মূল্যবোধ গড়ে তুলুন। তাহলেই সুফল ফলবে।

আর একটা কথা সর্বদা মনে রাখবেন—নিজেকে প্রকাশ করার রাস্তা আপনাকে নিজেই খুঁজে নিতে হবে।

আপনার গভীর আগ্রহ, ঐকান্তিকতা, শেখবার জানবার প্রবল ইচ্ছে না থাকলে কর্মদক্ষতা বাড়াতে বা দৃঢ় নিশ্চয় ভাব বাড়াতে কখনই সক্ষম হবেন না।

এ বইয়ের মত ও পথ অনুসরণে ও অনুশীলনের মাধ্যমেই আপনি সফল হতে পারবেন অন্যথা নয়।

এই বইটি কেমনভাবে কী করে পড়লে আপনি অতি দ্রুত অধিক সুফল পারেন সে সম্পর্কে কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য নিচে বর্নিত হলে

(১) বইটি একবার পড়ে রেখে দেবেন না। শুধুমাত্র পড়ার জন্য পড়ার বই এই এটি নয়। এর আসল রহস্য হল—বইতে লেখ পদ্ধতির সঠিক অনুসরণ।

* * * *

(২) বইটি বার বার পড়ুন। হাতের কাছে রাখুন। বইটিকে আপনার প্রাত্যহিক ব্যবহারিক জীবনের একটি অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী বলে মনে করুন।

* * * *

(৩) পড়ার সময়, পড়তে পড়তে থামুন। একটু ভেবে দেখুন আপনি কি পড়ছেন। এক নিঃশ্বাসে দ্রুত চোখ বুলিয়ে গেলে কোন ফল হবে না।

(৪) লাল পেন্সিল সংগে রাখুন। পড়তে পড়তে যে অংশগুলো বেশী গুরুত্বপূর্ণ মনে হবে তাতে দাগ দিন।

* * * *

(৫) প্রতিদিন বইটিতে অন্ততঃ একবার চোখ বুলিয়ে নেবার চেষ্টা করুন। তাতে করে অনেক সমস্যার জট ছাড়াতে সুবিধা হবে আপনার।

* * * *

(৬) নিয়মগুলো বাস্তবে প্রয়োগ করুন। কেবলমাত্র সঠিক অনুশীলনের মাধ্যমেই সফল হতে পারবেন আপনি। তাই নিয়মিত অভ্যাস করুন।

* * * *

(৭) এই বইয়ের নিয়মগুলোর বাস্তব প্রয়োগ ও অনুশীলনের যে অমূল্য শিক্ষা আপনি পাবেন, তা আপনার বুদ্ধিকে মানবিক সম্পর্ক উন্নয়ণের ক্ষেত্রে সঠিক ব্যবহারে সাহায্য করবে।

* * * *

(৮) খুব দ্রুত আপনি লোকের সংগে মিশতে সঠিক ও বাস্তব ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে পড়বেন।

* * * *

(৯) ডায়েরী লেখার অভ্যাস করুন। প্রতিদিন যত লোকের সংগে মেলামেশা করবেন, তাদের নাম-ধাম-পেশা তার বিস্তৃত বিবরণ স্পষ্ট করে লিপিবদ্ধ করুন। দেখবেন একদিন ঠিক কাজে লাগবে।

* * * *

(১০) এই বইয়ের পথ অনুসরণ করলে আপনার সাফল্যের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে অচিরেই।

এ বইতে যে সব নিয়মকানুন দেওয়া আছে সে সব কে শুধুমাত্র পুঁথিগত বিদ্যা না ভেবে—সত্যিকার আন্তরিক ইচ্ছার সংগে অনুশীলন

করে গেলে—আপনার জীবনে ম্যাজিকের মত ফললাভ হবে—জীবনের মোড় ঘুরে যাবে—আমূল পরিবর্তন হবে।

আমার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে আমি আপনাদের পুণরায় অনুরোধ করবো—বই না ভেবে—সঠিক অনুসরণ ও অনুশীলন করুন—সাফল্যের নতুন দিগন্ত খুঁজে নিন।

॥ সমাপ্ত ॥